হাসান আজিজুল হকের শ্রেষ্ঠ গল্প

শ্রেষ্ঠ গল্প

হাসান আজিজুল হক

অনুষ্টুপ
২ই নবীন কুণ্ডু লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

SRESTHA GALPA

best short stories of

HASAN AZIZUL HAQUE

প্রকাশ : বইমেলা ১৯৫৫

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : অনিল আচার্য । অনুষ্টুপ

২ই নবীন কুণ্ডু লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেক্‌নোপ্রিণ্ট

৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভ্রাতৃপ্রতিম

সুশীল সাহা-কে

শ্রেষ্ঠ গল্প প্রসঙ্গে

হাসান আজিজুল হকের জন্ম অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলায়। সেখান থেকে খুলনা হয়ে তিনি রাজশাহী নিবাসী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। বিগত চারদশক যাবৎ তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন মূলত গল্পকার হিসেবে। কিশোরদেব জন্য তার একটি উপন্যাস 'লাল ঘোড়া আমি' এবং একটি প্রবন্ধের বই। হাসানেব উজ্জ্বল উপস্থিতি বাংলাদেশের সাহিত্যে একটি নতুন ধাবা সৃষ্টি করেছে। হাসানেব প্রথম গল্প 'শকুন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে আর তার শেষ যে-গল্পটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেটি লেখা হয়েছে ১৯৫৪ সালে। বিগত চৌত্রিশ বছর তার গল্পেব মোড ফিরেছে অন্তত তিনবার। ১৯৬০ থেকে ১৯৫০ এবং ১৯৫০ থেকে ১৯৫০ এবং ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪। ১৯৬০ থেকে তাঁর লেখালেখিতে প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্লীন সম্পর্ক, প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'জীবন ঘষে আগুন'। মানুষের দেশত্যাগের যন্ত্রণা এবং বাধ্য হয়ে দেশে আটকে থাকা এ-দুয়েবই প্রতিফলন তাঁর 'খাঁচা' গল্পে। তাঁর শেষ গল্প 'মা-মেয়ের সংসার'। গত চৌত্রিশ বছর ধরে লেখা গল্প থেকে সংকলন করে আমরা অনুষ্টুপ থেকে প্রকাশ করছি 'হাসান আজিজুল হকের শ্রেষ্ঠ গল্প'। এর আগে বাংলাদেশ থেকে হাসান আজিজুল হকের বেশ কযেকটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই গল্প-সংকলন তুলনায় অনেক সুগ্রন্থিত এই অর্থে যে হাসান আজিজুল হক, আমি এবং সুশীল সাহা এই তিনজন মিলে অনেক আলোচনা করেই গল্পগুলি নির্বাচন করেছি। প্রকাশিত লেখার ক্ষেত্রে হাসানের দুর্বলতা প্রায় নেই বললেই চলে। তিনি 'নির্বাচিত গল্পের' ভূমিকায় লিখেছেন—'বাস্তবকে সামনে রেখেই যে লেখা বাস্তবকেই ফিরে নির্মাণ করতে চায়, তেমন লেখার বেলায় কথাটা আরো সত্যি। নিজের লিখিত ও মুদ্রিত রচনার প্রতি আমার বরং বিমুখতাই আছে। যে লেখা-গুলি এখনো লেখা হয়ে ওঠেনি, ভবিষ্যতে লিখবো বলে ভাবি, সেই লেখাগুলির ওপরেই আমার সমস্ত দুর্বলতা।'

তবে মুশকিল হলো এই যে, ভবিষ্যতে যে লেখাগুলি তিনি লিখবেন বলে ভাবেন, তা অনেক সময় হয়ে ওঠে না। হাসান লেখেন বড়ই কম। আর তার

চাইতে বড সমস্যা—তিনি দেশ ও কালের সমস্যার সঙ্গে প্রায়শই জড়িয়ে যান। মিটিং, মিছিল, আড্ডা, সাংস্কৃতিক সংগঠন তার প্রচুর সময় নিয়ে নেয়। লোকের বিপদে-আপদে দৌড়ে যাবার 'বদ অভ্যাস' থেকে 'লেখক-অভিমানে' মুক্ত হতে পারেন না। ফলত সংসার এবং লেখা যেহেতু নিজের কাজ, সেটা তেমন করে করতে পারেন না হাসান আজিজুল হক।

না পারুন, নিয়ম করে নাই বা সকাল বিকেল লিখলেন তিনি। তাঁর গল্প পড়লে বোঝা যায় একটি গল্প নিয়ে কত ভাবেন তিনি। লিখতে গেলে কত যন্ত্রণা পান তিনি। আর এই যন্ত্রণার ফলে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে যদিও হাস্যরসপরায়ণ, তার লেখায় ঢুকে পড়ে এক দার্শনিক। সে তার গল্পের নির্মাণ, বাণী ও বাস্তবকে ধরে রাখে এক অনন্য শৈল্পিক সৌন্দর্যে। তার গল্পের গাথুনি এবং তার চিত্রকল্পের ব্যবহারে জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রকৃতি, জীবন ও বাস্তব। এই উপমহাদেশে এমন এক-জন গল্পকারের আবির্ভাব বিরল ঘটনা। সামান্য হলেও গল্পের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নিজেকে যেমন গর্বিত মনে হয়, তেমন মনে হয় আরো একটু বেশি লিখুন হাসান আজিজুল হক।

বইমেলা ১৯৫৫

অনিল আচার্য

সূচি

শ্রেষ্ঠ গল্প

শকুন

কয়েকটি ছেলে বসেছিল সন্ধ্যার পর। তেঁতুলগাছটার দিকে পিছন ফিরে। খালি গায়ে ময়লা হাফশার্টকে আসন করে। গোল হয়ে পা ছড়িয়ে গল্প করছিল। একটা আর্তনাদের মতো শব্দে সবাই ফিরে তাকাল। তেঁতুলগাছের একটা শুকনো ডাল নাড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে, সোঁ সোঁ শব্দে একটা বিরাট কিছু উড়ে এলো ওদের মাথার ওপর। ফিকে অন্ধকারের মধ্যে গভীর নিকষ একতাল সজীব অন্ধকারের মতো প্রায় ওদের মাথা ছুঁয়ে সামনের পোড়ো ভিটেটায় নামল জিনিসটা।

হৈ চৈ করে উঠল ছেলেরা, ছুটে এলো ভিটেটার কাছে। আবছা অন্ধকারে খানিকটা উঁচু মাটি আর অন্ধকার একটা ঝোপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না তাদের। কিন্তু ওদের সর্দার ছেলেটি বুঝতে পারল হামেশা দেখা যায় এমন পাখিদের মধ্যে শকুনই তীব্রবেগে মাটিতে নেমে তাল সামলানোর জন্য খানিকটা দৌড়ে যায়। তাই তার চোখেই প্রথম পড়ল অন্ধকারের তালটা দৌড়তে দৌড়তে খানিকটা এগিয়ে বিব্রত, হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেটি বলল, ভয়চকিতস্বরে। কিরে ওটো? আর একজন জবাব দিল, মুটেই বুঝতে পারচি না।

পাখি ওটো।

পাখি-টাখি হবে।

ক্যা জানে, সজেব্যালায় ক্যার মনে কি আচে? সে বুকে থুথু দিল। অনড় হয়ে রয়েছে অন্ধকারের দলাটা। লুকিয়ে যাওয়ার একটা ভাব, পারলে কোনো বহু পুরনো বটের কোটরে, কোনো নোংরা পুরীষর গন্ধের বিকট আবাসে, কোনো নদীর তীরে চেনাঝোপের নীচে শেয়ালের তৈরি গর্তে লুকিয়ে যাওয়ার মতলব।

শ্যালা। ক্যার মনে কি আচে, ক্যা কি চায়, ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে। চ' বাড়ি যাই।

দলের মধ্যে গোরু চরানো রাখাল আছে। স্কুলের ছাত্র আছে। স্কুলের ছাত্র অথচ সুযোগ পেলেই গোরু চরায়, ঘাস ক্যাটে, বীজ বোনে এমন ছেলেও আছে।

তু তো ভীতু, দ্যাখলাম একটো জিনিস, শ্যাষ পর্যন্ত দেখি দাঁড়া।

না, আমি চলে যাব।

তু যা গা তবে, আমরা যাব না।

ক্যারে বাড়ি যেচিস, তেঁতুলতলাটা পার হয়ে মজা দ্যাখগা। স্কুলে পড়ে সেই ছেলেটি বলল, জিনিসটো দেখতে হবে।

প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বড় ছেলেটা এগিয়ে গেল। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে।

এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত সুন্দর জিনিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো সেই কুৎসিত জীবটা।

সর্দার ছেলেটি জানত, সেটা একটা বুড়ো শকুনি। নির্বাক, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ।

একেবারে কাছে এগিয়ে গেল সে। এত কাছে যে হাত বাড়ালে ধরা যায়।

শ্যালা, ক্যার মনে কি আচে, ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে—রাখালটা তখনও বিড়বিড করছে।

একটা দমকা বাতাসে অজস্র শুকনো পাতা ঝরে পড়ল। পুকুরের পানিতে প্রথমে মৃদু কম্পন, তারপর আস্তে আস্তে ঢেউ উঠল—কার হাত থেকে কোথায় ধাতব কিছু পড়ে বিশ্রী অস্বস্তিদায়ক একটা শব্দ হলো।

ছেলেটা একদম কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল সত্যিকারেই সেটা একটা শকুনি—আলো থাকতে থাকতে বাসায় ফিরতে পারেনি। এখন রাতকানা। বিকট উগ্র একটা দুর্গন্ধ ওর নাকে এলো—ভাগাড়ের আঁশটে গন্ধ মাখানো, গলিতজন্তুর শবদেহের পচা পাঁকে সে যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছে। শকুনি কুকুরে লড়াইয়ের শেষচিহ্ন এখনো একটা ছিটকে বেরিয়ে আসা মোটা খসখসে, নোংরা পালক থেকে টের পাওয়া যায়।

মারামারি করেচে শালা ঠিক সারা দোপরবেলা। এখনো ধুঁকচে। পলটু এগিয়ে এলো। পিছু পিছু জামু, এদাই। আরও অনেকে যারা ছিল।

পলটু বলল, শিকুনি লয়?

হ্যাঁ দেখতে পেচিস না?

মোল্লা শিকুনি লয় তো?

বোধহয় মোড়ল শিকুনি।

রাখাল জামু বলল, মেদী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ!

সর্দার রফিক বলল, তু তো গোরু। তাই গোরুর মতন কথা বলিস।

শকুনটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ হয়ে। বোধহয় সে পছন্দ করছে না এই বিরক্তিকর ক্লান্তিজনক পরিস্থিতি। রফিক হাঁক দিল, আয় খানিক মজা করি —আর নাচাই খানিকটো ওটোকে।

হৈ হৈ করে উঠল ছেলের দল। বাড়ি যাবার ইচ্ছা অথচ ভয়ে তেঁতুল-তলাটা পার হতে পারছে না সেই যে ছেলেটি, সেও চেঁচিয়ে উঠল।

রফিক এগিয়ে শকুনিটার ডানা ধরে ফেলল। ততক্ষণে চেতে উঠল কুৎসিত পাখিটা, অত সহজে সে ধরা দিতে চায় না। নোংরা বিরাট দুটো পাখা মেলে বিচ্ছিরি নখওয়ালা পা দুটো চরম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চালিয়ে দৌড়তে শুরু করল সে গাঁয়ের সরু গলিটার মধ্যে দিয়ে।

এইভাবেই ওরা ওড়বার প্রস্তুতি নেয়, ভারমুক্ত করবার চেষ্টা করে নিজেকে। বোধহয় সে শেষ পযন্ত উড়তে পারত—অন্তত মুক্তি পেত এই অসহনীয় শিশুদের হাত থেকে—তাদের হিংস্র কৌতূহল আর প্রাণান্ত খেলার খপ্পর থেকে। কিন্তু তার চোখে দৃষ্টি নেই—চলার কোনো সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নেই। শকুনিটার মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। পেছনে পেছনে একদল খুদে শয়তানের মতো প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছেলের দল নিষ্ঠুর আনন্দে ধাওয়া করেছে।

কিন্তু পাখিটা পার হতে পেরেছে অন্ধকার গলিটা। কারণ গলিটা কানাগলি নয়। গলির দু'পাশের দেয়ালের ফুটোয় যে সাপগুলো গ্রীষ্মের গরমে গলা বের করে থাকে ও প্রতীক্ষা করে—যদি তারা সেই অবস্থায় থাকত তাহলে নিশ্চয়ই মাথা আবার গুটিয়ে নিয়েছে।

কুলতলার পাশ দিয়ে, আরো দুটো পোড়ো ভিটের ওপর দিয়ে, হাড়গোড় জড়ো করা টুকরো জমিটার নীরস আর্তনাদ উপেক্ষা করে জীবটা অনবরত ডানা মেলে ওড়বার চেষ্টা করছে, আরো দ্রুত দৌড়চ্ছে, আরো শক্তি ব্যয় করছে, আরো পরিষ্কারভাবে পথ চিনতে চাচ্ছে—পালাতে চাচ্ছে। কিন্তু সে নিস্তেজ, উপায়হীন। আক্রমণ করতে জানে না। দারুণ রোষে ছেলেদের দলের মধ্যে পড়ে তীক্ষ্ণ ঠোঁটে এদের খেলার আয়োজন বন্ধ করে দিতে পারছে না। তাই সে পালাচ্ছে। আর একটা দমকা জীবন তার পিছে পিছে তাকে তাড়া করেছে।

চিৎকার করে কে আর্তনাদ করে উঠল। তার পায়ে শুকনো হাড়ের সূক্ষ্মদিক ফুটে গিয়েছে।

আচ্ছা, উ বসে থাকুক, শকুনিটোকে ধরবুই। চেঁচিয়ে বলে উঠল রফিক।

হ্যাঁ, তু বোস, আমরা ওটোকে ধরবুই।

নাইলে তু বাড়ি যা।

এঃ লউ পড়ছে যি।

যাকে লেগেছে সেই বলল, পড়ুক গা। বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার ছুটল। সামনেই একটা এঁদো ডোবা। মোড় ফিরেই মাটি ছাড়ল—উড়ল সে। কিন্তু বড় ইতস্তত বড় বিব্রত ও অনিশ্চয় তার পক্ষসঞ্চালন। হয়ত হাফ ধরে গিয়েছে, হয়ত ক্লান্ত হয়েছে সে। হয়ত দিকনির্ণয় করতে পারেনি। সে পড়ল ডোবাতে। পানি ছিটকে নোংরা মোটা পানির ঢেউ তুলে—যেগুলো আঁধারে চকচকে চোখে চেয়ে রইল—প্রায় শোনা যায় না এমনিভাবে আঘাত করল তীরে।

অজান্তে আরো কিছু মাটি মিশল পানিতে।

একটি কদর্য-কিন্ন জীব হিঁচড়ে উঠল ওপাড়ে।

পরিবর্তিত, ভিজে, ধূলিকীর্ণ।

ছেলেরা দৌড়ে এসেছে এপাড়ে।

গ্রামের ঘনবসতি পাৎলা হতে হতে এখানে ছিটিয়ে গিয়েছে। অন্ধকার স্তূপের মতো হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে। একান্ত সহজ বুদ্ধিতে ফাঁক-ফোকর দিয়ে জন্তুটা পড়ল মাঠে। খোলা বিস্তৃত মাঠে।

প্রাণভরে শক্তির শেষ সীমানা পর্যন্ত দৌড়বার বিস্তারে।

ছেলেরা পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তারাও হাঁফিয়ে উঠেছে।

শালা কত দড়বি দড়—যিখানে যাবি চ'।

আর লয় মানিক, আর লয়।

তুমার ইবার হয়ে আলচে।

অকে ধরবুই আজ।

হ্যাঁ, ধরবুই।

এবার আল টপকে উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো জমি পেরিয়ে পগার আর শিশু-শস্যের ওপর দিয়ে—শেয়াকুলের কাঁটায় জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মরণ প্রতিজ্ঞায় ক্ষেপে উঠল ছেলের দল।

এদাই জিগ্‌গেস করল রফিককে, কি করবি উটোকে ধরে?

কিছু করব না, শুধু ধরব।

তা'পর?

হুঁ।

হুঁ ক্যানে, তা'পর কি করবি?

এগু ধরে তা'পর অন্য কাজ।

কেউ আর কথা বলছে না। বলতে পারছে না। সব ভূতের মতো অন্ধকারে চলন্ত চঞ্চল বিভীষিকার মতো ছুটছে।

দক্ষিণ দিকের বাতাস গায়ে লাগছে না। দূরে বাবলাবনের পাশে আমের পাতা ভাঙার মড়মড় মসমস শব্দ কানে আসছে না।

কিংবা শেয়াল ডেকে উঠল, কি ঝিঁ ঝিঁ একটানা, সিমেণ্টের মেঝেতে পাথর ঘষার মতো শব্দ করছে, কি প্রতি পদক্ষেপে পায়ের নীচের নাড়া গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—অন্ধকার ঘনতর হয়েছে এসব কিছুই না।

কিন্তু শেষ পযন্ত সবাই ধরে ফেলল ওকে। আঁকড়ে, জাপটে, দুমড়ে ধরে ফেলল শকুনিটাকে। তারা বুক দিয়ে অনুভব করল হাঁপরের মতো ফ্যাসফেসে শূন্য শব্দ উঠছে ঐ জন্তটার যন্ত্রের ভিতর থেকে। দীর্ঘশ্বাসের মতো—ফাঁপা, শূন্য, ধরা পড়ার, ক্লান্তির, ক্ষোভের।

ছেলেগুলোর কৌতূহল, আধিক্যের নিষ্ঠুর তুষ্টির, তৃপ্ত ক্লান্তির, সম্ভাব্য পীড়ন দেওয়ার উত্তেজনাকর বক্ষস্পন্দন পাখিটা অনুভব করতে পারল কি?

সেই, সেটোই বটে তো?

যেটোর পেচু পেচু এ্যালোম এটো সেই শিকুনিটোই বটে তো?

ক্যানে, পেত্যয় হচে না তোর?

কি জানি ক্যামন পারা লাগচে।

যেটা দৌড়ে আসছিল, যেটা পালিয়ে আসছিল সেটা এখন থেমে গিয়েছে, দাঁড়িয়ে গিয়েছে, যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

ক্যামন ভকভক করে বই বেরুইচি দেখচিস?

বই কিরে, বল দুর্গন্ধ।

তাতে বই কমচে কি?

অর্থাৎ দুর্গন্ধ কমছে কি?

ভিজে গিয়ে চিমসে গন্ধ ছাড়ছিল শকুনটি। জমাট গন্ধ তরল হয়ে এসেছে। গলা গলা দম আটকানো গন্ধ।

রফিক বলল, লে এ্যাখন ধর এটোকে—ঠোঁটটো ধরতে হবে না—দোম বন্ধ হয়ে যাবে।

রাখালটা এগিয়ে এলো, শালাকে আমি ধরব। পীরিত ক্যাকে বলে দেখবি শালা।

একদিকে জামু আর একদিকে রফিক ছড়িয়ে মেলে ধরল শকুনিটার বিশাল শক্তিহীন পাখাদুটো।

কি পেল্লাই ড্যানা রে—আট ল হাত হবে।

গোটানো ঘনবুনুনির পালক মেলে গেল। বুনট যেন পাতলা হয়ে এলো। স্তরে স্তরে সাজানো পালক পাশাপাশি চওড়া হয়ে কারকিত করা গালিচার মতো বিছিয়ে যাওয়ার কথা—কিন্তু শকুনিটা ভিজে গিয়েছে, ধুলো লেগে গুটিয়ে গিয়েছে তার পালক। এখন তাই অনেক ফাঁক—পাশাপাশি পাখনা অনেক ছিটোনো ছিটোনো। দুই ডানা অসহায়ভাবে, নিরুপায়ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল শকুনিটা।

এবার দ্বিতীয় দফা দৌড়। প্রত্যাশার পিছু পিছু নয়। প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। অকারণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। আত্মতৃপ্তির নিষ্ঠুরতা।

দড় দড়—লেঙ্গুড় তুলে দড়।

শকুনির পা পারে না অত জোরে তাল দিতে। কিন্তু তাতে কি-ই বা এসে যায়! পা না হয় মাটিতে পড়চে না। ছেলেদের দৌড়ের গতিই টানচে তাকে—হিঁচড়ে নিয়ে যাবে।

এ্যাদা, মুখটো ঠুকে গেল। কি টেনে লিয়ে যেচিস দ্যাক, মরে গেল লিকিন দ্যাক, এগু।

ক্যার গরজ কেঁদেছে দ্যাখবার। মরাটোকেই টানব।

ভয়ানক হুল্লোড় করে ওরা দৌড়চ্ছে এই টানার পিছু পিছু। চেঁচাতে চেঁচাতে। ভারি মজা পেয়ে। অদ্ভুত রকমের খেলা পেয়ে। কি লাভ?

লাভ?

লাভ তোকে দেখে লোব—তু তো শকুনি, তোর গায়ে গন্ধ, তু ভাগাড়ে মরা গোরু খাস, কুকুরের সাথে ছেঁড়াছিঁড়ি করিস—তোকে দেখে রাগ লাগে ক্যানে?

ছেলেদের কথায় শকুনিটাকে দেখে তাদের রাগ লাগে—মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনির খাদ্য—তাদের পোশাক যেন ওর গায়ের বিকৃত গন্ধভরা নোংরা পালকের মতো—সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুনি বলে কেন! আর এই কিছুক্ষণ আগে সে যে শূন্য নিশ্বাস ফেলল, কেন তা তাদের বাপমায়ের দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো! কেন মনে হয় শকুনিটার বদহজম হয়েছে। যে ধূসর রঙটা দেখলেই মনটা দমে যায় তার সঙ্গেই এর রঙয়ের এত মিল থাকবে কেন। প্রায়-জীবন্ত, অপরাধ করে

ফেলে দেওয়া যে শিশুগুলোকে গর্তে, খানা-ডোবায়, তেঁতুলতলায় ছেলেরা দেখে, না বোঝার যন্ত্রণায় মন যখন করুণ হয়ে ওঠে, কেমন জানি এইসব শিশুগুলিকে ভাইবোন বলে মনে হয় তখন তাদের কচিমাংস খেতে এর এত মজা লাগে কিসের !

কে বলল, ভোক লেগেছে।

কিছু খাস নাই ?

দোপর বেলায় গোস্ত দিয়ে ভাত।

আমিও—আমার ভোক লেগেছে।

তোর জামার রঙটো দেখে রাগ লাগে।

য্যামন মোটা, তেমনি খস্‌খসে।

ঠিক শ্যালা শকুনিটোর মতুন।

আমাদের সবারই তাই—রফিক বলল।

হামবুর বাপটো দু'একদিনের ভিতরেই মরবে। আজ সারা বৈকালি কি করেছে জানিস ?

জানি—খালি হাঁফিয়েছে—এই শালোর মতুন।

জামু বলল, সব শালোর হাঁফানির ব্যায়রাম। ওরে শালা, পালাইতে চাও, শালা শকুনি, শালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম।

অঘোর বোষ্টমের চেহারার কথা মনে করে হা হা করে হেসে উঠল সবাই।

মাতামাতি চলে, আল টপকে টপকে, উঁচু-নীচু জমির উপর দিয়ে, ক্ষত-বিক্ষত মনে আর দাগরা দাগরা ঘায়ে, শেয়াকুল আর সাঁইবাবলার বনে, লম্বা শুকনো ঘাসে, পগারে, সাপের নিশ্বাসের মতো রুক্ষ ফাটা মাটির ভ্যাপসা হাওয়ায়, আখ আর অড়হর কাটা জমির বল্লমের মতো সূক্ষ্মাগ্র সরল গুঁড়ির আক্রমণে ও আর্তনাদে। একটা মাটির ঢেলার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে, নিঃশেষে শক্তির বেদনা-বোধের অতীত অবস্থায়, আচ্ছন্ন চেতনহীন তন্দ্রার মধ্যে শকুনিটা শুধুই চলেছে। তখন ছেলেরা বিশ্রাম নিচ্ছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে—ক্ষতের রস মুচছে প্যাণ্টে, শকুনিটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। জোরে নিশ্বাস নিয়ে ক্লান্তি কাটানোর অসম্ভব চেষ্টা করছে না সে।

কত তারা উঠেচে দ্যাক।

কিন্তুক আলো তো হচে না।

চাঁদ নাইকো যি।

বাতাস দিচে লয়রে।

দিচে, তা শালার গরম বাতাস।

আমার কিন্তুক জার লাগচে।

তোর ভয় লেগেচে।

কতদূরে এ্যালাম র‍্যা ?

উরে সব্বোনাশা, মাঝমাঠে এসে পড়েচি, মানুষমারী মাঠ যে র‍্যা। উইটো নিচ্চয় কোলনের পাড়।

চ' কোলনের পাড়ে যাই, আর একবার গা ধোয়াই গা চ' শকুনিটোকে। পথটা ঠহর করা যায় না। চারিদিকের গাঁ ঝাপসা। দিশাহারা মনে হয়—এতবড় আকাশ, এত অন্ধকার।

জামু বলে, শুনিচিস রাত দোপরে কি সব হয় ?

হেহ ভাই পায়ে পড়ি, বলিস না।

যিখানে সিখানে তেঁতুলগাছ দেখা যায়। ঘরের খিল খুলে মেয়ে হোক আর মরদ হোক ঘুমের ঘোরে ঘোরে মাঝমাঠে চলে আসে। দ্যাখে, খালি শালা তেঁতুলগাছ আর মিসমিসে কালা বিলুই। যিদিকে তাকাও খালি বিলুই আর বিলুই। ক্যার ভ্যাকে ক্যা আসে—শকুনিটাকে হঠাৎ কালা বিড়াল বলে মনে হয়।

ছেলেদের আর কারো গায়ে হাত দেবার সাহস নেই। নিজের নিজের বুকে হাত দিয়ে অনুভব করে।

একটা বেপার তো হতে পারে, ধর সবাই ভূত আর সবাই মানুষের ভ্যাকে এয়েছে।

না না, আমি ভূত নই, এ্যাকা আমি মানুষ।

তাইলে আমাকে ছুঁয়ে দ্যাক, আমি যদি মানুষ না হই, আমি উড়ে মিলিয়ে যাব। ছোঁ আমাকে।

আমি তোকে ছুঁতে পারব না।

সবাই সবাইয়ের থেকে সাবধান হয়ে ক্যানেলের পাড়ে বসল। একে অপরের দিকে তীব্র চোখে তাকাচ্ছে। তারপর নিজের হাতে চিমটি কাটছে। শকুনিটাকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। সে দুটো ডানা চেপে, পা দুমড়ে মাটিতে গোঁজ হয়ে পড়ে আছে।

রাত দোপর ঘুরে গেয়েছে লয় ?

এ্যাকন সাঁজও লাগতে পারে আবার দোপর রাতও হতে পারে।

বোধহয় তাই। তাদের হিসাব নেই। এ সময়টুকু ঠিক সময় নয়। এ খেলাটা তাদের সময়ের বাইরে ঘটেছে যেন।

তবু কে বলল, তিনবার শেয়াল ডেকেছে।

তাইলে পেরায় শ্যাষ রাত।

চা ভাই, পানিতে নামি।

কাদা আর পানিতে ছুটে পাগলের মতো নামল ছেলেরা।

একটা বাতাসও সঙ্গে অগভীর পানির ওপর দিয়ে সরসর করে এসে ওদের চোখে মুখে লাগল; কি একটা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো।

আর একবার স্নান করল শকুনিটা।

শ্যালা কিছু খাবে না?

কি খাবে—মরা আচে এখানে যে খাবে।

জামু বলল, ভুঁইয়ের লাড়া ছিঁড়ে লিয়ে আয়, ঐ খাক শালা।

তাই নিয়ে এলো কে। রফিক বলল, গোরু তো লয় যে খ্যাড় খাবে। কিন্তুক এখন ঐ শালাকে তাই গিলতে হবে।

হ্যাঁ, লাও গেলাও।

দেখি র‍্যা, তোর ছড়িটা দে।

হ্যাঁ, ঠিক অমনি করে অর ঠোঁঠটো চিরে ধর।

খ্যাক খ্যাক করে শব্দ করে উঠল শকুনিটা। তার ঘাড় মুচড়ে, ঠোঁট ফাঁক করে অতি সাবধানে ছেলেরা তাকে খড়ের টুকরো খাওয়াচ্ছে।

খা, শালা, মর্ শালা।

আমি একটো পাখনা লোব। কলম করব।

আমিও লোব, মুটুক করব।

রফিক সবথেকে বড় পালকটা ছিঁড়ে নিলো। মাংসের ভিতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো পালকটা। শিউরে উঠল যেন শকুনিটা। তারপর সবাই ছিঁড়ল।

কদাকার বড় মুরগির মতো দেখতে লাগল তাকে।

তারা সবাই ফিরছে। টলতে টলতে। বসে দাঁড়িয়ে। হোঁচট খেতে খেতে। ছেঁড়া শার্ট দেখতে দেখতে। আগামীকালের কথা চিন্তা করতে করতে। গাঁয়ে ঢুকতেই এপাশে তালগাছ ওপাশে ন্যাড়া বেলগাছের যে ছোট তোরণটি আছে তারই আবছা ছায়ায় শাদা মতো কি দেখা যাচ্ছে।

জামু বলল, উদিকে যাস না—চ' ঘুরে যাই।

তোর বাড়ি তো উদিকেই—চ' দেখিনা উ দুটো কি।

বাড়ি কাচে বলেই জানি উ শালা-শালী ক্যা?

ক্যা র‍্যা?

দরকার কি তোর শুনে?

বল্ ক্যানে!

উ হচে জমিরদ্দি আর কাজু শ্যাখের রাঁড় বুন।

কি করচে উখানে?

আমড়ার আঁটি। চ' বাড়ি যাই।

পূবদিকে রঙ ধরবার ঠিক আগেই যখন গভীর অন্ধকার নেমে আসে তখন ছেলেরা ছেঁড়া মাদুরে, সোঁদা মাটিতে অচৈতন্য হয়ে ঘুমোয়—ক্লান্তি একদম মুছে যায় যখন তখন অসুবিধের মধ্যে. অশান্তিব মধ্যে না খেয়ে খালি পেটে ছেলে-গুলো বেঘোরে ঘুমোয়। যখন সূর্য উঠল. রোদ উঠল, গাছপাতা ঝকঝক করে উঠল তখন এবং তারপর যখন রোদ চড়া হয়, বাতাস গরম হয়, মাঠে ছেড়ে দেওয়া গোরুগুলো মাটি শুঁকে শুঁকে শুকনো ঘাস খেয়ে ফেরে তখনো ছেলেদের ঘুম শেষ হয় না।

ন্যাড়া বেলতলা থেকে একটু দূরে প্রায় সকলের চোখের সামনেই গতরাতের শকুনিটা মরে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বমি কবেছে। কত বড় লাগছে তাকে। কত শূন্য কত ফাঁপা—ঠোঁটের পাশ দিয়ে খড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে। ডানা কামড়ে, চিৎ হয়ে. পা দুটো ওপরের দিকে গুটিয়ে সে পড়ে আছে। দলে দলে আরো শকুনি নামছে তাব পাশেই। কিন্তু শকুনি শকুনির মাংস খায় না। মরা শকুনিটার পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধোস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনির দল। চিৎকার করতে করতে। উন্মত্তের মতো। কিন্তু শিশুটার পেটে প্রথম দুর্বল ঠোঁটের আঘাত বোধহয় মরা শকুনিটারই।

আশেপাশের বাড়িগুলি থেকে মানুষ ডেকে নিয়ে আসছে মৃত শিশুটি।

ই কাজটো ক্যা করল গা?—মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমে গেল আস্তে আস্তে। এলো না শুধু কাদু শেখের বিধবা বোন। সে অসুস্থ। দিনের চড়া আলোয় তাকে অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মরা শকুনিটার মতোই।

তৃষ্ণা

বড় ছেলেটা ক্রমাগত লম্বা হয়ে চলল। তার মা বলে বোশেখ মাস থেকেই ছোঁড়াটা লম্বা হতে শুরু করেছে। তারপর সেই বছরেরই যখন মাঘ মাস তখন তার দিকে চাওয়া যায় না। সে তার ভাইদের সঙ্গে মাঠে যেত এবং ধানের শীষ কুড়োত। তার লম্বা লম্বা কঞ্চির মতো নীরস আঙুলগুলো ছিল অত্যন্ত দ্রুত। হেঁট হয়ে হয়ে মাটি থেকে শীষ কুড়িয়ে নিত মুহূর্তে। কিলবিল করত সাপের মতো, সেগুলির তিনটে গাঁটের ওঠানামা চোখে পড়ত আর অন্য ছেলেরা বলত হিংসা করে, 'শালা, থা পাড়তে দেয় না, দেখতে দেখতে কুড়িয়ে লেবে।' পাঁচজনের সঙ্গে জমিতে নামলে সে একাই ওদের চারজনের সমান শীষ যোগাড় করবে। প্রত্যেকবার নীচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পট পট করে তার হাঁটুর জোড় ফুটতো।

সে মাছ ধরতে পুকুরে নামত। সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে বোয়াল মাছের টুঁটি চেপে ধরত। কনুই পর্যন্ত গাছের কোটরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাচ্চা শালিক বের করে আনত। পাড়াগাঁয়ের চাষীর ঘরের চৌকস ছেলের মতো সব সূক্ষ্ম কাজেই সে ছিল নিপুণ, ঠাণ্ডা আর নিরীহ।

আসলে ছেলেটা ছিল অত্যন্ত যোগাড়ে। এক কোঁচড় মুড়ি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। ফিরত, হয় কাদা মেখে মাছ নিয়ে, নয় কাঁচা আম, আমড়া নিয়ে, কি চুরি করে কয়েকটা আলু কিংবা কচু নিয়ে। বছরের প্রথম যেদিন ভারী বর্ষণ হয়ে যেত, ভেজা মাটির গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আর দুধে ভেজা পাউরুটির মতো মাটিতে পা ডুবিয়ে সে জাল কিংবা 'পলুই' নিয়ে বেরিয়ে যেত। তার মা বলত, 'ওরে খালভরা, যাস না, সাপে কামড়াবে।'

'কামড়াকগো, তু চুপ কর দিকিন।'

'কামড়াইলে মরবি যে বাঁশেচাপা।'

'মরি তো তোর কি হারামজাদী?'

ওর বাপ অন্ধকারে ঘরের ভেতর থেকে জেগে উঠত, ওর মা বলত, 'দ্যাখো দিকিন, বাচেদ গেচে এই রেতে মাছ ধরতে।'

'মরুক খচ্চর, মরুক শালার ব্যাটা শালা।' চিৎকার করে গাল দিয়ে একেবারে চুপ করে যেত বাশেদের বাপ।

পুকুর থেকে উঠে আসা বড় বড় কই এবং লাল রঙয়ের পুরনো মাগুর ভর্তি কোঁচড় নিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরত, লোভে তার মায়ের চোখ বড় বড় হয়ে উঠত। সে নিরীহকণ্ঠে বলত, 'কালকে ভালো করে ঝালে দগদগে করে রাঁধবি বুঝলি মা!'

বাশেদের ছেলেবেলাটা এমনি করে কাটতে কাটতে সে এমন একটা সময়ে এসে পৌঁছল, যখন তার পায়ের আর বুকের কটা কটা রেশমি মোলায়েম লোমগুলি উঠে গিয়ে কর্কশ, কালো লম্বা চুলে ভরে গেল। তার মুখে বয়সের চিহ্ন দেখা গেল, অল্পবয়সের লাবণ্যটুকু মরে গিয়ে কঠিন নির্বোধ এবং বিশ্রী একটা মুখ জন্ম নিল। চোয়ালের হাড় দুটো উবু এবং ধারালো হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর ভাঙা আর অপ্রীতিকর। কিন্তু গোঁফদাড়ির কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

কঠিন নির্বোধ এবং বিশ্রী মুখটা জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরের মনটির চেহারা কি হলো কেউ জানে না।

এরই ফাঁকে ফাঁকে সে অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হয়ে উঠতে শুরু করল। গাঁয়ের মানুষগুলি বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ওর বেড়ে ওঠা দেখতে লাগল।

'আরি সব্বোনাশ, কি হচে কি র‍্যা ছেলেটা দিনকে দিন!'

'ক্যানে বল দিকিন, বাপ তো অত নোম্বা লয়।'

'ক্যা জানে? বাচেদের মায়ের কথা ক্যা কি জানে বল?'

এরপর যেদিন গাঁয়ের সব চাইতে লম্বা মানুষটা বাশেদের কাঁধের নীচে পড়ল সেদিনই সে সকলেই থেকে আলাদা এবং একা হয়ে পড়ল। পাতা ঝরে গেলে শুক্‌নো লতার ওপর দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাশেদ একা একা হেঁটে বেড়াত। কাটা ধানের নাড়া মাড়িয়ে খড়মড় করে সে চলত। পৌষ মাসের রাত্রে ধান চুরি করে করে এনে বাড়ির উঠানে গাদা করত।

সে দগ্‌দগে ঝালের মাছ খায়, তর্ক করে আড়াই সের রসগোল্লা খায়, পেটপুরে বেগুনি ফুলুরি খায় আর হাড়গিলের মতো ঢ্যাংগা হতে থাকে। বন্ধুদের বলে, কি ভালো যে লাগে খেতে। পোত্যেকদিন সকালে উঠেই মনে হয়, শালা বেঁচে তো আছি খাবার লেগে।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ভারি পছন্দ করে সে বেঁচে থাকতে। শীষ কুড়োতে, ধুলো গায়ে হেঁটে বেড়াতে, কাদা ঘেঁটে মাছ ধরতে,

পাখির বাচ্চা জবাই করতে, এটা ওটা চুরি করতে। অত্যন্ত শখ তার বাঁচতে। যেভাবে বাঁচলে সে আনন্দ পায় সেভাবে সে বাঁচতে চায়। একদিন অন্ধকারে তাকে সাপে কামড়াল। কি যে হতাশ হয়ে সে বলল, আমি তাইলে বাঁচব না, লয় মা। আমি মরে যাব!'

চিলের মতো তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় সে চিৎকার করে উঠল, 'আমি মরে যাবো গো আমাকে কবরের ভ্যাতরে নিয়ে যাবে অরা।'

তার মা সান্ত্বনা দেয়, 'বালাই ষাট, মরবি ক্যানে বাপ আমার?'

বাশেদ কিন্তু মরল না শেষ পর্যন্ত। সাপটা বিষাক্ত ছিল না। পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে থাকল কিছুদিন। তার বেঁচে ওঠাটা যখন নিশ্চিত হয়ে গেল তখন বাশেদের মা অন্ধকার একা ঘরে বিড়বিড় করতে থাকল, 'আঃ ছেলেটোই সংসারে অতিথ গো। হয়া আল্লা, কত গোনা করলাম, আল্লা! মিনষেটো ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার সব্বোনাশ করলে। আমি ছাড়া বাচেদের আর ক্যা আচে? ই সংসারে উ ভাত ক্যানে পাবে। বাচেদের বাপ তো বাচেদের বাপ লয়, ইয়া আল্লা, আমি বুঝতে পারি নাই, সেই মিনষেটোর সাজা দিও, ই বান্দার গোনা লিও না!' বেঢপ লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাশেদ কি করে যেন বুঝতে পারে সে একা। আলো-আঁধারিতে একা রাস্তার মোড়ে সে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বয়স্ক লোকেরাও আঁৎকে উঠত ওকে দেখে আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো দিনের বেলাতেই ওকে দেখলে ছুটে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরত। বাইরের গ্রামের লোক এই অবস্থায় তাকে দেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পিছন ফিরে নিস্তব্ধ, অন্ধকার অন্য কোনো রাস্তা ধরে আত্মীয় বাড়িতে এসে বলে, 'ভূত দ্যাখলোম বাপু বর্মীতলায়।'

তারা হাসে, 'অ, তুমি বাচেদকে দেখেচ ঠিক।'

মেয়েরা বলে, 'ভারি ব্যাদরা ছোঁড়া, তালগাছের মতুন দাঁড়িয়ে থাকে।'

পাড়ার ছেলেগুলো বলে, 'অদা, বাচেদ আসছে লপাং লপাং করে।'

বাশেদ হঠাৎ একটা বাচ্চাকে মাথায় তুলে বলে, 'তোকে আল্লা দ্যাখাই দ্যাখ।'

কিছুদিন পরেই বাশেদের ফরশা চামড়ার ওপর কালো কালো দাগ পড়ে গেল। পাঁজরের আর বুকের হাড় নিশ্বাসের সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল আর কপালের ভিতর তার গোল চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত হয়ে উঠল।

সে যে কেমন হয়ে উঠছে কেউ তার বর্ণনা দিতে পারছে না।

কেউ বলে, 'উ একটো অবং।'

আবার কেউ বলে, 'উ একটো কাটাকাপ।'

আর একটি শীত এসে গেল। দুরন্তবেগে উত্তর দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করল। তৎপর হয়ে উঠল গাঁয়ের ছেলেগুলো। বিশেষ করে যাদের জমি নেই। বাশেদ তার ভাইদের নিয়ে বেরুল মাঠে। তাদের নিজেদের সামান্য ক'টি ধান কেটে শেষ করল অন্যেরা যখন ধানকাটা আরম্ভই করেনি। তারপর একটি দীর্ঘ বৎসরের যোগাড় আরম্ভ হলো এবং হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল বাশেদ ও তার আট বছরের ভাইটা। বড় পাঁঠার মাপের গোরু দু'টি নিয়ে গিয়েছিল পশ্চিমের মাঠে আর মুখে গামছা জড়িয়ে হুশ্ হুশ্ করে ধান তুলছিল তার গাড়িতে। এমনি সময় সামাদ মণ্ডল লাফিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরল। ভার সইতে না পেরে প্রথমে কুঁজো হলো বাশেদ, তারপর বসে পড়ল, এবং সে বসে পড়তেই সামাদ তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে সোজা বসে পড়ল তার বুকের ওপর। জন্তুর মতো গুমরানো, অব্যক্ত, বীভৎসকণ্ঠে ঠিক যেন মৃত্যুকালীন চিৎকার করে উঠল বাশেদ, 'আর করব না বাবা, আর কোনোদিন এ্যামোন করব না।'

সামাদ মণ্ডলের কথা বলার সময় নেই। সে টুঁটি টিপে চিৎকারটা বন্ধ করে দিতে চায়। আর একবার বাদেশ চিৎকার করে উঠল, কিন্তু তার বদ্ধ গলনালী থেকে ফ্যাঁস করে এমন একটা ফাঁপা, মৃত্যুচিহ্নিত শব্দ বেরিয়ে এলো যে সামাদ চমকে তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

পৌষ মাসের রাত তিনটের ঘন তীব্র তুহীনশীতল, নির্জন ভুতুড়ে প্রান্তরে আকূল মিনতি চোখে নিয়ে সাত ফুট লম্বা বাশেদ সামাদের দিকে চেয়ে রইল।

যেন আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল সামাদ, 'হারামখোর। শালা হারামখোর। শালা তু একা বাঁচতে চাস? শূয়োরের বাচ্চা শূয়োর! শালা এতর!'

সামাদ মণ্ডলের গাল দিয়ে আশ মেটে না, 'শালা, ঢ্যাংগা শালা। কাল তোর মড়াই ভাঙব। দেখি কোন্ বাপ তোর রোকে। লোকে খেতে পেচে না, বছরের কটা ধান শালার কাণ্ড ছাখো দিকিন!'

বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাশেদ তার লম্বা লিকলিকে গলায় হাত বুলোয় আর ভয়ার্ত চোখে চেয়ে থাকে সামাদের দিকে, যেন এখুনি সে আবার তার সাঁড়াশির মতো আঙুল ওর গলায় বসিয়ে দিয়ে যমচাপ দেবে আর সে দম নেবার চেষ্টা করতে করতে, বাতাস নেবার জন্যে হা করতে করতে, বাতাস না

পেয়ে এক রুদ্ধ, চেপে-ধরা ধূসর, অন্ধকার হতাশ গর্তে আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে থাকবে। একটি অবোধ তীব্র মৃত্যুচিন্তা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে না বাশেদের।

'আর কুনদিন এ্যামোন করব না, চাচা।'

'চাচা-লয়, তোর বাপ, চাচা লাফাইচে বাঞ্চোৎ।'

পুবদিকে শুকতারা জ্বলজ্বল করে উঠল। শীতের বাতাস উঠল, শুকনো ধানে ধানে ঘর্ষণে এক রকম সন্‌সন্‌ শব্দ উঠল আর বাতাস ভরে উঠল পাকা ধানের রুক্ষ গন্ধে। গোরু দুটো জুতে সামাদকে তারই গাড়িতে উঠিয়ে বাড়ি ফিরে এলো বাশেদ।

'কাউকে বলো না বুইলে চাচা।'

'আরে না, বলব না কাউকে, বিঁড়ি দে দিকিন একটো'।

এরপর ক'দিন খুঁটিতে ঠেস দিয়ে শরীরটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে বাশেদ বসে রইল চুপচাপ। কঞ্চির মতো লম্বা আঙুল দিয়ে কপাল টিপে ধরে কি যে সে ভাবে সেই জানে। শুধু খাবার সময় হলে খেয়ে আসে। পুরো এক সের চাউলের ভাত খায় সে। না বলতে চেয়েও তার মা বলে, 'খুব যে খেচিস ক'দিন?'

মুখ খিস্তি করে ওঠে বাশেদ, 'হ্যারে, শালী, খাবো না তো কি করব? তোর বাবার খেচি? নিশ্চয় খাবো।'

'খেচিস তো খা। ক্যা বা গ করেচে হ্যা খালেভরা?'

'তবে বকাব না খবরদারও।'

'এমন গিলাবি ক'দিন?'

'যদ্দিন আছে।'

'তা বাদ?'

'তা বাদ কবরে যাব, দেখিস শাগ্‌গির আমি কবরে যাব।'

মা শিউরে ওঠে। বাশেদ বিরসমুখে উঠে গিয়ে আবার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। বোধহয় বিশ্রী দুর্গন্ধ ঢেঁকুর ওঠে তার, মুখচোখ কুঁচকে ওঠে, মুখ-ভর্তি থুথু ফ্যালে পচ করে আর নিরীহের মতো মুখ করে হেঁচকির সঙ্গে উঠে আসা টক পানি এবং গোটা ভাত নির্বিবাদে আবার ভেতরে চালান করে দেয়। ঠিক এই অবস্থায় শীতের স্বল্পস্থায়ী বিকেল যখন ম্রিয়মাণ সন্ধ্যায় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, ঠিক তেমনি করে টক পানি এবং গোটাভাত গিলতে গিলতে,

বিশ্রী দুর্গন্ধ ঢেঁকুরগুলোকে উপেক্ষা করে, থুথু ফেলতে ফেলতে বাশেদ রান্নাঘরে গিয়ে বসে।

মা বলে, 'ওমা কি আশ্চর্য, ইরি মধ্যি ভাত খাবি লিকিন ?'

'হুঁ খেয়েই লি সোল্‌কালো করে। ভাত দে।'

'মা কি আর্চয্যি।'

'আর্চয্যি আবার কি হারামজাদী ? ভাত কি খাব না লিকি ?'

'বাচেদ তু মরবি, ঠিক মরবি।'

'তু আপনার ভাত দে দিকিন। ম্যালামারি বকাস না'।

দুপুরে যতগুলি ভাত খেয়েছিল ঠিক ততগুলি ভাত খেয়ে বাশেদ যেন আর উঠতে পারে না। তার পেটটা শক্ত হয়ে ফুলে ওঠে। ধুঁকতে ধুঁকতে সে উঠে যায়। ছেঁড়া চাদরটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আর নিজের পেটটাতে টোকা দিতে দিতে বিড়বিড় করে, 'শালা, প্যাটটো কি শ্যাষ পর্যন্ত লোয়া হয়ে গেল লিকিন। শ্যাষ পর্যন্ত লোয়াই হোল শালোর প্যাটটো।'

শীতের রাত একটু এগোতে না এগোতে রাস্তায় আর লোকজন নেই। রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট মাটির ঘরগুলো নিশ্চুপ কবরের মতো। ঝোপ ঝোপ গাছগুলোতে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর ভাঙা জানালার পাট দিয়ে পুরনো হ্যারিকেনের কিংবা প্রদীপের শংকাধরানো লাল আলো। ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে মেয়ে-পুরুষে শুয়ে।

একটা চিন্তার হঠাৎ আক্রমণে বাশেদ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সে আপন মনে যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলে, 'মেয়ে আর মরদে—মানে হোল খি মেয়েলোক আর আমরা—আমি—' আর সাহস হয় না তার চিন্তার। স্পষ্ট কোনো ধারণাও নেই তার।

কিন্তু সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ভিতরে ভিতরে।

রাস্তায় ধানভর্তি গাড়ি চলেছে সমস্ত শীত ধরে। হাঁটু পর্যন্ত ধুলোর মধ্যে ঢুকে যায়। টকটকে রক্তিম বিকেলগুলোর কথা তার মনে পড়ে। ধানভর্তি গাড়ি আসে একটার পর একটা। ঠিক চৌমাথার ওপরে ছেলেদের ভিড়—উষ্ণ আর উদ্দাম কলরব—সমস্ত বিকেলটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে শরীরটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে থুথু করে থুথু ফেলছে বাশেদ। এখন এই আড়ষ্ট রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ চিন্তার আক্রমণ—'মেয়েগুলোর সাথে মরদগুলোর, মানে—আমরা, মানে আমি—'

বাশেদ তার কদমছাঁট করা চুলে হাত বুলোয়, জিরজিরে বুকের ওপর হাত রাখে, তারপর আবার বিড়বিড় করে, 'প্যাটটা জমির আলের মতুন ক্যামন ঠেলে উঠল দ্যাখো দিকিন!'

রাত আর একটু বেশি হলে হাওয়া উঠল। শীতের কঠিন ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে নিদ্রিত, জমাট, নিঃসঙ্গ, নিষ্ঠুর রাস্তার ওপর ঝকঝকে তারা ভর্তি আকাশের পশ্চিম দিকে ঝুঁকে নোংরা চাদর জড়িয়ে একেবারে নিশ্চুপ বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল বাশেদ। তারপর একসময় প্রার্থনার মতো করে ছেলেটা যেন কঁকিয়ে উঠল, 'খোদা আমি আর লম্বা হব না আমার গায়ে খুব বল দাও। আমি যেন আর লড়তে পারছি না। হাঁটতে গেলে আমার ঠ্যাং জড়িয়ে যেচে। আমি আর চুরি করব না, মাছ ধরব, নাংগল দোব আর খাব। খালি খাব।'

কিন্তু তার যেন মনে হয় খোদা নিষ্ঠুর। সে ভাবে তার নিস্তার নেই। মনে হয়, বয়সের চাইতেও ঠাণ্ডা দুশো মণ ভারী। (দু'শো মণের আন্দাজ নেই তার, কিন্তু সে একটা অকল্পনীয় ওজন)। লোহার হাত একদিন অন্ধকারে তার বুকে পড়বে। সে পাশ ফিরতেও পারবে না। আর সেই হাত ক্রমাগত আসছে, যেন অন্ধকার ফুঁড়ে কঠিনতর নিষ্ঠুরতর অন্ধকার হয়ে সে কেবলই আসছে বাশেদের দিকে। এই শীতে পুকুরের পানিতে, মাটির নীচে, বাতাসে, গাছের ডালে বাশেদ যেন ঠাণ্ডা আর ভারী, ভারী আর ঠাণ্ডা কি অনুভব করে। ভূত না খোদার হাত, পাথরের দেয়াল না জাঁতা সে বুঝতে পারে না। এক অদ্ভুত ভয়ে গা ছমছম করে ওর। চক্‌চকে কালো পানিতে ভরতি পুকুরটা আর তার বাবলা, কেয়াফুল আগাছা আর আমগাছের জটলা পাকানো উঁচু পাড়গুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। ওখানে নতুন পুরনো ধসে পড়া কিংবা উঁচু উঁচু কবরের সারি।

'আমি কত নোম্বা, আমার কবর যেতি বেশি গওনা করে আমি কি করে উঠে বসব। লোয়ার ডাংগা লিয়ে য্যাখন ফেরেস্তা আমার কবরের ভ্যাতর আসবে ত্যাখন তো আমি নামাজ পড়ব। কিন্তু কি করে উঠি বসব। আর একটা কথা—'

বাশেদ বিবেচনা করে, 'আমি যে এ্যাখনও নামাজ শিখতে পারলাম না। বুকের ভিতর থেকে বাশেদ জীবন্ত, আলোর পৃথিবীর দিকে তীরের মতো তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম একটি অন্তিম ইচ্ছা ছুঁড়ে দিতে চায়, তার ইচ্ছাটা যেন তীর হয়ে গিয়ে যারা বেঁচে আছে, হাসছে, আনন্দ করছে, খাচ্ছে আর যে পুরুষেরা মেয়েমানুষের সঙ্গে শুয়ে আছে তাদের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, 'এই দ্যাখো, আমি বাচেদ,

বাচেদ গো আমি ঢ্যাংগা নোম্বা বাচেদ তোমাদিগকে বলচি যে আমি কবরের ভ্যাতর যেতে চাই না।'

ভূতগ্রস্তের মতো সে পা টিপে টিপে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে।

সে বছরের শীতটা এমনি করে করে পার হয়ে গেল। মাঘ মাসের শেষে ফাল্গুন যখন আসন্ন, যখন মাঘের কনকনে ঠাণ্ডা উত্তরের বাতাস গর্জন করতে করতে ঈষৎ তপ্ত দিনে আস্তে আস্তে দীর্ঘশ্বাস সংগ্রহ করতে থাকল, আর সন্ধ্যায় হঠাৎ কখন লক্ষ্য করা গেল একঝলক দক্ষিণের বাতাস এলো পাতা ঝরিয়ে, তখন সেই আশ্চর্য উদাস দিনগুলোর শুরুতে বাশেদের ফরশা চামড়া একেবারে রঙ করা চামড়ার মতো তামাভ কালচে। কনুই এবং হাঁটুর হাড় পরিস্ফুট এবং সমস্ত শরীরের চামড়া ঢিলে, চোখ দু'টি বিবর্ণ নিষ্প্রভ।

ঠিক এমনি দিনে গাঁয়ের ছেলেগুলো বেরিয়ে পড়ল দলে দলে। বড় বড় থলি, চট আর ঝুঁড়ি ঘাড়ে করে। সাংবাৎসরিক গোষ্ঠীভোজনের আয়োজনটা এগিয়ে এলো। ওর সঙ্গে ধর্মের ছিটেফোঁটা লাগিয়ে নাম দিয়েছে ওরা ওরোস। আম এবং বাবলাগাছের বাগান ভর্তি সেই বিশেষ পুকুরটার পূর্ব পাড়ে বড় আমগাছটার নীচে আয়োজন শুরু হলো। গাঁয়ের যিনি মাথা তার বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে এলো বড় বড় ডেকচি, হাতা, খোন্তা। আর ছেলেরা মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করতে লাগল চাল, ডাল, আলু, বেগুন। আমগাছটার নীচে বড় একটা চট বিছিয়ে সব চাল রাখা হলো তার ওপর, নতুন চালের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। তিনটি মাঝারি আকারের ছাগল এক পাশে বাঁধা।

জড়ো করা নতুন চালের পাশে বসে ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলে বাশেদ বসেছিল চুপ করে। লোভার্ত ইঁদুরের মতো নাক তুলে তুলে গন্ধ শুঁকছিল সে এবং প্রাণপণে ইচ্ছা করছিল এই মুহূর্তে সব রান্না হয়ে যাক, ঐ দুই ডেকচি ভাত আর এক ডেকচি ছাগলের মাংস—সব, সব এই মুহূর্তে রান্না হয়ে যাক আর 'খোদার শানে মানুষগুলো গোসল করতে গিয়ে একসঙ্গে ডুবে মরে যাক। তারপব সে এই অজস্র অফুরন্ত খাবারগুলো নিয়ে একা আরামে…চোখ বন্ধ করল বাশেদ, তারপর হঠাৎ সোজা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'হুই শালোরা, দাঁড়া রে, আম্মু যাব যি।'

ছেলের যে দলটা গ্রামের দিকে যাচ্ছিল তারা ওর কথা শুনতেই পেল না। আবার চিৎকার করে উঠল সে, 'শুনতে পেচিস না, হুই শালোরা, হুই।'

দলটা ফিরে দাঁড়াল। এখানে এটা ওটা কাজে যারা ব্যস্ত ছিল তাদের মধ্যে

একজন বিরক্ত হয়ে বলল, 'ই বাঞ্চোত ছোঁড়া চ্যাঁচায় কি র‍্যা ? লড়বার মুরোদ নাই, তাদের সাথে যাবে, যি খানা রাঁধা হচে বাপধন, একবার খাও, তা পরে আর দেখতে হবে না।'

দলের ভিতর থেকে একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঢ্যাংগা কি বলছিস রে ?'

বাশেদ জবাব দিল, 'আমি যাব তোদের সাথে।'

'না, তোকে আর মালোক মারতে হবে না, চুপ করে বসে থাক।'

দলটা চলে গেল কলরব করতে করতে। বাশেদ আবার বসে পড়ল চালের পাশে। চোখ বন্ধ করে ভাবতে শুরু করল। ইতিমধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, ছাগল তিনটি জবাই করা হয়ে গেল। রান্না আরম্ভ হলো। বাশেদ চুপ করে বসে দেখতে লাগল। মাংস নাড়তে গিয়ে সামাদ মণ্ডলের কঠিন পেশীগুলো নড়াচড়া করছে। মান্নানের তামাটে মুখ জ্বলজ্বল করছে আগুনের তাপে, তালপাতার উজ্জ্বল লাল আগুন ঝোপঝাড় ভর্তি আমগাছটার তলা রাঙিয়ে তুলেছে, একটু একটু করে ছাগলের কাঁচা মাংস কি চমৎকার রং নিচ্ছে।

আঃ, বাশেদ আবার চোখ বন্ধ করল।

সব ক'টি মানুষ ব্যস্ত। একটা আদিম কাজে ব্যস্ত। আর ওরোস মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ নিষ্ঠুর নির্মল সিদ্ধান্তে, কঠিন সংকল্পে একটা জৈবিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে জান্তব নিঃশব্দে এই ভোজনপর্ব শেষ করতে চায়। লোভে চকচক করে উঠেছে ওদের চোখ, স্বার্থপর ওদের কঠিন হাসি। ওদের মধ্যে একটি স্থির উপলব্ধি এক হয়ে প্রত্যেকের মনে সরল হয়ে উঠছে, রান্না হয়ে গেলেই গোগ্রাসে খেতে হবে, আকণ্ঠ হয়ে, চূড়ান্ত করে খেতে হবে। নিঃশেষে পেট ভরাতে হবে।

শীত শীত করা বিকেল এসে গেল রান্না শেষ হতে। তারপর আর আধঘণ্টার মধ্যেই গাছতলায় জায়গা নেই। নিজের নিজের থালা নিয়ে মানুষগুলো বসে গেল। ছোট ছোট ছেলেগুলো চীৎকার করে উঠল। কঁকিয়ে কেঁদে উঠল একেবারে বাচ্চা দুটি-একটি ছেলে। পরিবেশন আরম্ভ হয়ে গেল। বাশেদ নিজের থালাটা সামনে বাড়িয়ে, পায়ের দুই পাতার ওপর উবু হয়ে বসে লাঠির মতো হাতটা হাঁটুর ওপর ঝুলিয়ে দিল। এরপর নিঃশব্দে খাওয়া ছাড়া আর শব্দ নেই, ক্বচিৎ আর্তনাদের মতো গলা থেকে অস্ফুট শব্দ বের করে কেউ 'ইদিকে গো ইদিকে, গোস্তো দাও দিকিন', কিংবা 'বড্ড ভালো হয়েছে গো রাধনটা ঝাল একটু কম হয়েছে লিকিন ?'

যতক্ষণ খাওয়া চলতে থাকে বাশেদ একটি কথা বলে না। যারা পরিবেশন করছে তাদের কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, 'আর ভাত লিবিলিকিন ?'

বাশেদ কোনোরকমে বলল, 'দাও।'

'আর দোব র‍্যা ?'

'দাও, দাও।'

'গোস্তো দোব ?'

'দাও।'

'হোই ডাল লিবি লিকিন ?'

'দাও দিকিনি এটুন।'

'ই শালোর ছেলে না করে না গো !'

খেতে খেতে বাশেদের চোখ বড় হয়ে উঠল, একবার গলায় ভাত আটকে গিয়ে মনে হলো ওর চোখ দুটো বোধহয় বেরিয়ে আসবে।

'আরে আস্তে খা।'

'অবংটা কি মরণ খাওয়া খেচে র‍্যা ? খাস নাই বাবার কালে ?'

বাশেদের বাপ এসেছিল খেতে। এককোণ থেকে ভীষণ রাগে দাঁত কিডমিড করে উঠল সে, 'বাঞ্চোত খেয়ে ফুবো, মরবি শালার ব্যাটা শালা, পডবি আব মরবি।'

'আঃ অমন করে কি বলতে আছে গো ?'

'তু চুপ কর্ খচ্চর, বলব বেশ করব।'

খাওয়া শেষ হতে সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার এসে আশ্রয় করল আমগাছের ঘন ডালে, কেয়াফুলের ঝোপে, বাবলাবনের জটলায় আর পুকুরের স্থির কালো পানিতে। একটুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। উচ্ছিষ্ট খাবার পড়ে রইল এখানে সেখানে, কয়েকটা কুকুর এসে মারামারি আরম্ভ করল, পোড়া কাঠ আর ছাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল, কেমন যেন ধর্ষিতার মতো চেহারা হয়ে গেল জায়গাটার। কাঠের অঙ্গারগুলো জ্বলতে লাগল নিঃশব্দে। অন্ধকাব বীভৎস হয়ে উঠল।

সকলে চলে গেলেও বাশেদ উঠতে পারল না চেষ্টা করেও। উঠতে গেলেই চারিদিকের অন্ধকারের চাইতে ভীষণতর নিরন্ধ্র অন্ধকার আশ্রয় করছিল ওর চোখে। তার হাত দুটো এলিয়ে পডল মাথার দুই পাশে, একটা পা দুমড়ে মুড়ে রইল যন্ত্রণাদায়কভাবে আর একটা পা তার বিনা ইচ্ছায় লম্বা হয়ে নেতিয়ে রইল

মাটির ওপর। লুঙ্গিটা কখন খুলে নেমে গিয়েছে তলপেটের নীচে। বাশেদ স্থির চোখে চেয়ে রইল ওপরের দিকে—গাছের কোটর থেকে সারি বেঁধে নেমে আসছে কাঠপিঁপড়ে বুক বেয়ে, মাথা বেয়ে ওরা উঠছে।

বাশেদ ভাবল, 'খোদা তাইলে কি আর আমি উঠতে পারব না? আজ রেতেই কি মরব এই আদারের মিধ্যি?'

আর একটু রাত হতেই কথা কানে এলো ওর। একটু দূরের ঝোপটার পাশে কারা কথা বলছে। একবিন্দু লাল আলো একবার জ্বলছে একবার নিভছে। বিড়ি ধরিয়েছে কেউ। হঠাৎ রিন্‌রিন্ করে যেন একটি মেয়েই হেসে উঠল। কান খাড়া করে রইল বাশেদ। ফিস্‌ফিস্ করে কে বলল, এ্যাই সখি হাসিস না, লোক জানতে পারবে।

'পারুকগো পয়সা বার কর।'

'না, আগে—'

'উঁহু, আগে পয়সা বার কর, তা'পর কথা।'

আবার রিন্‌রিন্ করে হেসে উঠল মেয়ে: 'দু'আনা লয় দু'আনা লয়, তিন আনা করে দিতে হবে।'

'ইঃ, ভারি সাহেব লাটসাহেব! তিন আনা লাফাইচে।'

'তবে চললোম।'

মেয়েটি বোধহয় উঠল, ছেলেটি মিনতি করে ওঠে, 'ঠিক আছে যা, যাস না, এই লে তিন আনা।'

'কই, তু দে।'

'দিচি'—বাশেদ চিনতে পারল এ গলাটা গাঁয়ের যিনি মাথা তাঁর বখাটে ছেলে সোহরাবের।

আগুন হয়ে উঠল যেন রক্ত। ওদিকটা একেবারে চুপ, অন্ধকার কাঁপছে। ঠক করে শুকনা পাতা খসে পড়ল। নিশ্বাস কাদের দ্রুত। বাশেদ তার বিরাট ভূতুড়ে কঙ্কালটা নিয়ে প্রাণপণে উঠবার চেষ্টা করে। এলোমেলো হাত দিয়ে অনুভব করে লুঙ্গির একটা খুঁটে বাঁধা আছে পয়সা। চার আনা আছে।

আবার সেই তীক্ষ্ণ ইচ্ছাটা সূক্ষ্ম হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, এ্যাদ্যাখো, আমি নোম্বা বাচেদ, অবং বাচেদ, ঢ্যাংগা বাচেদ, আমি কিছুতেই মরতে চাই না, মরব না, মরব না, ই আল্লা পায়ে পড়ি তোমার, আমি কবরে যাব না, আমি মরব না, আমি উই ঝোপটার কাছে যাব, সিকিটো ছুঁড়ে দোব সখির আঁচলে, 'এই লে,

আমি বাচেদ—আমি—'

বাশেদ প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল। আর কিছু সে চিন্তা করতে পারল না। নিয়তির মতো একটা শক্তি তাকে টেনে নিয়ে চলল। উ'চু নীচু মাটিতে তার পা কাঁপতে লাগল আর সেই প্রবৃত্তিজড়িত পদক্ষেপ বেসামাল হতে হতে কখন এসে পড়ল বালুচরের একটা গর্তের মধ্যে। বিশাল তালগাছটার মতো বাশেদ মাটিতে পড়ল আর গড়িয়ে চলল ঢালু পাড় বেয়ে কিংবা বলা যায়, একটা তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ, তীব্র মৃত্যুর মতো অমোঘ প্রবৃত্তির পত্তন হলো এবং সেই প্রবৃত্তি গড়াতে গড়াতে এগিয়ে চলল ঢালু বেয়ে, তার মৃত্যুর দিকে।

তখনই ঝোপের আড়ালের তিনটি কণ্ঠস্বর অন্ধকার বিদীর্ণ করে ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল শরীরহীন ভয়কে শরীরের মতো প্রত্যক্ষ করে। অন্ধকার আর একবাব আলোড়িত হলো, আর মাঠের ওপর দিয়ে একটা দমকা বাতাসেব সঙ্গে তিন চলন্ত অন্ধকাব অদৃশ্য হল।

ওরা বাশেদকে পেল সকালে। ঠিক ঢালুটার নীচে জমির কিনারায় উলঙ্গ, বিবর্ণ নোংরা মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে। এই শীত শীত রাত্রে এইটুকু সময়েব মধ্যেই যেন ভিতবে ভিতরে দুর্গন্ধে মৃতদেহটি ভরপুর হয়ে উঠেছে।

মন তার শঙ্খিনী

শাদুর মনটা আজ ক'দিন থেকে ভালো নেই। এটা অবশ্য খুব একটা বড় খবর হলো না। ওর আশেপাশে যারা রয়েছে এতে যে তাদের কিছু এসে যাচ্ছে তাও নয়। কিন্তু শাদুর মনটা ভালো নেই। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে না, মাথা ধরেনি, কিছুই নয়, কিন্তু সে দুনিয়ার উপর চটে আছে, বিরক্ত হয়ে আছে, ভ্রু কুঁচকে আছে, এক কথায় সে ভীষণ রেগে আছে। ওর কাছে যাওয়া চলছে না, ওর বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, মনটা হু হু করছে। খরার দিনের সন্ধ্যায় শস্যহীন মাঠের মতো ওর মনটা ধূসর ঝাপসা! এখন শরতের উজ্জ্বল সকালে গ্রামের প্রান্তে একটা পগারের ওপর বসে শাদু মরা ঘাস ছিঁড়ছে, একটা মরা পাখির পালক থেকে শিশির ঝাড়ছে।

শাদুর মনটা খারাপ।

ওকে এমনি করে বসে থাকতে দেখে কেউ হয়তো বলে, কি বাপধন, এমন করে বসে কি?

শাদু জবাব দেয় না, গুম হয়ে থাকে।

কি বাপ, কতা বলছ না ক্যানে?

জানটো ভালো নাই, বাপু!

জানের আবার কি হলো তোমার?

না, বাপু জানটো ত্যামন ভালো নাই।

শাদু আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয় কথা বাড়াতে চায় না সে। হিতাকাঙ্ক্ষী আরো কিছু জিজ্ঞেস করলে সে হয়তো খেপে উঠল, মানে মানে কেটে পড়ো দিকিন্। বলচি ভালো লাগছে না, ভ্যালো বেপদ বটে।

হিতাকাঙ্ক্ষী সত্যিই বিপদ গোনে। শাদুর রাগটা একটু বিপজ্জনকই বটে। শরতের উজ্জ্বল সকালে ওর মনটা কেন খারাপ সে কথা ও ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রসন্ন শীত শীত বাতাস বইছে, রোদ যেন সোনা, মাঠভর্তি সবুজ ধানের ওপর রোদের সোনা—কিন্তু সব তার কাছে বিস্বাদ।

শাদু আপন মনে বিড়বিড় করে, রাককুসী, রাককুসী, মানুষখেকো রাককুসী, আমার জানটো খেলে, শালো, আমাকে খেলে। আমাকে বরবাদ করলে।

ঠিক এই সময়ে পগারের আব একপ্রান্তে একটি মেয়ে দেখা যায়—কোমরে একটি ঝুড়ি, তাতে গোবর, কাঠিখোঁচা, শুকনো পাতা। মেয়েটির তৈলহীন রুক্ষ চুল বাতাসে উডছে, শাড়িটা এমন করে পবা যে মনে হয় ছোবল দেবার আগে লেজেব ওপব ভব দিয়ে একটি কালো সাপিণী দুলছে। অলঙ্কারহীন মিশমিশে কালো মেয়েটি যেন এই পগারেব গর্তে যেসব সাপ পাওয়া যায় তাদেরই একটি।

শাদু আডচোডে চাইল ওর দিকে। চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে ঘাড ফিরিয়ে নিল মেয়েটি। এদিকে ওদিকে চেয়ে শাদু ডাকল, এই হামি, ইদিকে শোন। মেয়েটি স্রেফ নাকচ করে দিল এই আহ্বান।

হামি !

হামি অর্থাৎ হামিদা নিরুত্তর।

এই হামি !

ঝঙ্কাব দিয়ে উঠল হামিদা, কি ?

শোন ইদিকে।

কি বেপার ?

কাছে আয়, বলচি।

আমার শোনবার দরকার নাই।

আমার কি কুনো কতাই শুনবি না তু !

কি শুনব ?

কাছে আয়।

হামিদা কাছে আসে। শাদু চেয়ে থাকে ওর দিকে, আবার একটি বিদ্যুতেব ঝিলিক হেনে চোখ নাচিয়ে হামিদা বলে, সঙ।

সত্যিই সঙয়ের মতো বসে থাকে শাদু। তার মনে হয় হামিদাব সঙ্গে এখন দেখাটা না হলেই ভালো হতো। সে ওব ঘুম কেড়ে নিয়েছে, শান্তি কেড়ে নিয়েছে, ওর মনটা যে এখন খরার সাঁজের মাঠের মতো—এর সবকিছুর জন্যে দায়ী এই মেয়েটির সঙ্গে এখন ওর দেখা না হলেই ভালো হতো। কিন্তু ওকে দেখেই ওর বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, একটা ভীষণ আবেগে সে নিশপিশ করে।

বাক্যহীন আবেগে থমথমে মুখটির দিকে চেয়ে কৌতুকে উচ্ছল হয়ে ওঠে

হামিদা, ভ্যাবার মতুন বসে বসে ভাবচিস কি ? তোর কত ক্ষ্যামতা জানা আচে। যত লাফানি আমার কাচে। উদিকে কি বেপার হচে দেখগা !

কি বেপার ?

রহম মালামো করচে বগীতলায়। তিনটাকে চিৎ করলে আমার ছামনে। লাগগা দিকিন অর সাথে। জ্যানে শ্যাষ করে দেবে। ব্যাটা ছেলেরা যা করে তার খোঁজ নাই, মেয়েমানুষের কাছে বাহাদুরি।

শাদু বলল, মারামারি করে লাভটো কি বলতে পারিস। এ গাঁয়ে কুন শালা আচে আমার সাতে পারবে—জানটো খেয়ে লোব।

হামিদার নাকের পাশটা কুঁচকে উঠল, তোর খালি বোলচাল, খালি বাহাদুরি। ক্ষ্যামতা থাকলে লাগগা না !

লাভটো কি হবে ?

তু তো ভীতু, পারবি না তাই বল।

শাদুর দু'চোখ জ্বলে উঠল। ওর পিঙ্গল চোখের তারা দু'টি যেন আগুনের ফুলকি ছিটোল। ঠোঁট টিপে মুচকি হাসল হামিদা। সে হাসিটাও চোখে পড়ল শাদুর, ছাখ হামি মাথাটো খারাপ করে দিস না সকাল বেলায়, আজ যদি লাগি রহমের জান লিয়ে লোব।

তাই যা না।

যদি পারি ?

যদি পরিস তো কি ?

যদি পারি তো কি দিবি ?

আমি নাচব এখানে।

ঠিক ?

নিষ্‌ষস।

চোতমাসের দুপুরে গাদা করা কাঠে আগুন লাগলে যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, শাদুর বুকে যেন তেমনি আগুন ধরে যায়। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়ায়। ওর চোখের একগুঁয়ে মোষের মতো চাহনীটা দেখে এক মুহূর্ত ভয় পায় হামিদা, তারপরেই আবার কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তাকাইচ্চে ছ্যাকো দিকিন ? ইখানে কি, যানা বগীতলায়।

শাদু কথা না বলে চলে গেল।

বগীতলায় তখন একটা ভিড় জমে উঠেছে বলা যায়। রহম দড়াম করে

একবার মাটিতে আছাড় খেল, মোষের মতো কালো শরীরটায় দু'হাতে ধুলো মাখাল, চুলটাকেও ধুলো মাখিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল, তারপর গরিলার মতো বুক পিটোতে পিটোতে ঘ্যাষঘেষে গলায় চিৎকার করে উঠল, আয় ইবার ক্যা আচিস।

দু'নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ধুঁকছে। দুই হাঁটু থরথর করে কাঁপছে তার। পয়লা নম্বর তখন একটু সামলিয়েছে, দুই পায়ের ফাঁকে ল্যাজ চালিয়ে দিয়ে পরাজিত কুকুর যেমন করে দাড়িয়ে থাকে তেমনি করে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

জুলজুল করে তাকিয়ে দেখচিস কি? আব একবার লাগগা না!

পয়লা নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্লান হাসে, কালো কালো মাড়ি বের করে বলে, উ শালোর সাতে কি পারা যায়।

হুঁ হুঁ, শালো যে বাঘের দুধ খায়।

অপরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী, রহম আর একবার হাঁক দেয়, ক্যা আচিস, আয়।

অর সাতে কেউ পারে গো—গতরটো দেখচ না!

হ্যাঁ বাপু খোডপারা গতরটো হইচে বটে।

ঠিক এমনি সময়ে শাদুকে দেখা গেল। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল দর্শকদের দল, আয় বাপ, একবার দেখিয়ে দে একহাত।

শাদু কারও দিকে চাইল না, কারও কথায় কান দিল না, একট ভীষণ মরণ প্রতিজ্ঞায় চোখে প্রতিহিংসার কঠিন আলো জেলে সে রহমের মুখোমুখি দাঁড়াল। হবে লিকি স্যাংগাত, লাগবি লিকি একহাত?

শাদুর চোখেব দিকে চেয়ে প্রায় শিউরে ওঠে রহম। একটা অস্বস্তির ঠাণ্ডা স্রোত যেন মেরুদণ্ড দিয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। লড়াই করার প্রবৃত্তিটা সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় ওর।

ইতস্তত কণ্ঠে সে বলে, সেই লেগেই তো দাঁড়িয়ে আচি—তা ব্যালা হলো অ্যানেক, এ্যাকন—

শাদু লোহার সাঁডাশির মতো আঙুল বাড়িয়ে মুঠো করে রহমের ফাঁপানো চুলের মুঠি ধরে বার দুই ঝাঁকি দেয়, তারপর চুল ছেড়ে দিয়ে ওর বুকে দুটো থাপড় দিয়ে বলে, শালো ভয় পেলি?

রাডের লডাইয়ের ইতিহাসে এর চাইতে অপমান আর কিছু নাই। রহম যদিও তার বুকের হাড়ে শাদুর থাপড দুটো তখনো অনুভব করে, মাথার চুলের যন্ত্রণায় ওর হাতেব কঠিন শক্তির পরিচয় পায়, তবুও সে খেপে ওঠে, এ্যাই খবরদার, গায়ে হাত দিবি না, পারিস তো চলে আয়।

আজ কিন্তুক সাবধান—মারাত্মক ও জোরালো গলায় বলল শাদু।

তু সাবধান হ' আগে।

সকলে সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দেয়। একটা নিদারুণ লড়াই হবে এই আশায় সবাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নানারকম মন্তব্য শোনা যায়। আজ আর শাদুকে পারতে হবে না—রহম খেপেচে।

তা খেপুক—শাদুর কাছে উ কিছুই লয়।

দু'জনে দুটো বুনো মোষের মতো সামনাসামনি দাঁড়াল। ঘাড় বাঁকিয়ে ছোট ছোট লাল চোখে রক্তাক্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। শাদুর কৌশলটা রহম জানে, এঁকেবেঁকে ধুপ করে সে পড়বে, সবার ধারণা হবে শাদু নীচে পড়েছে, এর পরেই বোধহয় হার স্বীকার করবে সে। যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার করতে করতে শাদু লড়াই করে, হারও স্বীকার করে না, লড়াইও বন্ধ করে না—সে যেন সুযোগের অপেক্ষা করে বনবেড়ালের মতো। তারপর কোনো এক চূড়ান্ত মুহূর্তে গর্জন করে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর পড়ে। সে আক্রমণ আজ পর্যন্ত কেউ সহ্য করতে পারেনি।

শাদুর মনে মনে চিন্তাটা প্রায় একটা বিড়বিড় শব্দে পরিণত হয়, রাককুসী, তোর লেগে আজ মানুষ খুন করব আমি, তা বাদ তোকে ধরব আজ, ইঁদুর ধরা করব আজ।

রহম লাফ দিয়ে পড়ল শাদুর ওপর। শাদু নীচে গড়িয়ে পড়েছে, রহম ওর বুকে বসেছে, গলাটা টিপে ধরেছে শাদুর—দু'চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে ওর। আশপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের কেউ চেঁচিয়ে ওঠে, ছাড়িয়ে দে র‍্যা, মরবে যি, শাদু মরবে যি।

রুদ্ধকণ্ঠে শাদু গর্জন করে, খবরদার।

এর পর যখন চূড়ান্ত মুহূর্ত এসেছে বলে মনে হয় সমকক্ষ দু'টি শক্তি যখন নিঃশব্দ দ্বন্দ্বে লিপ্ত, নিশ্বাস ছাড়া অন্য শব্দ নেই যখন, দর্শক যখন নিরুদ্ধশ্বাস তখন সেই আতঙ্কিত নৈশব্দ চিরে একটি দীর্ঘ জান্তব শব্দ ভেসে এলো, ভেঙে দিয়েচে গো, কোমরটো আমার ভেঙে দিয়েছে, শালা শাদু আমাকে মেরে ফেললে—অর রক্ত দেখব আমি।

শাদু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রহম তখনও মাটিতে পড়ে চিৎকার করছে।

অর রক্ত দেখব আমি, শালো আমার কোমরটো ভেঙে দিয়েছে।

ইকি র‍্যা, কোমরটো অর ভেঙে দিলি লিকিন ?

শাদু বলল, বললোম আজ সাবধান, আমার কিরে আচে।

কিরে ? কিসের কিরে র‍্যা ?

হ্যাঁ আচে—আমার কিবে আচে।

আর কোনো কথা না বলে শাদু চলে গেল। পগারটার দিকে সোজা এগিয়ে গেল সে। ওকে ফিবতে দেখে হামিদার চোখ চিকচিক করে ওঠে, হেরে এলি তো ?

শাদু চুপ কবে থাকে—জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে সে। কথা বলচিস না যি, হেরে এলি লয় ?

গম্ভীর মুখে শাদু বলে, দেখে আয় গা যা।

কি ?

রহমের কোমরটো ভেঙে দিইচি আজ।

সত্যি ?

কোমবটো ভেঙে দিইচি শালোর। শালো দশদিন উঠতে পারবে না, চেরজন্ম সোজা হয়ে হাঁটতে পারবে না।

হামিদার দু'চোখের কোণ আর্দ্র হয়ে ওঠে, করুণায় আর রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে। আই সব্বনাশ, আই সব্বনাশ, কোমরটো ভেঙে দিয়ে এলি তু ?

তু যি বললি !

তা বলে কোমরটো ভেঙে দিবি তু ?

তু বললি ক্যানে ?

হাঁ যমের অরুচি, তা বলে মানুষ খুন করবি তু, মানষুটে। আই সব্বনাশ মানুষটোর কোমর ভেঙে দিলি তু ? লে, এ্যাকন আমাকে লিয়ে কি করবি কর, ধুয়ে ধুয়ে খা আমাকে।

তু বল আমি কি কবব ? আমি যে তোর কথা মন থেকে তাড়াইতে পারচি না, আমার ঘুম লষ্ট হবে, আমার কাজে মন যেচে না, আমি কি করি তু বল।

আমি কি বলব ?

আমি তোকে বিয়ে করব ?

মরণ, আমাব সোয়ামী বেঁচে নাই লিকিন। সোয়ামী থাকতে তোকে বিয়ে করব ক্যানে ? মরণ।

তাইলে আমি কি করব আমাকে বল।

খা দা আর ঘুমো, কাজকম্ম কর।

তু যি বলেছিলি ভালোবাসিস।

বলেছেলোম একদিন।

আজ কি ভালোবাসিস না ?

না।

দেহটি মোচড়ায় শাদু, হাত ধরা কাঠিখোঁচাগুলি মড় মড় করে ভাঙে, নিশপিশ করে, তারপর বলে, ক্যানে তবে বলেছিলি ?

হামিদা চুপ করে থাকে।

ক্যানে আমার মনটো ভাঙলি ?

মেয়েটি তবু চুপ করে থাকে।

আমি তোকে বিয়ে করি।

না।

ক্যানে ?

আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।

তু সোয়ামীর বাড়িতে গেলি না, সে শালোর ঘাডটো আমি ভাঙব, ই গাঁয়ে শালো যেন না আসে। তু সোয়ামীর ঘরও করবি না, আমার ঘরও আসবি না. আমি ঠিক তোকে খুন করে ফাঁসি যাব।

আমাকে ত্যাখন বিয়ে করলি না ক্যানে ? খেতে দেবার ক্ষ্যামতা নাই তোর। তোর বিয়ের সখ ক্যানে ?

শাদু অসহায় চোখে ,'চয়ে থাকে। শরতের রোদ প্রখর হয়ে ওঠে। অনেক দূরে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যায়। মনটা কেমন করতে থাকে। মরা পাখিটার ভিজে পালক শুকিয়ে গিয়েছে। ওর মতো চোখ বন্ধ করে ঘুমোতে ইচ্ছে করে শাদুর।

হামি ?

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ওঠে মেয়েটি। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে, আমার যে সোয়ামী আছে।

তাকে তো তু ভালোবাসিস না।

না।

ভালো না বাসলে আর সোয়ামী কি ? আর ভালোবাসলে সোয়ামী না হলেই বা কি ?

ছি, উকথা বলিস না।

ক্যানে বলব না, ইটা নেয়ম। তু যি বলেছিলি ভালোবাসিস।

ছাগলের খোঁটা পুঁততে পুঁততে হামিদা একদিন বলেছিল ভালোবাসে।

সেদিনও এমনি প্রথম শরতের সকাল ছিল। পিছন থেকে শাদু এসে ডেকেছিল, হামি?

ফিরে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল হামিদা।

শরতের সেই সকাল সেদিন তাদের জন্য একটি আড়াল রচনা করেছিল।

বুক-উঁচু ধানের জমির ভিতরে সারস চরছিল প্রকৃতি যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ করে একবার বাতাস বইল দক্ষিণ দিক থেকে, হলদে পাতা উড়তে উড়তে এসে হামিদার খোঁপায় আটকে গেল।

শাদু ডাকে, হামি।

উঁ।

এ্যাই।

উঁ।

বল।

কি?

বল ভালোবাসি।

ভালোবাসি।

আবার বল।

ভালোবাসি।

আবার।

বাসি।

আর একবার—

মরণ। খবরদার ছুঁবি না, ছুঁবি না খালেভরা।

ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। উজ্জ্বল রোদের মধ্যে ওদের মাথার ওপর শরতের একখণ্ড মেঘ জমে ওঠে, হঠাৎ বর্ষণ শুরু হয়। রুপোর মতো সাদা বড় বড় বৃষ্টিবিন্দুগুলি দেখা যায়, ধানের পাতায় পানি জমে থাকে। একটা সোঁদা গন্ধ ওঠে।

সেই যে হামিদা বলেছিল ভালোবাসি তখন থেকেই শাদুর মনখারাপের রোগটা দেখা দিল। মেয়েটা রাককুসী, মেয়েটা শনি—শাদু ভাবে। বললে,

ভালোবাসে—বলে আবার বিয়ে করলে আর একজনাকে। ওর বুড়ীদাদীকে বলতে গ্যালোম, তা সে হারামজাদি তেড়ে এলো আমাকে, বিয়ে তো করবি, খেতে দিতে পারবি আমার লাতিনকে ? তোর লিজের আজ খেতে কাল জোটে না, তোর আবার বউয়ের সখ ক্যানে ? হামিকে বলতে গ্যালোম তা সে চোখ ঘুরিয়ে বললে, আমাকে বিয়ে করবি তো খেতে দিবি কি ?

সি কথাটো সত্যি। সি কথাটো বাপু সত্যি, আমার জমি যা তাতে মায়ের আর আমার তিন মাসের খোরাকীটো কোনোরকমে হয়, তা বাদ সারা বছরটো মুনিষ খেটে, অ্যানেক ধান্দায় চালাতে হয়। আমার লিজের ভাত জোটে না, তা তোকে মহারানীর মতো রাখি ক্যামন করে।

ভেবে কোনো সুরাহা হয়নি। হামিদার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ট্যারার সঙ্গে। বাড়ি অন্য গ্রামে। লোকটা ট্যারা, মিশমিশে কালো, ঘাড়ে গর্দানে।

ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পরেই শাদুর রোগটা শুরু হয়। বুকটা জ্বালা জ্বালা করে, মনটা হু হু করে—খরার শস্যহীন মাঠে ধূসর সন্ধ্যার মতো। ওর ব্যবহারও কেমন অদ্ভুত হয়ে আসে। বুড়ি মা শাদুর চালচলনের অর্থ খুঁজে পায় না—মাঝে মাঝে কাঁদে, ছেলেটা আমার বেবাগী হচে ক্যানে গো ?

অনেক রাত হলে শাদু বাড়ি ফিরে আসে। প্রদীপের নিরানন্দ আলোয় মা একা একা ঢোলে, ছেলের প্রতীক্ষা করে, তারপর এক সময় মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

শাদু ভাবে মায়ের দুখটো আর এহজনমে ঘুঁচুইতে পারলোম না, ভাতের কষ্টই গেল না শালোর। অনেক দিন বাড়ি ফিরে দেখে ভাত ঢাকা দিয়ে মা বসে আছে। শাদু জিগগেস করে, তু খেলি মা ?

খেয়েচি বাপ, তু খা।

মা তু মিছে কথা বলচিস, তোর ভাত নাই লয় ?

কপালে চড় মারে মা। চড় মারার তালে তালে বলে, হায়, আমি কি করব ! তার বাপ যে একবিঘে জমি রেখে ড্যাংড্যাংগিয়ে চলে গেল, তা আমি কি করি। বলি বাজেপড়া, লিজে এগু খেয়ে লেয়ে আমাকে শুধুইতে পারিস না।

আধপেটা ভাত খেয়ে অন্ধকার ঘরে ছেঁড়া কাঁথার ওপর শাদু শুয়ে পড়ে। খড়ের ফুটো চাল দিয়ে শীতার্ত হিমেল আকাশটা চোখে পড়ে। আকাশের ঠিক সেই অংশেই গোটা কয়েক তারা নিদ্রাহীন স্তিমিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। আকাশটা যেন হামিদার সখের শাড়ি, যে শাড়ি সে কোনোদিনই পরতে

পারেনি, যে শাড়ি সে একদিন পরবে, আকাশটা যেন সেই শাড়ি। তারাগুলি সেই শাড়িরই চুমকি। মাটির দেয়ালের খাঁজে খাঁজে ইঁদুর দৌড়ে বেড়ায়, অন্ধকারের ভিতর থেকে টিকটিকি ডেকে ওঠে—শাদু এপাশ ওপাশ করে। কত রাত্রে পরিচিত স্পর্শে চোখ মেলে চায়, ফাটা শীর্ণহাতে কপালে হাত বুলোয় মা—বাঁ হাতে নিভু নিভু প্রদীপ।

হাঁ বাপ তু ঘুমুইচিস না ক্যানে? তোর কি হয়েচে আমাকে বল।

সি তু জানিস না, মা।

বিয়ে করবি তু?

না।

ক্যানে?

না।

মায়ের জানটোরও ত্যাল শ্যাষ হয়ে আসছে—শাদু ভাবে। মৃদু আলোয় বুড়ির মুখের অসংখ্য বলিরেখা জটিল জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সি তু জানিস না, মা। তু ঘুমো গা।

মা আস্তে আস্তে উঠে যায়।

ঐঃ, উ হোনেই আমার এ্যমোন হলো, উ সব্বোনাশী আমার সব্বনাশ করলে। ক্যানে সি আমাকে বলেছিল ভালোবাসি—তা লইলে তো এ্যামোন হতো না। আমাকে বললে ভালোবাসি, কতদিন ডাকলে অর ঘরে, তা বাদ আবার বিয়ে করলে। বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি গেল না—তাই যা, শ্বশুরবাড়ি যা—তু শ্বশুরবাড়িও যাবি না, আমার ঘরে আসবি না, তোকে লিয়ে তো ভারি বেপদ হলো।

হামিদার বিয়ের কদিন আগে মরিয়া হয়ে ওর কাছে আর একবার গিয়েছিল শাদু। অনুনয় করেছিল, মিনতি করেছিল, তাদের ভালোবাসার দোহাই দিয়েছিল।

হারামী মেয়েটো আমাকে আচ্চর্যি করলে। উকে বোঝলোম না আমি, উকে বোছলোম না।

হামিদাকে বুঝে উঠা সত্যিই মুশকিল হয়েছিল শাদুর পক্ষে। সে বলেছিল, হামি, আমি একটো উপয় করলোম। বিয়েটো আমরা করেই ফেলি।

তা বাদ?

তা বাদ আবার কি? তুও এক আধটু খাটবি, চলে যাবে যেমন করে হোক।

আহা রে, ওরে আমার গোঁসাই—চোখ ঘুরিয়ে, কোমর দুলিয়ে একটা বিশ্রী ভঙ্গি করে উঠেছিল হামিদা—যিখানে আমার বিয়ে হচে সিখানে আমাকে কি কি গয়না দিচে জানিস। জানিস কয়টো শাড়ি দিচে ? তোর আজ খেতে কাল নাই, হাডহাবাতে, তোর বাড়ি যেয়ে তোর মায়ের বাঁদী হব লিকিন ?

ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল শাদু, ন্যাকার মতো প্রশ্ন করেছিল, ভালো-বাসাটো কিছুই লয় ?

অত পিরীত আমি বুঝি না—কোমর দুলিয়ে চলে যাচ্ছিল হামিদা। চিৎকার করে উঠল শাদু—দূর হ, দূর হ চোখের সামনে থেকে, দূর হ যমের অরুচি, চক্ষের শূল।

মেয়েটিকে শাদু বলে হাডজ্বালানি। বিয়ে করল সে ট্যারাকে। হ্যাঁ, সে-ই বিয়ে করেছে বলা চলে। কারণ তার এক পোষা কালা দাদী ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার বিয়ের পর হামিদা শ্বশুরবাড়ি গেল না। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাত স্বামীর সঙ্গে। ট্যারা মাঝে মাঝে আসত, নিয়ে যাবার প্রস্তাব করত, না যেতে চাইলে চিৎকার করত, যাবি না ক্যানে হারামজাদি, তোর বাপ যাবে, চুলের ঝুঁটি ধরে লিয়ে যাব।

মাঝখান থেকে খনখন করে চেঁচিয়ে উঠত হামিদার দাদী, এ্যাদ্যা ম্যালা চেল্লাস না, যাবে না আমার লাতিন, কী করতে পারিস তু ? তোর বড্ডা বাড়, দশকে ডেকে জুতিয়ে তোকে গাঁ থেকে তাডাব।

ছোকরা আর বেশি গোলমাল করতে সাহস করত না। সেও যেন আস্তে আস্তে কেমন হয়ে গেল—নিজের গ্রামে আর বড একটা থাকত না। শ্বশুরবাড়িতে জায়গা না থাকলেও এর ওর বৈঠকখানায় শুয়ে থাকত, দিনমজুরি করত, যার-তার সঙ্গে মারামারি করত আর মাঝে মাঝে আকণ্ঠ তাড়ি গিলে অন্ধকারে হামিদাদের বাড়ি গিয়ে চিৎকার করত, যাবি না ক্যানে হারামজাদি, ক্যা আচে তোর ইখানে, যেতে হবে তোকে ? বল কুন শালা আচে তোর ইখানে, সে-শালোর ঘাড় ভাঙব আমি।

ওর চিৎকারের উত্তরে হামিদা তার দাদীকে লেলিয়ে দিত। পাড়া মাথায় করত হামিদার দাদী। মাঝে মাঝে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে ট্যারা, আমার দোষটো কোতা হঁ৷ দাদী ? বিয়ে করলোম, বউ লয়ে যাব না লিজের বাড়িতে, লিজের বউয়ের সাথে ঘর করব না, ই কতা কুন রাজ্যে ক্যা শুনেচে। ই তো মাহা ফ্যারের কতা বটে।

হামিদার বুড়ি দাদীর কথা একটাই, থাকবে না আমার লাতিন তোর সাতে, তু আপনার মানে মানে দূর হ।

নিদারুণ প্রতিহিংসায় যেন ক্ষেপে উঠত ট্যারা, দাঁড়া হারামজাদিরা, একদিন রেতে গলা টিপে যদি লিকেশ না করি, আমাব ট্যাবা নাম লয়।

এই গোটা ব্যাপারটার কোনো হদিস পায় না শাদু। একটা অজুহাত তুলে শাদুকে বিয়ে কবল না হামিদা। মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত হাসি চিকচিক করে ওঠে হামিদাব চোখে, গভীর কালো সেই চোখের রহস্য ছাপিয়ে হাসিটা দুর্বোধ্য একটা ধাঁধার মতো হতচকিত করে দেয় শাদুকে। সেই হাসিটুকু সে বুঝতে পারে না। কেমন ভয় ভয় করে তার। ওর মনে হয় হামিদাকে একটুও চেনে না সে। এ-সন্দেহও তার মাঝে মাঝে হয় যে হামিদা আসলে ডাইনী কিংবা সাপিনী— তার মতো একটা জোয়ান পেয়ে খেলা করছে, ইচ্ছে হলেই মাথাটা চিবিয়ে খাবে, না হয় মোক্ষম ছোবল দেবে। তাই যদি না হবে, সে শাদুকে বিয়ে করল না কেন? আর ট্যারাকে বিয়েই যদি কবল তাহলে তাকে একদিনও আমল দিল না কেন? মেয়েটা ওর চোখের সামনে থেকে ওকে যেন প্রতি মুহূর্তে পুড়িয়ে মারছে, শাদুর মনটা তাই হু হু করে, বুকটা যেন খাক হয়ে যায়। অথচ ওকে ত্যাগ করা যাচ্ছে না। কখন হয়ত সেই দুষ্টুমিভরা তীক্ষ্ণ সূচিমুখ চকচকে হাসিটা প্রেয়সীর পরিচিত কোমল প্রশ্রয়ের অশ্রুতে গলে যায়, চোখের মণিদুটি ভরপুর অশ্রুর মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠে, ওর ভিতরের ভালোবাসাটা যেন চোখে দেখা যায়, ভালোবাসার যে পরশমণির স্পর্শে সবকিছু সোনা হয়ে ওঠে, ওর চোখের মণি যেন সেই পরশ-মণি—দু'হাতে বুকে টেনে ফিসফিস কবে বলে, ভালোবাসি, তোকেই ভালো-বাসি। তারপর কেঁদে বলে, আমার যি বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আমি কী করি। আমি ক্যানে যে বিয়েটো করলাম। কী ঢুকল আমার মাথার ভ্যাতর, তু ক্যানে কেড়ে আনলি না আমাকে?

কথা শুনে শাদু ভীষণ অবাক হয়ে যায়। মেয়েটা বলে কী। দোষটা এখন তারই ঘাড়ে চাপাতে চায়। সে বলে, তাহলে এখন তালাক দে ক্যানে?

না তা হয় না।

ওদের গ্রাম্য নীতিবোধে শাদু ভাবে, কাজটো বড্ডা খারাপ হচে, উ সোয়ামীর কাচেও যেচে না, আমার ঘরেও আসচে না, অথচ আমাকে ফী রেতেই পেরায় ভালোবাসচে। ই সাংঘাতিক বেপার।

সেদিন রহমের কোমর ভেঙে এসে একটা হেস্তনেস্ত করার মনোভাব নিয়ে

এল শাদু। সে বলল, ভালো না বাসলে স্বামীর কোনো মর্যাদা দেবার দরকার নেই।

আবার ওদের অদ্ভুত গ্রাম্য নীতিবোধে নড়েচড়ে হামিদা বলে, ছি, উ কথা বলিস না। সোয়ামী সব সোমায়েই সোয়ামী।

একটু আগের লড়াই-জেতা শাদু যেন বিমুগ্ধ অসহায় একটি পতঙ্গ। কিন্তুক আমি কী করি আমাকে বল। আমার একটো বেবস্থা কর।

আবার যেন হামিদার ভালোবাসাটি শাদু চোখে দেখতে পেল। ওর চোখের মণি যেন ভালোবাসার পরশমণি—সে যেন এক গভীর বৃহৎ মমতায় গলে যেতে লাগল। সে বলল, আজ রেতে আসিস আমাদের বাড়িতে, মনের জ্বালা জুড়োব তোর কাছে। সবকথা বলব তোকে। শেতল হব, আমি আর সইতে পারচি না। আসবি তো আজ রেতে? আসিস, আজ নিচ্চয় আসিস।

শাদু তাকে কথা দেয়। ভাবে, জানটো জুড়োতে চায়, শেতল হতে চায় হামি আমার কাছে, আমি না গেলে চলবে ক্যানে। তবে শালোর আমিও আজ একটো হেস্তোন্যাস্তো করব, হাড়জ্বালানি আমার জানটোকে খেলে।

রাত একটু বেশি হলে শাদু পায়ে পায়ে এগোয়। শাদুদের সময় পরিমাপের রীতি অনুসারে তখন ভাতঘুমের সময়, অন্ধকার ঝেঁপে আছে গ্রামটিকে। যেন একটি বিরাটকায় কালো বাদুড় তার ডানা মেলে অন্ধকারে গ্রাস করেছে গ্রামটিকে। রাস্তার উঁচু-নিচু, ইট-পাথর শাদুর পরিচিত। বিশেষ করে অন্ধকারে এই রাস্তটা তার এত বেশি পরিচিত যে চোখ বন্ধ করে যেতে তার অসুবিধা নাই।

হামিদাদের বাড়ির পাঁচিল পড়ে গিয়েছে। মাটির বারান্দায় কাঁথামুড়ি দিয়ে ওরা শুয়ে আছে, দূর থেকে বো॰। যায়। অভ্যস্ত চোখে অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। শাদু জানে সে গেলেই দাদীর ঘুম ভেঙে যাবে, একটুও ব্যস্ত না হয়ে বুড়ি জিজ্ঞেস করবে, ক্যা ও শাদু লিকিন? আমি ভাবলোম আর কেউ। কাল যাব তোর মায়ের কাচে—ও হামি ওঠ টি, শাদু আইচে—বুড়ি আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

উঠোনটুকু পার হয়ে শাদু বারান্দায় উঠে পড়ল। দাদীর ঘুম আজ আর ভাঙে না—হামিদার শিয়রের কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে শাদু ডাকল, হামি।

মেয়েটা অঘোরে ঘুমিয়ে। শাদু আবার ডাকে, হামি, এই দ্যাখ, আমি এয়েচি, হামি। এ্যাই হামি?

যেন আঁতকে উঠে ঘুম থেকে জেগে উঠল হামিদা। আর্তস্বরে চিৎকার করে

উঠে, ক্যা গো ?

চুপ চুপ, আমি শাদু।

হাঁ ওলাউঠো, হাঁ মরণ আমি চুপ করব ? ক্যানে ? দাদী, দাদী, ওঠ্ শিগগীর, শাদু আইচে আমার বাড়ি এই রেতে, শাদু আইচে আমার সব্বনাশ করতে।

শাদু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। অন্ধকারে হামিদার মুখটা দেখা যায় না, কিন্তু বোধহয় আন্দাজ করা যায়, সাপিনীর সেই হিসহিসে হিংস্র হাসিটা ওর চোখে চকচক করে উঠেছে। ফণা তুলে দুলছে মেয়েটা, এক্ষুনি ছোবল দেবে।

দাদী ঘুম ভেঙে উঠে বসে। সেও ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। শাদু এসেছে এজন্যে চেঁচামেচি কেন তা তার নিদ্রাস্থূল নির্বোধ মাথায় ঢুকতে চায় না। তারপর সেও যেন হামিদার প্রতিধ্বনি করে ওঠে। আই সব্বনাশ, আই সব্বনাশ, শাদু আইচে এই রেতে আমার বাড়ি, লাতিনের সব্বনাশ করতে। হায়, ই কী কথা গ ! চিলের মতো তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করছে তখন হামিদা। ক্যা কোতা আচ গো, ছাখোসে, শাদু এসে আমার কাপড ধরে টানচে।

হতভম্ব শাদু দেখল অন্ধকার ফুঁড়ে তিনটি ছায়ামূর্তি বাড়ি ঢুকল, ওরা কাছে আসতে একজনকে চিনতে পারল—ঘাড়েগর্দানে ট্যারা। ট্যারা আসতেই হামিদা আর একবার চিৎকার করে, ওঠে, এ্যা ছাখো শাদু এই রেতে এসে আমার কাপড় ধরে টানচে, আমি কিচুই জানি না, আমি তোমার বিয়ে-করা বউ।

ওরা এসে যখন শাদুকে ধরল, সে ব্যাপারটার তখনো যেন মর্ম নিতে পারে না। দারুণ আক্রোশে ট্যারা ওকে যেন খুন করেই ফেলতে চায়, শালো ঘুঘু বারে-বারে ধান খাও তুমি, শালো আজ তোমার হালোয়া বার করব আমি।

শাদু স্থির হয়ে বসে থাকে। ওর চোখের সামনে আকাশের তারাগুলি থির থির করে কাঁপতে থাকে। গাছকোমর করে কাপড়-পরা হামিদার মূর্তি ফিকে অন্ধকারে ভয়ংকর একটা সাপের মতো চলতে থাকে। নিজের রক্তে বিষের ক্রিয়া সে অনুভব করে। ছুরির ফলার মতো চকচকে চাপা হাসিটা সে অনুভবে দেখতে পায়।

তার পরের দিন সন্ধ্যায় বিচারসভা বসে। মাতব্বর জিজ্ঞেস করে, হামিদার দাদী, শাদু কি কাপড় ধরে টেনেছিল হামিদার ?

সি কথা আবার শুধুইচ গ—আমি কি মিছে কথা বলছি ?

আচ্ছা হামিদা, ঠিক করে বলতো বাপু, শাদু কি রেতে তোমার কাপড় ধরে টেনেছিল ?

হাঁ টেনেছিল।

ঠিক বলছ তো ?

অয়, আমার কাপড় ধরে টানলে আর আমি বুঝব না, কী কথা বলছ গ ?

বাস বাস—আর-একটি কথা, ট্যারা ইদিকে এসো দিকিন !

ট্যারা মাতব্বরের সামনে দাঁড়ায়।

তুমি তো বাপু হামিদার কাছে থাক না—উ বাড়ি যাওনা তুমি, কী করে তুমি বাপু ঠিক পেলে আজ রেতে শাদু আসবে।

আমি জানতোম।

কী কবে জানতে সেইটোই শুধুচ্চি।

আমি জানতোম।

একটা কতা একশবার বলো না বাপু, জানতে কী করে সেটি তুমাকে বলতে হবে।

বউয়ের সাতে আমার ভাব হইচে, বউ বলেছিল আমাকে।

সভায় একটা গুঞ্জন শোনা যায়, ই তো ভারী মজার কতা বটে।

মাতব্বর এবারে শাদুকে ডাকে। শাদু, তুমি কাল রেতে হামিদার বাড়ি গেইছিলে ?

গ্যাসলোম।

আরে শালো, শালো আবার ––ল, গ্যাসলোম—কোনো নীতিবাগীশ মন্তব্য করে।

অর কাপড ধরে টেনেছিলে ?

টেনেছেলোম।

মাতব্বর শান্তকণ্ঠে বলে, তাইলে আর কী, সবাই স্বীকার যেচে। মানে কতা হলো কী শাদু অন্যায় করেচে, তার বিচের দরকার।

শাদুর সমর্থক কেউ চিৎকার করে ওঠে বিচের আবার কী, হামির বাড়ি শাদু আজ কেন কতদিন ধরে যেচে। বোধহয় আরো কেউ যায়, সি কথা আমরা জানি। মাতব্বর বলে, বেশ না হয় জানলে, কিন্তুক হামিদা তো কুনদিন বিচের চায় নাই। বিচের চাইলে বিচের হতো তার।

অ, সেটোও তো একটা কথা বটে—সমর্থক যুক্তি পেয়ে আশ্বস্ত হয়। মাতব্বর

রায় দেয়, তাইলে অন্যায় একটো শাদু করেচে, অকে দশজুতো মারা হোক, না কী গ?

নিচ্চয় সেইটোই লেজ্য হয়।

আমি দশের কাছে দশজুতো খ্যালোম—অন্ধকারে অশ্বত্থ গাছটার মোটা গুঁড়িটায় বসে শাদু ভাবে, উ কী ভালোবাসতে আচে, উ পাপ, উ কী কেউ ভালোবাসে, উ যে সাপ।

ওর পিছনে একটি ছায়া এসে দাঁড়ায়।

শাদু বিড়বিড় করে, আমার লেজ্য বিচার হয়েচে। দশের কাছে আমি দশজুতো খ্যালোম। আমার জানটো লিয়ে লিলে না ক্যানে ওরা।

পিছনের ছায়া মৃদুকণ্ঠে ডাকে, এ্যাহ।

শাদু পিছন ফিরে তাকায়। হামিদা দাঁড়িয়ে আছে। মাথার কাপড় তোলা, জড়সড় হয়ে নববধূর মতো দাঁড়িয়ে আছে। চোখদুটো হাসছে। এ্যাই শুনতে পেচিস না?

শাদু চুপ করে থাকে।

আর ভালোবাসবি না? মন জুড়োতে যাবি না আমার কাচে, শেতল হবি না—ম্লান হাসে হামিদা।

শাদু কথা বলে না।

আমার সাথে কতা বলবি না, লয়? গাল দিচিস আমাকে?

মানুষটা তবু কথা বলে না।

বলিস না, বলিস না, কতা বলিস না। যমের অরুচি, চক্ষের শূল—হু হু করে কেঁদে ভেঙে পড়ে মেয়েটা। ঐ যে ওর ভালোবাসাটো ওর চোখে আশ্রয় করে—যেন চোখে দেখা যায়।

আজ যেচি আমি সোয়ামীর বাড়ি, তোর ছেলে রইল আমার প্যাটে। খানিকটো শোধ দেলোম।

যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

গুনীন

তারা বিশ্বাস করে প্রতি বছর ফসল দেবার পর মাটি আবার কুমারী হয়ে ওঠে। তখন তার মানভঞ্জন করতে হয়, মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে হয় তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে। তারপর বর্ষার শুরুতে প্রথম ভারী বর্ষণের দিনে তার রসপূর্তি ঘটে ; কানায় কানায় মাটি যৌবনবতী হয়ে ওঠে। রসে আপ্লুত সেই ভিজে মাটি তখন বীজগ্রহণে এবং গর্ভধারণে প্রস্তুত হয়।

সে-বছর জ্যৈষ্ঠের প্রথম যেদিন প্রবল বর্ষণে এই নদী-নালা এবং খাল-ভর্তি বিশাল ভূভাগ সম্পূর্ণ অবগাহন করেছে, চাপ চাপ অন্ধকার জমেছে নদীর উপরে, তীরের জঙ্গলে এবং আর্ত বাতাসের শব্দ শোনা গিয়েছে বহুদূর থেকে—সেদিন রাতে বুড়ো গুনীন মারা গেল।

বর্ষার প্রথমেই এ-ঘটনাটিতে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল গ্রামবাসীরা।

বুড়ো গুনীন এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। সে রূপকথার সেই বুড়ো যার অজানা নেই কিছুই। সে এমন একটি মন্ত্রের অধিকারী, যার শক্তিতে আকাশ থেকে অকস্মাৎ বাজ নেমে আসতে পারে, উড়ন্ত পাখি যে-মন্ত্রে একখণ্ড পাথরের মতো মাটিতে পড়ে যেতে পারে।

গোটা দুটো পুরুষ ডিঙিয়ে সে বেঁচে আছে। তার প্রৌঢ় দুই ছেলের মৃত্যুর ঘটনা গ্রামবাসীদের স্মৃতিতে ঝাপসা। এখন তার তিন পৌত্র বেঁচে আছে—তাদের মধ্যে যে বড় সে চাল্লিশ ধরব ধরব করছে।

গ্রামের মাঝখানে গুনীনকে রাখতে ওদের সাহস হয়নি। গাঁয়ের এককোণে ডোবার ধারে বড় একটা তেঁতুলগাছের গা-ছমছম-করা অন্ধকারে তাকে একটা কুঁড়ে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তৈরি করে দেওয়া হয়েছে বললে ভুল হবে, সে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে।

গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত বিস্ময়ে গভীর রাত্রে ওকে দেখতে পায়—সাড়ে-ছ'ফুট লম্বা, জীর্ণ কঙ্কালসার একটি মানুষ, দুচোখ যেন জলছে, হাতে ছোট একটি লাঠি, বিড়বিড় করে কী বলছে সে। দিনের বেলায় দেখা যায়, ঐ দীর্ঘ লম্বা শরীরটা

গুটিয়ে তালগোল পাকিয়ে কুঁড়ের ভিতর সে পড়ে আছে। ঝাড়ফুঁক বা এ-ধরনের বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে ওর সামনে কেউ যায় না।

সে-রাতে ডাক এল গুনীনের নাতিদের কাছে। বর্ষার প্রথম ভারী বর্ষণের রাতে। তপ্ত কামনায় বৃষ্টিধারা পান করে মাটি বিবশা নারীর মতো অপেক্ষা করছে তখন। বড় নাতি রহম উঠে এল বিছানা থেকে। গলা থেকে বউয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে তীব্র কী এক আকর্ষণে, নিশি পাওয়া মানুষের মতো উঠোনে নেমে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে। জলো হাওয়া খালের দিক থেকে হু হু ছুটে এল, সূঁচের মতো আঘাত করল বড় বড় বৃষ্টিবিন্দু। সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, বাতাসের উজোন ঠেলে, হিমশীতল ভূতুড়ে গাছগুলির নিচে দিয়ে টলতে টলতে সে তেঁতুল-তলার কুঁড়েটার দিকে এগোল। ডোবাটার কাছাকাছি আসতে হঠাৎ পায়ের নিচে গর্জন করে কী যেন ফুঁসে উঠল। রহমের বুঝতে দেরি হয় না, সাপের ঠিক মাথায় পা দিয়েছে সে। লম্বা চাবুকের মতো দেহের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে সাপটা জড়িয়ে ধরল তার পা। ডান পা-টা ওর ধীরে ধীরে অবশ হয়ে ওঠে। কিন্তু সে ভালো করেই জানে পা আলগা করলে বাঁচবার কোনো পথ নেই।

শরীরটা একবার খুলে নিয়ে চাবুকের মতো আঘাত করে সাপটা। কিন্তু রহম তার কুৎসিত প্রশস্ত পা দিয়ে প্রায় থেঁতলে দিয়েছে ওর মাথা। আস্তে আস্তে ওর বাঁধন আলগা হয়ে খুলে যায়। আর গভীর আক্রোশে চাপ দিতে দিতে রহম বলে, হালার পো হালা, মোরে কামড়াইতে চায়। হালার খায়েশ দ্যাহো।

গোটা শরীরে শিউরে উঠে সাপটা স্তব্ধ হয়ে যায়। লেজ ধরে রহম ওকে ডোবাটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আবার মাতালের মতো চলতে থাকে সে। যখন নিকষ অন্ধকার-ভর্তি কুঁড়েটার মধ্যে সে ঢোকে, একটা কাঁপা কাঁপা পাতলা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার কানে আসে, আমি মরমু এ্যাহন বোঝছো, এ্যাহনই মরুম। তোরা হকলডি আইছ? আইছ তো তোরা তিন ভাই?

রহম গুনীনকে দেখতে পায় না। অন্ধকারের সঙ্গে সে মিশে আছে। কিন্তু পা বাড়াতেই কিসের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে হুড়মুড় করে সে পড়ল পশ্চিমের বেড়াটার উপর। দারুণ ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে রহম। আঘাত তার একটুও লাগেনি, তাড়াতাড়ি উঠে চোখ কচলে চাইতে সে টের পায় অন্ধকার যেন অনেকটা সয়ে এসেছে তার চোখে আর ফিকে অন্ধকারে নিরেট দুটি অন্ধকারের ঢিবি স্তব্ধ হয়ে আছে। ঘরের একপাশ থেকে গুনীন তেমনি করেই শুকনো গলায় আবার

জিজ্ঞেস করল, আইছ তোরা তিন ভাই? তখন রহম বুঝতে পারে অন্ধকারের তাল দুটি আর কেউ নয়, তার দুই ভাই আলী আর রমিজ। ওদের মুখ যেন কে সেলাই করে দিয়েছে। রহম আপন মনে গজগজ করে, হালাগো মুহে কতা নাই, মানুষটা মরতে লইছিল, আর হালারা চুপ কইর‍্যা আছে। আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত তীব্র আলোয় ঝলসে গেল—সেই আলোয় ছায়া ছায়া গ্রামটা, সরু খালগুলি, ছোট ছোট ক্ষেতগুলি, আতঙ্ক ধরানো ডোবা—সবকিছুর সঙ্গে গুনীনের বাসি কুৎসিত মুখ ছবির মতো ভেসে উঠল। মেঘগর্জনকে দু'খান করে দিয়ে খনখনে ক্যানাস্তারার মতো বুড়ো যেন অন্তিম চিৎকার করে ওঠে, যা, যা, যা, তোরা, শিগ্‌গির যা, শিগ্‌গির যা—কথাগুলো বলতে বলতে লিকলিকে বাঁশের মতো রসহীন হাতদুটি তুলে বারবার সে কাদের বাইরে যেতে আদেশ করল। ওরা তিন ভাই উঠতে যাচ্ছিল, ভয়ে ওদের গলা শুকিয়ে এসেছিল. বুড়ো ব্যাকুল-ভাবে বলল, তোরা না, তোরা না, আমি অগো কইছি, ঐ অগো. যা, যা, যা, তোরা, হাবাজীবন আমি তোগো লগে কাটাইছি. এ্যাহনই মরমু, হ্যাষকালে এট্টু মানুষের লগে থাকতে দে, যা তোরা, যা তোরা।

বারবার চিৎকার করে আদেশ দিতে দিতে করুণ মিনতিতে ভেঙে পড়ল সে।

একটা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের কোণ থেকে উঠে এসে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে চলল। আবার একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। রহম দেখতে পেল তেঁতুলগাছের একটা শুকনো ডাল ভেঙে পড়ল। অনেকদূরে বাঁশির মতো শব্দ করে একটা বাতাস ছুটে চলছে সে শুনতে পেল।

ওরা তিনজন কাঠ হয়ে বসে থাকে। গুনীন ফিসফিস করে বলে, গ্যাছে অরা, হোন, আইজগো একটা কতা তোগো কমু, আমারে তোরা তোগো দাদা বলে জানো, কিন্তু আমি কারো কেউ না, আমি রহম আলী গুনীন. আমি কহন হইছি কেউ জানে না, কিন্তু মরণডা আইজ হইবে। মুই আছিলাম ভূত-পেত্নার রাজা, হকলডি মোরে মানে। কিন্তু সাবধান, একজন তোগো ক্ষতি করবে, মোর জীবন-কালে পারে নাই, এ্যাহন আমি মরমু, এ্যাহন হে তোগো খুন করবে।

বুড়োর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চড় চড় শব্দ করে বাজ পড়ল। ধবধবে আলোয় চোখ ধেঁধে যাবার আগে রহম গুনীনের মুখে যেন একটা অদ্ভুত হাসি দেখল। ওদের কারো কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। গুনীন নিজের কথার খেই টেনে বলল, কিন্তু ডর নাই তোগো। একটা মন্তর শিখাইয়া দিমু। ঐ হারাম-জাদা তোগো কিছু করতে পারবে না, যা চাও—ধনদৌলত, মাইয়ালোক, যা

চাও সব পাবি, সব পাবি। কিন্তু মন্তর তিনোজন শিখতে পারবি না। যে-কোনো একজনের শিখতে হইবে। কেডা শিখবি ক। শিগ্‌গির ক। যা চাও—টাহা-পয়সা, মাইয়্যালোক সব পাবি—

এই প্রথম ছোট ভাই রমিজ বাজের মতোই গর্জন করে ওঠে, আমি—আমি শিখমু।

একমুহূর্ত সব নিস্তব্ধ, তারপরেই আলীর গলা শোনা যায়, না মুই।

একটা ধারালো নিষ্ঠুর হাসি মুমূর্ষুর ঠোঁটে দেখা দেয়, বুড়ো আবার বলে, শিগ্‌গির ঠিক কর—আমি এ্যাহনই মরমু। কেডা শিখবি ক। এই মন্তর না শিখলে তোরা কেউ বাঁচবি না। হ্যাবাদে যে-কোনো মাইয়ামানুষ—

এবারে রমিজের গলায় হিংস্র একটি সিংহ উন্মত্ত ক্রোধে ফেটে পড়ে, খবরদার, ঐ মন্তর আমি শিখমু।

মোডেই না, মুই শিখমু।

আর একবার গুনীনের ক্ষীণকণ্ঠে শোনা যায়, শিগ্‌গির ক।

মেজভাই আলী এগিয়ে যায় বুড়োর দিকে।

রমিজ নিঃশব্দে শ্বাপদের মতো লাফিয়ে পড়ে আলীর উপর। রহম চুপ করে বসে ওদের লড়াই দেখতে থাকে। কথা তো দূরের কথা, নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই ওদের। একে অপরকে জড়িয়ে ওরা একরকম বিনা শব্দেই গড়িয়ে চলে। পশ্চিম দিকের দুর্বল বেড়াটা শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে ওদের চাপা দিল, দুটো দৈত্যের মতো ওরা বেড়াটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। একসময় রমিজের একটি প্রচণ্ড লাথি এসে লাগে গুনীনের পেটে, অস্ফুট শব্দ করে বুড়োর শুকনো শরীরটা পুব-দিকের বেড়ার গায়ে লেগে থাকে।

রহমের মনে হয় লড়াইটার যেন শেষ নেই। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে সে, অসহ্য বোধ হতে থাকে তার। এবং সেইজন্যেই হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে ওদের ঘাড় মাটিতে গুঁজে ধরে। যখন তার মনে হয় সে নিশ্চিন্ত হতে পারে, তখন ওদের ছেড়ে দেয় এবং কারো কোনো খোঁজ না নিয়ে সটান ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে ভোরের বাতাসে ঠাণ্ডা জমা হয়েছে, ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যুতের চকমকানি তখনো থামেনি।

সকাল হতেই ঘটনাটা জানতে পারল গ্রামবাসীরা।

গুনীনের দুর্বল বেড়ার ঘরটা ভেঙে পড়েছে। একপাশে ঘাস আর কাদার মধ্যে গুনীনের দেহটি এতক্ষণ ভিজে ভিজে চুপসে গিয়েছে। ঘরের এককোণে

খোয়ারী না-ভাঙা মাতালের মতো আলী-রমিজ দুই ভাই শুয়ে আছে। এর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে শুকিয়ে কালচে হয়ে গিয়েছে, ওর দুটো দাঁত ভেঙেছে আর দুজনের গলায় মোটা আঙুলের কালো দাগ। বর্ষার প্রারম্ভেই এরকম দৈবঘটনা ঘটে যাবে কে ভেবেছিল ?

রমিজ আর আলী উঠে বসল বেলা দশটার দিকে। তারপর ঝগড়াটা আপসে মীমাংসা করে নিয়ে ওরা গ্রামবাসীদের লোমহর্ষক গল্প বলতে বসল। রহম বলল, গুনীন যেইনা কইল যে মন্তরডা শিখাইয়া দিবে, আর মন্তরডা শিখাইলেই জ্বেন-পরী সব দফায় রফা, ট্যাহাপয়সার অভাব হইবে না, অমনি কমু কি এই আঙুলের লাহান ছোট্ট একটা ফাড়ি কোহান দিয়া উইড়া আইয়্যা গুনীনের অলকুসের উপরে চাইপা বইল। হঠাৎ দেহি কি অলকুসের গর্তে কিছু পানি হইয়া গেছে। তহন গুনীন কইল, এড্ডা জ্বেন আমাগো পিছনে লাগছে। মন্তরডা না শেখলে বাঁচার কোনো উপায় নাই। হঠাৎ কী হইল বুঝতে পারলাম না। কোহান দিয়া বন্যা আইয়া পড়ল।

মন্তরডা তয় শেখতে পারলা না ?

আর মন্তর। আমি সোজা বাইরইয়া আইছি।

বাকিটা রমিজ বলল, লোয়ার হাড়াশির লাহান পাচটা-পাচটা দশটা আঙুল মোর গলায় বইয়া পড়ল।

আলী বলল, মোরও।

গল্প শোনার পর থেকে গ্রামবাসীদের পিছনে ছায়ার মতো ঘুরতে লাগল একটা আতঙ্ক। ওরা কিছুতেই আতঙ্কটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তার উপর সেইদিনটার সঙ্গে রাত্রির বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। সকালবেলায় আকাশের রঙ ছিল ঘোর কালো, এখন তার রঙ হয়েছে ভিজে ভাতের আমানির মতো। খুব গম্ভীর মৃদুস্বরে ডাকতে ডাকতে মেঘ আয়েশ করে বেড়াচ্ছে যেন। তবে ঝড়টা বন্ধ হয়েছে, বাতাস একেবারে থেমে গিয়েছে। গাছগুলির পাতায় সামান্য কম্পনও নেই।

আর সে কী অঝোরে বৃষ্টি! বাইরে বেরুনোর উপায় নেই। গুনীনের লাশ খড়ের বিছানা করে তার উপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মৃতদেহটি দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। বর্ষার বড় বড় মাছি বসেছে তার উপর। ঘরটার বাইরে নিচু দাওয়ায় কাদায় মাখামাখি করে, পচা কাদা ডলতে ডলতে ওরা সবাই বসে আছে। গুনীনের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। হাজার হলেও মুরুব্বি ছিল লোকটা।

কিন্তু একটা শঙ্কা এমন করে ওদের কণ্ঠরোধ করেছে যে ওরা কেউ কথা বলতে পারছে না। কদাকার হাতগুলি হাঁটুর বাইরে বের করে দিয়ে মাথা নামিয়ে ঢুলছে যেন ওরা। শেষ পর্যন্ত বরকত বলে, গুনীন কী মোসলমান আছিল না?

ক্যা?

ভূত-পেত্নী-দ্যাও লইয়া আছিল গুনীনের ব্যবসা। মন্তরতন্তর লইয়া থাকত— হুনছি নাহি শ্মশানেও বইয়া থাকত।

অরা ওতবহমই অয়—আবার দ্যাহো যাইয়া পীর-মুন্সী, ময়-মুরুব্বী, আল্লাহ্-রসূলেও অগে, ইমান আছে।

কিন্তু একলগে সব অয় ক্যামনে—শেরেকী গুণা অয়না?

মাঝখান থেকে রহম খেপে ওঠে, গুনীনের কবর তোরা হেইলে দিবি না? গুনীন মরলে হইবে কি—হেই জ্বেনটারে হে লিলাইয়া দিবে।

বৃষ্টিরঝাপসা অন্ধকার ভেদ করে ওদের দৃষ্টি বেশিদূর যায় না। কিন্তু আকাশজোড়া বৃষ্টি, বড় বড় গাছ আর সাপের মতো বাঁকা খালের পটভূমিকায় ওদের চেনা জগৎটা অবাস্তব লাগে। লম্বা হলদেটে পাকা দাড়ি মোচড়াতে মোচড়াতে কোবাদ শেখ অকস্মাৎ গর্জন করে ওঠে, আল্লা, আল্লা।

শিউরে উঠে লোকগুলো একসঙ্গে গুঞ্জন শুরু করে, না না, কবর দেতে হইবে —করব না দিলে চলবে ক্যা!

গুনীন সম্ভবত তার কোনো বিশ্বস্ত জ্বীনকে ইতিমধ্যেই লেলিয়ে দিয়েছে। তিনবার করব খুঁড়েও গুনীনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো না।

খানিকটা গর্ত করতেই পানি উঠছে নিচে থেকে, দমকা দমকা পানিতে ভরে যাচ্ছে কবর।

আকাশ উন্মত্ত হয়ে উঠল, বাতাস আবার শুরু হলো, বাজ পড়ল নারকেল গাছের মাথায়। শেষ পর্যন্ত গুনীনকে ওরা একরকম অর্ধেক পানিতে ডুবিয়ে মাটি-চাপা দিয়ে এল, রহম বলল, আইজ রাইতে গুনীনের কবরে আগুন উঠবে— পানি যতহ হোক, আগুন উঠবেই।

ভয় ভয় ভয়। এক ভয়ঙ্কর ভয়ানক দেহহীন ভয়। সেই ভয়ের আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিতে নিতে দিনটা ফুরিয়ে গেল।

কিন্তু মন্তরটা যে ওদের কেউ শিখতে পারল না এজন্যে রহম যেন সিঁটিয়ে রইল শঙ্কায়। বদমাইশ দুটো যদি ওরকম করে মারামারি না করত! মন্ত্রটার এত গুণের কথায় কেউ কোনো কান দিল না—মেয়েমানুষের কথাতেই যেন ক্ষেপে

উঠল ছোঁড়াদুটো। তার উপর রহম খুব ভালো করেই জানে গুনীন মারা গিয়েছে রমিজের লাথিতে। কারণ ওই লাথিটা পেটে লাগতেই বিশ্রী শব্দটা করে গুনীন সেই যে চুপ করে গিয়েছিল, তারপর আর কথা বলেনি। রহম বার বার চেয়ে দ্যাখে আলী আর রমিজের মুখের দিকে। মুখ তো নয়, যেন দুখণ্ড ঢাউস মাটি।

কিন্তু ভয় তারাও পেয়েছে।

গুনীনের কবরটা শেষ করে, মোটামুটিরকম হাত-পা ধুয়ে ফিরতে ফিরতে একসময় দেখা গেল আলী নেই দলের মধ্যে। কখন সে সরে পড়েছে কেউ লক্ষ করেনি। সন্ধ্যার ছিলছিলে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে মাটি-কাদা-মাখা অবস্থায় কোদাল কাঁধে সে তখন আমেনা চাচীর উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সুযোগটা সে কিছুতেই হারাতে চায়নি ; কালরাতে মারামারি করে শরীরটা ভার হয়ে আছে। গুনীনের কাছ থেকে মন্ত্রটাও শেখা গেল না, জীনটা নিশ্চয়ই লেগেছে পেছনে। কিন্তু মন্ত্রটা শিখতে পারলে অন্য কাজ হতো। বর্ষা শুরু হলে, মাটি ভিজলে হু হু করে মনটা।

আমেনা চাচীর কাছে থেকে আজ জবাবটা চাই. রাবেয়ার খবরটাও আজ তালাশ করে দেখতে হবে।

মেঘের মতো চুল এলিয়ে দিয়ে বসে রয়েছে রাবেয়া। আলীকে দেখেই সে তাদের খুপরির এক কোণে গিয়ে ঢোকে। আবছা অন্ধকারে, উপুড় করা কলসের মতো ওর আশ্চর্য উর্ধ্বাঙ্গের রেখাগুলি আলীর চোখে পড়ে। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপটা এবং ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আসে। প্রাণভরে নিশ্বাস নেয় আলী। বৃষ্টির পানি সে মুখে মাখে।

দাওয়ার উপর তসবী হাতে বসেছিল আমেনা চাচী। সাংঘাতিক চমকে ওঠে সে। ভয়চকিতস্বরে প্রশ্ন করে. কেডা, কেডা, ওহানে কেডা ?

মুই চাচী, মুই আলী।

কাশটাশ দিয়া আইতে অয়না—সন্ধ্যাকালে ওরহম চোরের লাহান মানষের বাড়ি কেউ আয় ? বাড়িতে পুরুষ পোলা কেউ নাই—তোগো আক্কেলডা কী ?

মনডা খুব খারাপ চাচী, খেয়াল আছিল না। গুনীন আইজ মরল কিনা !

গোর দেওয়া হইছে ? হারাদিন কী ভাওর না হইল। গুনীনের লগ্‌গেই এরহম হইতে আছে। হারাজীবন কত তেলেছমাৎ না গুনীন করল—আইজ হ্যার মরণে তেলেছমাৎ হইব না ?

ঠিক কইছ চাচী—তিন-তিনবার কবরে পানি ওঠছে—আর হে পানি একছের

জ্যানো আগুন।

আলী ততক্ষণে দাওয়ার উপর বসে পড়েছে। রোমাঞ্চকর গল্প বলার মতো শোনার ইচ্ছাও মানুষের আদিম। আমেনা চাচীর হাতের তসবী হাতেই থাকে। একটু ঝুঁকে বসে সে। খুপরির ভিতর থেকে মোটা শ ড়ির খসখস অ'ওয়াজ আসে। আলী একবার সেদিকে চেয়ে গল্প বলতে শুরু কার। যখন বুঝতে পারে দুটি নারীর হৃৎপিণ্ড গলার কাছে এসে ঠেকেছে তখন বলে এ্যাহন আর কমু না চাচা —রাত্তিরে তোমাগো ডর করব। ভয় যেন ছুটে আসে হুর্তে খালের ধার থেকে বাতাসের সঙ্গে মিশে, অন্ধকারের সঙ্গে জড়িয়ে।

আর-একটু বসে নিজের কথা পাড়ে আলী।

মুই তোমারে আগেই কইছি চাচী—বিয়াডা করতে অয় এ্যাহন? ময়মুরুব্বী বোলাইয়া কামডা সাইর‍্যা হালাই। গুনীন তো আর মোগো লাইগ্যা কম রাইখ্যা যায় নাই।

আমেনা চাচী নির্বিকার মুখে জবাব দেয়, মোর আর বেমত কী? মাইয়া যখন বড় অইছে, বিয়া তো দিতেই আইবো।

খসখস শব্দ তুলে রাবেয়া দরজার পাশ থেকে উঠে যায়। প্রবল শব্দে হাতের রুপোর চুড়িগুলো যেন আপত্তি করে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে আলী, মুই এ্যাহন যাই—কাইলই পয়গাম পাডামু। চলে যেতেই অন্ধকারের ভিতর থেকে রমিজ এসে হাজির হয়। সে কখন বাড়ির ভিতরে আসে আমেনা বুঝতেই পারে না। সারা শরীরে ওর মাটি মাখা। কোনো ভূমিকা না করে সোজা সে আমেনার কাছে এসে বলে, খবরদার, খবরদার। রাবিয়ার বিয়া ঠিক অইয়া আছে। তোমার মাইয়ারে জিগাইয়া দ্যাহো।

আমেনা একটুক্ষণের জন্যে ভয় পায়, তারপর বলে, হ্যারে আবার জিগামু কি? মোর মাইয়া, যারডে খুশি মুই বিয়া দিমু।

ভীষণকণ্ঠে আবার ভয় দেখায় রমিজ, সাবধান কিন্তু—গুনীনের কতা মনে আছে তো? অরে বিয়া করমু মুই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে রমিজ চলে যায়।

তার পরদিন আলীর পাঠানো লোকের কাছে আমেনা রাজী হয়ে যায়। ঘন-বর্ষণ এবং বীজবপনের কালেই আলী বউ আনার আয়োজন করে। কিন্তু রমিজের কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা যায় না। সে তার ক্ষেতগুলি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বলে, মানুষে মাইয়ালোক বিয়া করে, মুই মোর ভুইডাই বিয়া করমু—দশটা

বউ অইবো আমার।

বিয়ের দু-তিন দিন বাকি। সন্ধ্যার একটু পরে রমিজ ডেকে নিয়ে গেল আলীকে। তখন আলী কোবাদের সঙ্গে কথা বলছিল। রমিজ বলে, খালের ধারের খ্যাতে আইল বান্দনের কাম আছে। লও, পুবকুলের আইলডা বানদ্যা আই।

রমিজের মুখে গামছা জড়ানো ছিল। অস্বাভাবিক লম্বা মনে হচ্ছিল তাকে। কোবাদ ঠাট্টা করল আলীকে, ও এ্যহন নিজের সুহে আছে···অর কী এ্যাহন এসব ভালো ঠ্যাহে ?

আলী জবাব দেয়, হ্যা অয়না—জমিডা যহন একলগেই চই, তহন যাইতে তো অয়ই।

আর-একটা কোদাল নিয়ে আলী রমিজের সঙ্গে চলে গেল।

রাত তখন দশটা হবে, কিন্তু গ্রামবাসীদের যেন মনে হয়েছে নিশুতি রাত। ছিলছিলে বৃষ্টি ফুঁড়ে, বাতাসের আকুল আর্তনাদকে চিরে, বুনো শুয়োর যেমন করে কচুর ক্ষেত ফুটিফাটা করে দেয় লম্বা দাঁত দিয়ে, তেমনি করে রাত্রিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে একটা বিলম্বিত চিৎকার কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসে খালের ধার থেকে। গোটা গ্রামটা উঠে বসল আবার বিছানার উপরে। ওদের মনে হলো, গুনীন উঠে এসেছে কবর থেকে। কবরের পানি থেকে শ্বাসরুদ্ধ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল যেন।

একজোট হয়ে টিমটিমে লণ্ঠন হাতে ওরা খালের ধারে জমিটার কাছে এসে দেখল আলীর মাথা থেকে বুক পর্যন্ত মাটিতে পোঁতা। নতুন ভিজে মাটি তুলে কে যেন তাকে চাপা দিয়ে কোদালের উল্টো পিঠ দিয়ে মাটি সমান করেছে। আল বাঁধার কাজ একটুও হয়নি।

হতভম্ব হয়ে গেল গ্রামবাসীরা। ওদের বুকের উপর একটা বীভৎস অস্তিত্ব চেপে বসল। অনেক কষ্টে প্রচণ্ড আতঙ্কে একটু পাশ ফিরিয়ে প্রথম চিৎকার করে উঠল রহম, ভাইরে, ওরে মোর ভাই। তখনই কোবাদ দেখতে পেল সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রমিজ, দুচোখ বিস্মিত, বিস্ফারিত। গর্জন করে উঠল কোবাদ, আল্লা, আল্লা, ইয়া আল্লা রাছুল। আল্লার নামটা উঠে পড়তেই যেন সাহস পেল আল্লার মানুষগুলো, একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল, কেডা, কেডা, কেডা।

পেছন থেকে নিয়তির মতো গম্ভীর কণ্ঠে কেউ জবাব দেয়, গুনীনের জেন। ভয়ের অনুভূতিটা আবার শিরদাঁড়া দিয়ে নামতে থাকে। শুধু কোবাদের চোখে

একটা সন্দেহ দেখা দেয়, রমিজের দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করে, সন্ধ্যাকালে তুমি আলীরে মোর সামনে থেকে বোলাইয়া নেলা না ?

ভয়ের সঙ্গে বিস্ময় ফুটে ওঠে রমিজের মুখে। সে বলে, মুই ? মুই বোলাইছি অরে ? কও কী ? অর লগে মুই তো মোডে কতাই কই না।

আইল বানাবার লাইগা সন্ধ্যাকালে আলীরে তুমি বোলাও নাই ?

কহনো না।

মাঝখান থেকে ছমির বলে, হ্যা অয় ক্যামনে। রমিজ তো হারা বিয়াল মোগো বাড়িতে বইয়া রইছে। এই তো একটু আগেই মোর বাড়ি থেহে ও আইছে।

একটা আশ্চর্য নীরবতা নেমে আসে। কেউ নিজের জায়গা থেকে নড়তেও পারে না। এর মধ্যে কোবাদ আবার গর্জন করে ওঠে, আল্লা, আল্লা, ইয়া রাছুল। এবার আর সাহস পায় না মানুষগুলো। তারা আরো ভয় পায়। তারা লক্ষ করে দেখে, ভিজে মাটিতে একটিও পায়ের দাগ নেই। আলগোছে কে যেন আলীর শরীরটাকে ধরে মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছে।

ঠিক গুনীনের জেন, গুনীনের জেনই এই কাম করছে। ফিসফিস করে সমবেত কণ্ঠে গুঞ্জন করতে করতে মানুষগুলো ফিরে আসে পায়ে পায়ে। আলীর দেহটাকে ছোঁবার সাহস হয় না ওদের।

খানিকটা আসতেই উন্মত্ত চড়া গলার এক সাংঘাতিক চিৎকার কানে আসে ওদের। ওরা দেখল দলের মধ্যে রমিজ নেই।

আলীর মৃতদেহটা যেখানে পড়ে আছে, সেখানে অন্ধকারের মধ্যে লম্বা দীর্ঘ একটি জোয়ান আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করছে, তোরে মুই দেহাইয়া দিমু কেমন জেন তুই।

রমিজের গলা বলে চেনবার উপায় নাই। ইস্পাতের মতো কঠিন একটি কণ্ঠ সংকল্পের দৃঢ়তার যেন দ্বিগুণ জোর পেয়েছে। সকলে মিলে একরকম তুলেই নিয়ে এল রমিজকে। কিন্তু সেদিনই শেষ রাতের দিকে গ্রামবাসীরা আবার একটি নিদারুণ চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে উঠে বসে। কিন্তু এবারে আর সকাল হবার আগে ওরা এগুতে সাহস পায় না। সকালের অপেক্ষায় ওরা বসে থাকে। গুনগুন ফিসফিস করে নানারকম আলোচনা চালায়। কী খেয়াল হতে রহম একসময় চিৎকার করে ওঠে, রমিজ কই ? হে তো নাই এহানে।

সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে। মরিয়া হয়ে রহম শুধু ছুটে যায় বাড়ির দিকে।

একটু পরই ফেরে সে এরকম বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, হে নাই, ঘরেও নাই, মোগো তিন ভাইরে না মাইরা জেনটা থামবে না। দুইজন গ্যাছে, এ্যাহন মোরে মাইরা হে ছাড়বে।

দিনের আলো ফুটতেই ওরা খালের ধারে গিয়ে পৌঁছল। আলীর দেহটা ঠিক তেমনই মাটিচাপা, আর তার পাশেই কালো কুচকুচে একটি কাক মরে পড়ে আছে। বল্লম দিয়ে তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধে মাটির সাথে গেঁথে ফেলা হয়েছে।

খানিকটা দূরে পাওয়া গেল রমিজকে অচেতন অবস্থায়। রহম ছুটে গিয়ে ওকে স্পর্শ করতেই ওরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, আছে এ্যাহনো, বাঁইচ্যা আছে এ্যাহনো?

গোল হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল তাকে। রমিজ বেঁচে আছে। গ্রামে ফিরে মেয়াদী অচৈতন্য আসবার আগে কিছুক্ষণের জন্য রমিজ জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। তখনই তার কাছে গ্রামবাসীরা গল্পটা শুনতে পেয়েছিল। জ্বীন আবার এসেছিল তার কাছে। মাঝরাতের দিকে। এসেছিল বড় ভাই রহমের চেহারা নিয়ে। আলীর মৃতদেহটা তুলে আনার কথা বলেছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়েছিল রমিজ। শুধু বল্লমটা নিয়েছিল হাতে। আলী যেখানে পোঁতা ছিল, তার কাছাকাছি এসে সে হঠাৎ ধাক্কা দেবার চেষ্টা করেছিল রমিজকে। তৈরি ছিল রমিজ। হাতের বল্লম দিয়ে আঘাত করেছিল তাকে। বুক ফুঁড়ে গিয়েছিল বল্লম। তারপর সে আর কিছু জানে না।

গল্পটা কোনোরকমে শেষ করে অচেতন হয়ে পড়েছিল রমিজ। পুরো একমাস পরে সে সেরে উঠল। তারপর নাবেয়া এল তার ঘরে। একই বছরে দ্বিতীয় বর্ষা এল ওর জীবনে।

১৯৬৪

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

এখন নির্দয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে হিম, চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়। ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাশেত খানের বাড়ির টিনের চাল হিম-ঝকঝক করে। একসময় কানুর মায়ের কুঁড়েঘরের পৈঠায় সামনের পা তুলে দিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে। হঠাৎ তখন স্কুলের খোয়ার রাস্তার দুপাশের বনবাদাড় আর ভাঙা বাড়ির ইটের স্তূপ থেকে হু-উ-উ চিৎকার ওঠে। ইশেন কোণ থেকে ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার—ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে। গঞ্জের রাস্তার ওপর উঠে আসে ডাকু শিয়ালটা মুখে মুরগি নিয়ে। ডানা ঝামড়ে মুমূর্ষু মুরগি ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মতো ছায়া পড়ে শিয়ালটারও, চাঁদের দিকে মুখ তুলে চায় সে, রাস্তা পেরোয় ভেবেচিন্তে—তারপর স্কুলের রাস্তার বাদাড়ে ঢোকে। হাতে লাঠি চাঁদমণির বাড়ির লোক ঠ্যাঙাড়ের দলের মতো হল্লা করে রাস্তায় পড়ে—কোনদিকি গেল শালার শিয়েল, কোনদিকি ক দিনি।

আরো হিম নামে।

বড় পুলের ওপর থেকে নিচের পানিতে আপন ছায়া দেখতে চায় সরদারদের ছোটতরফের বড় ছেলে ইনাম। পানির রুপোলি মেঝেয় হাতড়ে বেড়ায় নাকমুখ। হিম নামে যেন শব্দ করে, বাতাস আসে শিরশির, খড়মড় উড়ে যায় বাদাম খোলা। খাদের আসশ্যাওড়ার পাতা থেকে আলো চলকে ওঠে, কাঁঠাল গাছের পুবদিকের ডাল হাত নাড়িয়ে ডাকতেই থাকে বিচ্ছিরি। অজস্র খঞ্জনি বেজে ওঠে ঝনঝন।

ইনাম পুল ছেড়ে ধুলো ভেঙে শুকনো বিলের কিনারায় দাঁড়ায়। সেখানে শঙ্খচূড়ের মতো দেখায় যে ধবল পথটা এখন তা ত্রস্ত হয়ে এল, ফেকুর বাঘের মতো শরীরটা দেখা গেল, তার পেছনে সুহাস। ওরা খুব গল্প করছে। যে-জন্যে এখানে এখন এত রাতে সে-সম্বন্ধে কোনো কথা নেই। কখন সুহাস ছোটমামার

বিয়ের বরযাত্রী গিয়েছিল, অমৃতের মতো পুরী খেয়েছিল আর অঢেল মিষ্টি সেই গল্প। ট্রানজিস্টরটা বেজেই যাচ্ছিল ফেকুর বগলে, ওরা কেউ শুনছিল না, কণিকা বিলের কিনারায় দারুণ ঠাণ্ডায় বৃথাই গাইছিলেন অন্ধকারে একা থাকার যন্ত্রণা। বিনিয়ে বিনিয়ে। আর আশ্চর্য, একটা পাখিও ডাকছিল না। রেডিওডা বন্দ করে দে—ওদের দেখে ইনাম বলল। অসহ্য লাগছিল তার। আইছিস—দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দুজনে। সুহাস হাসল, বিড়ির ধোঁয়ায়-কালো দাঁতগুলো প্রায় মুখের বাইরে চলে এল। ইনামের আবার অসহ্য লাগল। রেডিওডা বন্দ করে দে—বলল সে। কেউ শোনপে না, শোনলেও এদিকি আসবেনানে কেউ, ফেকু বলল। সেজন্যি বলতেছি না, খারাপ লাগতেছি গানডা। কণিকার গলা টিপে দিল ফেকু। এখন চল, দেরি করলি ঘুমিয়ে পড়বেনে আবার, ফেকু বলল আর ট্রানজিস্টরটা সুহাসের হাতে দিল। সেটা নিতে নিতে সুহাস প্রশ্ন করে, কেডা? বুড়োটা আবার কেডা! সন্ধে হলি ঘুমিয়ে পড়বে কেশো বুড়ো—থু করে থুতু ফেলে বলে ফেকু।

যেতে যেতে বাতাস বেড়ে গেল একটু—ফাঁকা বিল থেকেই আসছিল বাতাসটা। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছিল। ঝপ করে মাছ লাফিয়ে উঠল কাজীদের পুকুরে আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল খাঁ-দের বাড়িতে ধান সেদ্ধ হচ্ছে উঠোনে। উনুনের আগুন দপ করে জ্বলে উঠলে খাঁ-দের সুন্দর সুন্দর মেয়েদের মুখ একবারের জন্যে ঝলসে উঠল। ইস্কুলি যাতিছিস না আজকাল? সুহাস জিজ্ঞেস করে। না—ইনাম জবাব দেয়। পর্ডাব না আর? না, পড়লি আমারে কেউ সিন্নি দেবে ক! চাকরি করবি। হয়, চাকরি গাছে ফলতিছে! সুহাস আর কিছু বলে না। ট্রানজিস্টারটা নিয়ে খুচরো শব্দ করে শুধু আর বেঢপ বুটজুতো দিয়ে ধুলো ছড়ায়। নাকে ধুলো এসে লাগতেই রুখু গন্ধ পাওয়া যায়। ইনামের বিকেলের কথা মনে পড়ে, হাটবারের কথা, মাছের কথা। মাছ থেকে নদী। নদী এখন প্রায় শুকনো, চড়া পড়ে গেছে। গোরুর গাড়িতে লোকে বালি আনছে নদী থেকে। বাঁকের কাছে কাশ হয়েছে। এ-পাড়ে স্কুলবাড়ি, বড় সজনে গাছে ফিঙে, তার লম্বা লেজের দুলুনি। স্কুলের পেটা ঘড়ি ভেঙে গেলে এক টুকরো রেল ঝুলিয়ে লোহার ডাণ্ডায় ঘনাৎ ঘনাৎ আওয়াজ—হুড়মুড় করে হেডমাস্টার…… শালার জোকার একডা, বই বগলে মাস্টার তারাপদ, তার পাকানো চাদর, আধ-ভাঙা দাঁত আর মুখে কথার ফেনা। এইসব মনে পড়ল। ঝরঝর করে ছবিগুলো এল; যেন দক্ষিণ বাতাসে নিমের হলুদ শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, আর ছবি-গুলো চলে গেল যেন ট্রেনটা যাচ্ছে পুল পেরিয়ে, মাঠের বুক চিরে আর ন্যাংটো

ছেলেটা দাঁড়িয়ে দেখল। ছবিগুলো পেরিয়ে যেতেই খেয়াল হয় সুহাস সেই গল্পটা আরো তোড়জোড় করে বলছে, ছোটমামার বিয়ের বরযাত্রী যাবার গল্প। ওর একটা কথাও শুনছে না ফেকু, সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। চাঁদের আলোর মধ্যে দেশলাইয়ের আগুনটা দেখাল ম্যাড়মেড়ে আর ফেকুর বিতিকিচ্ছি মুখটা দেখা গেল, কপালের কাটা দাগটা, মুরগির মতো চোখ, নিচে ঝোলানো ঘোড়ার মতো কালো ঠোঁট। খাবি নাহি? ফেকু জিজ্ঞেস করে। সুহাস গল্প থামিয়ে সিগারেট নেয়, দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাওয়ায় আর-একটা জ্বালায় তারপর আবার গল্প শুরু করে, লঞ্চে যাতি হয় তো, মধুমতী নদী দিয়ে—অন্ধকারের মধ্যি গেলাম—দুপাশে গেরাম না কি কিডা জানে—মনে হচ্ছিল সোন্দরবন। এমন অন্ধকার আর এমন জোঙ্গল বুজিচো? ইনামের মনে হলো সুহাস গতকাল থেকে গল্পটা বলছে আর আগামীকাল পর্যন্ত বলবে। নাপিত বিটা কমিয়ে কতি পারে না? একেবারে অসহ্য লাগলে এইকথা ভাবল ইনাম। সুহাসের গল্পে একশোটা পল্লব—ছোটমামার চেহারার বর্ণনা, বিয়ের সম্বন্ধ, পাত্রীর খোঁজ, পাত্রীর কাকার সঙ্গে ছোটমামার বাবার ঝগড়া, বিয়ের দিন ধোপাবাড়ি থেকে সিল্কের পাঞ্জাবি ভাড়া নিয়ে আসার ঝকমারি—কিচ্ছু বাদ দিচ্ছিল না সে—তাই ইনাম খেপে গিয়ে বলল, তোর ছোটমামা বিয়ে করতি গিলো ক্যানো ক তো? সুহাস কান দিল না; সকালে সূর্য উঠতি মধুমতী ঝক-ঝক করতিছে, জ্যাঠামশাই ধপ করে কাদায় পড়িল লঞ্চ থেকে নামতি গিয়ে আর মামীর বোনেরা যা সোন্দর সে আর কলাম না! তোর মামার বাড়িটা কোয়ানে, মামার শালীরা বেড়াতি আসলি কস আমাকে—ফেকু কথা না বললেই নয়, তাই বলে। সেটি হচ্ছে না, বুজিচো—চোখ বন্ধ করে মনের আরামে বলল সুহাস। ও, তাই তুমি মাসে পাঁচবার করে ছোটমামার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতি যাচ্ছ? বুজিচি, ওখেনে তো পয়সাকড়ি লাগে না; আরামেই আছ দেহা যায়—ফেকু চোখ মটকে বলে।

রাহাত খানের টিনের চাল দেখা যাচ্ছে না আর, পুল কোথায়, বিল সরে গেছে কখন। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন চুপ করে গেছে। একটা মুরগির শোক আর কতক্ষণ থাকে! কাল হয়তো বসুবাবুদের ইটখোলায়, না হয় সরকারদের পোড়ো বাড়ির ভেঙে-পড়া সিঁড়িঘরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক হলদে ঠ্যাং কিংবা ঠোঁটের টুকরো পাওয়া যাবে। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন কাজেই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু বুড়িটা বসে আছে, ফাটা পায়ে তেল ঢালছে আর

পিদিমটা কেন নিভছে না তা পিদিমটা ছাড়া আর কেউ জানে না। কী ঠাণ্ডারে বাবা—বউ অ বউ, আর একটা খ্যাঁতা দে, মরে গেলাম, হেই বউ। বউটা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোচ্ছে, ছেলেটা বকছে বিড়বিড় করে, মরে যাচ্ছে না ক্যানো কেডা জানে! বুড়ি আর-একবার চেঁচায়, কিন্তু হঠাৎ হাওয়াটা ওঠে, সুমসাম শব্দ জাগে, বুড়ির কাঁপা গলা কেউ শুনতে পায় না। এইরকম জীবন চলতে থাকে। ফেকু ঠোঁটে কুলুপ দেয়, সুহাস হঠাৎ ট্রানজিস্টরের চাবিটা ঘট করে খুলেই বন্ধ করে, ইনাম মাথা নিচু করে ভাবতে থাকে।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর পা ঠুকে ধুলো ঝাড়ে ওরা। পাশের গলিপথটায় ঢোকার সাথে সাথে জাপটে ধরে অন্ধকার আর সপাং করে চাবুক চালিয়ে দেয় কী একটা লতা। ফেকুর ঠোঁট খোলে, জঘন্য একটি গাল দিয়ে ওঠে লতাটিকে। তার-পর শান্ত হয়ে গল্প শুরু করে, শালা, আজকাল এত বেশি ধরা পড়তিছি ক্যানো কতি পারিস? এই কথায় সুহাসের চোখ দুটি চকচক করছে কৌতূহলে, একটা কথা কই, কিছু কবি না ক? ফেকুর সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে বলে, অত মার খাস কী করে, আমাকে বলতি পারিস? শালার দাদা একচড় মারলি চোহে অন্ধকার দেহি। মার খাওয়াডা শিখতি অয় বুঝিচো বাপধন্—ওস্তাদের কাছে শিখতি অয়। লেহাপড়ার জন্যি ইস্কুলি যাতি অয় যেমন, তেমনি—ফেকু বলে। ইনামের আবার অসহ্য লাগে, ইস্কুলি লেহাপড়া বিয়োচ্ছে, বিটার শালার মাস্টাররা—ইনাম এমন কথা বলে যা মুদ্রণযোগ্য নয়। ফেকু তখন বলছে, ইষ্টুপিট হলি আর মার খাতি না জানলি মানুষের পহেটের কাছে যাতি নেই পহেটথে ট্যাহা বারোয়ে থাকলিও না। ফেকুর কথা শুনে ইনাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। টেণ্ডু ড্রাইভারের কথা শুনে একবার ভিড়ে হাত দিয়েছিল বঁটিমুখো এক ভদ্র-লোকের পকেটে। কাগজ খড়মড় করে উঠল আর এমন শব্দ উঠল যে মনে হলো কানে তালা লেগে যাচ্ছে। অ্যাও বলে গড়র গড়র গর্জন করে উঠল লোকটা। কিন্তু আসলে ভদ্রলোক গলা ঝাড়ছিল। কাজেই ইনামের কাছে পয়সা নেই। নাববেং চুরি করে বিক্রি করলে হয়—কিন্তু ভাতের চালের অভাবে উপোস করে থাকতে বড় কষ্ট।

পথটায় অন্ধকার থকথক করছে। মাথার ওপর বাঁদিকের লতা ডানদিকে চলে গেছে জাল বুনতে বুনতে। গল্পের ঝোঁকে ফেকু সুহাসের ওপর এসে পড়ে আর সুহাস চিৎকার করে, উরে, মরিছিরে বাপ। ফেকু বলে, দেহিস বেডিওডা ফালাসনা।

...সেদিন কী হলো ক দিনি, এক বাস লোক—বাস যাচ্ছে চল্লিশ মাইল পঞ্চাশ

মাইল স্পীডি, সামনের লোকটার পাঞ্জাবির পহেটথে নোটগুলো বারোয়ে আছে —হাত দিতি খপ্‌ করে ধরে ফেলল। তারপর উরে মার. ভাগাড়ে যেন গোরু পড়িছে। কপালের ঘা শুকোয়নি এহনও। এইবার গুণ্ডোটা শুরু করিছে—ইনাম ভাবল। গল্প শুনতে শুনতে সুহাস ট্রানজিস্টরটা চালিয়ে দেয়, গর্জন করে ওঠে সেটা। আওয়াজটা কিম্ভূত শোনা যায় ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ অন্ধকারে। সুহাস থুতু ফেলে বলে, শালা খ্যাল গাতিছে—বলেই চাবি বন্ধ করে এবং 'তুমি যে আমার জীবনে এসেছ' ধরে দেয়। ভিটে থেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে—ক্ষীণ চিৎকার করার চেষ্টা করছে। গলা যখন ফুটল না, ইনামের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সমস্ত পাছাটা দোলাতে শুরু করে। নড়েচড়ে গরম হতিছ শালা—ফেকু মন্তব্য করল এবং কেন তার জীবন নষ্ট হলো, কে কে নষ্ট করল আর পকেটমারার কৌশল, তার নিজস্ব নৈপুণ্য, সাফল্য আর পিটুনি খাওয়ার অভিজ্ঞতা বলেই যেতে লাগল। করবটা কী কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি না হয়—। লেহাপড়া মুহি পেচ্ছাপ—ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি—ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়ায়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ! কাজ কোয়ানে? জমি নেই খাটি. ট্যাহা নেই ব্যবসা করি—কী কলাডা করবানে?

পাখিদের কোনো গান নেই এখন। শব্দ যা শোনা যাচ্ছে চাপা। কুয়াশা আর হিম জড়িয়ে আছে ওদের। সামনে বিড়ালটা যখন পার হয়ে গেল, শুধু দুটি জ্বল-জ্বলে চোখ দেখা গেল তার। সুহাস ফেকু ইনাম কথা বন্ধ করেছে। সুহাসের বগলে ট্রানজিস্টর, ফেকু মাফলার মুখের ওপর জড়িয়ে নিল, ইনাম হাতে হাত ঘষে একটু গরম করতে চেষ্টা করল। ডাইনে পালদের বাড়ি, মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরি করে, পরিচয় জিজ্ঞেস করলে রাস্তা থেকে হেঁকে জবাব দেয়, পালমশাই; তাদের বাড়ির পলেস্তরা-খসা দেয়াল, কারণ বাড়িটা আসলে সেনদের। ওরা চলে গেছে পঞ্চাশে। বাতাবিলেবু গাছটার পাশ দিয়ে যেতে চড়াৎ করে একটা পাতা ছেঁড়ে ইনাম আর ঠাণ্ডা উঠোনটার দিকে চেয়ে থাকে। পোড়ামাটির গন্ধ নাকে লাগে, কালো জালাগুলো ছড়িয়ে আছে দেখা যায়, ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘুম-জড়ানো গোঙানি ভেসে আসে। সব ঘুমোয়ে পড়িছে—সুহাস বলে। ফেকু সায় দেয় ঘোঁৎ করে। আজ না আসলিই হতো—সুহাস অভিযোগ করতে থাকে. ভয় করতিছে আমার। ফেকু ভ্যাংচায়, ভয় করতিছে, কচি ছ্যামরা, দুধু খাবা! সুহাস বলেই চলে, বুড়োরে দেখলি আমার ভয় করে। একবার মনে হয় মরে যাবেনে এহুনি, একবার মনে হয় আমাদের সব কডারে খুন করবেনে। বাড়ির

মধ্যি ঢোহার সময় মুখডা দেহিছিস? দেহিছি—তুই থো, তাচ্ছিল্য করে ফেকু, পয়সা পালি মুখডা কেমন হয় দেহিস একবার। ফেকু হারামজাদাটারে খুন করতি পারলি হতো—ইনাম ভাবল। তখুনি সুহাস ফেকুর দলে মিশল। সে বলছে, এট্টু এট্টু সর হইছে এমন ডাবের মতো লাগে মেয়েডারে। ঠিক কইছি না, ক? তোরেও খুন করতি পারলি হতো—ইনাম আবার ভাবল।

ওরা এখন হাসাহাসি করছে, ঢলাঢলি করছে, কলবল করে আলাপ করছে। দু'-পা এগিয়ে ভেতরে ডাক্তারবাবু বসে আছেন—মোটা শাদা বিরাট শরীর, হারিকেন জ্বলছে, তাই খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল। পুকুরের বাঁধাঘাটে একটি মাত্র শুকনো পাতা তখন ফরফর পাক দিতে থাকল। বাঁদিকের খোলা জায়গাটা এসে গেছে, কুয়াশার সঙ্গে মিশে ঘোলা দুধের মতো চাঁদের আলো খুদে খুদে মরা ঘাসের ওপর পড়েছে। পেছনের জামগাছটা কালো, তার পেছনে সব কালো এবং নির্জনতা। আর এইসব ছাড়িয়ে যেতে আরো নির্জনতা, পোড়োজমি, জঙ্গল, পানের বরজ, কাশ আর লম্বা ঘাস আর মজা পুকুর আর বিল। এখন ডাইনে দড়ি দিয়ে ঝোলানো বাঁশের গেট। গেট পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জমি চিৎ হয়ে শুয়ে। কিছুই ফলেনি সেখানে। ইনাম পিছনে আছে, অনেকটা পিছনে, এমনকী ফিরে যেতে পারে হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে। লাল আলো আসছে কাঠের রড লাগানো জানলা দিয়ে। মজা পুকুরে শিয়ালের চকচকে চোখে ঝিলিক। ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করে ডেকে ডানা ঝটপট করে পুরনো ডাল ভেঙে বাজপাখিটা নড়েচড়ে বসল। ফেকু দড়ি ঝোলানো বাঁশগুলো তুলে ধরেছে, হাত নেড়ে ডাকছে সুহাসকে, সুহাস ট্রানজিস্টরটা হাতে নিয়ে অস্থির হ ঠোঁট চেপে আছে, কিছুতেই এগুচ্ছে না। ইনাম চট্ করে সামনে এসে ফেকুর কাছে টাকা চায়, দুডো ট্যাহা দে—কাল দিয়ে দেবানে। বাঁশগুলো ছেড়ে দেয় ফেকু, অ, খালি হাতে মজা মারতি আইছ? মুহূর্তে সোনালি হাত সামনের আবছায়ায় ভেসে ওঠে। সেই হাত মাথায় রাখে। চুল সমান করে দেয়। আঙুলে তেল লাগলে আঁচলে মোছে। ইনাম নিজে কিনে দিলেও মিলের শাড়িটা খুলে নেওয়া যায় না তখন। ব্যাকুল হয়ে ইনাম বলে, দুডো ট্যাহা দে, কাল দেবানে সত্যি কচ্ছি। ট্যাহা লাফাচ্ছে, মোডে দুডো ট্যাহাই আছে আমার কাছে—ফেকুর মূলোর মতো দাঁতগুলো কড়মড় করে ওঠে। তাহলি সুহাস দে—দে সুহাস কচ্ছি, কাল দিয়ে দেবানে, ঠিক কচ্ছি, দে সুহাস, তোদের মা কালীর দিব্যি, কাল দিয়ে দেবানে—ছটফট করে ইনাম। সুহাস বলে ফেকুকে, কিছু কয়নি এতক্ষণ, কেমন গুড়ি গুড়ি আসতিছিল দেহিছিস?

উরে তুই কী ইস্টুপিট—সে হাসে, মাইরি কচ্ছি, পহেটে হাত দিয়ে দ্যাখ—দুডো ট্যাহা আছে মোড়ে, দাদার পহেটথে মারিছি, মাত্তর দুডো ট্যাহা। তখন ইনাম ক্ষান্ত হয়। গেটের কাছে ফেকু আর সুহাস গলাগলি দাঁড়িয়ে। জানলার কাঠের রডে মুখ লাগিয়ে বুড়োমানুষ চিৎকার করে, কে, কে ওখানে গো—অ্যাঁ? লাল আলোটা সরে যায় জানলা থেকে, হডাম করে দরজা খোলে, হাতে হারিকেন নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মানুষটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুঙ্গির নিচে শুকনো দুটো পা। গেটের পাশে করবী গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে লোকটা। বোশেখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের আঁকিবুকি এমনি ওর মুখ। ঠাণ্ডা চোখে ইনামকে দেখে, সুহাসকে দেখে, ফেকুকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে, হারি-কেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো। তোমরা? ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। তা কে আর আসছে এখানে মরতে? জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই—ইচ্ছে করলেই কী আর ঘুমানো যায়—তার একটা বয়েস আছে—অজস্র কথা বলতে থাকে সে, মানে হয় না, বাজে কথা বকবক করেই যায়। এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কী ঠাণ্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর-বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে। সবাই ভিতরে আসতে করবী গাছটায় একটা ডাল ঝটকানি দেয়—পায়ের নিচে মাটি ঠাণ্ডা শক্ত আর সেজন্য ইমামের গোড়ালিতে ব্যথা করছে।

ভিতরে কালো রঙের চৌকিটা পড়ে আছে। ঘুমের মধ্যে মুরগিগুলো কঁ কঁ করে উঠল। আবার হু-উ-উ চিৎকার এল। বিলে বাতাস উঠছে শোনা গেল। ভাঙা চেয়ারে ভদ্রলোকটি বসে। হারিকেন মাটিতে নামানো। ওরা তিনজন চৌকিতে কাছাকাছি বসেছে। কেউ কথা বলছে না। বুড়োর এ্যাজমার কষ্টের নিশ্বাস পড়ছে। তুখোড় লোকটা এখন চুপ—ভস ভস বাতাস ছাড়ছে মুখ দিয়ে। খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। শিরা-ওঠা আঙুলগুলো চেয়ারের হাতলে পড়ে আছে। নোংরা নখ দীর্ঘদিন কাটা নেই। গলার কাছে শ্লেষ্মা এসে জমলে বাতাস যাওয়া আসা প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ইনামের ইচ্ছে হলো একটা নল দিয়ে সাফ করে দেয় ফুটোটা। তারপর কী খবর? অ্যাঁ? সব ভালো তো? ঘড়ঘড় করে একটানা কথা আরম্ভ হয়। আক্ষেপ-বিলাপ, মরে গেলেই তো হয় এখন, কী বলো তোমরা? টক করে মরে গেলাম ধরো। তারপরে? আমার আর কী—ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং, চলে গেলাম, বুঝে মরগে তুই বুড়ি—ছানাপোনা নিয়ে বুঝে

মরগে।·· এই তোমরা একটু-আধটু-আসো, যখন তখন এসে খোঁজখবর নাও। সময়-অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা, আমার পরিবার তোমাদের কথা বলতে অজ্ঞান। ফেকু ভয় পেয়ে গেছে এখন। বুড়োর মুখের দিকে বার-বার চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে আর সিঁটিয়ে যাচ্ছে। সুহাস চোখদুটো গোল গোল করে চেয়ে আছে। বুডোর মুখ এখন বহুরূপী। সুহাস ভাবছে, কেশো বুড়োটা খুন করবেনে মনে হতিছে আমার। আজ ক্যানো যে আলাম! না আসলিই ভালো হতো।···তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হতো এই জঙ্গুলে জায়গায়—বুড়ো বলছে, বাড়ির বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমাদের কম্ম—হ্যাঃ। ওসব তোমরা জানো। আমরা শুকনো দেশের লোক, বুইলে না? সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের। এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা! ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কী ভালোই না বাসে! এই ছ্যাখো না, বড মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্যে—একটা শ্লেষ্মার দলা শ্বাসনালীটাকে একবাবে স্তব্ধ করে দেয়, তাতে চোখ কপালে তুলে বুড়ো কাশছে। কথার খই ফুটছিল অথচ এখন মরে যাবে নাকি? আমরা চা খাব না, আমরা চা খাব না—চিৎকার করে ওঠে সুহাস আর ফেকু। খাবে না? বুড়ো সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলে, অ, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা এখন চা খাবে না—অ্যাঁ—আচ্ছা, ঠিক আছে।

বিল থেকে বাতাসটা উঠে আসছে। এখন অশথ গাছটার মাথায় ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, এগিয়ে আসছে, খঞ্জনির বাজনাও এগিয়ে এল সঙ্গে, খোলের চাঁটি আর কী বিশাখার কথা, কী ৎ.াগের কথা—সব এসে আবার দূরে চলে গেল। সুহ সের চাদরের মধ্যে নোট খড়মড করে। সেগুলো নিয়ে ফেকু নিজের পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে, দলা পাকায়, ভাবে, ভয় পায়, শেষে বুডোর দিকে ঝুঁকে পড়ে, সুহাস আর আমি দিচ্ছি।

চেয়ারের ওপর লোকটা ভয়ানক চমকে ওঠে। পড়ে যাবার মতো হয়। খটাখট নডে পায়াগুলো, তোমরা দিচ্ছ, তুমি আর সুহাস? দাও। আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে! কবেও-বা শুধতে পারব এইসব টাকা? সুহাস উঠে দাঁডায়। চলে যাবে এখন? এত তাড়াতাডি? রুকু রাগ করবে—চা করতে দিলে না ওকে। ওর সঙ্গে দেখা না করে গেলে আর কোনোদিন কথা বলবে না। দাঁড়াও—হারিকেনটা রেখে বুডো বেরিয়ে যায়। ছায়াটা ছোট হতে হতে এখন নেই। মুরগিগুলো আবার কঁ কঁ করে ওঠে, কথা বলে ওঠে এক বৃদ্ধা

স্ত্রীলোক। তীক্ষ্ণ গালাগালি অন্ধকারকে ফাড়ে, চুপ, চুপ, মাগী চুপ কর, কুত্তী— এবং সমস্ত চুপ করে যায়। বুড়ো ফিরছে এখন—মাথা নামিয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে ঘরে ফিরে এসে ফিসফিস করে, যাও তোমরা, কথা বলে এসো, উই পাশের ঘরে। ইনাম তুমি বসো, এখখুনি যাবে কেন ? এসো গল্প করি।

বুড়ো গল্প করছে, ভীষণ শীত করছে ওর, চাদরটা আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই। শীত তবু মানে, শ্লেষ্মা কিছুতেই কথা বলতে দেবে না তাকে। আমি যখন এখানে এলাম, আমি যখন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম···তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না—সারারাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম—আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই···তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এল, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ—সুহাস হাসছে হি হি হি—আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে ? বলে থামল বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এল আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ—প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো—এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি ?

পরবাসী

কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল সে। কিছু একটা শব্দ। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। বাতাসের কিংবা পাতা ঝরার শব্দ—কোনোকিছুই তার কানে এল না। এই এতটুকু সময়ের মধ্যেই মাটি বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। নিঃশব্দ শিশিরের হিমে স্নান করে বিবর্ণ পাতাগুলো ভিজে। শীতের শেষ বলে সারাদিন ধরে উত্তর দিক থেকে ঝড়ের বেগে বাতাস দিয়েছে—খোলা মাঠ পেয়ে বাতাস হু হু করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে শরীরের সমস্ত উত্তাপ শুষে নিয়ে চলে গেছে। তারপর নতুন করে আবার ঝাপটা এসেছে। কিন্তু সন্ধ্যার সূচনাতেই বাতাস দু-একবার ডানা ঝাপটা দিয়ে, শুকনো পাতা ঝরিয়ে একেবারে এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে এসেছে বড় বড় মাঠ, ছিলেছিলে পানি-জমা ডোবা এবং খাল, আধশুকনো হলদেটে অপরিচিত লতাপাতা কাঁটাগুল্মের স্তূপাকার জঙ্গল। ওর চারিপাশের কয়েক হাত জায়গা বাদ দিয়ে নিউমোনিয়া রোগীর শ্লেষ্মার মতো জমে বসেছে কুয়াশা। সারাদিনের ঝড়ো বাতাসের জায়গায় এসেছে কুয়াশা। সেই কুয়াশা এবং ম্লান রঙের আকাশ ও বাসি মড়ার মতো জোলো অন্ধকারের নিচে তার চারপাশের পৃথিবীটা শু হয়ে গেল। সে কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করল। কিছু একটা শব্দ। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। বাতাসের কিংবা ঝরাপাতার শব্দ, নিদেনপক্ষে শুকনো পাতার ওপর শিশির পড়ার টপ টপ শব্দ অথবা কোনো ছোট বন্য প্রাণীর চকিত পদধ্বনি। কোনোকিছুই তার কানে এল না। মোটা ছেঁড়া র‍্যাপারটা ভালো করে জড়িয়ে সে এবড়ো-খেবড়ো মাটির ওপর, খড়ের রঙের ভিজে দুর্বার ওপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল।

এখন একমাত্র বক্ষস্পন্দন ছাড়া ওর কাছে শব্দের জগৎ সম্পূর্ণরকমে হারিয়ে গেলেও, সারাদিন এবং সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত অবশ্য অজস্র শব্দের বিরাম ছিল না। অনেক দূরের কালো পীচ ঢালা রাস্তা দিয়ে গোঁ গোঁ করে বাস-ট্রাক যাচ্ছিল। মিষ্টি, দ্রুত স্বল্পস্থায়ী শব্দ করে ছোট গাড়িগুলির—এমনকী তীক্ষ্ণ হুইশেল বাজিয়ে

ঝকঝক করে যে ট্রেন গেল তার শব্দও সে শুনতে পেয়েছে। একরকম সারাদিনই এসব শব্দ সে শুনেছে। নির্জন মাঠটিতে বড় ঝোপটার ভিতরে শুয়ে শুয়ে তার আকাশ-পাতাল ভাবনার সঙ্গে এইসব শব্দ মিশে গেছে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক কাক উড়ে গেছে, জোড়ায় জোড়ায় বক উড়ে গেছে, তারপর দেখা দিয়েছে শঙ্খচিল, সকলের শেষে একটি-দুটি একাকী পাখি, তার মধ্যে একটা বিরাট পাখি বিশাল পাখা অনেকক্ষণ পরে পরে নাড়তে নাড়তে, পা-দুটি পিছনে ফিরিয়ে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে, সুন্দর মাথাটি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে চলে গেছে। সোঁ সোঁ শব্দ তুলে পরম নিশ্চিন্তে সে আকাশের পূর্ব কোণের দিকে ছোট হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেছে। মাঠের একপ্রান্তে গ্রামটার বাঁশঝাড়ে ছোট-বড় অসংখ্য পাখি তখন একসঙ্গে কলরব শুরু করেছে। রাত আর-একটু এগোনোর সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ওদের কাউকেই আর দেখা যায়নি। সে তখন শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে র‍্যাপারটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে, পেটের কাছে র‍্যাপারের বিরাট ফুটোটা লুঙ্গি দিয়ে ঢাকতে গিয়ে নিজেকে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলেছে এবং এই অবস্থার মধ্যেও প্রচণ্ড খিদে অনুভব করেছে। ময়লা ছোট একটুকরো কাপড়ে বাঁধা মোটা চিঁড়ে বের করে অন্যমনস্কের মতো চিবুতে চিবুতে সে ভাবল, হুঁ, অরা ঘুমুইতে গেল।

এরপর অনেকক্ষণ সে আর কিছুই ভাবেনি। একটা খালে জমা পানি অতি সাবধানে কাদা বাঁচিয়ে আঁজলাভরে তুলে খেয়ে টলতে টলতে হাঁটতে শুরু করেছে। শীত যখন দুর্দম হয়ে উঠল, মাথা হয়ে উঠল নিরেট একটা বরফের চাঙর, পা-দুটি যখন তার অবশ হয়ে এল তখন পশুর মতো এই শুকনো খালটায় আশ্রয় নিল। কোনোরকমে গুটিশুটি মেরে একটু গরম পেতেই আবার ভাবতে পারল সে। ভাবতে গিয়ে দেখল তার চারিদিকের পৃথিবী জমে গেছে। সে ভাবল, তাইলে রাত তো অ্যানেক হলছে। শালো কতক্ষণ হাঁটছি গ—কোতা এ্যালোম তা যি মুটেই ঠোম করতে পারছি না। আর শালার আচ্ছা জাড় বটে!

ফসলকাটা মৃত মাঠের কঠিন শীতের মধ্যে উবু হয়ে থাকা মানুষটার ভোঁতা মাথার মধ্যে এ-বছরের প্রথম শীতের চিন্তা এল চিৎকার শুনতে পেল যেন, বচির, বচির র‍্যা, এ বচির, ঘুম মারচিস শুয়ে শুয়ে, মুনিব যি কান কাটবে র‍্যা। আচ্ছা ঘুম র‍্যা তোর। চিৎকারটা যেন সে একবারই শুনল তার মাথার ভিতরে। তারপর আবার স্তব্ধ সব।

এবার প্রচণ্ড শীতই গেল বলা চলে। শীত এল যেমন সকাল সকাল, অঘ্রাণ

ভালো করে পড়তে-না-পড়তেই, তেমনি তাড়াতাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, মাঘের এই শেষদিকেও তার দাঁতের তীক্ষ্ণতা একটুও কমেনি। এবারে শীত এসেছিল হেমন্তকে বেশিদিন তার শবশয্যায় শুয়ে থাকার সুযোগ না দিয়েই। শরতের শেষে গাছের পাতাগুলি মোটা ও হলদেটে হবার উপক্রমেই এবং শীত শীত বাতাসের আমেজ ভালো করে অনুভব না করতেই হুড়মুড় করে জাড়কাল এসে পড়ল। প্রত্যেক বছরের মতোই বুড়োরা বলল, জাড বটে বাপু, জাড় বটে। হাড়-কাপুনি জাড ইয়াকেই বলে, এতোটা বয়েস হোল, চুলদাড়ি পাকিয়ে ফ্যাললোম, এমুন জাড় কুনদিন দ্যাখলোম না।

প্রত্যেক বছরের মতোই জোয়ানরা হেসেছে এ-কথায়, উ তুমাদের ওমান মনে হচে। আমাদের জাড য্যামুন মালুম হচে না, আমাদের বয়সে তুমাদেরও তেমনি জাড় লাগত না। উ কিচু লয় গো, অক্কেটোই আসল। মাথা নেড়ে কেউ সায় দিয়েছে, তা হবে, অক্কেটোই আসল। তোদের বয়সে জোস্তা থাকলে পোষমাসেও রাতদুপুর পয্যন্ত ধান কেটেচি, ভুলকো তারা দেখে মাঠে গেইচি—ওইটোই কথা, অক্কেটোই আসল।

কিন্তু যে দু-চারজন বৃদ্ধ সায় দেয়নি, শেষ পর্যন্ত তাদের মতটাই সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এ-বছরে সত্যি করেই প্রচণ্ড শীত এসেছে। বিশেষ করে মধ্যরাতের এই সমতল চ্যাপ্টা দেশে ঠাণ্ডাটা যেন আকাশ থেকে উপচে উপচে পড়েছে অঘ্রাণের শুরুতেই উত্তুরে এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস সারাদিনে দেশটির শরীরে হিমের কালো পরদা ফেলেছে এবং সন্ধ্যার পর সেই বাতাসের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মাটি বরফকুণ্ড হয়ে গেছে। ধবধবে সাদা মাটির দেশ এ-বছরের শীতে কালো হয়ে গেছে এবং সে-দেশের সবাই তা লক্ষ্য করেছে। পাতলা পিছল কালচে একটা আবরণ পড়েছে মাটির ওপর—সেটাকে কোনোমতেই শরতে ধানের জমিতে জমা ঘন শ্যাওলার আস্তর বলা চলে না।

এই কঠিন শীতে এ বছরের কাজ আরম্ভ হয়েছে। শীত কী করতে পারে যতক্ষণ হাতে কাজ আছে? শীত যত প্রচণ্ডই হোক না, যতই নিরাশাব্যঞ্জক হোক ফলনের পরিমাণ এবং হোক না সেই ফসলের অর্ধেকটাই জমির মালিকের বাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে, তবু শীত কী করতে পারে? কাজেই গোটা গাঁয়ের কাস্তে সচল হয়ে উঠেছে যথারীতি। মোটা ছেঁড়া র‍্যাপার কিংবা ময়লা দুর্গন্ধ কাঁথা গায়ে দিয়েই মানুষগুলিকে শীত এবং উত্তুরে বাতাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পৌষের মাঝামাঝি আসতেই রুপোর মতো সাদা হয়ে এল সামান্যমাত্র

ইস্পাত ছোঁয়ানো লোহার কাস্তে। মাঠের ধান কাটা হয়ে গিয়ে আঁটিবাঁধা শেষ হলো—যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত মৃত সৈনিকের মতো মোটা মাথার আঁটিগুলি জমিতে পড়ে রইল কিছুদিন। শিশিরে ধুয়ে ধুয়ে ধানের শিষগুলো চকচকে সোনার বর্ণ নিল। এরপর কাস্তের কাজ মোটামুটি শেষ হলো। গাঁয়ের মুচির তৈরি তোবড়ানো উৎকট চটি পায়ে হট্ হট্ হেঁটে আঁটিগুলিকে ছোট ছোট পাহাড়ের মতো সাজাতে শুরু করল ওরা।

সমতল চ্যাপ্টা দেশ থেকে তখন সবুজের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে—খালগুলোতে মিশমিশে কালো রঙের কাদা ছাড়া আর কিছু নেই। কাদাখোঁচার লম্বা ঠোঁট খচ খচ করে ক্ষতবিক্ষত করছে কাঁচা কাদাকে, এক ঠ্যাংয়ের ওপর ভর দিয়ে কালোয় শাদায় মেশানো বিরাট সারস লম্বা সারি দিয়ে বসতে শুরু করেছে। উত্তরে বাতাস দিন দিন সঙ্কুচিত করতে শুরু করল দেশটাকে, গাছগুলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেল এবং ঘাসপাতার রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে দিয়ে গাঢ় সবুজবর্ণের ফড়িং মেটে হয়ে গেল। আর ধূসর চ্যাপ্টা দেশ গোরুর গাড়ির নেমিচিহ্নিত সমান্তরাল চওড়া রাস্তায় আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে গেল।

এই সমগ্র শীতকালটা, শীত আক্রান্ত দেশের এই ছবিটা তার অশিক্ষিত প্রায়-বর্বর মনে আবছাভাবে ভেসে ওঠে। পুঙ্খানুপুঙ্খতার দিক থেকে ওপরের বর্ণনা অনেক বেশি সঠিক—কিন্তু ওর মনের ছবিটা অনুভূতির সজীবতায় গাঢ় এবং উত্তপ্ত। কাজেই শুকনো খুঁটিনাটি অনেক বাদ পড়লেও সে যোগও করল অনেক-কিছু এবং ছবিটা তার কাছে চরম সত্য ও সমগ্র হয়ে উঠল। ছবিটাকে যখনই সে পেয়ে গেল, সেই শীতঝরা বীভৎস স্তব্ধ নির্জন রাত্রির আকাশের নিচে অসাড় হয়ে যেতে যেতে, ক্ষুধায় চেতনা হারাতে বসেও সে দু' কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে আকুল হয়ে পিছনের দিকে ঘাড় ফেরাল। কুয়াশা জমাট হয়ে তার চোখের ওপরই পর্দা ফেলল।

সে কিছুই দেখল না। প্রান্তর নিথর হয়ে রইল। যে-খালটায় সে আশ্রয় নিয়েছিল তা তাকে উষ্ণতা দেবার পরিবর্তে বড় বড় দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল। তবু গোল একটি পুঁটুলির মতো হয়ে সে মনের চোখে ছবি দেখে আর তার কানে স্পষ্ট ভেসে আসে, বচির, বচির র‍্যা—এ্যাই বচির, ঘুম মারচিস শুয়ে, শুয়ে. কান কাটবে যি মুনিব।

চিৎকার করে যে ডাকত তার আর বেশি কষ্ট করতে হতো না। বসির বউয়ের শরীরের ওম থেকে এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিত। বিছানা ছেড়ে ঠাণ্ডা

মেঝেয় মাংসল একটা শব্দ করে পড়ত সুডৌল হাতটা। আট বছরের ছেলেটা সরে যেত বিছানা ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই নুয়ে পড়ত বশির, বউয়ের হাতটা আস্তে আস্তে তুলে গলার ওপব রাখত, বাচ্চাটাকে আর-একবার কাছে টেনে নিত। তাবপর সাবধানে কাথা সরিয়ে সে বিছানার বাইরে আসত। র‍্যাপারটা দাড় থেকে টেনে নিয়ে মাথা থেকে সমস্ত শরীরটা ঢেকে নিত। অন্ধকাবের মধ্যে কাস্তেটা চকচক কবতে থাকে—পেতে একটুও দেরি হয় না তার। আমকাঠের পলকা দরজা খুলে সে বেরিয়ে আসে, চাচা লিকিন?

হুঁ রে বাপু হুঁ—ডেকে ডেকে হয়রান হাচ, কি ঘুম র‍্যা তোর আঁ—ওয়াজদ্দির কণ্ঠে অপ্রসন্নতা, চ এখন, দেরি হয়ে যেচে আবার, বিশে কত্তা লোকটো বেশি সুবিধের লয়, বুইলি না? কত্তার সাঁওতাল মুনিষকটা আর উদের কামিনী-গুলোর তো ঘুম নাই বেতে—শালোবা সারারাত মদ মাবে, আর তিনপোহর বাত থাকতে মাঠে যেযে হাজির হয়। ওদেব লিয়ে হয়েছে আমাদের বেপদ। বাতদুপুবে যেতে হবে এই জাড়ে। চ বাপু এ্যাকোন তাড়াতাড়ি।

যেরি যেরি—বশিবের তাড়া নেই, একটু তামকু খেয়ে লি, দাঁড়াও এণ্ডু।

দেরি হয়ে যাবে র‍্যা—তৃ তবে তামুক খা, আমি চললোম।

দাঁড়াও চাচা, বেস্ত হচো ক্যানে বলো দিকিন—এ্যাই দ্যাখো তো কতক্ষণ, লেলোম বলে।

বিশে কত্তাও বলবে লেলোম বলে, বলবে মানে মানে পথ দ্যাখো।

ভারী বয়ে যাবে তাহলে। পোষমাসে কাজের অভাবটো কী? সব শালোব মুনিষের পেয়োজন। ভারী তোমার বিশে কত্তা।

বশির খড়ের পাকানো নুর্ণা থেকে খড় টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে। খানিকটা খড় নিয়ে গোল একটা গুলি পাকায় সে—ধীরেসুস্থে দলাটাকে হাতেব তেলোয় রেখে রগড়াতে থাকে, তামুক না খেয়ে বেরুতে পারব না বাপু—সে যোগ করে।

বারে বাবে তামাকেব কথা শুনে এই সাংঘাতিক শীতের ভোরে ওয়াজদ্দিরও তামাক খাবাব বাসনাটা আস্তে আস্তে প্রবল হতে থাকে। দাওয়ার এক কোণে বসে পড়তে পড়তে বলে সে, লে বাপু, ছাড়বি না যাকোন, দুটান দিয়েই লি। লে লে লুটি হয়েছে, গুঁড়িয়ে ফেললি যে।

রগড়াতে রগড়াতে গোল দলটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলে কলকির পর সেটাকে রেখে খট খট করে কড়া হাত দুটোয় চাপড় দেয় বশির। দাওয়ার কোণ

থেকে চকমকি ইস্পাত শোলা এনে শোলায় আগুন ধরায় অভ্যস্ত হাতে, সেখান থেকে আগুন ধরায় খড়ের দলায়। তামাকটা যখন তৈরি হতে থাকে ওয়াজদ্দি চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে—শীতে হি হি করে কাঁপে সে, একটা ঠাণ্ডা বাতাস আসে, ঘরে ঘরে মানুষ জেগে ওঠে—ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে ঝকমক করতে থাকা কাস্তে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওরা। কেউ নিজের ক্ষেতে, কেউ পরের ক্ষেতে। বশির তামাক তৈরি করে টান দেবার নামে বার দুই চুম্বন করে হুঁকোটাকে। আস্বাদ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে সে হাত বাড়িয়ে দেয়, লাও।

ওয়াজদ্দি হুঁকো নিয়ে মিনিট পাঁচেক নিবিষ্ট মনে টান দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে প্রায় গোপন থেকে বলে, তামুকটো না খেয়ে কাজে যাওয়াটো কোনো কাজের লয় বাপু।

ল্যায়কো? তবে? বললোম তুমাকে, তুমি বিশে কত্তা বিশে কত্তা করে তামুকের এ্যাটাই লষ্ট করে দিলে।

তোর ধান কটা কবে কাটবি? ওয়াজদ্দি প্রশ্ন করে।

ঐ কটা ধান বাপু—উ আর কতক্ষণ লাগবে। ত্যাড় বিঘে জমির ধান—উ শালো কাটলেও তিনমাস, না কাটলেও তিনমাস। মরশুমের পেরথম তো, কদিন না হয় মুনিষই খাটি বুইলে না, কটো টাকা ঘরে আসবে তেবু। তোমার ধানটো কাটলে?

আমারটো? লে হুঁকো লে। আমারটো? শালোর পেটরোগা হেগো রুগীর মতুন ছিঁয়েপড়া ধান—কবে কেটে টিপ দিয়ে রেখেচি। আমার ধানের টিপ দেখিস নাই তু—ওয়াজদ্দি খেঁকশেয়ালীর মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে, পেল্লাই টিপ র‍্যা, খলখলের টিপ ঘাটতলা থেকে দেখা যায় জানিস,—একটো ছাগল লুকোনোও ফ্যার আচে। উ কতা বাদ দে দিকিন।

না, তা লয়, কথাটো তুমিই তুললে কিনা, তাতেই।

চ চ আর দেরি করিস না।

চলো।

ওরা বেরিয়ে পড়ে।

একটু দূরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে একটা দল থেকে কেউ চিৎকার করে, কে?

ক্যারে ভক্ত লিকিন?

অ, অজদ্দি চাচো? আর কে গো সঙ্গে?

আমি র‍্যা ভক্তা। বশির জবাব দেয়।

অ, কোন মাঠ আজকে ?

জামতলা। তোর ?

ভেরে-ডাগডে। কার কাজে যাচ্ছিস ?

বিশে কত্তার। তোর নিজের ধানটো কাটা হলো র‍্যা ভক্তা ?

হয়েছে—বুইতে লাগব পরশু থেকে। কদিন এসে পিটিয়ে দিস ধান কটা।

দোব, দোব। দোব না ক্যানে ?

বশির ওয়াজদ্দি এগুলো। সকাল হয়নি এখনো। পাতলা একটা কুয়াশা পড়েছে। কালচে রঙের মাটি অল্প ভিজে এবং পাথরের মতো কঠিন। গোরুর গোয়াল থেকে ধোঁয়া এসে কুয়াশায় মিশেছে। ভারী একটা পর্দা পড়ছে গাঁটিকে ঘিরে। সেই পর্দা ভেদ করে ওরা মাঠে এসে পড়ল। ভিজে ভারী ধানের লুটিয়ে পড়া শীষ চাবুকের মতো আঘাত করে পায়ের গোছায়। শিরশির করে বাতাস দেয়, ধানে ধানে ঘষা লেগে শনশন শব্দ হতে থাকে এবং এই অল্পএকটু শব্দ ছাড়া বিরাট খোলা মাঠের কোথাও কোনো শব্দ নেই। অন্ধকারে ছায়ার মতো মানুষগুলোকে হুস হুস করে হাঁটতে দেখা যায়। তারপর কুয়াশার পাতলা চাদর ছিঁড়ে হঠাৎ সূর্যের অজস্র আলো লাল হয়ে মাঠে পড়তেই দেখা যায় বিরাট মাঠে প্রায় জনারণ্য। তখন একটা শব্দ ওঠে, একটা বিশাল গম্ভীর গুঞ্জন—মাঠের আকাশ এবং বাতাস বেষ্টন করে বাজতে থাকে। এর অন্য কোনো নাম নেই, একে জীবনের গুঞ্জন বলা চলে। বেঁচে থাকার গুঞ্জন—উষ্ণ উত্তপ্ত এবং চিরকালীন।

খালটায় গুটি মেরে শুয়ে এই ছবি দেখতে দেখতে এখন তার মনে হলো সে মরে যাচ্ছে। মানুষ কেমন করে মরে যায় তা সে জানে না। কিন্তু তার মনে হলো মরার ঠিক আগে মানুষ তার সমস্ত জীবনের ছবি একবারে দেখতে পায়। তার আরো বিশ্বাস ছিল মরার সময় কেউ কিছু ভাবতে পারে না, সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারে না, শুধু দেখতে থাকে। সেও কিছু ভাবতে পারছিল না—এই শীতে শরীরটার মতো মনটাও অবশ হয়ে জমে গিয়েছিল, সে যেন সুখ-দুঃখের অতীত হয়েছিল, কারণ আর তার কোনো কষ্ট অনুভব করার ক্ষমতা ছিল না। এখন আর সে শীত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টাও করছিল না। কিন্তু তবু চোখ বন্ধ করে এক-দৃষ্টে মনের দিকে চেয়ে নিরীহ অসহায়ভাবে সে একটির পর একটি ছবি দেখতে পাচ্ছিল। স্পষ্ট রঙে রঙ করা ছবিগুলো—এবং সেগুলোতে যা কিছুই ছিল—

মানুষ কিংবা প্রান্তর, আকাশ অথবা বৃক্ষ সবকিছুই যেন তার গা ঘেঁষে স্পর্শ করে যাচ্ছিল।

সকালের সেই আশ্চর্য গুঞ্জনের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে কাস্তে চালানোর ঘস্ ঘস্ শব্দ, শুকনো শামুক বা কাঁকড়া পায়ের নিচে কুড়কুড় করে গুঁড়িয়ে যাওয়া, হঠাৎ কোনো ইঁদুরের পালিয়ে যাওয়া, গুঞ্জন ছাড়িয়ে অতর্কিত চিৎকার এবং মেঠো সুর, ধানকাটা, আঁটি বাঁধা, ধানের স্তূপ সাজানো এবং ধান বোঝাই মোষের গাড়ির মন্থর গতি এবং তৈল-পিপাসু চাকার চিৎকার রেষারেষি করে ধান পেটানোর ধুপধাপ শব্দ এবং আরো অসংখ্য খুঁটিনাটি—তার দেশের মাটির এবং তার নিজের জীবনের অজস্র ঘটনা তার হৃৎপিণ্ডের সামনের বুকের দেয়ালে প্রতিফলিত হতে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল রোদ কটকটে শাদা হতে থাকে—দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শুরু হয়—গুনগুন ধ্বনিটা আস্তে আস্তে মাঠের নিস্তব্ধতার চাপে উচ্চকণ্ঠের চাপে ডুবে যায়—অসংখ্য কাস্তে একসঙ্গে দুপুরের রোদে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

এই ছবিদের সঙ্গে সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগালাগি করে শেষ ছবিটা এসে মনের ওপরে সেঁটে গেল। আগাগোড়া কেঁপে উঠল সে। ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল চিত্রটাকে। অন্ধকার দিয়ে লেপে দিতে চাইল। কিন্তু স্থির হয়ে ছবিটা ঝুলে রইল—সে দেখতে বাধ্য হলো, কেঁপে উঠল, চিৎকার করে উঠতে চাইল—কিন্তু তবু চিটচিটে আঠার মতো জড়িয়ে রইল সেটা।

মাঠ থেকে সেদিন তখন প্রায় সবাই ফিরে গেছে। সাঁওতাল পুরুষ এবং নারীরা আগুনের চারপাশে বসে গেছে—ইঁদুর কিংবা কাঠবেড়ালি পুড়িয়ে সাবধানে তার ছাল ছাড়াচ্ছে—সারাদিনের ঝাড়া ধানের হিসেব করছে চাষী এবং গৃহস্থরা। বশির এবং ওয়াজদ্দির সেদিন ফিরতে একটু রাত হলো। কান ঢেকে মুখে কাপড় জড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি ওরা বাড়ি ফিরছে। কেউ কাউকে কথা বলছে না। পায়ের নিচে মাটি কনকনে ঠাণ্ডা। বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে হঠাৎ বশির বলল, চাচা?

আঁ—একটু যেন অন্যমনস্ক ছিল ওয়াজদ্দি।

বলি অ চাচা?

বল্।

কী শুনচি বল দিকিন্।

ক্যানে, কী আবার শুনলি তু?

তুমি শোন নাই ?

কী বেপারটে তা তো বলবি।

আবার হিড়িক লিকিন লাগবে।

কোতা ?

তুমি কিচুই শোন নাই গ ?

কই বাপু, আমি তো কিচুই শুনি নাই।

আচ্ছা লোক বটো বাপু তুমি—সারোটা দিন আজ খালি কানাকানি হলচে—একানে ফিসির ফিসির, ওকানে গুজুর গুজুর, তুমি কিছুই শোন নাই? পাকিস্তানে হিঁদুদের লিকিন্ একছার কাটচে—কলকাতায় তেমনি কাটচে মোচলমানদের।

ক্যা বললে ক্যা তোকে ? ওয়াজদ্দি খেঁকিয়ে ওঠে।

লোকে বলাবলি করচে যি !

তা করুক গো, তু আপনার বাড়ি যা দিকিন—ভাত মেরে শুয়ে থাকগা।

কিন্তু আজ রেতে যি আমাদের গাঁটোকে—

এই দ্যাকো—ওয়াজদ্দি বলে, ইয়াকেই বলে মুরুক্ষু—মুরুক্ষু কী আর গাছে ধরে র‍্যা ? আজ রেতে গাঁটোর কী করবে কী ?

আসবে।

কুন শালোরা ?

লবাবপুর, ছিষ্টিধরপুর থেকে মা কালীর পুজো দিয়ে হিঁদুরা আসবে।

বাড়ি যা—নিদারুণ বিরক্তিতে ওয়াজদ্দির মুখে কথা আসে না।

শোনলোম তাইতি বলচি।

কেস্তে দিয়ে সি শালোর গলাটো ঘ্যাচ করে কেটে দিতে পারলি না।

সবাই বলচে যি।

তু বাপু চুপ কর দিকিন এটু—বড্ডা জাড় লাগচে।

দুজনেই চুপ করে। কিন্তু একটু পরেই আবার বশির বলে, চাচা আমার মনে হচে আবার অরম্ব হবে।

এটা কমনেকার মোনাকাটা গ আঁ—বলচি বাড়ি যা তেবু ব্যাদর ব্যাদর করবে।

বশির কিন্তু কান দিল না কটুক্তিতে, ফিস ফিস করে বলল, কতকটা যেন নিজের মনেই, হাজার হলেও পাকিস্তানটো মোচলমানদের দ্যাশ, সিখানে

মোচলমানদের রাজত্বি।

তাইলে যাস নাই ক্যানে?

আমাদের কী সায়োস হয় চাচা ঘরসংসার লিয়ে কোতাও যেতে। তবু দ্যাশটো—

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ওয়াজদ্দি—বশিরের মুখের ওপর তীব্র চাহনী ফেলে নিঃশব্দে ওকে যেন দগ্ধ করতে থাকে সে। বাশির দাঁড়িয়ে পড়ে বোকার মতো, তেমনি করেই চেয়ে থাকতে থাকতে ওয়াজদ্দি জিজ্ঞেস করে, তোর বাপ কটো? এঁ্যা—কটো বাপ? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো। বুইলি? যা—বলেই ওয়াজদ্দি নিজেই চলে গেল হনহন করে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা এল। দূর দূর গ্রাম থেকে, ছোট ছোট মাটির ঘরে-উষ্ণতা ত্যাগ করে কপালে চওড়া করে সিঁদুর লেপে অপরিচিত মানুষদের হত্যা করতে এল ওরা। ওদের আসার আগে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে তারা মেঝেতে পাতা ঠাণ্ডা বিছানায় বসে ঢাক কাঁসর এবং শাঁখের শব্দ শুনল। নিস্তব্ধ মাঠ এবং শীতের কুয়াশা ছিঁড়ে ভেসে এলো ঢাকের গুড়গুড় শব্দ। মাঘের আকাশ শিউরে উঠল কাঁসরের ঢং ঢং আওয়াজে এবং রাত্রি বিরাট একটা ঈগলের মতো কুৎসিত নখর দিয়ে নিরীহ পায়রার মতো গ্রামটাকে চেপে ধরল।

সামান্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল সহজেই—রাস্তার ওপরে আড়া-আড়ি করে লাগানো গোরুর গাড়িগুলি ভেঙে ফেলা হলো এবং বশিরের চোখের ওপরেই প্রথম বলি হলো ওয়াজদ্দি। তারপরে খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরগুলি বেষ্টন করে আগুনের শিখা উঠল—আগুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অপরিচিত খুনীদের মুখ, তাদের কপালের সিঁদুর এবং তীব্রভাবে ঝলকে উঠল ওয়াজদ্দির তাজা রক্ত এবং মৃত ও ভীষণভাবে বিস্মিত তার মুখের ওপর আগুন খেলা করতে শুরু করল।

বচির, বচির—তোর বাড়িটোর দিকে ওরা গেল।

কই, কখুন।

উই যি—উই যি—আর আমাদের বাড়িটোও।

এ্যাই রকিব—উই যি শালোরা—

দল ছেড়ে প্রাণপণে ছুটল বশির। বাড়িটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। বাড়িটা শান্ত। বাড়িটা স্থির। বাড়িটা মূক। ওরা চলে গেছে। বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের আট বছরের ছেলেটা। বাড়িটার মতোই শান্ত এবং মূক ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ—কালো একখণ্ড পোড়া কাঠের মতো পড়ে আছে ভাঙা

দগ্ধ ঘরে। কাঁচা মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস অভিশপ্ত।

আল্লা তু যি থাকিস মানুষের হ্যাহোটার মধ্যি—বুকফাটা চিৎকার করে উঠল বশির, কোতা, কোতা থাকিস তু, কুনখানে থাকিস বল্।

সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে সে। যে খালটার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে সে শুয়েছিল, শীতে আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল তার হাত-পা, ভয়-ভাবনা চিন্তার অতীত হয়ে, শারীরিক কষ্টের বাইরে চলে গিয়ে সে যেখানে স্থির হয়ে শুয়ে, কুয়াশার দিকে চাইতে চাইতে ছবি দেখছিল, এই শেষ ছবিটা দেখতে দেখতে সে ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—তার গলার শিরাগুলি ফুটে উঠল। শিরাওঠা হাতদুটি লোহার ডাণ্ডার মতো শক্ত হয়ে উঠল। আর সে কোনো ছবি দেখতে পেল না। হঠাৎ একেবারেই অন্ধ হয়ে গেল সে। অন্ধ হয়েই এগিয়ে চলল।

এই ভয়ঙ্কর রাত্রির ছবি দেখতে দেখতে অন্ধ হয়ে, পাগল হয়ে, তাড়িত হয়ে গত কয়েক রাত্রি ধরে সে এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছে তার দেশ ছেড়ে। ঝোপে-ঝাড়ে সে লুকিয়ে থেকেছে সারাদিন—কোনো মানুষের সামনে যায়নি, সাহায্য চায়নি কারো কাছে, প্রার্থনা করেনি। ঈশ্বরের কাছেও না। মনে মনে সে বলেছে, আমি আর বচির নাই—বচির শ্যাষ, বচিরের হয়ে গেলচে, হ্যাশ ফ্যাশ নাই—আমি এ্যাকোন আর-এক হ্যাশে জন্ম লোব।

আজ সারাটা দিন ঠিক এমনি কেটেছে তার, একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কতরকমের শব্দ শুনেছে, পৃথিবীর অর্থহীন ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে সেইসব শব্দ। সারাদিন ধরে উত্তর দিক থেকে ঝোড়ো বাতাস এসেছে, পৃথিবীর পাত্র ঠাণ্ডা হয়েছে ধীরে ধীরে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বিদায় নিয়েছে—কিন্তু ততক্ষণে জমে গেছে পৃথিবী এবং আকাশ আর কুয়াশার পর্দা নেমেছে ভারী হয়ে। কখন নিস্তব্ধ হয়েছে তার চারিপাশের জগৎ সে খেয়াল করেনি। যখন খেয়াল হয়েছে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো শব্দই সে শুনতে পায়নি। এইমাত্র সে অনুভব করল তার দেশের প্রান্তে পৌঁচেছে সে—এবার কখন নিজের অজান্তেই যে-দেশে সে পালাচ্ছে সে-দেশের মাটিতে পা দেবে। অত্যন্ত সাবধান হতে হয়েছে তাকে যেন কারও চোখে না পড়ে। মানুষ কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর চোখেই সে পড়তে চায় না। সে আরো শুনেছে নিজের দেশ যেমন ছাড়তে দেওয়া হয় না, অন্যদেশে তেমনি ঢুকতেও দেওয়া হয় না। প্রতিমুহূর্তে এখন তার মনে হচ্ছে এখুনি তার চোখের ওপর টর্চ পড়বে, গম্ভীর গর্জন উঠবে একটা, তার প্রাণ-

হীন দেহ লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

প্রচণ্ড শক্তিধর শীতের একটি তরঙ্গ এল। তার হাড় ভেদ করে মজ্জায় গিয়ে পৌঁছল শীত—ধারালো চাকুর মতো কাটল তার মাংস, তার হাড়, তার মজ্জা, মগজের কোষে কোষে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠল এবং একসময় তার বোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলো। তবু কিন্তু সে এগুচ্ছিল—অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হচ্ছিল। আসলে যন্ত্রের মতোই পা পডছিল তার—অবশ পা দেহের সঙ্গে সম্পর্কহীন আলাদা এক অঙ্গ হয়ে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে যেখানে সেখানে পড়-ছিল। হঠাৎ চষা জমির একখণ্ড কঠিন মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গড়াতে গড়াতে ওর শরীরটা আশ্রয় পেল একটা খালে। এবার তার বিশ্বাস নিশ্চিত হলো যে সে মরে যাচ্ছে।

সে সম্ভবত মরেই যাচ্ছিল। কারণ তার আশেপাশে কোনো কিছুই তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বেঁচে ছিল না। মাঠ, জলা, খাল, ঝোপঝাড় এবং আকাশ নিয়ে প্রকৃতি এমন একটা অবস্থায় ছিল যে, সে অবস্থার সঙ্গে একমাত্র মৃত্যুর তুলনাই সম্ভব। যে-খালটার মধ্যে সে শুয়েছিল তার পূর্বদিকের পাড়টা ছিল এত উঁচু যে খালের ভিতর থেকে দেখার উপায় ছিল না পৃথিবীটা অত্যন্ত ছোট হয়ে এল তার চোখের ওপরে এবং সেই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পৃথিবীতে সে মরতে মরতে আবার ছবি দেখতে লাগল।

কিন্তু সবচাইতে হাস্যকর ব্যাপারটা এই যে এইসময় পুরো চাঁদের চারভাগের একভাগেরও কিছু কম জঘন্য হলদে রঙের একটা চাঁদ উঠেছিল। বীভৎস একটা কাণ্ড ঘটালো চাঁদটি—সে মৃত্যুকে একেবারে ন্যাংটো করে দিল।

এই চাঁদের আলোয় এক পা এক পা করে পুবদিকের মাঠ পেরিয়ে খালটার উঁচু পাড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি মানুষের মূর্তি। পরনে হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা মোটা পাড়ের ধুতি—মোটা একটা চাদর জডানো গায়ে। কাঁধে বাঁক—বাঁকের দুদিকের ঝুড়িতে অনেকরকমের জিনিস—বড একটা কুড়ুল চাঁদের আলোতে ঝকমক করছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় তুলে তাকাল বশির, তার মাথা মাটিতে অস্পষ্ট ছায়া ফেলল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝুঁকে পড়ল ওর মাথা। তন্ময় হয়ে ছবি দেখছিল সে—মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জীবনটা দেখতে পাচ্ছিল। সে দেখছিল বিশাল বিরাট চ্যাপটা একটা দেশ—সেই বিরাট দেশটা সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে যেন ছোট্ট হয়ে দুলছিল তার চোখে, তারপর উল্কার বেগে পট বদলাতে থাকে—সে দেখে ওয়াজদ্দির তাজা রক্ত, তার বিস্মিত মৃত মুখ, দেহে

ল'ল টকটকে—আগুনের চাইতেও লাল তপ্ত রক্ত, বল্লম দিয়ে গাঁথা তার আট বছরের ছেলেটাকে, কয়লার মতো কালো ছাব্বিশ বছরের যুবতীকে, প্রেয়সী এবং ঘরণীকে।

অকস্মাৎ উৎকট একটা শব্দ করে খালটা যেন বিদীর্ণ হলো—কাঠবেড়ালীর মতো উঠে এল বশির, এসে দাঁড়ালো বাঁক-কাঁধে নির্বাক মানুষটার সামনে। দু'জন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ চাঁদের আলোয়, হিমবর্ষী আকাশ-আক্রান্ত মাঠে এই খালটার উঁচু পাড়ের কিনারায় মুখোমুখি দাঁড়াল। বশির দেখল সে-মানুষটার পরনে মোটা ধুতি, গায়ে চাদর, কাঁধে বাঁক। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, চিৎকার করে কে ডাকল, বচির বচির, তার মুখে ঝলকে পড়ল বল্লমগাঁথা সন্তানের উষ্ণ রক্ত। মৃত মাছের চোখের মতো ওয়াজদ্দির শাদা চোখ অর্থহীনভাবে চেয়ে রইল যেন তার দিকে। তীব্র চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কুড়ুলটা তুলে নিয়ে মানুষটার মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করল বশির। বাজ পড়ার মতো যেন কড়কড় আওয়াজ হলো এবং বাঁকশুদ্ধ সেই মানুষটা বিস্মিত হতচকিত একটা মৃত্যু-চিৎকার করে খালটার ভিতর গড়িয়ে পড়ল।

পালাইছিলে শালো ই দ্যাশ থেকে—শালো—চাঁদের মৃদু আলোতেও গরিলার মতো বিরাট দুপাটি শাদা দাঁত ঝকঝক করে ওঠে।

একসঙ্গে দুটি টর্চের আলো পড়ে—বশিরের মুখে একটি, আর একটি মৃত্যু-যন্ত্রণাখিন্ন হতবাক সেই মুখের ওপর। টর্চের আলো মুখ থেকে সরে গেলে বশির দেখল সেই মুখ—ঠিক যেন ওয়াজদ্দির মুখ—রক্তাক্ত, বীভৎস, তেমনিই অবাক। চোখের ওপর থেকে অন্ধকার পর্দাটা যেন সরে গেল আর তার চোখের পানিতে ধূসর হয়ে এল দুটি পৃথিবী—যাকে সে ছেড়ে এল এবং যেখানে সে যাচ্ছে।

সারাদুপুর

কাঁকন ছেলেটা বেড়াতে বেরুল। শুকনো মুখে খালি পায়ে বেরিয়ে এল। মা বলল না, কাঁকন কোথায় যাস? ওকেও বলতে হলো না, কোথাও, না, এমনি। কাঁকন জানে মা কিছুই জিজ্ঞেস করবে না, কারণ ডাক্তার এসেছিল, বলে গেছে, দাদু মারা যাবে আজ। না হয় কাল। না হয় পরশু। কিন্তু মারা যাবেই। তাই মা জানে দাদু মারা যাচ্ছে। কাঁকনও জানে। এখন ভীষণ শীত পড়ে গেছে। গরম কাপড়চোপড় বের করতে হয়েছে। লেপ রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এই শীতে ঠাণ্ডায় দাদুর মরতে কষ্ট হবে। দাদু বোধহয় রোদে মরতে চাইবে। মাকে বলবে, আমি রোদে মরব।

শীতের গাছের পাতাগুলোকে বিশ্রী দেখাচ্ছে, পথের ওপর ছায়া ভয়ানক ঠাণ্ডা আর ঘাসের ভেতর রাস্তার রঙ দুধের মতো শাদা। ঘাস এখনো হলদে হয়নি —হবে হবে করছে। এইসব আধ-মরা ঘাসের ওপর শিশির আধাআধি শুকিয়েছে এতটা বেলা হয়েছে। রোদ কেবল এই সময়টায় একবার চড়াৎ করে উঠেছে, খেজুর গাছে ঘুঘু ডাকছে। অমনি মনকেমন করে উঠল কাঁকনের। সব মরে যাচ্ছে গো—কাঁকন এই কথাটা শোনবার মতো লোক খুঁজে পেল না। দ্যাখোনা, পাতা মরে যাচ্ছে, ঘাস মরে যাচ্ছে, বাগানগুলো ফাঁক ফাঁক, ফ্যাকাশে হলদে হলদে ভিজে ভিজে। মরে যাচ্ছে আর কী! দাদুও মরে যাচ্ছে এইসঙ্গে। এদের সকলের সঙ্গে একবার আলাপ করে নেওয়া দরকার। ঘাস, পাতা, আকাশ ইত্যাদির সঙ্গে। বাতাসের মধ্যে খালি গায়ে কাঁপতে কাঁপতে কাঁকন বেরিয়ে এল। প্যাণ্টটা কষে এঁটে পরল। পাছায় হাত ঘষে সর্দি মুছল। পকেটের মার্বেলগুলো গুনলো একবার, আপন মনে বলল, শালারা জিতে নিয়েছে দশটা। হেরে যাওয়ার স্মৃতিটা আসতেই লোকসানের কথা ভেবে পথের মাঝখানে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু মার্বেলের শোক ভুলল সঙ্গে সঙ্গেই, কী ছাই মার্বেল, দাদু মরে যাচ্ছে সে কথাটা ভাবা নেই—কী যে তোমার মার্বেল হয়েছে কাঁকন? মা যা বলে সেটাই নিজের করে নিয়ে কাঁকন ভাবল আর

ভারিক্কি চালে দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, এখন বাইরে যাচ্ছি, মা কিন্তু বলছে না, তোমাকে স্কুলে যেতে হবে না? কাঁকন, স্কুলে যাবে না তুমি? মা বলবেই বা কেন? স্কুলে যেতে তো হবেই না। আজ কাল পরশু। আজ কাল পরশুর মধ্যে দাদু মারা যাচ্ছে। মরব মরব করে দাদু যতদিন না মরছে স্কুলে যেতে হবে না। কেউ মরলে কী স্কুলে যাওয়া চলে? ছিঃ, লোকে কী বলবে? অবশ্য মার্বেল খেলাও উচিত না। যে মরছে তার কাছে থাকা উচিত। এইকথা মনে হতেই কাঁকন আর একটুও দাঁড়ায় না। হন হন করে হাঁটতে শুরু করে। পায়ের নিচে মাটি ভিজে ঠাণ্ডা। বরফের মতো শক্ত আর ঠাণ্ডা করকরে। মরা লতাপাতা জঙ্গল পেছনে সরে যায়, শুকনো পাতা সামনে উড়ে এসে পড়ে, খালে জমা অবশিষ্ট একটুখানি চকচকে কালো পানি কাতর চোখে কাঁকনের পেছন দিকে চেয়ে থাকে। ফাঁকা চষা জমিটায় হোঁচট খেয়ে পায়ের আঙুলের মাথা ছিঁড়ে রক্ত পড়ে। কাঁকন হাঁপায়। দাদুর কাছে যাওয়া যায় নাকি? ওরে বাপরে কী ভীষণ ঠাণ্ডা দাদুর ঘর আর কী ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর এক-দম চুপ। চেয়ার টেবিল, জানলার কপাট, খাট, বিছানা, পানির জগ, দাদু সব চুপ। আর আমাদের ঘর দেখুন না—অদৃশ্য শ্রোতাকে কাঁকন বুঝোয় - আমাদের ঘর হচ্ছে নোংরা, আমি সেখানে পড়ি, কাগজ ছিঁড়ি, ফেলি, নোংরা আমাদের ঘর। বাতাস ঢোকে আর জানলা খটখট করে ওঠে। যাচ্ছেতাই নোংরা আমাদের ঘর। মা আর আমি ঘুমোই সেই ঘরে। আমি চেঁচাই। মা বকে, কাঁকন চেঁচিও না। মায়ের মুখভঙ্গি নকল করে কাঁকন বলে, চেঁচিও না। আমাদের ঘরে খালি মা-টাই চুপ—আর সব ঠিক আছে।

দাদুর ঘরটা অবিশ্যি সবচাইতে ভালো। বাড়ির মাঝখানে ঘরটা। দরজা জানলায় পরদা দেওয়া আছে। অন্য কোনো ঘরে নেই। খাটের ওপর ধপধপে বিছানা, টেবিলে শাদা চাদর পাতা। চেয়ারে তুলোর গদি। টেবিলের ওপর পানির জগ, গ্লাশ, ওষুধের শিশি। একটা শুকনো পাতা এসে পড়লেও মা হাতে করে তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। তিনবার করে ঘরটা ঝাড়া হয় আর ঝি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে মেঝেটা আয়নার মতো চকচকে করে। দাদু সেই কবে থেকে পড়ে আছে, বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। কেউ ঘরে ঢুকলে দাদু খ্যাপার মতো চেঁচায়। বাজারের জটাই পাগলের মতো। বেশি রেগে গেলে বালিশে মাথা ঠোকে। বুড়োটা আচ্ছা চেঁচাতে পারে। খালি ঘ্যান ঘ্যান করে আর চেঁচায় —খেতে দে—খেতে দে—ক্ষিদে লেগেছে, বিরক্ত করে মারল আমার মা-টাকে।

কাঁকন একটা গাছকে শুনিয়ে বলল। ওর দাদু লোকটা প্যারালিসিসে পড়ে আছে। মেজাজটা তিরিক্ষে থাকে এজন্যেই। বুড়োর বেশি দোষ নেই। মরতে এত দেরি কারই বা সহ্য হয়? সে বুড়ো ভাবে, যতদিন না মরা যাচ্ছে, দিনে চার বার খেতে হবে, মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কাঁকন তাঁকে বিনা কারণে ভ্যাঙাল।

কাঁকন ঘরে ঢুকলে তো বুড়ো খুশি হয়। বলে, এই যে ভাই—কী খবর?

হয়তো কাঁকন বলল, স্কুল থেকে এলাম।

তা আয়, বোস আমার কাছে।

আমি হাতমুখ ধুইনি এখনো।

তা হোক, বোস।

বাঃ, আমি বুঝি কিছু খাব না?

যা তাহলে, বেরো।

তখন কাঁকন হয়তো বসল।

ঘরে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে ফিশফিশ করে দাদু বলল, আজ কী দিয়ে ভাত খেয়ে স্কুলে গেলি বল্‌তো?

ইলিশ মাছ ভাজা, ডাল আর আলুর তরকারি দিয়ে। কাঁকন উৎসাহের সঙ্গে বলে, বুঝলে দাদু—তরকারিটা এত ভালো হয়েছিল না!

ভাই, আমাকে দুটো ইলিশ মাছ এনে দিবি। চুপি চুপি রান্নাঘর থেকে এনে দে।

মা দেখলে পিটিয়ে আমার ছাল তুলবে।

তোর মা দেখতে পাবে না—যা।

আমি পারব না দাদু।

যা না ভাই—লক্ষ্মী—ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে আমার।

দাদু তুমি কী? ছেলেমানুষের মতো কেবল খাওয়ার বায়না! ও তো আমরা করব। তা আমি কোনোদিন করি না। মা যা দেয় তাই খাই। কেন, দুপুরে তুমি খাওনি? মা দেয়নি খেতে? অত খাইখাই করো কেন? উঠতে পারলে তুমি ঠিক হাঁড়ি খেতে দাদু।

দাদু কথা কানে তোলে না, দুটো ইলিশ ভাজা এনে দে দাদু—তোকে একটা দেব। কাঁকন মুখ গম্ভীর করে বলে, ও! আবার লোভ দেখানো হচ্ছে? তুমি যাচ্ছেতাই হয়ে গেছ। খেলার সাথীদের কাছ থেকে শেখা কথাটা বলে

কাঁকন, এবার তুমি টেঁসে যাও দাদু।

এইবার চটে বুড়ো, তাই তো তোরা চাস—তোর মা রাক্ষুসী তাই চায় বলেই তো খেতে দেয় না।

এখন যেই মা ঘরে ঢুকে বলল, কী বলছেন, দাদু ভিজে বেড়াল হয়ে গিয়ে বললে, এই কাঁকনমণির সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম আর কী ?

দাদুটা এত পারে—ন্যাকা—কাঁকন নাক সিঁটকোয়।

ফাটা আঙুলটায় হাত বুলোতে বুলোতে আর একটা হাত গালে রেখে কাঁকন ভাবতে লাগল, কিন্তু দ্যাখো, সেই দাদু আজ মরে যাচ্ছে। হয় আজ, না হয় কাল, না হয় পরশু। মতি ডাক্তার এসে বলে গেল। দাদু না মরা পর্যন্ত আমাকে আর স্কুলেও যেতে হচ্ছে না। আহা রে—দাদুটা মরে যাচ্ছে—লতাপাতা, ঘাস, আকাশ সব কীরকম করে মরে যাচ্ছে ! দাদু আমার লোক খুব ভালো। মায়া লাগে বুড়োর জন্যে। আমি বড়ো হতে হতে দাদু বেঁচে থাকলে দাদুকে রাজা করে দিতাম। কাঁকনের হাসি পেল, দাদু সেদিন দুপুরবেলায় আমাকে ডেকে চুপি চুপি বলল কিনা—কাঁকন আজকাল বাজার যাস না ?

কেন দাদু ?

বালিহাঁস বিক্রি হচ্ছে না বাজারে ? আনিস তো ভাই একটা। বলেই দাদু কেমন ঝিমুতে লাগল।

দাদু মাত্তর একটা বালিহাঁস চায়। কি ওড়ে বালিহাঁসগুলো ! শোঁ শোঁ করে শব্দ হয়। কাঁকন আকাশের দিকে চাইল। ম্যাটমেটে রঙ আকাশটার। একটুও ভালো লাগে না। হাঁসগুলো ঐ আকাশ দিয়ে উড়ে আসে—কোথা থেকে কে জানে ! কেমন হু হু করে উড়ে আসে। আমি যদি উড়তে পারতাম ওদের মতো ! কী মজাই না হতো। এক-একদিন আমার কী খারাপ লাগে ! দাদু মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে—মা কথা বলে না। আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। আর না হয় মরে যেতে। কবে মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল কাঁকন সেইকথা মনে করার চেষ্টা করল। পনেরোটা মার্বেল হেরে খেপে গিয়ে একদিন ন্যাজা বলল, ভারী তেজ দেখি যে। তোর বাপ কোথায় জানিস ?

মা যেমন বলেছিল তেমনি জবাব দিল কাঁকন, ঢাকায়।

এঃ ঢাকায় ! ঢাকায় তো আসে না কেন শুনি ?

গর্বের সঙ্গে কাঁকন বলে, আসবে।

তোর বাপকে আর আসতে হচ্ছে না।

কেন ?

লোকে ধরে ঠ্যাঙাবে।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁকন, কেন ?

তোর বাবা একটা মাগীকে নিয়ে ভেগেছে।

মাগী কী ?

মাগী জানিস না ? আরে ছ্যা ছ্যা—মাগী জানিস না ? এবার আর একা ন্যাজা নয়, সবাই ওকে ঘিরে ধরে হাসল, ভ্যাংচাল, চিমটি কাটল, ছোঁড়া মাগী জানে না—হো হো !

ওদের সঙ্গে খুনোখুনি করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মাকে খুঁজল কাঁকন। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। হাত মুখ না ধুয়েই পড়তে বসল কাঁকন। একটা অক্ষরও পড়তে পারল না, বই খুলে ঘরের ছায়ার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ঢুলতে শুরু করল। মা খেতে ডাকলে গেল না। রাত একটু বেশি হলে সব কাজ শেষ করে মা ঘরে এসে শুয়ে পড়তে যাবে, কাঁকন জিজ্ঞেস করল, মা, আব্বা কোথায় ?

ঢাকায়।

আসে না কেন ?

আসবে। শুয়ে পড়ো কাঁকন। কিছু খেলে না কেন ?

আব্বা একটা মাগীর সঙ্গে চলে গেছে ?

মা একটু থমকাল, কে বলল ?

ঐ ছেলেরা।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে মা জবাব দেয়, হ্যাঁ।

মাগী কী ?

প্রচণ্ড একটা চড় কষে ওর মা ফেটে পড়ে, রাতদুপুরে শয়তানি। পাজী কোথাকার। হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি তোমার। মাগী কাকে বলে জানিস না—আমি একটা মাগী।

পাশের ঘর থেকে দাদু বলে, কী হলো ?

কাঁকনের মা রাগে ফুলতে ফুলতে ছুটে যায় ও ঘরে। দড়াম করে দরজা খুলে বলে, খবরদার, একটা কথা নয়, একদম চুপ। কুচুটে বুড়ো, কিছু জানে না !

অ, আচ্ছা—দাদু আর কথা বলে না। ঘুমোয়, না জেগে থাকে কে জানে ? মা ফিরে আসে, দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে দেয়। তারপর শুয়ে পড়ে। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁকনের ইচ্ছে হয় মরে যেতে। মাগী খুব খারাপ

কথা, ছি ছি করার মতো কথা ? নাকি খারাপ জিনিশ ? কেমন জিনিশ ? জিনিশটা ঠিক কিরকম জানবার ইচ্ছা নিয়ে কাঁকনের ঘরে যেতে মন করে।

সেই একবার। আরো একবার ইচ্ছে হয়েছিল। এই তো কদিন আগে। কাঁকন মনে করল ঘটনাটা। স্কুল থেকে দুপুরে হঠাৎ বাড়ি চলে এল। খুব রোদ ছিল। গাছপালা পুড়ছিল। মাটি পুড়ছিল। এইসব পোড়ার পটপট শব্দ হচ্ছিল। কাঁকন গন্ধ পাচ্ছিল। এইসব পুড়ছিল আর ঝিমুচ্ছিল। ওদের বাড়িটাও রোদে থিরথির করে কাঁপছিল। দাদুর ঘরে কেবল ঠাণ্ডা ছায়া, ওষুধের মিষ্টি একটা গন্ধ, টেবিলে পানির জগ, গ্লাশ। দাদু ছায়ায় শুয়ে। কাঁকনের ইচ্ছে হলো একবার দাদুর ঘরে যেতে। দাদু হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। কলতলায় একটা কাক খানিকটা রোদ আর খানিকটা ছায়ায় থেকে একটা হাড় আছড়াচ্ছে। হঠাৎ হাড় ছেড়ে লাফিয়ে একটা মরা ইঁদুর তুলে নিয়ে এল, উড়ে গেল, সজনে গাছে বসল। একটা শাদা লম্বা-ঠ্যাং ফড়িং ঘাসে তিরিং করে লাফ দিল। কাঁকন নিজেদের ঘরে এল, ঘরের ছায়ায় বিছানায় ফরশা একটা মানুষ শুয়ে, মায়ের কোলে তার মাথা, মা ওর চুলের ভেতর আঙুল চালাচ্ছে, তারপর মা তার মাথা নামিয়ে আনে, কাকটা চিৎকার করে ওঠে কা কা করে, কাঁকন ফিরে দেখে, ইঁদুরটা রেখেছে কার্নিশে, আবার তুলে নিল ঠোঁটে।

মা বিষণ্ণ চোখে কাঁকনকে দেখল, বলল আয়।

লোকটা উঠে দাঁড়াল, চুল ঠিক করল, একটা হাইও তুলল, মা বলল, আমার ছেলে কাঁকন।

আচ্ছা—কাঁকনের থুতনিতে একটা টোকা দিয়ে মায়ের দিকে ফিরে লোকটা বলল, চলি। তারপর চটপট রোদের রাস্তায় বেরিয়ে গেল। রোদে-পোড়া ঘাসের গন্ধ ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল আর পটপট শব্দ হলো। কাকটার পাত্তা নেই, তার বদলে সজনে গাছে সবুজ রঙের একটা পাখি লেজ নাচাচ্ছে, কলতলায় এঁটো বাসনকোশনের ডাঁই পড়ে আছে। সেদিকে চেয়ে মা বললে, কাঁকন কাউকে কিছু বলবে না।

লোকটা কে ?

কাউকে কিছু বলবে না তুমি।

রাগে কাঁকন চোখে কিছু দেখতে পেল না। মায়ের মুখটা কলতলার দিকে ফেরানো।

সে বলল, বলব।

না, বলবে না।

হ্যাঁ বলব, সবাইকে বলব।

কাঁকন।

হ্যাঁ বলব, সবাইকে বলব—রাগ নয়, চোখের পানিতে এখন কাঁকন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, বলব, যাকে খুশি তাকে বলব—জবাই করা মুরগির মতো সে আছাড় খেল, লাফাল, ধেই ধেই করে নাচল, বলব, বলব, সবাইকে বলব।

মা চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখল ওকে, দেখতে দেখতে রোদ ঝিমিয়ে এল, কাঁকন ঘুমিয়ে পড়ল। পড়ন্ত রোদে অনেকগুলো কাক কলতলায় জমে চেঁচাতে শুরু করল। কাঁকন সেদিন ঘুম থেকে উঠেছিল সন্ধ্যাবেলায়। চোখ কচলে তার মনে হলো সকাল হয়েছে আর মনে হলো মরে গেলে বেশ হয়। নিজেকে শুনিয়ে সে বলল, কাঁকন তুমি মরে যাও। মায়ের সঙ্গে লোকটাকে দেখে তার কেন যে মরে ইচ্ছে করল কে জানে? লোকটা কী খুব খারাপ? কয়েকবার দেখেছে তাকে, পাকা রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে মোটর সাইকেলে যায় ঝকঝক করে। একবার এসেছিল দাদুকে দেখতে। খুব খারাপ নাকি লোকটা? কিন্তু মায়ের সঙ্গে লোকটা ঐভাবে থাকলে কাঁকনের মনে হয়, তার, না হয় তার মার মরে যাওয়া উচিত।

এই নিয়ে কাঁকন যখন গালে হাত দিয়ে ভাবছিল, ওর পকেট থেকে একটা মার্বেল গড়িয়ে পড়ল। চমকে উঠে দাঁড়ায় কাঁকন। মনটা তখন ওর ভারী খারাপ। বোকার মতো সে গড়িয়ে-চলা মার্বেলটার দিকে চেয়ে দেখল। একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে মায়ের সকালবেলার কথা মনে পড়ল, কাঁকন আজ বিকেলে বাড়িতে থাকবে।

কেন?

না, বাড়ির বাইরে যাবে না বিকেলে।

তখুনি বুঝতে পারল কাঁকন, দাদুর কথা বলছ মা? ডাক্তার যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছিল আমি শুনেছি জানো?

বেশ করেছ। বাইরে যেওনা আর, মায়ের গলা একটু কাঁপল—কাঁকন মায়ের দিকে চেয়ে, আর—বিকেলে তোমার আব্বা আসবেন।

সত্যি? কখন?

বললাম তো বিকেলে।

ভারী মজা হবে।

বাড়িতে থেকো আজ। মা আর কথা বাড়ল না।

সকাল বেলার কথা মনে পড়ে এখন কাঁকনের মন কিন্তু আরো মুষড়ে পড়ল। মজা হবে না ছাই। সেই লোকটা আর আসে না। কিন্তু পড়তে পড়তে হঠাৎ হয়তো কাঁকনের মনে হলো লোকটা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। ওর মনে হয়, লোকটা সবসময় ঘরে রয়েছে, আর মায়ের কোলে তার মাথা। মায়ের কোলে কতদিন যাই না—ছিঃ, বড় হলে আবার কেউ মায়ের কোলে যায় নাকি। কিন্তু মা তো ইচ্ছে করলে কোলে টানতে পারে—আমি নাইবা গেলাম! মা টানে না। আব্বা কোন ঘরে থাকবে? আর সেই মাগী কথাটা পরে জেনেছে, একটা যাচ্ছে-তাই। মা বলল কথাটা সত্যি। তাহলে মায়ের ছেলে কাঁকন তোমার আব্বার মুখ দেখা উচিত কী? পাকা ঝুনো ছেলে কাঁকন ঝাঁকি দিয়ে চুল সরাল কপাল থেকে।

একটা শব্দ হলো শোঁ শোঁ করে মাথার ওপর। কাঁকন রোদ থেকে চোখ আড়াল করে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। বালিহাঁসের বিরাট একটা দল উড়ে যাচ্ছে। ওদের পা পেছনে ফেরানো, গলা এগিয়ে দেওয়া সামনের দিকে। রোদে ঝলকাচ্ছে ওদের কালচে ডানা, গলার কাছে ফিকে নস্যি রঙ যেন সোনালি। হঠাৎ সাঁ করে ঘুরে একটা বড় ত্রিভুজের আকার নিয়ে দলটা বিলের দিকে ফিরল।

সব কষ্ট-দুঃখ ভুলে কাঁকন হাততালি দিয়ে বলল, এতদিন কোথা ছিলি তোরা? একটা নেমে আয় না! ভয় নেই। দাদু একটা খেতে চেয়েছিল—তা দাদু আজ না হয় কাল, না হয় পরশু মরে যাচ্ছে, খেতে পারবে না। পুষব আয়!

হাঁসগুলো আমন্ত্রণে কান দেয় না। রেলগাড়ির মতো হু হু করে বাতাস কেটে বিলের দিকে এগোয়। মার্বেলটা কুড়িয়ে পকেটে পুরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করল কাঁকন। তারপর পাছায় সর্দি মুছে দৌড়ুল চষা জমির ছোট মাঠ, আগাছার পোড়ো জমি, বুক পর্যন্ত উঁচু আধমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ভাঙা দালানবাড়ির ভিটে থেকে একটা ঘুঘু আড়চোখে কাঁকনের মারমূর্তি দেখে নিয়ে পিরিং করে ডানার শব্দ তুলে উড়ে গেল। ঝোপের পাশে একটা শেয়াল বিশ্রাম নিচ্ছিল চোখ বন্ধ করে। কাঁকন হুড়মুড় করে প্রায় তার ওপরে পড়ল। ভীষণ বিরক্ত হয়ে শেয়ালটা সরে গেল। কাঁকন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল একটুক্ষণ। তারপরেই আবার ছুটতে শুরু করল।

এখন হাঁসগুলোকে আর দেখা যায় না। রোদটাও মিইয়ে লালচে হয়ে

এসেছে। কাঁকন সামনে রেললাইন দেখতে পেল। পেছনে ঝাপসা মাঠ আর রেললাইনের ওপারে বিরাট বিলটা। এতবড় বিলটা যে ভয় পেল কাঁকন। এর মধ্যে কোথায় হাঁসগুলো বসেছে দেখতে পেল না সে। এতদূর দৌড়ে এসে ক্লান্ত অবসন্ন কাঁকন রেললাইনের নিচে জমির আলে বসে পড়ে। কোনদিকে ওদের বাড়ি বুঝতে পারে না। আর হাঁসগুলোকে দেখতে না পেয়ে দুঃখে কষ্টে ও আবার ভেঙে পড়ে। ভারী দুঃখী হয়ে যায় কাঁকন। সেই মরে যাওয়ার ইচ্ছাটা ফিরে আসে। আহা রে যদি মরে যেতাম — কত ভালো হতো — হয়তো হাঁসগুলোর মতো উড়তে পারতাম। তার বদলে দাদুটা মরে যাচ্ছে। হয়তো এখুনি দাদু মরছে। একটা বালিহাঁস খেতে চেয়েছিল দাদু। দাদু মরে গেলে চেয়েচিন্তে একটা বালি-হাঁস খেলেও খেতে পারবে। এই সঙ্গে মায়ের কথা মনে পড়ল কাঁকনের আর ওর বুকটা যেন ফেটে যেতে চাইল! মা-টাও মরে গেছে। মা-টাও মরে গেছে বলে মনে হয় যে আমার! আব্বার সঙ্গে বিকেলে কী আজ দেখা হবে? সেই মেয়ে-লোকটা কী আসবে?

কাঁকন ছেলেটার মনে কীরকম মরে যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়। দারুণ শীতের জন্য সেইসময় ঘাস, পাতা, আকাশ, রোদ সবকিছু মরছিল বা মরণাপন্ন ছিল।

হাঁসগুলো ঠিক এই সময়েই বিল ছেড়ে আকাশে উঠল আর কাঁকন দেখল ওদের। আস্তে আস্তে উঠে এল সে রেললাইনের ওপর। চারদিকে চেয়ে দেখল। আকাশের রোদ কমে এসেছে, কিন্তু রেললাইনটা ঝকঝক করছে।

বেলা তিনটের ট্রেন ক্রুর আনন্দে ঝকঝক গুমগুম শব্দ তুলে দৈত্যের মতো চলে গেল। তারপর কী নিদারুণ স্তব্ধ প্রশান্তি!

আমৃত্যু আজীবন

আকাশে হাওয়া ছিল তখন।

করমালি দেখছিল মোষের মতো কালো মেঘ উঠে আসছে। সে চিৎকার করে ছেলেকে ডাকল, বিষম মেঘ আসতিছে বাজান। দেরি করিসনি আর। বলে সে উঠে গোয়ালঘরে গিয়ে বলদ দুটোর দিকে একটু মন দিল। ধলা গরুটার লেজ নাচছিল চঞ্চলভাবে। একপাশে খোঁড়া গাইটা শুয়ে খড়ের গাদার ওপর। বিশাল কালো চোখে চেয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। ছাইগাদা থেকে উঠে গা ঝাড়ল কুকুরটা, আকাশের দিকে মুখ তুলে জল-বাতাস শুঁকল।

করমালি বেরিয়ে এল গোয়াল থেকে। উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে বিষণ্ন বিলের দিকে তাকাল। বিল রুপোর মতো ঝকঝক করছে। করমালির কটা চোখ মিইয়ে এল। ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো বিল স্থির—বহু দূরের গ্রামের সবুজ ফ্রেমে আটকানো। সেইখান থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে করমালি এদিক-ওদিক খুঁজতেই নিজের পঁচাত্তর বছরের মাকে দেখল। সে এক মনে ঝাঁটা বাঁধছে।

এইটুকু সময়মাত্র গেছে। যে সুর্মা রঙের মেঘবাহিনী উঠে আসছিল তারা এখন আকাশে-আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। করমালি শুনতে পেল গর্জন গড়িয়ে বেড়াচ্ছে শানের মেঝেতে পিপের মতো। দেখল কালো মেঘ ধোঁয়াটে হয়ে টগবগ করে ফুটছে। এই ব্যাপারে অগুনতি বর্ষাকাল এবং সহচর দৃশ্যপটগুলি—অর্থাৎ সাঁতলা বাতাসের ঝোড়ো উন্মত্ততা, অতি বলশালী কৃষ্ণকায় মেঘ, পৃথিবীর মতো পুরোনো বিল এবং গাব-ভেজানো পানির মতো কালো অতল জলরাশি, হাঁসেরা, বাড়ন্ত লতাপাতা আর দ্বিপ্রহরের দানবীয় খিদে—এইসব তার পিঙ্গল চোখের তারায় নেচে উঠল। তখন করমালি নিজেকে জাল থেকে ছাড়াতে আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে উঠোনটাকে জরিপ করতে শুরু করে। কিন্তু বেচারার চোখ গিয়ে সেঁটে থাকে মায়ের বেতো বাহাত্তুরে পায়ের বেগুনে হাঁটুটার ওপর। করমালি বিব্রত হয়ে কাঁচা-পাকা দাড়িতে আঙুল চালায়। এইসময় গোপনতম সূক্ষ্মতম সমস্ত অস্তি প্রকাশ করে অবিশ্রান্ত শাদা আলো ঝলকে উঠল আর বিকট গর্জন করে উঠল

আকাশ আগাগোড়া।

বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিক অথচ বিদারণকারী স্মৃতি এসে পড়ল। করমালির সামনে তার শৈশব মেলে ধরল মুহূর্তের জন্যে। সে এই ঢালু ভিটের গড়ানে দিকটায় যেখানে ভেঙে পড়ো-পড়ো বৃষ্টি-ছিন্ন মায়ের ঘরটা কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে চেয়ে, পুরোনো ভেজা গোলপাতা থেকে চুঁইয়ে-পড়া কালো পানির টপাৎ টপাৎ শব্দ শুনে এবং আশ্চর্য এক নিরাসক্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন ভিটে, গোয়ালে জাবরকাটা গোরু, ছলছলে বিলের ওপর ছিটানো ছবির মতো গ্রাম দেখতে দেখতে শৈশবের দ্যুতিহীন দিনে ডুবে গেল। এক নিষ্ঠুর বৃদ্ধের সঙ্গে বিলে যাওয়া, অচেনা মানুষের জমিতে সকাল-বিকেল-দুপুর-সন্ধে আর অসহ্য খিদে—এইসবের স্মৃতিতে ডুবে গিয়ে সে যখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন ফুটন্ত আকাশ থেকে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এল। বিলের ওপরটা ধোঁয়াটে এবং শুধুই বৃষ্টির শব্দ।

মা মাজা টানতে টানতে ঘরের মধ্যে চলে গেল এবং এতক্ষণে ছেলে রহমালি পেটের ওপর শিরা পরিস্ফুট করে উদ্গার তুলতে তুলতে বেরিয়ে এই বিষ্টিটা থামলে যাবানে, বলে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আম আর জামগাছের মাঝখান দিয়ে, উল্লসিত নৃত্যরত সুপারি বনের ভিতর দিয়ে রহমালির মা বেরিয়ে আসে এইবার। তার হাতে গলে-পড়া একতাল গোবর। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে মাথা ঢেকে পরম আদরে গোবরপিণ্ড নিয়ে ছপছপ শব্দে শিয়ালের মতো এগিয়ে আসছে সে। কিন্তু গোরুর জন্যে কাটা হলুদ ঘাসের স্তূপের কাছে এসে সে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোবর মুখে মেখে ভিজে, এবং অনবরত বৃষ্টিতে আরো বেশি ভিজে অদ্ভুত হয়ে উঠল। এই পতনে করমালির যখন কিছুই করার নেই, সে বলল, আহারে গোবরটা ফালালি—বলে সম্ভবত সহানুভূতির জন্যেই জ্বালানি রাখার আড়ালটা থেকে উঠোনে বেরিয়ে এসে নিজেও ভিজতে ভিজতে ছেলের উদ্দেশ্যে বলল, আর দেরি করিসনি দিনি বাজান। বিশ বছরের ছেলেটা এরপর আর কোনো উপায় না দেখে লাফ দিয়ে উঠোনে নামল এবং চারপাশ খোলা হোগলায় ছাওয়া চাতালে এসে পুরোনো টিন, ছেঁড়া মাদুর ইত্যাদির মধ্য থেকে কোদাল দুটো নিয়ে বাপের দিকে এগিয়ে গেল। তার কালো শক্ত শরীরের ওপর এখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে এবং সে যতক্ষণে লম্বা লম্বা পা ফেলে বৃষ্টির মধ্যে ধীরেসুস্থে করমালির কাছে হেঁটে এল ততক্ষণে, দুরূহ দুর্ভেদ্য ধোঁয়ার মতো বৃষ্টি শরীরের আবরণে ঢাকা তার দেহ বেয়ে এই বাংলা—কঠোর কোমল এই বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা-

ধলেশ্বরীর তেতো-পোড়া-ভিজে হাজার বছরের পুরোনো জীবন গানের মতো ঝরে পড়তে থাকে।

হাওয়াটা প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে। এত জোরে বৃষ্টি আসে যে বিলের মধ্যেকার গ্রামগুলো আর নজরেই পড়ে না। রহমালির মা গোবরের আশা পরিত্যাগ করে হাত ধুয়ে একটু আড়ালে গিয়ে উর্ধ্বাঙ্গের কাপড় খুলে নিয়ে নিংড়ে পানি বের করছে। করমালি আড়চোখে সেই শীর্ণ কোঁচকানো শরীরের দিকে নজর ফেলে আরো বিব্রত বোধ করল—কী জন্যে সে বউকে খুঁজছিল তা-ও মনে পড়ল না। তখন ছেলেই মাকে তামাকের কথাটা মনে করিয়ে দিল। রহমালির মনে নেই কখন মায়ের বুকের দুধ খেয়েছে। কিন্তু সেই স্মৃতি তার সংস্কারের অন্ধকারে মানিকের মতো জ্বলছিল বলে মায়ের খোলা বুক দেখে তার লজ্জা করে না। সে বিলের কালো পানির হিমে ডুব দেয়, যেন হেমন্তের শীত-শীত রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আতার পাতায় বাতাবির পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার মতো শিশিরের শব্দ শোনে। কিন্তু করমালি গোয়ালঘরের হতাশ অন্ধকারের দিকে চোখ ফেরায়। তার আহত বুড়ো গাইটা মৃত্যুর অপেক্ষা করছে সেখানে।

তারা বেরিয়ে আসার পর বৃষ্টি সোজাসুজি অন্ধকার হয়। ধূমল আকাশ গম্ভীর আওয়াজ দেয়, গ্রামের নির্জন হিমপথ সামান্য কেঁপে ওঠে। পথে বৃষ্টি নেই, সেখানে শরীরহীন অন্ধকার নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। দুপাশের কালো আম-জাম-হিজল-সজনে-মাঠাম থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি জমছে এবং ভুষো কালো কাদা পিঠ বের করে আছে। চলতে গিয়ে ভিজে লতা জড়িয়ে ধরছে পায়ে পায়ে, কখনো চাবুকের মতো আঘাত করছে। এইভাবে পাড়াটা পার হতে হলো। দূরে দূরে বাড়িগুলো কখনো চোখে পড়ল হেঁট হয়ে নমিত হয়ে আছে। চালগুলো নেমে এসে বুক-সমান মাটির দাওয়ায় এসে ঠেকেছে এবং যেহেতু চারিদিকেই দাওয়া—অতএব বাড়িগুলোকে বিশালকায় পিঠ-উঁচু মতো দেখায়। বিলে পৌঁছুনোর তাড়নায় পথ ছেড়ে করমালি বেড়া পার হয়ে বাগানে ঢুকছে। তারপর এইসব বাগান, সুদেহী সুপারি গাছ, খোলা জমি, বিমর্ষ ঘাস এবং গ্রামের কালো সবুজ আবেষ্টনী পেরিয়ে একেবারে হঠাৎই বিলে এসে পড়ল করমালি ছেলে নিয়ে। তখন ওদের চোখের সামনে আকাশ বিল গোটাদশেক পাতিহাঁস এবং বর্ষার বিলের আরো অজস্র খুঁটিনাটি নিয়ে ভয়ংকর রকম সবুজ একটা দৃশ্য ফুটে উঠল।

করমালি এখন তার পতিত জমিটাকে পরীক্ষা করছে। যে-অংশটা পরিষ্কার

করা হয়ে গেছে গতকাল, সেখানে আশশ্যাওড়া, আগাছা দাঁতনগাছের সবুজ পাতা এখন ফিকে হয়ে এসেছে এবং পিটিয়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার জন্য মাটি কালো হয়ে বসে গেছে। নিবিষ্টমনে এইসব দেখছে করমালি। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় আর হাওয়া একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে বিল থেকে ভয়াবহ স্তব্ধতা উঠে আসছিল। শ্লেটের মতো কালো আকাশের নিচে অতল বিলের জলরাশি এখন সম্ভবত শাদা-কালো মেটে হাঁস দশটিকে আহ্বান করছিল না। ফলে তারা স্থির ভেসে বেড়াচ্ছিল। আয়নার মতো পরিষ্কার পানিতে শুধু আকাশের ছায়াই পড়েনি, সেখানে জলপিপি এবং অন্যান্য কিছু কিছু জলপ্রিয় পাখির চলাচলও ছিল। আর এই ঝকঝকে আয়নাকে ঘিরে বিভিন্ন আকারের জমিতে কচি ধান থেকে তরল সবুজ গলে গলে পড়ছিল। এরই মধ্যে পানির রঙ পাল্টাচ্ছিল কারণ হাওয়া থেমে যাওয়ায় আকাশে কালো মেঘ স্থির হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল। সেজন্যে আকাশ প্রতীক্ষায় গম্ভীর হয়ে এল ও স্থির স্ফটিকের মতো পানিতে ফিট ফিট শব্দ করে জলপোকাগুলো চলাচল শুরু করল। এই আশ্চর্য শান্তি করমালিকে এমন মোহিত করে যে সে স্বপ্ন দেখতে পারে, তার জমিটা পরিষ্কার হয়ে গেছে— তুলে ফেলা জঙ্গলগুলো থেকে সোঁদা গন্ধ আসছে এবং জমিটা বিলেব শামিল হয়েছে। তার তকতকে মেঝে কোদাল দিয়ে লণ্ডভণ্ড করে নতুন মাটির চাঙর-গুলোকে আকাশের দিকে মুখ করে চিৎ করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর বৃষ্টি শুষে চাঙরগুলো ভরপুর এবং দুধে-ভেজা পাউরুটির মতো নরম মিষ্টি মেদুর মাটি। এইভাবে করমালি প্রায় বিনা চেষ্টায় দেখতে পায়, বিলের সঙ্গে লাগোয়া তার নিজের, একেবারে নিজের রক্তের ভিতর থেকে জন্ম দেওয়া আত্মজের মতো একখণ্ড জমি কচি ধানে সেজে চোখের ওপর লাফিয়ে উঠল হাওয়ায়। করমালির বুক থেকে তাই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল বিল থেকে অনেক উঁচুতে পগারের মতো আধ-পরিষ্কার জমিটার দিকে চেয়ে। স্বপ্নকে কাজেই মুলতুবি রেখে করমালি গতকালের কাটা জঙ্গল আগাছাগুলোকে তুলে জমির কিনারে সাজিয়ে রাখতে বলল রহমালিকে এবং নিজে কোদাল তুলে নিয়ে একমাত্র নারকেল গাছটাকে কেন্দ্র করে যে-দুর্ভেদ্য লতাপাতার জালে একটি জটিল ঝোপের সৃষ্টি হয়েছিল তার বিনাশে এগিয়ে গেল। গলা পর্যন্ত উঁচু ঝোপটায় সে প্রায় আগাগোড়া ঢেকে গেল এবং তার প্রথম কোদাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি হিস্‌স্‌ শব্দ উঠল।

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক এই মুহূর্তে। অন্তত এই তার ধারণা। অবশ্য সে এখন কিছুতেই বলতে পারবে না শব্দটা—যা নাকি কোদাল বা এ-ধরণের কিছু চালানোর

সময় অজান্তেই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—এই তীব্র শব্দটা আসলে তারই মুখ থেকে বেরিয়েছিল কিনা। কারণ কোদালের চোটটা মাটিতে পড়বার সাথে সাথে, কোপানো চাঙরটা উল্টে চিৎ করে দেবার আগেই করমালি একটা গম্ভীর তীক্ষ্ণ মর্যাদাব্যঞ্জক শিস দেওয়ার মতো শব্দ শুনতে পেয়েছিল এবং প্রায় একই সময়ে সোনালি রঙের সাবলীল লতার একটা কুণ্ডলীকে বিদ্যুতের মতো দ্রুত উল্টোদিকে খুলে যেতে দেখেছিল। তারপরেই নিবিড় কালো রঙের নিকটবর্তী আকাশের পটভূমিতে, রসপূর্ণ উথলানো সবুজ, ছলোছলো সজল বিল, এককথায় তার বর্তমানের পৃথিবীর সামনে জলন্ত উজ্জ্বল সাপটাকে সে দুলতে দেখল। তার অতীত জীবনের ওপর জন্মপূর্বের অন্ধকার নামে। পূর্বস্মৃতির সুতো খুলতে থাকে, জীবন টাল খেতে থাকে দুরন্ত হাওয়ায়, অভাব-দুঃখ দারিদ্র্য-শ্রমের ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হয়। বর্তমান দৃশ্যপটও আবছা হয়ে আসে এবং সে তার চাষীজীবনের সঞ্চিত সমস্ত মনোযোগ দিয়ে দোদুল্যমান সাপটিকে পাঁচ হাত দুর থেকে দেখতেই থাকে। বিরাট একটা ছাতার মতো তার ফণা আর ফণার ওপর যে গোক্ষুর ধপধপ করছে তা যেন শরতের সকালের সূর্যের মতো উজ্জ্বল। করমালি তার চোখের দিকে চোখ রাখার চেষ্টা করল কিন্তু ওর ধূসর ম্লান ঠাণ্ডা বিষণ্ণ চোখদুটি সম্পূর্ণ বিনা চেষ্টায় দৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যায়। ফলে দ্বিতীয়বার করমালি সেদিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পায় না। সে কি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে? কণ্ঠরোধ করা শঙ্কা? বুক ভেঙে দেওয়া উদ্বেগ? কিন্তু আশঙ্কা ঘৃণা বিবমিষা ভীতি স্নেহ বা ভালোবাসা কোনো পরিচিত মনোভাবই জন্ম নিল না তার মধ্যে। কেবল সে তার ভাগ্যকে নিয়তিকে তার সংগ্রামকে—যে-সংগ্রামে অন্ত নেই, উত্তেজনা নেই এবং যে-সংগ্রামে বারবার পরাজয় এসে করমালির সাহস দেখে লজ্জা পায়—সেই সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করল। কারণ যে-গোক্ষুরটি দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে করমালির চোখের ওপর নাগরদোলার মতো উঠছে পড়ছে তাতে যেন অসংখ্য জটিল সাদা সুতো জট পাকিয়ে পাকিয়ে করমালির ভাগ্য আর তার বর্তমানকে কেবলই বাঁধছে। অথচ তার গায়ের উজ্জ্বল সোনার রঙ হেমন্তের হলুদ রোদের মতো যেন আকাশজোড়া। এই সময় চিৎকার করে একবার হাঁসগুলো ডেকে উঠল, বিদ্যুৎ চমকে উঠল, ভিজে সবুজ গাছপালা আগাগোড়া উজ্জ্বল হলো, বিলটার সুদূর প্রান্ত এবং সুদৃশ্য জলরাশি দেখা গেল, কাৎ হয়ে যাওয়া দুটি ডিঙ্গি চোখে পড়ল, গ্রাম থেকে অস্পষ্ট অজস্র চিৎকার ভেসে এল—পাখির মানুষের জীবজন্তুর। কানে শোনার ও চোখে দেখার এই সমস্ত শব্দ ও দৃশ্য মুহূর্তকালের জন্যে অভিজ্ঞতায় ধরা

দিয়েই অতলে তলিয়ে গেল। একটিমাত্র বোধ তীক্ষ্ণ হুলের মতো করমালির চেতনায় বিঁধে আছে, যে-বোধের কোনো নাম নেই। তখন, তখনো স্খলিত ভঙ্গিতে সে দুলে চলেছে। তার অতি চকচকে ধারালো জিভ একটা সকৌতুক ধরণে বারবার বেরিয়ে আসছে। করমালি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে দুলতে দুলতেই দূরে চলে যাচ্ছে। তারপরে তার বিস্ফারিত চোখের সামনে আশেপাশের বড বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল ওর মাথা। একটা বড় পুকুরের মতো বিরাট হলো তার উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক ফণা—যেন তার জীবনের সমস্ত কামনার রূপ নিয়ে দেখা দিল তার মাথায় আঁকা গোক্ষুরটি। এইভাবে করমালি নিমেষে আবৃত হলো তার সংসার-সাধ-বাসনাসহ। তার ফণার নিচে বলশালী অন্ধকারের দাঁত কড়মড় করে ওঠে এবং গ্রামের মানুষের ভেঙে-পড়া, ঘুণ-ধরা অথচ ঈশ্বরের মতো অমোঘ সংগ্রামকে গ্রহণ করে এবং মুহূর্তে চিবিয়ে যেন গুঁড়ো করে ফেলে। গোখরো তারপর হঠাৎ কাছে এল। করমালি কোদালেব হাতলে হাত বেখে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু সে আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে গম্ভীব নির্ভয় রাজকীয় শালীনতার সঙ্গে চষা জমির ওপর দিয়ে আলটার কোল ঘেঁসে, সামান্য পানিতে অঙ্গ ডুবিয়ে নিষ্প্রভ আকাশের আলোয় গেরুয়া তারপর মেটে হতে হতে অদৃশ্য হলো।

করমালি যখন ফেরার কথা ভাবল তখন হাঁসগুলো বিল থেকে উঠে এসে ডাঙায় দাঁড়িয়ে গা ঝাড়ছিল। শুধু ছোট একটা বাচ্চা তখনো ডুবে ডুবে গুগলি তুলছিল পরমানন্দে। করমালি ওদের দিকে তাকাতে আরো দেখল, বিরাট মেটে হাঁসটা এখন পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দেখে সে বিলের দিকে চাইল আর প্রচণ্ড এক বিশালতার চাপে ভীষণ ভয় পেয়ে রহ-মালিকে ডাকল তক্ষুনি বাড়ি ফেরার জন্য। রহমালি আপনমনে কাজ করছিল তার দিকে পিছন ফিরে, কাজেই করমালির ক্ষীণ শুকনো আওয়াজ তার কানে যায়নি। ইতিমধ্যে বিলটা তার বুকের ভিতর থেকে ভয়াল রহস্য আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়। তাই করমালির আহ্বান রহমালির কানে এখন বাজতেই থাকে, বাজান, শরীরটা বড় খারাপ লাগতিছে—কাজটা এ্যাহন থাক, বিকেল বেলায় করবানে। রহমালি বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকায়। কাজ শুরু করার আগেই কর-মালির কী হয়েছে সে ভেবে পায় না। কিন্তু করমালির মুখের আতঙ্কের ভাষা পড়ে ফেলে রহমালি। তানাকে দেহিছিস রহম—করমালি জিজ্ঞেস করে।

কার কথা কচ্ছ ?

উত্তরে করমালি মন্ত্রের মতো বারবার আওড়ায়, তানারে দেহিসনি—উরে

কপাল! তানারে দেখলিনে—আমার জমিতি অধিষ্ঠান করিছে। কনে ছিলি তুই ?

রহমালি এখন বাপকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে। করমালি দুর্বোধ্য হয়ে উঠল তার কাছে। আকাশ অন্ধকারে গর্জন করলে, বাতাস বন্ধ হয়ে নিঃসীম অথৈ পানি কালো হয়ে উঠলে যখন অচেনা মাছ পিঠ উঁচিয়ে রেলগাড়ির মতো দৌড় লাগায়—সেইসব মুহূর্তে সবকিছু ভয় আনে রহমালির কাছে। করমালিকে এখন ওর ভয় করছে। কাজেই ওরা এখন কোদাল ঘাড়ে নিয়ে জমি থেকে উঠে আসছে অল্পপানিতে পায়ের পাতা জাগিয়ে পানি ছিটুতে ছিটুতে বাড়ির পথ ধরেছে। তারপর আবার সেই ছায়াময় অন্ধকার পথ, বিশাল সিক্ত বাগান, বড় বড় ফোঁটায় টপ টপ বৃষ্টিশব্দ। কচ্ছপের মতো পিঠ-জাগানো বাড়িগুলো পেরিয়ে করমালির উঁচু ভিটে আর শুকনো কলাপাতা ঝোলানো বেড়ার ফাঁক দিয়ে মায়ের ভেঙে-পড়া চালটা এইবার নজরে আসে। সেইখানে দাঁড়িয়ে আকাশে দুহাত তুলে হাস্যকর অঙ্গভঙ্গ করছিল বুড়ি, তা-ও দেখতে পায় করমালি। মায়ের হাঁটু দুটি ফুলে ওল-কপির মতো হয়ে আছে, চেষ্টা করলেও এতটুকু হাঁটবার শক্তি নেই তার। অতদূর থেকে তার ক্ষীণ চিৎকার করমালির কানে আসে না। সে দেখছিল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা ছোঁড়ায় তাকে একটা বদখত ডাইনীর মতো মনে হচ্ছে। এই সময় অনেক মানুষকে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। বিশেষ করে করমালির গোয়ালের সামনে একটা ভিড়ই বুঝি জমে উঠেছে। ঠিক তখুনি চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে শুকনো আমসির মতো বুক উন্মুক্ত করে প্রায় বিবস্ত্র রহমালির মা চিলের মতো তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে আসে, উরে আল্লারে, আমার কী সব্বোনাশ হইছে রে।

আই—কর্কশ ধমক দিল করমালি, কী হইছে, আঁ? হইছে কী—এই কথা বলতে বলতেই করমালি গোয়ালঘরে পৌঁছয় এবং মানুষ তাকে পথ করে দেয় পরম সহানুভূতিতে। সে ভিতরে ঢুকে দেখল, প্রায় সমস্ত গোয়াল জুড়ে দীঘল তরুণ পুরুষ্টু ধলা বলদটা চার পা মেলে নিথর শুয়ে আছে। সে তার সজল কালো চোখ মেলে আছে। তা থেকে পানি গড়িয়ে চোয়াল পর্যন্ত এসেছে আর ধপধপে ফেনা জমে আছে তার মুখের একপাশে। সামনের একটা পা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে বড় টান টান করুণভাবে সে শুয়ে আছে। করমালি সেদিকে অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে। বুড়ো খোঁড়া গাইটা সর সর শব্দে লেজ নাড়ে। নীল রঙের বিরাট একটা মাছি এসে ধলা গোরুটার নিষ্প্রাণতার ওপরে বসে বসে পা ঘষে, করমালির কাঁধের

ওপর দিয়ে, বগলের ফাঁকে, তার সামনে, পিছনে, আশেপাশে, উঠোনে। অনেক মানুষ বিনা শব্দে নিঃশ্বাস ফেলে। তাদেব চোখের তারা কাঁপে, পাঁজর জিরজির করে। ক্ষেতখামারের কাজ ফেলে কেউ কোদাল কাঁধে বা নিড়ুনি হাতেই চলে এসেছে। অন্যের ক্ষেতে দিনমজুরী থেকে এইমাত্র ফিরে এখন তারা ক্লান্ত—বড ক্লান্ত, বড বেশি সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন এবং চোখ অন্ধকার করা খিদেয় তাড়িত! পিটুলি গাছে বর্ষার হাওয়া দোলে, ভেসে বেড়ায় এবং নিঃশব্দে অসহ্য হয়ে ওঠে। তখন কেউ ঘোষকের মতো আবেগহীন গলায় উচ্চারণ করে, সাপে কাটিছে। এই কথায় সমস্ত বন্ধ-দুয়ার খুলে যায়, শত-সহস্র কণ্ঠে যেন অনবরত কথার ঢেউ বইতে থাকে। দ্যাহো তো, লোম টানলি উঠে আসে নাহি। করমালি একজনের হাতের সুন্দব শাদা ঘাসের মতো একগুচ্ছ লোমের দিকে চেয়ে থাকে। দেহিছ—ঠিক কইছি, সাপেই কাটিছে। আহারে—কী বলবানে কী করবানে কও দিনি। তারপর মানুষটা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আর যেহেতু কান্না জিনিসটা ভয়ঙ্কর সংক্রামক, কাজেই যাদের সঙ্গে করমালির সম্পর্কমাত্র নেই শুধু এইছাডা যে সকালে উঠে কাস্তে হাতে কাজের খোঁজে একসঙ্গে বের হতে হয় এবং কাজ পেলে চাচা ভাইপো ইত্যাদি সম্বোধনে একসঙ্গে বেড়া বাঁধার বা জমির তৈরির কাজ চালিয়ে যেতে হয় বা নিজেদের একছটাক জমি নেই বলে অন্যের জমি ভাগে করার জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়—এককথায় বেঁচে থাকার তিক্ত সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো ঐক্যসূত্র নেই যাদের সঙ্গে সেই তারাও করমালির দূর সম্পর্কের ভাইকে কাঁদতে দেখে চোখ মুছতে থাকে।

এইখানে হঠাৎ কেউ করমালির হৃৎপিণ্ডের বোঁটা ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়। সে প্রায় ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাশেব মানুষটা আঁকড়ে ধরে ফেলল তাকে। তার সামনে অন্ধকার শূন্য দিনগুলো ক্রমাগত পাক খেতে থাকল। কারণ এইকথা তার মনে এল, আমার তো জমি নেই একছটাক—মোডে জমি নেই আমার। যেটুন আছে, তাতে একটা মাসও চলে না। দামডা দুডো ছিল তাই পরের জমি আবাদ করে দুডো ধান পাই। এ্যাহন, এ্যাহন আমার ধলা গেল আমি কী করবানে? আমি কি করবানে? এইভাবে প্রশ্নটা জলো বাতাসের মতো ঘুরে ঘুরে আসে, হাতুড়ির মতো আঘাত করে ঠাস ঠাস করে, তার হৃৎপিণ্ড কখনো গুঁড়িয়ে যায় হামানদিস্তার নিচে বরফের মতো, কখনো উল্টোদিকে ধকধক করে লাফাতে থাকে। বাইরে রহমালির মা বিলাপ করে, কী কালসাপে খাইছে রে—ওরে আমারে ক্যান নেলো না? এমন সব কথা সে বলতে থাকে যার কোনো অর্থ

নেই এবং এই ঘটনার আবেগের দ্বারা স্পর্শিত না হলে যেসব কথায় হাস্যোদ্রেক হতে পারে। শুধু দেখা যায় করমালির মা এখন ধাতস্থ হয়ে পিঁচুটিঅলা চোখে বিমর্ষ বসে আছে। কিন্তু এই দৃশ্যটাকে হঠাৎ অতিমাত্রায় নাটকীয় করে তোলে রহমালি। উৎকটকণ্ঠে দুহাতে পাঁজর চেপে প্রাণপণ শক্তিতে সে কেঁদে ওঠে। মনে হয়, ওর ভিতরটা যেন বোঝাই হয়েছিল, বোঝার ভারে তার মুখে রক্ত এসে গিয়েছিল, যেন শিরা ছিঁড়ে পড়ছে আর এখন সে নিজেকে ভারমুক্ত করছে, খালাস করে দিচ্ছে সমস্ত বোঝা। ওর কান্নাটা শুধুই চিৎকার—কারণ যন্ত্রণার কোনো বোধগম্য ভাষা নেই এবং এজন্যই সম্ভবত রহমালির অবোধ চিৎকার সব-কিছুকে যন্ত্রণালিপ্ত করে। সমস্ত বিকেলের আকাশ ভারী হয়ে মানুষগুলোকে চেপে ধরে। মৃত গোরুটাও এই যন্ত্রণার সহানুভূতিতে আর-একটু হাঁ করে একপাশে তার কালো জিভ এলিয়ে দেয়।

করমালি উঠোনে দাঁড়িয়ে বিলের দিকে চেয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসছিল বলে বিলের রঙ কালো হয়ে যাচ্ছিল আর ধানভর্তি ছায়াময় জমিগুলোকে আকাশের গায়ে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে লাগানো বাড়তি রঙের মতো মনে হচ্ছিল। একমুহূর্ত পরেই বৃষ্টি নামে। করমালি দাওয়ায় উঠে আসতে আসতেই বিল অন্ধকারে ডুবে যায়। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে করমালি ভাবে হাওয়া যেমন বেড়ে উঠল তাতে বৃষ্টি বোধহয় সারারাত চলবে এবং তাতে মায়ের চালাটা কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। সে-ঘর থেকে এখন মিটমিটে আলো আসছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে করমালি দেখল মা আপন মনে বকছে, আল্লার কাছে কিছু একটা নিবেদন করছে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করছে—টেনে নিয়ে আসছে মোটা কাঁথা, মাটির সরা বসাচ্ছে পানি ঠেকানোর জন্যে। এসব করতে গিয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে তার। হাঁটু সোজা করে কিছুতেই দাঁড়াতে পারছে না মা।

রহমালি কী এতক্ষণ ঘরে ছিল ? এই অন্ধকারের মধ্যে ! রহমালির কথা মনে ছিল না করমালির। সে ধলা বলদটার বদলে রহমালিকে হারাতে প্রস্তুত ছিল। এইজন্যেই যখন সমস্ত ভবিষ্যৎকে সবলে রুদ্ধ করে দিয়ে, অনশন উপবাস এবং উলঙ্গ মৃত্যুকে একমুহূর্তে হাজির করে করমালির বুকের ধন অন্ধকার গোয়ালে শুয়ে আছে তখন আর রহমালির কথা মনে নেই। এখন দেখা গেল সে ঘর থেকে বেরিয়ে আর-একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেছে এবং সম্ভবত অনেকক্ষণ পরে, অন্ধকার আরো ঘন হলে, বাতাসের বেগ আরো বাড়লে আস্তে আস্তে ডাকছে রহমালিকে,

বাজান।

করমালি শুনতেই পেল না। ছেলেটা তাই আবার একটা প্রচণ্ড হৃদয়ভার অনুভব করে। সেজন্যে সে উঠে আসে, করমালির কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায় এবং ফিস ফিস করে বলে, তোমার তো ট্যাহা নেই বাজান, ধলা দামড়াটা মরিছে—আর তো গোরু কিনতে পারবা না—এবারের ভাগচাষডা কী করে করবা? আমরা এবার মারা যাবানেরে বাজান—আচমকা চিৎকার করে করমালি, ছিলছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়ায় আর আকণ্ঠ পিপাসার্তের মতো ঠাণ্ডা পানির লোভে যেন দু'হাত বাড়িয়ে রহমালিকে বুকে টানে, মোড়ে মারা যাচ্ছি এবার—বর্ষাডা ক্যাবল শুরু হইছে, মালিক শোনবে গরু মরিছে, জমিগুলোন সব কেড়ে নেবেনে। কাল একবার মালিকের বাড়ি যাতাম, ধান চাতাম কিছু। এ্যাহন জমি নিয়ে নেবেনে, ধান পাবনানে এক ছডাক। কালথে কিষেণ দিতি হবে ডেলি। কিষেণের ট্যাহায় চাল কিনি কোনো পেরকারে বাঁচতি হবেনে। গোরুটোরে সাপে কাটিল কহন বাজান? মোড়ে জানতি পারলাম না। এট্টু ওষুধ দিতি পারলাম না। কেউ তো দেহেনি সাপডারে।

করমালি অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। জোনাকির দিকে চেয়ে আছে। বৃষ্টির দিকে। হাওয়ায় গাছের মাথা দুলছে। অন্ধকার, গাছ, আকাশ, হাওয়া ইত্যাদি পেরিয়ে বিশাল দুর্জ্জেয় বিল পড়ে আছে। সে এখন জীবনকে ছুঁড়ে দিল আকাশে এবং আবার লুফে নিয়ে মৃত্যুকে ছুঁড়ে দিল। জীবন বিলের অপার অন্ধকার তলদেশে গিয়ে স্থির হয়, বৈদুর্যমণির মতো জ্বলতে থাকে। তার বিশাল অতীতকে পর্যবেক্ষণ করে এবং মায়ার মতো মাটিতে, ঘাসে, বাতাসে, ধানে তার সারা দেহ জড়িয়ে থাকে। এই দেশের অনাদি প্রাণ তাকে ঘিরে স্পন্দিত হয়, কাঁপতে থাকে, নাচতে থাকে তার এই ভয়াবহ জীবনাচরণকে কেন্দ্র করে আদি-অন্তহীন বিল স্তব্ধ হয়ে থাকে। জীবনকে তা পাকে পাকে বাঁধে—ব্যক্তিকে এবং মানুষ নামের ধারণাকে, করমালির সংগ্রামকে এবং জীবনসংগ্রামকে। সে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ায়, তাকে ব্যর্থ করে, তছনছ করে, ধ্বংস এবং মৃত্যুকে পাঠায়, আবার গভীর মায়ায় মানুষকে জড়ায়, তাকে ভালো-বাসে। এইজন্যে অবয়বহীন কালো পাহাড়ের মতো কখনো তাকে দেখা যায় দিগন্তের কাছে, কখনো প্রায় বুকের ওপর, কখনো সে উৎক্ষিপ্ত হয় আকাশে ঘূর্ণির মতো এবং ঘর্ঘর শব্দে মন্থনদণ্ডের মতো গ্রামগুলোর ওপর নেমে আসে।

রহমালির গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে করমালি। তার গা ঘেঁসে সে বসে আছে

এবং করমালি সেইখানে বসে আবার অনন্ত গোখরোটিকে দুলতে দেখতে পায়। যখন রহমালি সাপের কথা বলে, যে-সাপ তার বলদটিকে বিনষ্ট করে দিয়ে গেছে এবং যাকে কেউ দেখতে পায়নি, সে তার ফণা তুলতেই বিলের অভ্যন্তরে মানিকের মতো জ্বলতে থাকা জীবন হঠাৎ নিভে যায়।।

করমালি দুর্ভেদ্য রহস্যের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। সে দেখতে পায় বিলের পানি থেকে তার কুচকুচে কালো ঠোঁটদুটি জেগে উঠল, তারপর স্বচ্ছ বিমর্ষ চোখদুটি আর ধারালো তলোয়ারের মতো ছিপছিপে লিকলিকে জিভ এবং সে থুতুর মতো নীল বিষ ছিটোল। তারপরেই অকস্মাৎ বিস্তৃত ফণার মাথাটা শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। বিশাল একটা পুকুরের মতো ফণা—সেখানে গোক্ষুরটি ধপধপ করছে। সে ধীরে ধীরে হাঁ করল এইবার, একটা বীভৎস অতল গুহার জন্ম হলো। সেখানে প্রথমে ধলা গোরুটা, তারপরে করমালির কামনার রঙে রঙিন নতুন জমিটা আর তার যা কিছু আছে—রহমালি, তার নিজের মা, রহমালির মা এবং ভিটেবাড়ি সবকিছু সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এখন ফণাটা হারিয়ে গেছে, গোক্ষুরটি নেই, তার কালো জিভটাও চোখে পড়ছে না—শুধু অন্ধকারের এক বিকট গহ্বর। করমালি দেখছিল কত ধীরে এবং নিশ্চিত গতিতে গাছপালা মাটি এবং অজস্র সাহসী মানুষসহ গ্রামটি ছোট হতে হতে সেই গহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। সমস্ত কিছু এইভাবে অন্ধকারে হারিয়ে গেলে অজস্র দাঁতের সারি ঝকঝকিয়ে ওঠে এবং বজ্রগর্জের মতো কড়মড় আওয়াজ ওঠে। তারপর ওপর-নিচু দুসারি দাঁত আঁটো হয়ে বসে যায়।

আকাশের রং পাল্টাচ্ছিল পৃথিবীতে একটা বিবর্ণ আলো আসছিল। হাওয়া ধরে গিয়েছিল বলে বৃষ্টিও নেই আর সেজন্যেই বিশ্রী একটা গুমোট গরম পড়েছিল। তখুনি কেউ করমালিকে ডাকছিল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে কেউ তাকে ডাকছে। কিন্তু বাইরে থেকে একটি কর্কশ গলা তাকে ডেকেই চলেছিল, করমালি আছিস নাহি? ও করমালি! বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল বলেই বাইরের মানুষটার চিৎকার গম্ভীর শোনাচ্ছিল। তার হাতের টর্চের আলো ইতস্তত দৌড়ে বেড়াচ্ছিল কখনো বৃষ্টিধোয়া গাছের মাথায়, কখনো এমনকী আকাশে উদ্দেশ্যহীন, কখনো-বা করমালির বাড়ির ভিতরে উঠোনে। করমালি এজন্যে উঠল, উঠোন পেরিয়ে বেড়ার কাছে সারসের মতো গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কেডা? সে মানুষটাকে আবছা দেখতে-না-দেখতেই গ্রামের মানুষের বদভ্যাসে মাফিক লোকটা তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে। করমালি চোখ কুঁচকে আবার

জিজ্ঞেস করে, কেডা—কেডা ডাকতিছেন ? পরিচয় দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গম্ভীর গলায় লোকটা বলে, এ্যাট্টা খবর শুনে আসতি হলো তোর কাছে।

এইবারে তাকে চিনতে পারে করমালি, ঠাণ্ডা ভারী গলায় আহ্বান করে, আসেন। তারা দাওয়ার কাছে আসতেই রহমালি একটা জলচৌকি আর একটা কালিপড়া হারিকেন নিয়ে আসে। তখন লোকটার চেক লুঙ্গি, দামি ময়লা শার্ট, রবারের জুতো, পোড়া কালো-রঙ এবং মোটা ঘাড়ের ওপর কাঁচা-পাকা চুল ইত্যাদি চোখে পড়ে। সে জলচৌকিতে চেপে বসলে করমালি সোজা দাওয়ায় বসে পড়ে এবং হঠাৎ অসহ্য গরম লাগাতে গামছা দিয়ে বাতাস খেতে থাকে। তখন লোকটা ভ্রূ কুঁচকে চোখ একেবারে বন্ধ করে একজন চিন্তানায়কের মতো কথা শুরু করে, কী আফশোশের কথা। গোরুটো তোর অপঘাতে মরে গেল। তা আবার এইসময়ে! এ্যাট্টা কাঠা জমিও তো আবাদ করতি পারলিনে। কী গজব যে নামিছে মানষের উফর।

করমালি শোনে।

তা কী আর কার যাচ্ছে কও ? গোরু তো আর বাঁচাতি পারতিছ না।

কী করে পারতিছি আর ? করমালি কথা বলে।

তা এ্যাহন কী করবি ? গোরু কী কিনতিছিস ?

আমারে বেচলিও গোরুর এ্যাট্টা ঠ্যাং কিনতি পারবনানে।

তাহলি ? ঠ্যাং কিনলিও তো আর কাজ হচ্ছে না।

করমালি কাজেই আবার শোনে।

আমি তো আর জোতদার নই। কী কস্ করমালি ? দক্ষিণি জমিও নেই এক ছডাক। বছরশেষ ধানকডা পালি সোংসারডা চলে। তা তুমি তো আর আবাদ করতি পারতিছ না এবার! তাহলি আমার জমিগুলোর কী হচ্ছে ক।

কী কবানে কন দিনি ?

আমি কই কী জমিগুলো এবার ছেড়ে দে। আসছে বছর গোরুটরু হলি আবার নিস্ ক্যানো ? তোরে ছাড়া জমিতো আর কারে দিচ্ছিনে!

উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ খড়্গটা ঠিক এইসময়েই নামে। ঐখানে জলচৌকিতে বসে লোকটা করমালির মাথাটা হাড়িকাঠে ঠেসে ধরে। তার চোখে মৃত্যু থিরথির করে কাঁপে। অন্ধকার পাথরের মতো বুক চেপে বসে। সে যেন বিলের অথৈ পানিতে নেমে যাচ্ছে, আর বাতাসের জন্যে শেষ চেষ্টায় বলছে, জমিগুলো নিলি

আমি বাঁচপোনানে—উপোস করে শুকিয়ে মরে যাবানে।

আরে বিপদ—আবাদ করতিছিস কী করে আমারে ক-দিনি।

আবাদ আমি করবানে। দ্যাহেন, ঠিক আবাদ করবানে। করমালি উঠে এসে লোকটার কাছে দাঁড়ায়, লাঙল কেনবানে আমি। ট্যাহা জোগাড় করে লাঙল কিনি আপনের জমি আমি আবাদ করতিছি—এই বলে সে কাকুতি জানাতে থাকে, বর্ষাডা শুরু হইছে ক্যাবল—আর কয়টা দিন দ্যাহেন। তহন না হলি জমি ছেড়ে দেবানে কচ্ছি।

এই হপ্তার মধ্যি আবাদ শুরু না হলি জমি আমি তোর কাছে রাখতি পারব না করমালি। আমাকেও তো বাঁচতি হবে। এই বলে লোকটা উঠে দাঁড়ায়, টর্চ জ্বালিয়ে চারদিক দেখে দিয়ে সাবধানে উঠোনে নামে ও একটু পরেই হারিয়ে যায়।

করমালি ফিকে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে দেখল বিল দিগন্তের কাছে এখন স্থির হয়ে ঝুলছে। তারপর তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নিচের দিকটা সামান্য কাঁপল এবং রঙহীন অবয়বহীন বিকট একটা অস্তিত্ব এখন দ্রুত আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কখনো সেটা সমস্ত আকারহীনতাকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম দ্যুতিময় তীরের ফলার মতো শূন্যতায় বিঁধে ছিল, কখনো বেঢপ, কল্পনাতীত বৃহৎ হাতির শুঁড়ের মতো অস্পষ্ট নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। নিচে পৃথিবীতে নিশ্চলের মধ্যে মাছের খোলা চোখে অন্ধকার ডুবে ছিল, ধান বেড়ে উঠছিল; কোথাও হয়তো কুমুদ ফুটেছিল আর এই আদিম অফুরন্ত আয়োজনের ভাঁজে ভাঁজে বিশালতা সাজানো ছিল ও অনিঃশেষ প্রাণ ছিল, অমর মৃত্যু ছিল, শ্রেণীবদ্ধ হাতিয়ার হাতে মানুষেরা ছিল এবং মুখোমুখি তাদের শত্রুরাও ছিল।

করমালিকে ডাকল রহমালি, বাজান। বাজান এ্যাহন কী করব? সে তখন একেবারে শিশু হয়ে গিয়েছিল বলে এই একটা প্রশ্নই বারবার করছিল বোকার মতো। ছোটবেলায় পায়ে একবার কাঁটা ফুটে গেলে সেটা টেনে বের করার কথা ভাবতে না পেরে সে শুধুই করমালিকে আকুলভাবে ডেকেছিল। করমালি কোনো জবাব দিচ্ছিল না। তখন ছেলেটা চুপিচুপি বলল বিষণ্ণ মেঘস্বরের মতো, গ্রীষ্মের দুপুরে চাতকের ফটিকজল চাওয়ার মতো, বাজান, এ্যাট্টা কাজ করলি হয় না? ধলার বদলে আমি—আমি লাঙল টানতি পারিনে? একদিকি বুড়ো দামড়াডা আর একদিকি আমি। পারিনে বাজান? জমির মাটি তো মাখনের মতো। পারব না আমি কও? আকাশ হাউইয়ের মতো জ্বলে উঠল। করমালি এইবার দীর্ঘ

তপ্ত নিঃশব্দ কাঁদছে। দু'হাত মুখের ওপর চাপা দিয়ে। ঘাড় ঝুঁকিয়ে একটা কান্নাই ফিরিয়ে ফিরিয়ে কাঁদছে। সঙ্গীতের সুরের মতো বারবার শুরুতে ফিরে আসছে কী কস তুই বাজান, কী কস ?

প্রস্তাবটা করে ফেলার পর রহমালি তীব্র উত্তেজনায় জ্বলতে থাকে। নিজের অজান্তেই সে কখন করমালির জনকে রূপান্তরিত হয়, তালি মরবা নাহি ? ট্যাহা আছে তাই গোরু কেনবা ? জমিগুলো ছেড়ে দিলি কী কলাডা খাবা সারাবছর ? জমি আবাদ করতি হবে আর বিলির ধারের আমাদের পগারডায় এবছরই ধান রুতি হবে। বুজিচো ?

একটু পরেই রান্নাঘরের কালো ঠাণ্ডা মাটির মেঝেয় করমালি দু'হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে। রহমালি বাইরে হাতমুখ ধুচ্ছে। কুপির পাশে বসে নতুন বউয়ের মতো গাঢ় নীল শাড়ির ঘোমটা দিয়ে অনেক পুরোনো তরুণী রহমালির মা ভাত বাড়ছে। মাটির শানকিতে মোটা মোটা লাল ভাত আর দুটো টুকটুকে লাল লঙ্কা করমালির নাড়িতে ঘূর্ণির মতো মোচড় দিতে থাকে। সে তখন আর কিছুই মনে রাখতে পারে না।

মা কনে ? ঘুমাইছে নাহি ?

হ, ঘুমাইছে—

ভাত খাইছে ?

না। খাবে এ্যাহন। তোমাদের হলি খাবেনে।

রহমালি হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলে করমালি খেতে শুরু করে।

খেয়ে উঠে রহমালির ঘুম পাচ্ছে। এখন তার ঘোর চলে গেছে। মেঘ কেটে যাওয়া রাত্রির আকাশ থেকে ঝরঝরে ঠাণ্ডা বাতাস পাওয়ায় রহমালি ভরা পেটে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। সে উত্তরের পোঁতার ঘরে গিয়ে চাটাই পেতে শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার নাক ডাকার শব্দ আসছে। তাই শুনতে শুনতে করমালি উঠোনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারপর তারও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে থাকে। আর দেরি করতে পারছে না বলে শেষ খবরদারিটুকু করে নিতে চাইল। বাড়ির বাইরে এসে সে ফাঁকা ভিটেটায় দাঁড়ায়। তখন গভীর অরণ্যের স্তব্ধতা গ্রামের পথে পথে, বাগানে এবং বড় বড় গাছের ডালপালায় ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছিল এবং কালো শ্লেটের মতো আকাশে অজস্র তারাও ফুটেছিল। করমালি হঠাৎ খেয়াল করে সে তার গোয়ালঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে হাঁড়িকুঁড়ি থালাবাসন ইত্যাদির শব্দ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল

এবং রান্নাঘর চুপচাপ হয়ে এসেছিল। করমালি পায়ে পায়ে গোয়ালঘরে ঢুকল কিন্তু সেখানে অপরিমিত অন্ধকার ছাড়া প্রথমে আর কিছুই ছিল না। তারপরে মুমূর্ষু গাইটা ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে অন্ধকারকে সচকিত করে দেয়। করমালির চোখে তারারা কেঁপে উঠলে সে অন্ধকারকে ফিকে হতে দেখে। একটু দেরি করতেই সেই ফিকে অন্ধকারের মধ্যে বিশাল ছায়ার মতো মৃত গোরুটি ভেসে ওঠে—ঘাড় তেমনি একদিকে কাৎ করা, পাগুলো ছড়িয়ে পড়া—তেমনি করুণ অসহায় হয়ে সে মাটিকে আশ্রয় করে অন্ধকারে দুলছে। একটু বাতাস দিতেই করমালির মনে হলো পালকের মতো হালকা ছায়াটা শূন্যে দুলে উঠল এবং চোখের ওপরেই ক্রমাগত কাঁপতে থাকল। কিন্তু হাওয়া বন্ধ হতেই সে আবার মাটিতে নামে, সুস্থির হয়ে শুয়ে থাকে। করমালি তখন তার পাশে মাটিতে বসে পড়ে। হাত বাড়িয়ে তার শঙ্খের মতো সাদা কোমল গলায় হাত রাখে আর সান্ত্বনাহীন কান্না কাঁদে। এইভাবে তার চোখ অন্ধকার হয়ে গেলে ছায়াটা আবার হারিয়ে যায়। তখন পিছনে দরজার ওপর লাল আলো এসে পড়ে এবং গাঢ় নীল রঙের শাড়ি-পরা রহমালির মাকে দেখা যায়। তার হাতের কুপি থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এবং সে কুপিটাকে উঁচু করে ধরা গোরু আর করমালিকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছে। তার শীর্ণ তোবড়ানো মুখ লালচে আলোয় প্রায় বীভৎস হয়ে উঠেছে। নগ্ন চোখদুটো কপালের বাইরে চলে আসতে চাইছে। কিন্তু যেভাবে তার কুপি-ধরা হাত উঁচু হয়ে আছে, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ থেকে বিনত মায়াবী দৃষ্টি চেয়ে আছে তাতে করমালি সরাসরি ভেঙ্গে পড়ে—কী করব কতি পারো রহমের মা? আমি এ্যাহন কী করব?

কাঁদলি বাঁচপে?

না।

তবে কাঁদতিছ ক্যানো?

আমি কী করব বুঝতি পারতিছিনে।

গুমোট গরমের দিনে ঝিরঝির বৃষ্টির মতো রহমালির মা সেই অদ্ভুত প্রস্তাব করে, আমারে দিয়ে হয় না? কও। আমি তো দেহিছি দামড়া না থাকলি দুধের গাই দিয়ে আবাদ করিছ জমি। এ্যাহন আমারে দিয়ে পারবা না? রহমালিকে পেটে ধরিছি—তোমার সংসার টানতিছি এতদিন। আমি পারবানে—দেহো তুমি।

করমালির চোখ এখন শুকিয়ে গেছে এবং সে আশ্চর্য বিব্রত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে

চেয়ে আছে।

সকালের উজ্জ্বল রোদে তাকে বের করে পোড়ো মাঠে রেখে আসা হলো। দশ মিনিটের মধ্যে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়ে যেতে সে টকটকে লাল হয়ে একস্তূপ আগুনের মতো জ্বলছিল। করমালি সেখান থেকে সোজা তার গতকালকের জমিতে এসে পৌঁছুল। বিল এইসময় সবকিছু পালটে মোহময় হাসছিল। কারণ সূর্যের আলো লম্বালম্বি তার উপর পড়ায় কালো পানির ওপর ধবধবে শাদা ফিতের মতো রেখা শুয়ে ছিল এবং সেটাকে সত্যিকার কোনো মাছের পিঠ বলে মনে হচ্ছিল, আর যেখানে সূর্যের আলো শেষ হয়ে সূর্যটাই বিম্বিত, সেখানে গলিত রুপোর মতো অপরিমেয় পানি অল্প বাতাসে শিরশির করে কাঁপছিল। সেদিক চেয়ে করমালির চোখ অস্বস্তিতে করকর করলেও সে বারবার ঐ রুপোরাশির দিকে তাকাতে চাইছিল। কিন্তু কষ্ট অসহ্য হচ্ছিল। তাই সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে করমালি ছোট ধানের চারাভর্তি সবুজ টুকরো টুকরো জমিগুলোর দিকে চাইল। বিশেষ করে বিলের মধ্যে তার নিজস্ব যে একটুকরো জমিতে এখন বিঘতখানেক উঁচু ধান মাঝে মাঝে বাতাসে নেচে নেচে উঠছিল, সেদিকে তার অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হলো। সে একই সঙ্গে রহমালি আর তার মায়ের কথাও চিন্তা করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে সে বিল এবং বিল-সংলগ্ন গ্রামগুলো এবং হাটবাজার সবকিছু কল্পনায় ঘুরে এল। রবিবারের হাটে অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করছিল। এই ভিড়ে করমালি দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যদিন যে পোড়ো জমিটা ভাগাড়ের মতো নির্জন হয়ে থাকে—কাক বা চিল ছোটখাটো হাড় কিংবা অন্যকিছু নোংরা জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে, মরা বিড়েল বা কুকুরের ওপর শকুন এসে বসে এবং পত্রহীন শিমুলগাছে কিছু কিছু ঘুঘু এসে দুপুরের ক্লান্তিতে ডাকতে থাকে—সেখানে এখন সাদা কালো এবং আরো অনেক বর্ণের অনেক আকারের অগুণতি গোরু মাথা ঝুঁকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বড় বড় কান খাড়া হয়ে উঠছে কখনো, লেজ নাড়ার সপ সপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। শরীরের অংশবিশেষের চামড়া কাঁপিয়ে ছোট কালো রঙের মাছি তাড়াতে দেখা যাচ্ছে তাদের। করমালি বিলের প্রান্তে তার অসমাপ্ত ঝোপজঙ্গল ভরা পগারের মতো উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দালালদের ঘোরাফেরা যেন দেখতে পাচ্ছিল এবং দরাদরি করার চিৎকারও শুনতে পাচ্ছিল। এইসময় রহমালি কথা বললে সে চমকে ওঠে। রহমালি বলছিল, বাজান, আজ জমি সবডা সাফ না করতি পারলি এবার আবাদ করতি পারবা না।

বিলের পানি কী এ-পর্যন্ত আসবেনে? করমালি জিজ্ঞেস করে। আসতিও

পারে—মোড়ে বর্ষা শুরু হইছে, বিষ্টি তো আশ্বিন মাস পর্যন্ত হবেনে। করমালি নারকেল গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখানে সে নামহীন লতাপাতা ঘাস কাঁটাগাছ ইত্যাদির জঙ্গলের সঙ্গে সেই বলিষ্ঠ প্রাচীন প্রাণীটিকে খুঁজতে থাকে। কালো মাটির খাঁজে খাঁজে পানি জমে আছে, তারা সূর্যকে বুকে নিয়ে ঝিকমিক করছে। মাটির মতো প্রবীণ, অসংখ্য সময়ের মধ্যে দিয়ে অফুরানভাবে চলে চলে যে বয়েসের ভারে পৃথিবীর মতো শক্তিশালী হয়ে গেছে এবং যার ওপর এখন সময় ধীর হাতে শ্যাওলার আস্তরণ পড়ায় সেই অমিত বলশালী অজেয় সর্প-টিকে করমালি খুঁজছিল। সে ভালো করেই জানত এখন তাকে না পাওয়া গেলেও যে-কোনো সময়ে এবং যে-কোনো জায়গায় তার আবির্ভাব ঘটতে পারে। কারণ যে সময়ের নিত্যসঙ্গী তাকে বারবার ফিরে পাওয়া যেতে পারে এবং বারবার হারানোও যেতে পারে। সময়ের সঙ্গে মিশে আছে বলে সে অস্তিত্বে আছে, আবার সে চেতনা এবং অবচেতনাতেও একইসাথে ক্রিয়াশীল। কাজেই তাকে অতিক্রম করা যায় না, যদিও এই নির্দিষ্ট যে তোমাকে তারই সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে এবং পরাজয়ের হাতে বারবার আঘাত খেয়েও তোমাকে নতুন করে নতুন কৌশলে ও দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত অস্ত্র তীক্ষ্ণধার করে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই ব্যাপারের সঙ্গে কাজেই মৃত্যুর প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। সম্ভবত তুমি মৃত্যুতেও তারই কাছে প্রত্যাবর্তন করে থাকো। মৃত্যু দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয় এবং এই কারণেই বান এলে, জমিতে নোনাপানি ঢুকলে, সাপে কাটলে, বজ্রপাত হলে, মালিক জমি কেড়ে নিলে তোমার তার কথাই পৌনঃপুনিক মনে হয়। এবং জীবন্তেরও এইকথা মনে হয়, কারণ জীবনেও সে আদিঅন্তহীন। জীবনের প্রবাহের সঙ্গেই সে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে।

করমালি একেমনে কাজ করছিল। তার শীর্ণ হাতের পেশিগুলো তখন যেন আর মাংসের ছিল না। আদতে সেগুলিকে দেখাচ্ছিল নীলচে ইস্পাতের মতো—কারণ করমালির রং কুচকুচে কালো এবং সে প্রচুর পরিমাণে ঘামছিল বলে রোদ তার শরীর থেকে পিছলে পিছলে পড়ছিল। যেহেতু আজ আকাশে মেঘের কণা-মাত্রও ছিল না অথচ গতকাল প্রায় সারাদিনই বর্ষণ হয়ে গেছে এবং বাতাসে আর্দ্রতা আছে প্রচুর পরিমাণে, এজন্যে মাটি থেকে গরম বাষ্প উঠছিল। গুমোট গরমের অন্ত ছিল না। রহমালি তাই প্রায়ই ঝোপের আড়ালে বিড়ি খাবার ছল করে বিশ্রাম নিতে চাইছিল। বিলের পশ্চিম দিকের রুপোর থনিটা অনেকক্ষণ আগেই মাঝখানে চলে এসেছিল। এখন সেটা আস্তে আস্তে পূর্বদিকে ওদের

কাছাকাছি আসছে। করমালি নারকেল গাছের নিচের সামান্য ছায়াটুকুতে দাঁড়িয়ে কোদালের লম্বা বাঁটটা তলপেটে ঠেকিয়ে দম নিচ্ছিল। জমিটার প্রায় সমস্ত জঙ্গলই পরিষ্কার হয়ে গেছে। রহমালি কাটা জঙ্গলগুলো জমির চারপাশে সাজিয়ে ফেলেছে এবং কিছুটা অংশে কোদাল চালিয়ে প্রায় ছ'আঙুল পরিমাণ মাটি উল্টিয়ে চিৎ করে দিতে পেরেছে। করমালি এখন খিদে ও পিপাসায় দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিল না। তবু তাকে ভাবতে হচ্ছিল কী কী করতে পারে সে। প্রথমত এই নতুন তৈরি জমি থেকে ধান পাওয়ার আশা এ-বছর কোনোমতেই করা চলে না এবং দ্বিতীয়ত তার নিজের জমি থেকে বারো-চোদ্দ মণের বেশি ধান পাওয়া যেতে পারে না। এইজন্যে জমিগুলো তাকে রাখতেই হবে। কিন্তু কীভাবে রাখা যায় কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না করমালি। বাপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রহমালি ভাবল এখন করমালি নিশ্চয়ই একটা বিড়ি খেতে চাইবে। তাই সে কোঁচড় থেকে বিড়ি দেশলাই নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়। করমালি রহমালির দিকেই চেয়ে ছিল এবং তার দিকে চাইতে গিয়ে চোখে রোদ পড়ছিল বলে যখন সে কপালের ওপর হাত দিয়ে আড়াল করেছিল চোখদুটোকে, তখনই তার চোখের ছায়ার নিচে জমিটার একটেরে ছোট্ট শীতল খাঁড়িটার গোখরোটিকে শুয়ে থাকতে দেখতে পেল। আজ তার উজ্জ্বল রং মেটে মেটে দেখাচ্ছিল, তার ওপর লতাপাতা বাতাসে ঈষৎ কাঁপছিল। তাই রোদ এবং ছায়া সেখানে পাশাপাশি খেলা করছিল। এই-জন্যে আজ করমালির তাকে বিচিত্র আঁককাটা অজানা একটি প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বা বোধহয় দেখার আগেই করমালি চিনতে একটু দেরি করেনি। এইভাবে শুয়ে শুয়ে সে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তার আদি সম্পর্কে ফিরে গিয়েছিল। রহমালি কাছে আসতে করমালি আপন নিয়তিকে দেখানোর মতো আঙুল উঁচিয়ে তাকে দেখাল। সে যেন নিজের কপালের অদৃশ্য জটিল অক্ষরগুলো নির্বিকারভাবে রহমালিকে দেখাতে চাইল। রহমালি প্রথমে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা জীবটিকে দেখতে পাচ্ছিল না। তারপরে যখন সে তার চোখে পড়ল তার সমস্ত শরীর সামান্য সময়ের জন্যে কেঁপে শক্ত হয়ে এল। কিন্তু এই অবস্থাটা থাকল অত্যন্ত অল্পসময়ের জন্যে। বয়সের এবং মানসিক পরিণতির সোজা প্রমাণ হিসেবে যে কঠিন ভোঁতা ধৈর্য তার কপালে এবং চিবুকে, অল্প গজিয়ে ওঠা দাড়িগোঁফে এবং ঠোঁটের রেখায় দানা বেঁধে উঠ-ছিল এবং একটি নির্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি জীবনের বাসিন্দা হিসেবে স্থপতির মতো দক্ষ-তার সঙ্গে জীবনব্যবস্থা যে-কঠিন ও শান্ত, বিমর্ষ ও কৌতুকবিমুখ সংগ্রামপরায়ণতা

তার সর্বঅবয়বে গেঁথে গেঁথে দিচ্ছিল সে-সমস্তই মুহূর্তে ঝরে যায়। কাজেই বিপুল অভিজ্ঞতার গ্রন্থিতে আবদ্ধ যে-করমালির চেতনা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে জীবনের অবশ্য-ঘটনীয়কে গ্রহণ করতে পারে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে রহমালি বাল্যে ফিরে যায়। ঝরনার মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে তার শরীর। কৌতুকে কাঁপে চোখের তারা। অনভিজ্ঞ শিশু-ঘোটকের মতো উদ্দাম দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে সে। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সমস্ত পারম্পর্য সে হারিয়ে ফেলে এবং অবিমৃষ্যকারীর মতো ছুটে গিয়ে তার কোদালটা নিয়ে ফিরে আসে। এ-সমস্ত করতে থাকল সে যতক্ষণ, করমালি নির্বিকার দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ করে। সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল যে রোমাঞ্চকর কোনোকিছুই ঘটতে পারে না। তবে শোচনীয় শোকাবহ কিছু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু সে-সম্ভাবনাতেও বিচলিত বোধ করে না করমালি—কারণ তা যদি ঘটেই তবে তার শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। কাল যখন তার সঙ্গে দেখা হলো তখন থেকে। হতে পারে তারও আগে থেকে, তার চেতনায় সমস্ত জীবন ধরে। জীবনের কুটিল কষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে নিজেকে টিকিয়ে রাখার মধ্যে। এইভাবে জীবনের শুরুতেই—অন্ধকার, খিদে, বাসনা, দলিত কান্নাসমূহ, শূন্যতার গহ্বর, জমি, মাটি, বিল, লোকালয়, মানুষ—এই সমস্ত ক্রমের ধাপে ধাপে সেই আরম্ভ চলে আসছে—গতকালের করুণ মৃত্যুতে সে ছিল, হয়তো এখনো কোনো নতুন মৃত্যুতে সে থাকবে।

রহমালি পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে। তার শরীর ফুলে উঠেছে। পেশি দৃঢ় হয়েছে। দু'হাতে কোদালটাকে উঁচিয়ে মাথার ওপর তুলে সে এখন তার একান্ত কাছে হাজির হয়েছে। কিন্তু সে ঠিক তেমনি করে নিথর শুয়ে। করমালি এদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বিলের দিকে তাকাল। এক্ষুনি বাড়ি যেতে হয় যে! দ্রুত বিকেল নেমে আসছিল। রহমালি তাকে এখন নাগালের মধ্যে পেয়েছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ স্থির করছে। তারপর নীলচে আলোর ঝলকানির সঙ্গে কোদাল পড়ল। মাটিতে কোপ পড়ার সময়ের মধ্যে কানে তালা লাগার মতো প্রচণ্ড গর্জন এল—হিস-স-স! বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত কর্মক্ষম গোক্ষরোটি লেজের ওপর ভর দিয়ে বিশাল ফণা তুলে রহমালির প্রায় মাথার ওপর দুলতে লাগল। ঠাণ্ডা ধারালো চোখে সে রহমালিকে নিরীক্ষণ করল একটু। তারপর মাথা নামিয়ে একসময়ে অদৃশ্য হলো।

বিস্মিত ভীত করুণ ছেলেটা দাঁড়িয়ে। করমালি কাছে এসে বলছে, কেউ মরতি পারে না। ওরে মারা যায় না কোনোদিন।

ব্যাপারটা এইভাবেই ঘটল। রহমালি ফিরে এসে তার মাকে আশ্চর্য সাপটার কথা বলল এবং খেয়ে নিয়ে সকলের বাড়ি বাড়ি কাহিনীটাকে সবিস্তারে বর্ণনা করার জন্যে বেরিয়ে গেল। সে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে কীভাবে বিষয়টার অবতারণা করেছিল কে জানে। হয়তো একটা জলচৌকি বা চ্যাটাই টেনে নিয়ে বসে পড়ে কিংবা মানুষটাকে উঠোনের একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু যা সে মুখে বলেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বলছিল তার বিস্মিত চোখের সমস্ত চাউনি, তার হাতের সমুদ্যত মুদ্রা। সাপটার বর্ণনা দেবার সময় সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, চোখের তাবা কৌতুকে ভয়ে নাচিয়ে তার বিশাল আকৃতির মেটে রঙের ফণা, তার বিদ্যুতের মতো গতি, নিষ্ঠুর ক্রোধ, সীমা-হীন শক্তি আর অপার দয়ার প্রসঙ্গ ক্লান্তিহীনভাবে টেনে আনছিল। চেষ্টা করছিল বর্ণনাটা যাতে সঠিক ও জীবন্ত হয়। এখনো সময় এবং পারিপার্শ্বিকের কথাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল সে। সূর্য, আকাশ, বিল, ধানের জমি, দুপুরের রোদ-ছায়া-ময় বনভূমি এবং অল্প কাঁপতে থাকা অতল জলরাশি ইত্যাদি সবকিছুই এক অদ্ভুত গ্রাম্যভাষায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল তার কাহিনীব সঙ্গে সঙ্গে। এইরকম অবিশ্বাস্য তৎপরতার ফলে সম্ভবত সন্ধ্যার আগেই সাপটি গ্রামটিকে তার বিশাল শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছিল, কারণ এইভাবেই কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে নিশ্চিন্তভাবে কাজ করার রীতি তার। সে অত্যন্ত ধীর গতিতে পৃথিবীর বয়েসী গ্রামচেতনায় উপস্থিত হতে জানত, কারণ গ্রামবাসী তার মধ্যেই সংগ্রাম করত, বাঁচত এবং মরত। এজন্যে কখনো সে তাদের তৈরি হতে দিত, কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ত অতর্কিতে। এখন রাত্রি আসতে-না-আসতে সে প্রতিটি মানুষের চেতনায় হাজির হলো। তখন তারা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হয়ে কেবলমাত্র তাদের সংকল্পকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকে, তাদের চেতনাকে বল্লমের ফলার মতো তীক্ষ্ণ করে নিয়ে আসে এবং সকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে একসঙ্গে মাঠের কাজে বেরোয়, দিনমজুরের কাজে যায়, যেভাবে একসূত্রে বাঁধা থেকে যাবতীয় সংস্কারের পরিচর্যা করে, গ্রামীন জীবনের আদিমতাকে টিকিয়ে রাখে, লাঙল, গোরু হাতিয়ার ইত্যাদির বিবর্তন ঘটতে দেয় না। ঠিক একইরকম জোট বাঁধার নমুনায় তারা করমালি এবং রহমালিকে বাড়ি থেকে জমির দিকে ডেকে নিয়ে যায়। দেরি করলি চলবে নানে—ওডারে শ্যাষ করে যে যার কাজে যাবানে। বাড়ির পাশে ও-কাল রাখা কাজের কথা না বুজিচো? এইকথায় প্রত্যেকে নীরব থেকে নিজের নিজের হাতিয়ারের দিকে মনোনিবেশ করে। এই দলে প্রবীণদের অনেকেই আসেনি

এবং যুবকদের চাইতে কিশোর এবং বালক ছিল সংখ্যায় অনেক ভারী। প্রবীণরা হয়তো করমালির মতো ব্যাপারটার নিরর্থকতা বুঝতে পেরেছিল। হঠাৎ ট্যানা দলের মাঝখানে থেকে লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল, তাহলি এডাই তোমার গোরুডা কাটিছে। করমালি ভাবল যদি সে ইচ্ছা করে থাকে তাহলে হয়তো তাই কিন্তু সে-কথায় নকিব রকিব সরদারদের দু'ভাই, রউফ জমাদার, সাবু মণ্ডল, অজেদ বিশ্বাসরা সবাই একটু সময়ের জন্যে কেঁপে উঠল।

মনের পিছনে যতক্ষণ সে আবহসঙ্গীতের মতো ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছিল, ততক্ষণে তারা বর্ষা, বিল, জমি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এইসব প্রসঙ্গ তাদের জীবনের অনুষঙ্গ। আর এইসব কথা তাদের মনে যেমন অনুরণন তুলত তেমন আর কিছুতেই না। কারণ তাদের বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা এসব কথা বার-বার বলে যেত এবং সেজন্যেই সেগুলো গ্রামের পথে, তেঁতুলতলার অন্ধকারে, শানবাঁধানো পুকুরের ঘাটে, সর্বত্র, ওদের ঘরেবাইরে মিশে ছিল এবং বহু বহু বছরের এই দ্রবণের ফলেই তারা নতুন কিছু ভাবতে পারত না, অভিনব বিষয় ও বাক্য ব্যবহার করতে পারত না। কাজেই চাষবাস, ভাগে আবাদ, দুঃখকষ্ট, অনটন, বিধিলিপি, হাটবাজার, ফসল ইত্যাদির আলোচনায় দলটা মগ্ন হয়েছিল এত বেশি যে, জমিতে না পৌঁছুনো পর্যন্ত তারা তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু জমিতে পৌঁছেই একটিমাত্র সংকল্পের সূত্রে একসঙ্গে বাঁধা পড়ে তারা যাবতীয় বিষয় নয় শুধু, পরস্পরকেও ভুলে যাচ্ছিল। এ-থেকেই বোঝা যায় তার প্রভাব কত গভীর ছিল ওদের মনে। জমিতে নেমে তারা সৈন্য-বাহিনীর মতো মার্চ করে এগিয়ে গে :, জমিখণ্ডটিকে কয়েকবার পারাপার করল। কিন্তু তাকে কোথাও পেল না। তারা তীক্ষ্ণ চোখে ছোট ছোট নালাগুলোর দিকে চেয়ে দেখেছিল। পরিষ্কার জায়গাটা বারবার পরীক্ষা করছিল, তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখা যায় কিনা পরখ করার জন্যে। যে-ঝোপঝাড়গুলো এখনো কেটে ফেলা হয়নি, সেখানে সে ছায়ার মধ্যে বিশ্রাম করতে পারে ভেবে তারা লতাপাতা সাবধানে ফাঁক করে ঝরাপাতাভর্তি কালো মাটির মেঝের উঁকি দিচ্ছিল আর ছেলেরা একনাগাড়ে জমির চারপাশের কাটা জঙ্গলগুলোর ওপর লাঠি চালাচ্ছিল যাতে যদি সে লুকিয়ে থাকে, বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কথাবার্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে একাগ্র মনে হারানো ধনের মতো তাকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এইভাবে খুঁজতে গিয়েই ক্রমে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, বিশৃঙ্খলা দেখা দিল তাদের মধ্যে। আলাদা হয়ে গিয়ে কখনো তারা

তার ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, কখনো এখানে এইসময়ে উপস্থিত হবার কারণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে চমকে উঠছিল। সবাই যখন এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, করমালি তার কোদাল হাতে নিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দলের বিচ্ছিন্নতা চূড়ান্ত হয়ে এলে, কেউ জমির বাইরে গিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকলে, বালকরা অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়ে খেলা শুরু করলে এবং প্রত্যেকে নিজের সত্তায় ডুব মেবে একদম পৃথক হয়ে গেলে শূন্য থেকে স্তম্ভের মতো একটা ঘূর্ণি বাতাস গর্জন করে নিচে নেমে এল। তখন তাকে দেখা গেল। পিছনে ছায়াময় অন্ধকার গ্রামের পটভূমিতে বিপুল বিলকে সামনে ধারণ করে তার আজকের তেজস্বী ছিমছাম স্বর্ণবর্ণের শরীর অপূর্ব ভঙ্গিতে ওদের আহ্বান করছিল। আর তার চোখের দিকে চেয়ে, তার সাবলীল দুলুনিতে পিপাসার্ত সঙ্গীত রসিকের মতো সেইসব যুবক, প্রৌঢ় এবং বালক হাতিয়ার হাতে রেখে তার দিকে এগিয়ে আসছিল এবং তাকে ঘিরে ফেলে নিবিষ্টমনে লক্ষ করছিল। সেইসময় করমালি দেখছিল পশ্চিম আকাশে দ্রুত একখণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দিচ্ছে বিল তার বুকের ভিতর থেকে। মুহূর্তে কালো মেঘখণ্ডটি সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ল আর যেমন হয়ে থাকে, সজল ছায়া পৃথিবীর ওপর নেমে এল, দর্পণের মতো স্থির হয়ে এল সীসে রঙের অজস্র জলরাশি আর বদলে গেল সাপটির উজ্জল রঙ। তাকে মাটির মতো কালো দেখাল এবং সে তার হালকা তারুণ্য পরিহার করে বিকট বৃহদাকার হয়ে উঠল তখন—বয়সে সময়ের সাথী এবং ওজনে অকল্পনীয়। তখন করমালি চোখ বন্ধ করল। কারণ তার বিশালতার দিকে বিপুল ফণা এবং শাদা গোক্ষুরটির দিকে আর তাকানো যাচ্ছিল না। সে চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে শব্দ উঠল—বোঁ-ও-ও-হিস। পরমুহূর্তেই নিঃশব্দের কালো ভারী যবনিকা পড়ে। চোখ চেয়ে এখন সে দেখল চোদ্দ বছরের ফর্মা মিষ্টি ছেলে সাদেক তার দেহের ভারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আহা—তার হাতে শীর্ণ কঞ্চিটা এখনো ধরা। তার সরল পা সিধে মেলা। তার গলার কাছে ক্ষীণ কালো রক্তের ধারা। তাকে ধূলিসাৎ করে সে এখন ফণা গুটিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। তার দেহের ওপর ক্রুদ্ধ সবল হাতের লাঠির আঘাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে। তার সঙ্গে শেষ মোকাবিলার জন্যে করমালি অটল প্রতিজ্ঞায় ওর কাছে যায়, দৃঢ় হাতে তার শরীরের মাঝ বরাবর কোপ মারে। মুহূর্তে গতি বাড়িয়ে কিন্তু করমালিকে একেবারে হতাশ না করে, যেন দয়া এবং স্নেহবশত সে তাকে তার লেজের দিক থেকে আঙুল পরিমাণ দেহ

উপহার দিয়ে যায়।

বিকেলে করমালি একাই গিয়েছিল। রহমালিকে সঙ্গে নিতে সাহস হলো না তার। তবে গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল অতিসহজে। লোকটাকে রাজি করাতে করমালি শুধু বলল, আমার জমিডা তো দেহিছেন। বিলির ওদিকি এমন জমি আর আছে কন দেহি।

করমালি তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, জমিডা ব্যাচপো না আমি। ঐটুকু জমিই আছে আমার—বেচলি থাকপে কী? ব্যাচপো না আমি। আপনে শতিনেক ট্যাহা দিয়ে রাখে দ্যান জমিডা। ফসলডাও আপনার। মাঘমাসে আপনার ট্যাহা দিয়ে দলিল ফেরত নিয়ে নেবানে।

লোকটা সব বুঝে বলল, ট্যাহা নিয়ে কী করবি? জমি দিলি আর কী ট্যাহা শুধতি পারবি?

ট্যাহা না নিলি আপনের জমি রাখপো কী করে? গোরু এ্যাট্টা কিনতি হবে। আপনের জমি আবাদ না করলি তো চলবে না।

এরপর দু-একমিনিটের মধ্যে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। করমালি কাজেই খুশিমনে ফিরে আসছিল। সে রাস্তায় নামতেই বৃষ্টি এল। বৃষ্টি নামল ঘন হয়ে। বৃষ্টির মধ্যেই সে রহমালিকে মনে মনে গাল দিচ্ছিল চিৎকার করে, হারামজাদা, আমার জমি আমি বেচতিছি, তোর বাপের কি—আঁ? শ্যাষ জমিডাও গেল? গেল তো গেল। কী করবানে? গোরু না কিনলি, ভাগে জমি আবাদ করতি না পারলি কলা চোষবা সারা বছর? হারামজাদা। তারপর বৃষ্টিতে করমালি আগাগোড়া ভিজে গেল। এত বেশি ভিজে গেল যে, মনটাও তার নরম হয়ে এল। সে তখন বৃষ্টির শব্দের মধ্যে, আকাশের গর্জনের মধ্যে, বাতাসের স্বননের মধ্যে বলল, বাজান, আমার বাজান, রাগ করিসনি। জমি তো বেচিনি। মাঘমাসে ট্যাহা কডা দিয়ে তোর জমি এনে দেবানে। বৃষ্টি খুব বেশি হচ্ছিল বলে করমালির চোখের পানি কিছুতেই দাঁড়াতে পারছিল না, ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছিল। এইসময় বিল চোখে পড়ল। দূরে সে তখন বৃষ্টির মধ্যে টগবগ করে ফুটছিল। আকাশ ও পৃথিবীকে একাকার করে দিয়ে বিরাট অগ্ন্যুদ্গীরণের জন্যে জ্বালাময় সীসে রঙের ধোঁয়ার পাহাড় তৈরি করছিল বারবার। করমালি তার বাড়ির বাইরে খড়ের গাদার কাছে নারকেল গাছের নিচে এসে পৌঁছুল। রহমালি দেখতে পাচ্ছিল করমালি ভীষণ ভিজে, যেন দু'হাত দিয়ে বৃষ্টি সরাতে সরাতে রাস্তা থেকে উঠে নারকেল গাছটার দিকে এগিয়ে আসছে। সেইসময় কটকটে

শাদা তীব্র আলো ঝলকে উঠল। এবং বেশ একটু পরে পাহাড় বিদীর্ণ হওয়ার মতো হিংস্র আওয়াজ উঠে বিলের দিকে চলে গেল গমগম করে।

করমালি খড়ের গাদার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি-ভ্রূ, চোখের পাপড়ি ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে কদাকার কিম্ভূত দেখাচ্ছে তাকে। রহমালি বাড়ির বাইরে এসে তাকে বুকে করে বৃষ্টির মধ্যে সবল পায়ে অশ্রুহীন চোখে ভিতরে নিয়ে গিয়ে পরম যত্নে দাওয়ায় শুইয়ে দিয়েছে।

বৃষ্টি এখন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল।

শোণিত সেতু

গাঁয়ের পুবদিকের ঢালুতে গত তিনদিন থেকে একটা ভীষণ কাণ্ড চলেছে। দুটি ষাঁড় লড়াইয়ে নেমেছে। যোদ্ধা দুটির একটির রং ধবধবে সাদা, কালো চুলঅলা চামরের মতো পরিচ্ছন্ন লম্বা লেজ, উঁচু খাড়া কুকুদ। এটি বিরাট আকারের, ঘাড়ের দিকটা সরু, পাগুলোও তাই, কুচকুচে কালো দুই চোখ। নিবাস এই গ্রামেই। আর একটি বিদেশি—কোথা থেকে এসেছে ঠিক বলা যাচ্ছে না—ধোঁয়াটে রং, বেঁটেখাটো শক্ত বাঁধুনি, ছোট ছোট পা, ভীষণ মোটা গর্দান, চোখের রং ধোঁয়াটে, ছাই ছাই, নিচে কাজল পরানো। ভুরুর নিচে তিন-চারটে করে বলিরেখা। দেখেই মনে হয় বদমেজাজি আর কুচুটে স্বভাবের। প্রায় সকলেই এইরকম মত দিয়েছে যে লড়াইটা বাঁধিয়েছে ঐ বাঁটকুলটা। এ-গাঁয়ের সাদা ষাঁড়টা নাকি ভারী লক্ষ্মী! ষাঁড় হলেও।

ব্যাপারটার শুরু এইভাবে।

ভোরের দিকে বেড়া ভাঙার মতো মড়মড় শব্দে মালেক মোড়লের ঘুম ভেঙে গেল। প্রায় তখুনি সে ধরে নেয় যে বেগুনগাছগুলো শেষ হয়ে গেছে এবং শেষ করে গেছে সাদা ষাঁড়টাই। ধর্মের ষাঁড় বলে কেউ তাকে কিছু বলে না। তাছাড়া বিবেচনা করে দেখলে সে অতি শিষ্ট ও ভদ্রস্বভাবেরও বটে। তবে গোজন্ম টিঁকিয়ে রাখতে গেলে খাদ্যগ্রহণও তো করতে হয়। মালেক মোড়ল হুড়কো হাতে বেরিয়ে গেল। হুড়কো নেওয়া হয়েছিল ওটাকে ভয় দেখানোর জন্যে—পেটানোর জন্যে নয়। এমন আদুরে স্বভাব ওর যে কিল-চড়-ঘুষি যাই চলুক না কেন ইচ্ছে হলে দাঁড়িয়ে থাকবে কিংবা বসেই থাকবে বা যা খাচ্ছিল খেয়েই যাবে। মালেকের যাওয়াটা বৃথা হলো—সমস্ত ক্ষেতটিকে বিধ্বস্ত করে চটকে বেড়া উপড়ে ফেলে দিয়ে সে তখন বড় মাঠাম গাছটায় শিং চুলকোচ্ছিল, হুড়কো হাতে মালেককে আসতে দেখে ষাঁড়েন্দ্রগমনে পুবদিকের খামারে ঝোপের মধ্যে ঢুকল। মালেক ফিরে আসছিল আর-একটু গড়িয়ে নেবার জন্যে, এই সময়ে মেঘরঙা বীরটিকে পগারের ঢালু গায়ে দেখা গেল। মালেক খুবই অবাক হয়ে গেল—কারণ ইতিপূর্বে কখনো

সে দেখেনি ষাঁড়টিকে এবং তার গলায় দড়ি দেখে সহজেই অনুমান করে নিতে পারল যে অন্য কোথাও থেকে সে আবির্ভূত হয়েছে। এরপরেই যা ঘটল সেটার জন্যে মালেক ঠিক তৈরি ছিল না। এ-গাঁয়ের সাদা ষাঁড়টি যেন প্রাতঃব্যায়ামের জন্যেই হালকা মেজাজে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে কয়েকটা লাফ দিয়ে ঝোপের বাইরে চলে এল। এবং সোজা পরদেশিটির মুখোমুখি। একটু হকচকিয়ে গেল সাদাটা —কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে সে সম্রাটোচিত ভঙ্গিতে ওটার দিকে চেয়ে পরখ করতে লাগল। ছাই রঙেরটা একবার তাকাল মাত্র—তারপরই আস্ত গোঁয়ারের মতো ঘাড় নামাল। মালেক বলল, এই রে! বলে হুড়কো বাগিয়ে ধরল।

বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল একেবারে সকালবেলাতেই সমরে প্রবৃত্ত হতে এ-গাঁয়ের রাজাধিরাজের একটুও ইচ্ছে ছিল না। সে পিছিয়ে এসে একবার অবজ্ঞার সঙ্গে বহিরাগত বর্বরটির দিকে চেয়ে স্থানত্যাগের উপক্রম করল। ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল ছাই রঙেরটি, তার মোটা ঘাড় আরো মোটা হয়ে এল যেহেতু সে মাথা প্রায় মাটিতে নামিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থাতেই পেট খালি করে আরো একবার গর্জে উঠল সে, তারপর মাথা তুলে লেজ খাড়া করে শত্রুর পিছনে পিছনে চলতে শুরু করল। সাদা ষাঁড়টি (তাকে মানিক নামে ডাকা হয়) একবারও ফিরে তাকাল না পশ্চাদ্ধাবনরত বৈরীর (ধরা যাক তার নাম অবলাকান্ত, যদিও নামটা ঠিক মানানসই হলো না—তবে অর্থবহ নিশ্চয়ই) দিকে। অবলা ফুট পাঁচেক ব্যবধান রেখে চলতেই থাকে এবং এইভাবেই ওরা রাস্তায় এসে হাজির হয়। হঠাৎ, একেবারে আকস্মিকভাবে এইবার মানিক, সম্ভবত অত্যন্ত উপদ্রুত এবং বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরেই অবলাকান্তের পাঁজরায় এমন সাংঘাতিক একটা গুঁতো দিল আর তেমনি করেই ওকে এমনভাবে ঠেলতে শুরু করল যে অবলার নেহাৎ চারটে পা ছিল—না হলে অত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হতো না। মানিক তাকে ঠেলতে ঠেলতে পগারের দিকে—ঢালু জমিটার উপরের দিকে নিয়ে চলল। মালেক দেখল নতুন ষাঁড়টার কুকুদের ঠিক নিচে গোল কালচে রঙের ফুটো থেকে টকটকে লাল রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে। সে হুড়কো নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল এবং এই সর্বপ্রথম মানিক ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার দিকে তাকাল মাত্র। মালেক তার চোখে কী দেখল সে-ই জানে; সেখানেই হুড়কো ফেলে একটা দৌড়ে নিজের ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। এবং বাড়ির ভিতরে চলে গেল। এরা ইতিমধ্যে পরস্পরকে ছেড়ে দিয়েছে, সরে গেছে

একজন পগারের উত্তর দিকে আর একজন দক্ষিণ দিকে আর দুজনেই নরম মাটিতে খুর আঁচড়াচ্ছে। কালো রঙের ঝুরঝুরে মাটি ছিটকে উঠছে চারিদিকে। মানিক ঘাড় নামিয়ে তৈরি হলো, তার বিশাল দেহ ফুলে উঠল, লেজ উঁচু হয়ে গেল, সুন্দর আকারের কুচকুচে কালো শিং দুটির উপর সূর্যের আলো পড়ল। ছাই রঙের অবলার ঘাড়ে ভাঁজ পড়ল অসংখ্য—বলশালী মহীরুহের গুঁড়ির মতো দেখাতে লাগল তার ঘাড়। এরপরেই ওদের শিংগুলি খটাখট শব্দে আটকে গেল। দুজনেরই মাথা নামানো—নাক প্রায় মাটিতে—জোর নিঃশ্বাসের বাতাসে আশে-পাশের ঘাস কাঁপছে। অবলাকান্তের চোখের উপরের বলিরেখা সংখ্যায় আরো বেশি হয়ে গেল।

লড়াই শুরু হলো।

ডাক্তারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। নিশানাথ এমনিতেই মারা যাচ্ছিল। কিন্তু তার আত্মীয়স্বজন সম্ভবত তাতে স্বস্তি পাচ্ছিল না। কারণ নিশানাথের হাঁপানি হয়েছে আজ বিশ বছর—নানারকম গ্রাম্য টোটকা আর বারদুয়েক গ্রামের হাতুড়ে বরকতকে দিয়ে পরীক্ষা করানো ছাড়া তার এই কালরোগের কোনো চিকিৎসাই হয়নি। ত্রিসীমানাতেও দেখা যায়নি কাউকে। নিশানাথ যেন প্রকৃতপক্ষেই আত্মীয়-বান্ধবহীন! কিন্তু আসলে তা তো নয়, প্রচুর আত্মীয় তার। আজ সবাই তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রচণ্ড জেদ—নিশানাথ কোনো অবস্থাতেই বিনা ডাক্তারে মরতে পারবে না। মরাটা যখন নিশ্চিত, তখন ডাক্তারকেও আসতে হবে।

পাশের গাঁয়ের পাশ-করা ডাক্তার নিশানাথের মরার তদারক করতে এল। সে একটা চ্যাটাইয়ে শুয়েছিল—একটা চ্যাটাই মাত্র; কাঁথা তার কোনোকালে ছিল না একথা সত্যি নয়, সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এমনভাবে যে সেটাকে আর কিছুতেই ব্যবহার করা যায়নি। একই মায়ের পেটের একটি চমৎকার ভাই ছিল নিশানাথের, সামান্য একটু দোষ ছিল তার। বউকে বড্ডো পিটোতো। আর কাঁচা পয়সা যা পেত মদ-গাঁজা-ভাঙ খেয়ে ফুঁকে দিত। ভাইটিকে বড্ডো ভালোবাসতো সে। অদ্ভুত ব্যাপার এই: এজন্যে মার খেত নিশানাথের বউ। নিশানাথ ভাইকে ভালোবাসবে আর মার খাবে নিশানাথেরই বউ—এটা বেগারার কাছে প্রথম দিকে বিশ্রী বদনিয়ম বলে মনে হতো। কারণ ভাইটা সব উড়িয়ে দিচ্ছে অথচ তার বিরাট সংসারটিকে টানতে হচ্ছে নিশানাথকেই এ-কথাটা

বলায় দোষের কী আছে বোকা বউটা কোনোদিন বুঝতে পারল না। যাই হোক, ভাইটি জমিজমা যা ভাগে পায় বিক্রি করে এদেশ থেকে চলে গেছে। এজন্যে নিশানাথের প্রচণ্ড দুঃখ হলেও সে-ব্যাপারটাই শেষ হয়ে গেছে।

এটা অবশ্যই খুবই হাস্যকর যে নিশানাথ পেশায় কবিরাজ ছিল। সে মরে যাবার পরও লোকে তাকে কবিরাজ নিশানাথ বলেই ডাকবে তাতেও সন্দেহ নেই। সমস্ত জীবনটা সে গাছগাছড়া, লতাপাতা এইসব নিয়ে কাটিয়ে দিল—পদ্মমধু, অনুপান, চ্যবনপ্রাশ, খল—ইত্যাদি কথা লেগেই থাকত তার মুখে। তবু কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি, নিশানাথ নিজের বিশ বছরের পুরনো হাঁপানিটার কোনো ব্যবস্থা করতে পারল না কেন। এমনকী গতবছর শীতকালে যখন তার মায়ের সজ্ঞান স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটল তখনো নিশানাথ কোনোরকম ওষুধ দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি কেন তা-ও কেউ তাকে জিজ্ঞেস করবে না। অর্থাৎ নিশানাথ কবিরাজ হয়ে জন্মেছে এবং কবিরাজ হিশাবেই মারা যাবে। শুধু মাঝখান থেকে হাঁপানিটা তাকে না ধরলে সে আরো অনেককিছু করতে পারত। অন্তত পুরো দু'গণ্ডা সন্তানের জনক হওয়া তার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ছিল না—কারণ তার বউ এখনো চল্লিশ পার হয়নি।

এ-সমস্ত কথাই অবশ্য এখন অর্থহীন। নিশানাথ তো মারা যাবেই। তাতে তার বিশেষ আপত্তি বা দুঃখ রয়েছে এমন মনে হয় না। নানারকম রোগহরণ ওষুধ বানাতে বসে মাঝে মাঝে সে একটা অদ্ভুত কথা বলত তার বউকে, ভাবিস, শুধু ধন্বন্তরিই বানাই আমি। আরো এট্টা জিনিস শিহিছি আমি বুঝলি! সেডাও ধন্বন্তরি—দুফোঁটা পেটে পড়লিই ভবনদীপার। ভারী আগ্রহ তার বউয়ের, আমাকে দিওনা দুফোঁটা! দেবা না?

মাইরি আর কী—নিশানাথ বিষ বিষ গলায় বলে, এমনি ছাড়া পাবি ভাবিচিস না? পেডে যেগুলো ধরিছিস ওগুলো বড় হবে, ও শালার আগাছার ঝাড়, না খাতি দিলেও বড় হবে, আগুনেও পোড়বে না—জলেও ডোববে না—বড় হয়ে তোকে নাতি মারবে, ঝাঁটা মারবে—তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে, চুলের মুটি ধরে ঘুরোপে—তবে তো ভোগান্তি শেষ হবে। তার আগেই পালাতে চাস? ধন্বন্তরিডা আমার থাকল।

বউয়েরও হাসির ধার বেরোয় যেন হিসহিস করে, কী স্বার্থপর। সবতা সুখ একাই চাও। মন্তর পড়িছি আর পেডে এসেছে ওরা, না! লোক নেই, জুতোয়ে দাঁত ভাঙ্গে দেত।

যা যা, ভাগ এখান থে। নিশানাথ হাঁকিয়ে দেয় বউকে।

যাই হোক আসল ব্যাপারটা হলো নিশানাথের সম্ভবত মরতে বিশেষ আপত্তি নেই। যদিও একথা সত্যি যে মরতে সেই বিশেষ ধন্বন্তরির সাহায্য সে নেয়নি, এমনিতেই মারা যাচ্ছিল। পুরোনো হাঁপানিতে। দৃশ্যটিকে চিত্তাকর্ষক বলতেই হয়। এমনিতে এসব গাঁয়ে জনবসতি কম। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব অনেক। কাজেই হাটবাজার ছাড়া লোকজন একসঙ্গে হয়ই না প্রায়। এজন্যে নিশানাথের বাড়িতে এই ভিড়টাকে বড্ডো জীবন্ত লাগছে। জায়গাটা যেন গমগমে হয়ে উঠেছে। মানুষের নিঃশ্বাস এমনিতে গরম—নিশানাথের বিছানার চারপাশে জমায়েত মানুষের আবার এই মুহূর্তে বেশ খানিকটা উত্তেজনাও আছে। মানুষ কীভাবে আস্তে আস্তে মারা যায়—অর্থাৎ কবিদের ভাষায় মৃত্যুর কোলে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে—তা দেখতে উত্তেজনা স্বাভাবিক। একেবারে সামনে থেকে মানুষের মরণ দেখার সুযোগ কী ছাড়ে কেউ? নানারকম মারী-মড়কে, ভয়ংকর রোগের ধাক্কায় মানুষ মরে পট করে—বিশেষ কিছু জানান না দিয়েই। নিশানাথই শুধু মৃত্যুকে ডেকে এনে বসিয়ে রেখেছে বুকের উপর। লোকজন তাই আসছে-যাচ্ছে, যেন জিজ্ঞেসই করে ফেলবে, কই কতদূর এগুলো? নিশানাথের চার নম্বর ছেলেটা বাপের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাবলা-ন্যাবলা চেহারা ছেলেটার। কালো রং, ধুলো মেখে ধুলোটে মেরে গেছে। নাক দিয়ে অনবরত সর্দি গড়াচ্ছে—গালের উপর শুকিয়ে অভ্রের পাতের মতো চকচক করছে। একটা প্যান্ট অবিশ্যি পরেছে—কিন্তু এইটুকু ছেলের লজ্জা নিবারণের এমন কিছু দায় নেই এই ধরণের ভাব করে প্যান্টটা হাঁ কপে আছে। ছেলেটা বাপের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন একটা চুষছে আপন মনে।

কিছুক্ষণ আগে গোটাদুই ইন্‌জেকশন করে আর খানকতক বড়ি আনবার পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার আট টাকা পকেটে ফেলে চলে গেছে। নিশানাথের খুড়তুতো ভাই বলল, সব বাজে—দাদার যে মালিশডা আছে না—সেই যে দাদা যেডা বরাবর বুকে দিত সেইডা লাগাও। আরাম হয়ে যাবেনে।

নিশানাথের বুক হাঁপরের মতো উঠছে আর নামছে। এইরকম করতে গিয়ে তার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। কারণ নিয়মিত তালে বুকটাকে ঐভাবে ওঠানো-নামানো সহজ কথা নয়। মালিশ দেবার জন্যে বুকে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিশার চোখদুটো বেরিয়ে এল। কিন্তু মালিশ চলতে থাকেই। নিশানাথকে ঘিরে যেমন ভিড় তাতে বাইরে থেকে তাকে আর দেখা যায় না। মেজো পুত্রটি তখন বাড়ি

ফিরছিল। বাপ সম্বন্ধে বেচারির বেশি মাথাব্যাথা নেই। সাংঘাতিক খিদে পেয়েছিল তার—দু-তিনদিন থেকে নিশানাথের বউও তাদের ছাই গিলগে—মরগে, বাপের আগে যা—এই ধরণের বাজে কথা চালাচ্ছিল। এজন্য কিছু মেটে আলু জোগাড় করেছিল ছেলেটা—নিজের পেট তো ভরিয়েছেই, বোধহয় উদ্বৃত্ত খানিকটা নিয়েও এসেছে ভাইবোনদের জন্যে। ছেঁড়া গামছায় কিছু বেঁধে আর আধখাওয়া একটা আলু হাতে সে নিঃশঙ্ক মনে বাড়ি ঢুকছিল, এই সময় বাজের মতো ছোঁ মেরে দারোগালি তার ঘাড়ে পড়ল, হারামজাদা পিচেস, আলু তুললি কেন বল। হারামজাদা, পরের হারাম খাও। ছেলেটা ভয় পেয়ে ছুটে ভিড়ের মাঝখানে আসতে চায়, দারোগালি তাকে আসতে দিল না। ধরে বারকতক ঝাঁকি দিতেই গামছা থেকে আলুগুলো মাটিতে পড়ল। ঘটনাটা সহৃদয় কোনো দর্শকের মনে নিদারুণ আঘাত দিল মনে হয়—সে চিৎকার করে অন্যান্যদের দলে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। তার কথাটা হচ্ছে : এমন নির্দয় মানুষ সে কখনো দেখেনি। একটা লোক মরে যাচ্ছে। সে-কাজটি নির্বিঘ্নে সমাধা করতে পারলে একটি মেয়েমানুষ বিধবা হবে। ছাট অবোধ বালক পিতৃহারা হয়ে যাবে। তাছাড়া মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে নানা ঝামেলায় থাকে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় না। সেজন্য মরার সময়েও কী মানুষ একটু শান্তি আশা করতে পারে না ? দেখা গেল, যে এইসব প্রশ্ন তুলল তার সমর্থক জুটতে দেরি হলো না। সবাই দারোগালিকে তাড়না শুরু করে। এমন নির্দয় কঠিনহৃদয় মানুষ কী পৃথিবীতে আছে ? মেটে আলু অবশ্যি এখন সবাই ভাতের বদলেই খাচ্ছে। তা নাহলে ওতো কচু-ঘেঁচুর মতোই বাঁদর-শুয়োরের খাবার। দারোগালি স্পষ্টত বিব্রত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে নিশানাথের বউ যখন আলুগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে ছোঁড়াটাকে ঘা-কতক বসিয়ে ফোঁস ফোঁস করে কান্না জুড়ে দিল, তখন দারোগালি রীতিমতো আপশোশ করতেই লাগল। তবে মেটে আলুর লোকসানটা বড্ডো গায়ে বেজেছিল তার। সে তো আসলে বস্তুটির প্রতি লোভবশত নয় প্রয়োজনের কথাটাই মনে করে অন্ধ হয়েছিল। হিতাহিত জ্ঞানটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। নিশানাথ এসব কথা বুঝতেই পারল না—ক্ষুধাতৃপ্তির মতো সামান্য পার্থিব ব্যাপারে মনোনিবেশের অবস্থা ছিল না তার। সে প্রাণপণে নিঃশ্বাস নেওয়া এবং ফেলাতেই মগ্ন হয়ে থাকল। কিন্তু লৌকিক কাণ্ডগুলি চলতেই থাকে। খুড়তুতো ভাইটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাদার অবর্তমানে পারিবারটির কী দশা হবে বর্ণনা করে যায়।

এইসময় নিশানাথ হঠাৎ যুদ্ধ চালাতে ব্যর্থ হয়। হেঁচকির মতো আওয়াজ

বের করে। কিছুক্ষণ সবাই দারোগালির দিকে মন দিয়েছিল—আবার তাদের মনে নিশানাথ রাজত্ব চালাতে লাগল। লোকটাকে তখন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। কাঁচাপাকা দাড়ি অনেকদিন কাটা হয়নি, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঁচু হয়ে গেছে—যেন বেরিয়ে আসতে চায়। ঘোলাটে চোখদুটি কপালের বাইরে চলে এসেছে, দুটি শুকনো সরু বাঁশের মতো ঠ্যাং চ্যাটাই ছাড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কোমর থেকে ওপরটা খালি—কোঁচকানো চামড়ার নিচে পাঁজরের হাড়গুলি জিরজির করছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। একটা নীল রঙের বড় মাছি মুখের অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঢুকবে কী ঢুকবে না যেন মনস্থির করতে পারছে না।

এইবার হয়ে আসতিছে—ঘন ভুরুর ভিতর থেকে খুদে খুদে দুষ্টুমিভরা চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে খাদেম মন্তব্য করল।

হাসপাতালে একবার নিয়ে যাবার চিষ্টা করলি হয় না—কথাটা কে যে বলল ঠিক বোঝা গেল না।

হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল কেউ। মনে হলো ছ্যা ছ্যা করে উঠল যেন। এমন হাসি যে প্রস্তাবকারী লজ্জায় টুব করে ভিড়ের মধ্যে ডুব দিল। নিশানাথ কিন্তু খুব শক্ত এবং ঘাগী লড়ুয়ে। ঘোঁৎ করে শব্দ করে কী যে সে তার বুকের ভিতর থেকে সরিয়ে ফেলে সে-ই জানে—কিন্তু একঘেয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজে আবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়ে যায়।

তখুনি খবরটা আসে। সাত্তার মোড়লই আনল। এমনিতে হয়তো জরুরি নয় খবরটা। একটা ষাঁড়ের সঙ্গে আরেকটা ষাঁড় মারামারি চালাবে এ তো খুবই সাদা কথা। সবসময়েই যে সংঘর্ষের কারণ থাকতে হবে তা-ও নয়। বিনা কারণেও দ্বন্দ্ব চলতে পারে—ষাঁড়েরা এমন করেই থাকে। তবে কিনা মানিকের মতো নিরীহ প্রাণী ওদের খুব বেশি জানা নেই। একটু বেশি প্রেমিক স্বভাবের বটে—প্রেমিকের মতো সময়ে সময়ে মাবমুখীও, কিন্তু আদতে বড্ডো নরম ধাতের জানোয়ার সে। এইরকম মরণপণ লড়াইয়ে নেমে যাবার কী থাকতে পারে তার?

কী যে হয় কেউ বুঝতে পারে না। শানপাথরে ইস্পাত ঘষলে যেভাবে ছিটকে ছিটকে পড়ে সেইভাবে নিশানাথের বিছানার চারিপাশের ভিড় থেকে উত্তেজনা নিষ্কাশিত হতে থাকে। আর গাঁজা-ভাঙ-মদের মতো উত্তেজনাও তো একটা নেশা! একটা অদ্ভুত আবেগ এসে তাদের চেপে ধরে। তাদের ষাঁড় মানিকের পক্ষে চলে যায় সবাই। গাঁয়ের ইজ্জতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ব্যাপারটা। তাদের কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায় মানিকের জন্যে তারা সমর্থন জড়ো করতে শুরু

করেছে। এমনকী নিশানাথের মরণের ব্যাপারটাও পানসে পানসে ঠেকছে তাদের কাছে এরই মধ্যে।

নিশানাথ অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করছে না। তবুও নতুন ষাঁড়টা কত বড়—কী রং তার, বেঁটেখাটো কিনা—শক্ত সুন্দর শিং না কপালের উপর ঝুলে থাকা নড়বড়ে শিংঅলা ইত্যাদি খবর জানার আগ্রহ থেকেই অনুমান করা যায় কীভাবে নাড়া খেয়েছে তারা।

নিশানাথের বউ মালিশ করা ভুলে হাঁ করে এইসব কথা শুনছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার মালিশ বন্ধ করতেই নিশানাথের নিশ্বাস সহজ হয়ে গেল। একটু টরটরেও হয়ে এল যেন। বেশ সহজ হতেই চাইল নিশানাথ। কী জানি কিছু শুনতে বা বুঝতে পারছিল কিনা সে। নিশানাথের বউয়ের খাঁড়ার মতো নাক কেমন জেদি আর একরোখা হয়ে গেল।

মনে হতে পারত লড়াইটা শেষ হয়ে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ থেকে মানিক ও অবলাকান্ত পরস্পর মাথা লাগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দুজনকেই বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মানিক বারকয়েক নিশ্চয়ই আছাড় খেয়েছে। তার সাদা শরীর ধূলিধূসরিত, ডানদিকের দাবনার খানিকটা ছড়ে গিয়ে লোম উঠে গেছে। কালো চামড়া উঁকি দিচ্ছে সেখানে, তাছাড়াও বুকে তলপেটে চোখের নিচে অবলার শিঙের আঘাতের দাগ। তার কালো রেখা-টানা চোখের তলায় পানি গড়িয়ে পড়ার চিহ্ন। এসব থেকে মনে হতেও পারে যে লড়াইটা একতরফাই হয়েছে, মানিক ক্রমাগত মার খেয়েছে। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। খুব আদুরে স্বভাবের সে, গাঁয়ের মানুষের প্রশ্রয় পেয়েছে বরাবর—কষ্টের জীবন ছিল না তার। নিষ্করুণ পরিশ্রম কাকে বলে—নিষ্ঠুর লড়াই কী ধরনের জিনিস এসব ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই তার। এজন্য তার বিরাট সুপুষ্ট দেহটি বাবু-বাবু গোছের দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কষ্টের আর পরিশ্রমের কাজে নামতেই তাই তার চাকচিক্যটুকু খুব তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয়েছিল। যতটা ঠ্যাঙানি খেয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল আসলে অতটা বেকায়দায় সে পড়েনি। কারণ, তার ষাঁড়জন্মের জন্যে সাংঘাতিক দৈহিক শক্তি এবং অকুতোভয় স্বভাবটি তো সে ঠিকই পেয়েছিল। অবলার আবার ব্যাপার আলাদা—তার শরীরে এতটুকু বিদেশি রক্ত ছিল না। সে দেহাতি গোছের—কোনো গৃহস্থের সম্পত্তি। ঠ্যাঙানি-পিটুনি তার দৈনন্দিন বরাদ্দ। এইসব কারণে অবলাকে এই যুদ্ধে খুব ব্যতিব্যস্ত বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু মার

কী সে কম খেয়েছে? তার কতকগুলি সুবিধা আছে বটে—যেমন শরীরটা ছোট, গোলগাল—মানিকের মতো সুদৃশ্য লম্বাটে নয়। সে গোলগাল, কিন্তু মেদবহুল নয়—ইস্পাতের মতো কঠিন মাংসপেশী দিয়ে তৈরি তার পাগুলি খাটো—মাটিতে কোনোরকমে গেড়ে দিতে পারলে লোহার খুঁটির মতো অনড় হয়ে আটকে যায়। তখন তাকে নড়ানো সাধ্য নয় মানিকের পক্ষে। মানিকের শক্তি অনেক বেশি—কিন্তু তার শক্তি কেমন ছড়িয়ে আছে। অবলার প্রকাণ্ড মোটা ঘাড়—ফুলে-ওঠা উচ্ছ্রিত বুক—সমস্ত শক্তি যেন সেখানে জড়ো হয়েছে। অবলার এমনকী শিঙের সুবিধেটাও বেশি। কিন্তু এত সুবিধে নিয়েও অবলা মার খেয়েছে। মানিকের বিরাট রাজকীয় শরীরটারই তো আলাদা একটা মূল্য আছে। সে যখন পিছু হটে তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে অবলাকে ধাক্কা দেয়—অবলা শত চেষ্টা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের একবার মনে হলো লড়াইটা বোধহয় শেষ হয়েই গেল। ওরা দুজন মাথায় মাথায় লাগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এমন স্থির হয়ে যে মানিকের পিঠের উপর একটা মাছি বসলে সে চামড়া কাঁপিয়ে সেটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করল—সেটা পর্যন্ত দেখা গেল। একটু সময়ের জন্যে মনে হওয়া সম্ভব ছিল যে ও-দুটি জীবন্ত ষাঁড় নয়—পাথরের তৈরি। তবে তাদের চোখ অস্বাভাবিক লাল হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাসও পড়ছিল জোরে জোরে। এই অবস্থাটা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না। অবলাই অকস্মাৎ ঘটাল এটা। তখনই বোঝা গেল যুদ্ধের শেষ তো নয়ই, হয়তো বা শুরুই হয়নি এখনো। অবলা শিঙে শিং লাগিয়ে ঘাড়টা নাড়াল একবার। তাতে এমন ভীতিকর একটা শব্দ বেরুল যে মনে হলো চামড়া-ঢাকা মানিকের ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেল কট করে। সে ভারী অসহায়ভাবে ঘাড়টা কাৎ করল। অবলা অবস্থাটার সুযোগ নিয়ে আরো চাপ দিয়ে মানিকের লম্বাটে ঘাড়টাকে মাটিতে প্রায় মিশিয়ে ফেলল। মানিকের উঁচু কুকুদ থেকে শুরু করে বুক পর্যন্ত কোনাকুনি ভাঁজ পড়ে গেল। সামনের একটা পা একটু বেঁকেও গেল। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হলো তাকে। শ্বাসকষ্ট হলে যেমন হয়। চোখের লালরঙে মারমুখী ভাবটা চলে গিয়ে একটা অসহনীয় কষ্টের ভাব ফুটে উঠল। অবলা আর-একটু চাপ দিলে তাকে নুয়ে পড়তে হবে এইসময় কী নৈপুণ্য সে ব্যবহার করে সে-ই জানে—কিন্তু তাদের শিংগুলি খটাখট বেজে ওঠে আর মানিকের ঘাড় সোজা হয়ে যায়। তখন বুঝতে পারা যায় ষাঁড়ের ঘাড় বস্তুটি বড় সোজা নয় এবং অবলার সঙ্গে যে লড়ছে সে-ও

একটা ষাঁড়। প্রীতিবশত আতঙ্কিত হওয়া চলে—কিন্তু সত্যি করেই ভয়ের কিছু নয়। মানিক এখন আর ঐভাবে থাকতে রাজি নয়—কী কারণে আবার তার অবলাকে পিটুনি দেবার ইচ্ছে দেখা দিয়েছে। সে পিছিয়ে এল। বোধহয় অভিজ্ঞতায় জেনেছে এই কায়দাতেই সে সুবিধে পাচ্ছে বেশি—দুর্দম বেগে সে অবলার উপর পড়ে। অবলা তার ছোট ছোট পা মাটিতে গেড়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘাড়টা আবার একটু কাত করে সে মানিককে গ্রহণ করে। কিন্তু এবার সামলানো সম্ভব হলো না তার পক্ষে। পিছনের পা দুটোকে কোনোরকমে খাড়া রাখে বটে কিন্তু শরীরের সামনের দিকটা যেন চুরমার হয়ে ভেঙে যায়। অধঃপতিত অবলাকে এখন পরম আনন্দে ঠ্যাঙাতে থাকে মানিক। একটার পর একটা নিষ্ঠুর আঘাত চলে—মাংসের উপর শিঙের প্রহারের শব্দ হয় না তেমন—তবু যে চাপা থ্যাপথ্যাপে একটা আওয়াজ ওঠে সেটাকে বড্ডো অস্বস্তিকর মনে হয়। অবশ্য মানিকের পায়েরও একটা শব্দ ওঠে মাটি থেকে, অবলা যে উঠতে চেষ্টা করছিল তারও একটা আওয়াজ আছে—কিন্তু মাঝে মাঝে শব্দহীন মুহূর্তও আসছিল। তখুনি অস্বস্তি লাগছিল বেশি। যারা দেখছিল তাদেরও বিশ্রী লাগছিল ব্যাপারটা যদিও মানিকের এই কৃতিত্বে একটু একটু গর্বও যে হচ্ছিল না এমন নয়। তবুও এ-অবস্থাটাও বেশিক্ষণ থাকে না। এক হিসেবে ধরতে গেলে লড়াই শুরু হবার পর প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন হচ্ছিল, কোনো দুটি মুহূর্তই তো আর একরকম থাকতে পারে না, মানিকের লেজ নড়ছিল তো অবলার পিছনের একটা পা মাটিতে ঘষে যাচ্ছিল। ওরা দুজনেই উঠে পড়ল। অবলা এড়িয়ে চলার তালে ছিল মনে হয়—সামান্য বিশ্রাম চাচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে উঠেই মানিকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লেজটা তুলে একটু যেন ঔদাসীন্যের ভাব করে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু মানিক তাকে এখন ছেড়ে দিতে চায় না—সে পিছন থেকে কাছে গিয়ে তল-পেটের দিকে শিং লাগিয়ে তাকে আড়াআড়িভাবে ঠেলতে ঠেলতে ঢালু বেয়ে নিচের দিকে যেতে থাকে। কিন্তু সে অবস্থারও শেষ আছে—অবলা আবার ফিরে দাঁড়ায়। সামান্য সময়ের জন্যে দুজন পরস্পর থেকে একটু দূরে যায়। এখন খুব স্পষ্ট দেখা যায় তাদের। ছাইরঙের গাঁট্টাগোট্টা গুণ্ডা অবলা—বল্লমের মতো সিধে শিং, বেঁটে লেজ আর পা—নিচু, ঝুলে-পড়া কুকুদ, বিশাল চওড়া বুক কিন্তু তার চাইতেও যেন একটু মোটা পেট, চওড়া খুর। তার বুকের কাছে সকালের প্রথম আঘাতের ঘা-টি এখন শুকিয়ে কালচে হয়ে এসেছে। কিন্তু তার চোখের নিচের ক্ষত থেকে রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে। ছাইরংটা আরো বিবর্ণ দেখাচ্ছে—বারকতক

ভূমিশয্যা নিতে হয়েছে তো! মানিক—বিরাট, ছিপছিপে—এখন কিছুটা গর্বিত। কিন্তু তার উপর দিয়েও ধকল গেছে। সমস্ত শরীরে ধুলো—পাছার কাছে সবুজ রং—ঘাস পিষে লেপে গেছে।

অবলা ঘুরে দাঁড়াল। দুজনের খুলিতে-খুলিতে লেগে শানে বেল ফাটার মতো আওয়াজ বেরুল। অবলা নিয়ে আসছে মানিককে উপরের দিকে—সে পালকের মতো যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আসছে। তার কোনো ওজনই নেই মনে হয়। মাটি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—ভেঙে ধুলো হয়ে যাচ্ছে। অবলা আরো ছোট হয়ে গেছে। একটা বেঢপ পুঁটলির মতো। একে তো তার ঘাড় ছোট—তা আবার সামনের দুপায়ের মধ্যে দিয়ে পেটের দিকে চলে যেতে চায়। সব মিলিয়ে অবলাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে বড্ডো। চার পা কাছাকাছি, লেজ সামান্য তোলা। মানিক দর্শকের কাছাকাছি এসে তবে একটু সামলাতে পারল। ঠেলাঠেলির কাজটা এতক্ষণ সে-ই বেশি চালাচ্ছিল—লাভও হচ্ছিল তার! কিন্তু দেখা গেল প্রয়োজনে অবলা বিস্ময়কর শক্তি দেখিয়ে দিতে পারে। শিঙের ব্যবহারে সে এমনিতেই নিপুণ, অত্যন্ত চতুর ও দ্রুত, যে-জন্যে মানিককে ঠ্যাঙানি দিতে পারছিল বেশি—তার শক্তির খানিকটা পূরণ করতে পেরেছিল। কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষেপে গেলে তার পেশীর শক্তিও যথেষ্ট কাজে আসে। মানিক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল।

লড়াইয়ের এইসব খুঁটিনাটি লোকেরা আস্তে আস্তে আবিস্কার করতে লাগল। তাছাড়া তারা ষাঁড় চেনে। মানিকের ধরণের ষাঁড যে দেখতে সুন্দর, স্বভাবে শান্ত হয়ে থাকে এও তাদের জানা। এমনকী মানিকের জন্যে যদি গ্রামের সমস্ত গোরু তার মতোই হয়ে যায় তাতেও তারা খুশি। বলতে কী তাকে আদর দিয়ে টিঁকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যও তাই। মানিক যে অত্যন্ত বলশালী তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার রং, সরু সরু পা, ছোটখাটো চমৎকার পরিষ্কার খুর ইত্যাদি তার আয়েশি প্রকৃতির কথাই বলে। অন্যদিকে অবলার কদাকার হাভাতে চেহারা—বিশ্রী ময়লা রং, সুষমাহীন আকার, ধ্যাবড়া ধ্যাবডা খুর তার অত্যন্ত রুঠোমেজাজ আর দুঃসাহসী স্বভাবেরই ইঙ্গিত দেয়। মার দিতে দিতেই অবলা ক্লান্ত হয়ে গেল। দুজনে মুখোমুখি হয়ে খানিকটা সরে দাঁড়াল। যারা দেখছিল তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এবার কী হতে পারে? কী করবে ওরা এরপর? সরে না গিয়ে আর কী লড়াই চালানো সম্ভব? দেখা গেল দুজনেই খুর দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। ধুলো ছিটকে এসে লোকজনের চোখে এসে লাগতে লাগল। মানিক

চোখ লাল করে একবার দর্শকদের দেখে নিল। এমন ভয়ংকর চাউনি যে সবাই ভাবল মানিক এবার তাদেরকেই আক্রমণ করবে। অবলা মাথা-ঘাড়-দেহ কাঁপিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে নিল। একটা ভোঁতা গর্জনও করে নিল সঙ্গে সঙ্গে। মানিক রাগের চোটে দিশাহারা হয়ে হঠাৎ শিং দিয়ে খানিকটা ভিজে ভিজে কালো মাটি তুলে চারদিকে ছিটিয়ে দিল। এইসব পাঁয়তারা শেষ হয়ে আবার লড়াই শুরু হতে দেরি হলো না।

জিনিসটা ধুঁইয়ে উঠছিল।

ঝগড়াঝাঁটি, খুনজখম বা ওই-ধরণের লোমহর্ষক কাণ্ড কেউ পছন্দ না করলেও কখনো কখনো জড়িয়ে কী পড়তে হয় না? মানসম্মানের জন্যে হোক, স্বার্থরক্ষার জন্যে হোক মারামারি কাটাকাটি তো করেই মানুষ। কিন্তু তা নয়। দীর্ঘ একটা বছরের তীব্র ক্ষুধার মুখোমুখি হবার সাহস ক'জনের থাকে? মানসম্মান ইজ্জত চুলোয় যাক—মামুলি স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন নয়—একেবারে নিশ্চিত ক্ষুধার সামনে দাঁড়িয়ে কে স্থির থাকবে? হঠাৎ সেই পরিস্থিতির সামনেই পড়ে গেল গাঁয়ের সমস্ত মানুষ। ঘটনাটি চেপে বসল তাদের উপর। এবার তাদের একটা বিলের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে শহরের একজন ব্যবসায়ী। এই লোকটিকে অনেকে চোখেও দেখেনি। যারা দেখেছে তারাও ঠিক মনে করতে পারে না কীরকম তার চেহারা —কেমন বেশবাস। আরো অদ্ভুত, শত চেষ্টা করেও কেউ তার সঙ্গে কোনোরকম শত্রুতার কথা মনে করতে পারে না। ব্যক্তিগত শত্রুতার তো কথাই ওঠে না— সে থাকে শহরে গাড়িঘোড়া, লোকজন এইসব নিয়ে অন্যজগতে। সে যেভাবে জীবনযাপন করে, যে-জামাকাপড় ব্যবহার করে বা যে-খাদ্য সে খায় তা তাদের কল্পনাতেও আসে না। কাজেই শত্রুতার প্রশ্নই নেই এখানে। সমস্ত গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে শত্রুতাও কেউ মনে করতে পারে না। তবে এটুকু শোনা গেছে সে মাঝে মাঝে মেয়েমানুষের খোঁজে এদিকে আসে। কখন নাকি একবার তাকে পিটিয়েও দিয়েছিল কোন নীতিবাগীশ যুবক। কিন্তু এ-ব্যাপারটি এমন ধরণের যে এটাকে নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাঁধানোর মতো মূর্খ নয় ব্যবসায়ীটি। যাই হোক, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ঐ প্রায় অপরিচিত ব্যক্তিটিই লোকজন পাঠিয়ে চাষীদের একটা বিলের ধান কেটে নিয়ে যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই কাজটির যুক্তি খুঁজে বের করতে গাঁয়ের লোকরা হিমশিম খেয়ে যায়। তারা খুব হৈ চৈ করে। কিছুই বুঝতে পারে না। শেষে একজন কৃষক

নেতা প্রচণ্ড বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে এর কারণ আর কিছুই না, ব্যবসায়ীটি শত্রুতা চান না, তিনি ধান চান। ধান বিক্রি করতে পারলে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হবে। এই কথা শুনে সবাই হাসাহাসি শুরু করে। তারা বুঝতেই পারে না—টাকাই হোক আর জহরতই হোক—অন্যের ধান চাওয়াটা কী ধরণের আবদার। বহু কষ্টে তাদের বোঝানো হলো ব্যাপারটা। এজন্যে নেতাটিকে অনেক আঁক-জোঁক কসরত করে চাষীরা কীভাবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শোষিত হয় তার বিবরণ দিতে হলো। সেসব কথা লোকজন বোধহয় শুনলই না ভালো করে। তবে তাদের ধান যে কেটে নিয়ে যাওয়া হবে ন্যায় বা বিবেক ইত্যাদির ধার না ধেরে—সেটা আস্তে আস্তে কবুল করে তারা।

কিন্তু একটা কথা। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী লোকটির এইরকম আহ্লাদী ধরণের কাজের কোনো ফিকিরই ছিল না? অবশ্যই ছিল। সে নাকি লোনাপানি থেকে বিল বাঁচানোর জন্যে যে-বাঁধ দেওয়া হয় গতবছর সেটির চুক্তি নিয়েছিল জলবিদ্যুৎ বিভাগের কাছ থেকে। বাঁধটি ঐ বিভাগেরই কাজ—কিন্তু অনেকসময় এ-ধরণের চুক্তি করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীটি যেহেতু এই বাঁধ দিয়েছে, কাজেই আগামী চারবছর পর্যন্ত ফসলের দু'আনা অংশ তার প্রাপ্য। বক্তব্যটি বেশ যুক্তিসিদ্ধ—হঠাৎ এমনও মনে হতে পারে যে অভাব-অনটনে চাষীদের এমনিই অধঃপতন হয়েছে যে তারা লোকের ন্যায্য পাওনা পর্যন্ত দিতে চায় না। ব্যবসায়ীটির একটি মাত্র অপরাধ—তার টাকা আছে এবং এই টাকার অংশ আরো খানিকটা বাড়ানোর জন্যে সে বাঁধ দিয়ে চাষীদের বাঁচিয়েছে। টাকা থাকলে টাকা নিয়ে প্রত্যেকেই খেলা করতে চায়। এইভাবে জিনিসটা উপস্থিত করলে কিছুই বলার থাকে না—শুধু একটিমাত্র কথা থেকে যায়। তাহলে, গতবছর বাঁধটা চাষীরা নিজেরাই দিয়েছে। জলবিদ্যুৎ বিভাগের কাছে দীর্ঘদিন আবেদন-নিবেদন কাঁদাকাটি ইত্যাদির পর যখন কিছুতেই উক্ত বিভাগের ঔদাসীন্য ভেদ করা গেল না—তখন এই বাঁধ চাষীদের নিজেদেরই দিয়ে নিতে হয়েছে। এজন্যে ব্যবসায়ীটির অছিলা শোনার পর থেকে তারা বিস্ময় রাখার জায়গা পাচ্ছে না।

এই জগাখিচুড়ি কাণ্ডটার শুরু বেশ কিছুদিন আগে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম-দিকে বিশ্বাস হয়নি। তারপর লোকজন বোকা বনে যেতে লাগল। শেষে এমন তালগোল পাকিয়ে গেল যে কীভাবে এই অত্যাচারের প্রতিকার হতে পারে সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল না। কেউ কেউ ঠ্যাঙানি দেবার পক্ষে ছিল। ঝামেলা এড়িয়ে কোনোরকমে ধান কেটে ঘরে তোলার পক্ষে ছিল কিছু লোক।

মোট কথা ঘোঁট পাকিয়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। কারো কারো এমন রাগ হলো যে ব্যবসায়ীটিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার কথা বলতে লাগল। কিন্তু সে-কাজটি কোনোরকমেই সম্ভব ছিল না—কারণ সে নিজে এখানে হয়তো কোনো-কালেই আসবে না। সে যাই হোক, আসলে মানুষ যে ঠিক কী ধাতু দিয়ে তৈরি সেটা ঠিক করা ভারী দুষ্কর। এটা কীরকম অদ্ভুত ব্যাপার যে প্রথমে যে-দাবিটাকে অত্যন্ত আবদার বলে মনে হচ্ছিল—অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর বলে গুরুত্ব দিচ্ছিল না গাঁয়ের মানুষ—সেই দাবিটাই আস্তে আস্তে তাদের মনে ঢুকে যায় শুধু নয়, একসময় ওটার জন্যে তারা খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেয় এবং সবচাইতে মর্মান্তিক এই যে অসহায়ভাবে এটার কাছে নতিস্বীকারের অবমাননাও প্রায় মেনে নেয়। কৃষক নেতাটির কাজ শুরু হয় ঠিক এই জায়গা থেকে। সে ওদের ভয় দেখাতে থাকে। আর সে কী যে-সে ভয়! শহরের ব্যবসায়ীটি ধান কেটে নিয়ে যাবার পর সামনের বছরটিতে ক্ষুধা কীভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার এমন বিস্তৃত বর্ণনা দেয় যে শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। এবং একবার অধিকার ফস্কে গেলে প্রত্যেক বছরেই যে একই ঘটনা চলতে থাকবে তা-ও তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তখুনি সামনের জনতার ভিতর থেকে কেউ—বোধহয় হানিফ বিশ্বাস—বলে ওঠে, আল্লায় এ্যার বিচার করবে। হানিফের চিবুকে ছোট ছোট দাড়ি—কটা রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে—চোখের চাউনিটা বোকা—সে এ-অঞ্চলের নামকরা চোর, এজন্যে তার কথা শোনবার গরজ ছিল না কারো। বিশেষ করে আল্লার বিচার করার ব্যাপারটা তার মুখে ভারী অদ্ভুত। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লার প্রসঙ্গই এমন যে প্রায় প্রত্যেকে সে-বিষয়ে খোলাখুলি মতামত দিতে থাকে। নেতাটি প্রমাদ গণে—তার মুখ থমথমে হয়ে যায়। তারপরেই তার ভুরুর নিচে অসম্ভব চতুর চোখ দুটি নেচে ওঠে, নিশ্চয়ই, আল্লার হাতে তো সবই—তাতে সন্দেহ কী! কিন্তু তিনিই তো বলেছেন, আল্লা শুধু তাকেই সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে। কাজেই আমরা বসে থাকলে আল্লাও বসে থাকবে আর সমস্ত বিলের ধান গিয়ে উঠবে সরদার সাহেবের গোলায়। খুব নম্র বিনয়ী আর গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলার চেষ্টা করে মানুষটি—কিন্তু কীভাবে চাপা বিদ্রূপের ভাবটা এসে শেষের কথাগুলিতে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। পুরুষানুক্রমে শোষিত হতে হতেও যারা ভবিতব্য এবং অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করে বা ঈশ্বরের কাছে বিচার চায়—তাতে যার যা সুবিধাই হোক কৃষককর্মী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, এটা আর বিচিত্র কী!

প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। হতে পারে কেউ তেমন উৎসাহ পেল না। নেতার

বক্তৃতাটিও হয়তো যথেষ্ট জোরালো হয়েছিল। সামনে পুরো একটা বছরের খাদ্য —যেটা এখন মাঠে ছড়িয়ে আছে—জোর করে, বিনা যুক্তিতে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে যে-অবস্থাটা দাঁড়াবে সেটা বুঝতে খানিকটা দেরি হলেও চাষীরা কিছুতেই বুঝবে না তা তো আর হতে পারে না। এবং বুঝতে পারলে আল্লার উপর সবকিছু ছেড়ে না দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষ আল্লার উপরে ভরসা রেখেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এইকথা যুক্তিশাস্ত্রে হয়তো নেই—ক্ষুধার্ত মানুষের ইতিহাসে নিশ্চয়ই আছে। নেতার বোধহয় এইরকম আস্থা ছিল বলেই সে ক্ষান্ত দেয়নি। দেখা গেল লোকজন বেশ ঘন হয়ে এল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা মাটির উপরেই বসে পড়ল। গামছা কোমরে বেঁধে নিল কেউ কেউ। যাকে বলে রীতিমতো সভা—কী করতি হবে তাই কও—অধৈর্য হয়েই একটা ছোকরা চিৎকার করে বলল। নেতা সেকথায় কান না-দিয়ে কথা চালাতেই লাগল। হয়তো এটাও তার অনেক কৌশলের একটি—সে জানে কীভাবে জনতাকে তৈরি করে আনতে হয়। সে সেই অস্থির শ্রোতাদের উপরই দীর্ঘ বক্তৃতা চালিয়ে যায়। একজন হঠাৎ পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে এইবার তুমি নামো দিনি—কী করতে হবে সেই কথাডা কও।

কী করতে হবে তা কী আমার কয়ে দিতে হবে? যে ধান কাটতে আসবে তার গলাডা কুপয়ে ধড়ের থে নামায়ে ফেলতি হবে। ঠিক যেন আগুন ধরে গেল। বারুদের মতো জ্বলে উঠল মানুষ। নেতা তখন বৃথা চেঁচাচ্ছে, তোমার ধান অন্যে জোর কবে কেড়ে নিয়ে যাবে—তুমি কী করবে জানো না? চোখের সামনে থেকে তোমাদের বউ-মেয়েকে কেউ ধরে নিয়ে গেলে কী করবে তোমরা? আমি বক্তৃতা দিতে না আসা পর্যন্ত বসে থাকবে নাকি? এই ধরণের গা-জ্বলানো বক্তৃতা সে কেন করেছিল বোঝা খুবই দুষ্কর। তবে উপস্থিত রুক্ষ কদাকার চেহারার লোক-গুলো এমন সাংঘাতিক গর্জন শুরু করল যে নেতার ক্ষীণ শহুরে গলা আর শোনা গেল না।

এই ঘটনাটি ঘটল বিকেলে মানিক ও অবলা তখনো পুরোদমে লড়ছে। সারাদিনে তারা ক্লান্ত হলো না তার কী একমাত্র কারণ তারা ষাঁড়? না কি অন্য রহস্য কিছু আছে?

পরের দিনের ঘটনা কিন্তু বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। বিস্ফোরণোন্মুখও বলা যেতে পারে। সমস্ত গ্রামে আগুন লেগে যায়নি—সর্বধ্বংসী কোনো প্লাবনও আসেনি—

এরকম কোনো সর্বনাশ তো দূরের কথা নেহাৎ ব্যক্তিগত কোনো বিপদও আসেনি কারো—দুটি নির্বোধ বলশালী প্রাণীর সংঘর্ষ কী কারণে সমস্ত গ্রামকে টানছে হঠাৎ সেটা বোঝা যায় না। প্রাণীদুটির কাছে যাবার কোনো উপায় নেই এখন। দুজনের কাউকেই ঠিকমতো চেনা যায় না। ছিঁড়েখুঁড়ে কেটেকুটে ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত হয়ে গেছে দুজনেই। মানিকের পেট গিয়েছে খারাপ হয়ে। দাবনার কাছে ময়লা আবর্জনা মাখা। তার চামরের মতো সুন্দর লেজের কেশগুচ্ছ ধুলো-কাদায় দলা পাকানো—পাগুলো হলদেটে হয়ে এসেছে! সাদা সাদা লোম উঠে গেছে বহু জায়গায়, দগদগে ঘা দেখা দিয়েছে। মোট কথা প্রাণান্তকর সংঘর্ষের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। অবলার অবস্থা বোধহয় আরো খারাপ। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে তার। গর্তের মুখগুলোয় কালো রক্ত জমে আছে। হয়তো তার সামনের কোনো পায়ে আঘাত লেগে থাকবে—ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না বেচারা। ল্যাংচাতে হচ্ছে। ঘাড়ের কাছেও একদিকে ফুলে উঠেছে। তাব চেহারা এমনিতেই কদাকার—কিন্তু এখন তার চেহারা এমন দাঁড়িয়েছে যে তাকে কোন ধরণের প্রাণী বোঝাই দায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে যদিও এটা একটা সার্বক্ষণিক বৈরীতার প্রশ্ন এবং কাউকে রেয়াত করার কথাই নেই তবু বোধহয় একটা চুক্তি আছে ওদের মধ্যে। যেমন এই লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকেই কিছু ঘাসপাতা চিবিয়ে নেওয়া। একটু দূরে সরে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলা। সেসময় মনে হয় পরস্পরের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা আছে তাদের কিন্তু তারপরেই আবার যখন নির্দয় আঘাত চলতে থাকে তখন মনে হয় দুটির একটি খতম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটার নিস্পত্তি নেই।

গোটা ঘটনাটির পুরো আকর্ষণ কী এখানেই—তাই মনে হয়। দুটি প্রাণ বা দুটি শক্তিই তো দ্বন্দ্বে নেমেছে। সে-সম্বন্ধে তো কোনোই সন্দেহ নেই। এই সংগ্রামেই কী জীবনের সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে না? হয়তো গাঁয়ের মানুষের কাছে এই কথাটা পরিষ্কার নয়। কীভাবেই বা তা হবে? তারা তো এটাকে স্রেফ দুটি ষাঁড়ের মজাদার লড়াই হিসেবেই নিয়েছে। কিন্তু আমৃত্যু সংগ্রামের নিজস্ব জোর তো আছেই। সেইজন্যেই লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনে জন-সমাগম অনেক বেশি। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম লোকে ঠিকই করছে। মাঠের কাজ এখনো শুরু হয়নি। তবু পাড়াগাঁয়ের লোকের কাজের কী শেষ আছে? হয়তো বাড়ির পাশের ক্ষেতটির উপর দু'ঘণ্টা কোদাল চালাতে হলো। গোরুগুলির দুধ

দুইয়ে ফেলতে হবে। তারপর সে-দুধ বাজারে নিয়ে যাওয়া আছে। অল্পস্বল্প কেনাকাটার কাজ আছে। বাড়িতে তৈরি লাউ-কুমড়ো বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রির ব্যাপার আছে। নিজের নিজের গোরুবাছুরের তদারক আছে। এছাড়া জ্বালানি কাঠ জোগাড়, খাবার পানি সংগ্রহ, সম্ভব হলে কিছু মাছ-টাছের খোঁজে থাকা—এই রকম অসংখ্য কাজে গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ সবসময়েই মৌমাছির মতো ব্যস্ত। যারা দিনমজুর খাটে তাদের তো কথাই নেই—ভোরে ক্ষেতে বেরিয়ে যেতে হয়। মোট কথা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামটা হয়তো চোখে দেখতে পাওয়া যায় না সব সময়ে—কিন্তু চলছে তো প্রতিমুহূর্তেই। কখনো তীব্র হয়ে ওঠে—কখনো-বা নিশানাথের সংসারের মতো ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলে। এইদিক থেকে দেখলে বাস্তবিক অবাক হয়েই যেতে হয়। সকাল থেকে ঘানি চালিয়ে যে তেল সংগ্রহ করছে—যে হাঁড়ি বানিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা—এমনকী যে-বাড়িতে শিশুরা খিদে হজম করছে নির্বিকার মুখে—তাদের সকলের মধ্যেই তো লড়াইটা এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। তবু অবসর থেকেই যায়—খেলাধুলো, গান-বাজনা, আমোদ-ফুর্তি বা প্রেমের জন্যেও। অদ্ভুত কাণ্ড তো বটেই। এবং হয়তো-বা শুধু মানুষেরই কাণ্ড। অত্যন্ত কদর্য জীবনের শর্তের মধ্যেই আশাহীন না হয়ে কাজ করে যাওয়া।

প্রায় প্রত্যেকেই নিজের অবসর কাজে লাগাচ্ছে। আমোদ-প্রমোদের বিকল্প হিসেবে। অন্তত গতকাল পর্যন্ত তাই ছিল। দুটি ষাঁড়ের লড়াই দেখে চমৎকার কেটে যাচ্ছিল সময়। গাঁয়ের দিকে উত্তেজনার বিশেষ কিছু থাকে না। মাঝে মাঝে যাত্রাগান বা ঐ জাতীয় কিছু হলে সবাই ফুর্তি করার সুযোগ পায়। কিন্তু সে আর কদিন। কাজেই মানিক-অবলার যুদ্ধ তাদের উত্তেজনার দাবি মেটাচ্ছিল খানিকটা। আজ সকাল থেকেই কেমন যেন একটু অন্যরকম হয়ে উঠল ব্যাপারটা। দর্শক হিসেবে হাজির থাকাটা যেন কিছুটা কর্তব্যের অঙ্গ হয়ে গেল। এমনকী উপস্থিত থাকতে না পারলে কৃপা কটাক্ষ পর্যন্ত সইতে হচ্ছিল তাদের। তাতে অবশ্য কাজকর্ম ফেলে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হচ্ছিল না সবাই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বা কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে নিয়ে দর্শকদের দলে গিয়ে মিশছিল লোকজন। দু-এক জন যাদের বিশেষ ব্যস্ততা নেই তারা তো সর্বক্ষণের দর্শক। যুদ্ধটার নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল এই দলের লোক। শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে গেল যে মানিক-অবলা একা একা যুদ্ধ প্রায় করতেই পেল না। কেউ-না-কেউ সবসময়েই থাকছে। দিন যত এগিয়ে যেতে লাগল অনেক মানুষই একসঙ্গে হাজির হতে শুরু হলো। শেষে দেখা গেল গ্রামটাই—অর্থাৎ সমস্ত গ্রামের মনোযোগটাই উঠে এসেছে

এখানে। তাদের সমস্ত প্রসঙ্গ এবং সমস্যাসহ।

আর-একটি কথা। গতকাল গাঁয়ের লোকের উত্তেজনাটা ছিল ভাসা ভাসা ধরণের। মানিক এই লড়াইয়ে জিতে যাক মোটামুটি এটাই ছিল তাদের কামনা। সে যখন অবলার কাছে প্রচণ্ড পিটুনি খাচ্ছিল, তাদের ভারী ক্ষোভ আর আক্রোশ হচ্ছিল। এমনকী একসময় মানিকের যখন অসহায় অবস্থা তখন তারা লাঠি-ঠ্যাঙ্গা নিয়ে অবলাকে খেদিয়ে দেবার কথা ভাবতেও লজ্জিত হয়নি। একই কারণে অবলা ঠ্যাঙ্গানি খেলে তারা পুলকিত হয়েও উঠছিল। কিন্তু আজ তাদের দেখে মনে হচ্ছিল লড়াইটিকে মেনে নিয়েছে তারা—অহেতুক উত্তেজিত হতে তারা চাইছে না। এই মারামারিতে একটা ষাঁড় মারা পড়বে এ-ও তারা ধরে নিয়েছে। একটা ভারী ও ব্যাপক উত্তেজনা থমথম করতে লাগল লোকজনের মধ্যে। রাত্তিরে শালারা কী করিছে? ঘুমোয়নি নাহি এট্টু?

এটা একটা প্রশ্ন বটে! দু-চার মিনিট ঘুমিয়ে নেবার প্রয়োজন কী তাদের হয়নি? সেসময় কী তারা লড়াই থেকে বিরত ছিল? নাকি মাথায় মাথায় লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে নিয়েছে তারা?

কেডা দেখতি গেছে—ঘুমোয়ছে না গুঁতোগুঁতি করিছে। খলিল উত্তর না চাইলেও খাদেম জবাব দিয়ে দেয়। ষাঁড় আর মানুষ কি এক নাহি?

লড়াইটা তীব্র হয়ে উঠল বিকেলে। দুপুরে দুজনেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। একবার সরেই গিয়েছিল দুজনে দুদিকে। অনেকে ভাবল হয়তো শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা এখানেই। আপোসেই শেষ করে গেল তারা লড়াইটা। মানিক খানিকটা দূরে গিয়ে মুখ উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগল। তারপর বেশ শান্ত-ভাবেই ঘাস খেতে শুরু করে দিল। অবলা তো চোখের আড়ালেই চলে গেল। কিন্তু এই অবস্থাটা বেশিক্ষণ থাকল না। মানিক একটু পরে ঘাস খাওয়া বাদ দিয়ে অবলাকে খুঁজে নিয়ে এল। বিকেলের দিকে অসহ্য কাণ্ড আরম্ভ হলো। একটি-দুটি করে অসংখ্য লোক জড়ো হলো। পাশের গাঁ থেকেও দু-চারজন এসে গিয়েছিল। পশ্চিমের বিলের ধান নাকি কেটে নে যাচ্ছে—তারা জিজ্ঞেস করল। হ—সেইরহমই তো শুনতিছি—খাদেম জবাব দেয়। তার ক্ষুদে হিংস্র চোখ থেকে ধারালো চাউনি ঝিকঝিক করে ওঠে। আসলে এ-আলোচনায় যাবার কোনো ইচ্ছে নেই তার। বিশেষ করে অন্য গাঁয়ের লোকের কাছে। বিশ্রী একটা অবিশ্বাস নিয়ে সে জবাব দেয়। তার কটা রঙ আর লালচে চুল থেকেই বোঝা

যায় খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ সে।

তা তোমরা কী করবা ঠিক করিছ? ওরা আবার জিজ্ঞেস করল।

আমাদের কিছুই করা লাগতিছে না—আল্লায় এ্যার বিচের করবে। আল্লার কাছে মাপ নাই—চোর হানিফই বলে এই কথা, আল্লা তো সব দেখতিছে। না কী কও?

সে তো ঠিকই—তবু তো কিছু করতি হবে।

খাদেম অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল বলে কিছু বলল না।

হ্যাহো, আল্লায় মারলি কেউ রাখতি পারে না, হানিফ বলে, তার রোগা লম্বাটে ঘোড়ার মতো মুখ—হলদে ফ্যাকাশে রং। খুবই নির্বোধ মনে হয় তাকে। তবু গাঁয়ের লোকে যেভাবে প্রচুর কথা বলে তেমনি অসাড়ভাবে সে কথা বলতে থাকে, আল্লা আমাদের রুজির মালিক—তার ইচ্ছে হলি বাঁচব, ইচ্ছে না হলি মরব—ঠিক কতা না?

তুই চুপো—বেশি লম্বা কথা কস না কচ্ছি—খালেক পশুর মতো গর্জে উঠল, তুই কারো জমি ভাগেও করিস না, তোর জমিও নেই এক ছড়াক। তোর দালালি কথা শুনলি পিত্তি জলে যায়।

দাড়ি রাখিছিস ক্যানো কদিনি—ক তোর দাড়ির মধ্যি কী আছে? এই ঠাট্টাটা করে বসে পরশ। তার বয়েস কম আর একটু ফুর্তিবাজ সে। হাতের কাঁচিটা দিয়ে হানিফের হালকা দাড়িতে নাড়া দিয়ে সে আবার বলে, তোরে কতি হবে কী রহস্য আছে তোর দাড়ির মধ্যি। গতবছর যহন ধরা পড়িলি মোড়লদের বাড়িতি—হায়রে তোর চুল আর দাঁড়ি ক্যানো কাটে দেলে না?

হানিফের কাছে ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করা যায় না—আল্লার নূর হলো দাড়ি এইকথা বলে প্রতিবাদ সে অবশ্যই করত—কিন্তু গতবছর মোড়লদের বাড়ি ধরা পড়ার কথাটা এমন মারাত্মক সত্যি যে কোনো কিছুই বলা সম্ভব হলো না তার পক্ষে।

তা তো হলো, তোমরা কী করতিছ তা তো বললে না—পাশের গাঁয়ের আবেদ শেখ পুনরায় জিজ্ঞেস করে।

হ্যাহা যাক কী করা যায়—খাদেম আবার সংক্ষেপে জবাব দেয়।

তোমরা কি খবর নিতি আইছো? ছোকরাবয়েসী কিছু লোক বেরোয় একপাশ থেকে। খবর নিতি আইছ নাহি—এঁ্যা। আসলে কিন্তু এই প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। এরা সত্যি করেই খোঁজখবর নিতে এসেছে কিনা

তা তারা জানতে চায় না। তারা হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছিল—কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে আর-একদিকে চলে গেল।

খাদেমের গলার পেশী ফুলে ওঠে। ছোট ছোট ভ্রুর চোখে পলক পড়ে না, কী খবর? আবেদ শেখের চোখের দিকে চেয়ে সে হেঁকে ওঠে।

অনেক মানুষ একজায়গায় জড়ো হলে সব প্রসঙ্গই পিছলে পিছলে যায়।

ভিড়ের দক্ষিণ দিকে আলোচনা চলে এবারের খেজুরগুড় সম্পর্কে।

পশ্চিমের কোণে এবারের ধান নিয়ে।

ধান এবার যা হয়েছে ভালোই বলতি হয়!

ভালো হলি তো হচ্ছে না—ধান তো নে যাবে মালিক।

হ, তোমারে দিয়ে যাবে সব, না ?

না, সে-কথা হচ্ছে না—

সেইরকম কথাই তো কচ্ছ। মালিকের ধান দেবা না?

আরে, দেব না কচ্ছে কেডা—দিতি হবে তাই বলতিছি।

হঠাৎ সমস্ত কথা একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। ভিড় একাগ্র হয়ে মানিক-অবলার লড়াই দেখছিল ঠিকই—কিন্তু যে-কোনো জিনিসের মতোই তাদের যুদ্ধটাতেও তো উত্থান-পতন ছিল। একঘেয়ে মুহূর্তও ছিল। এমনিই স্বভাব মানুষের, এমনিই তার অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ক্ষমতা যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবল উত্তেজনাও তার ধাতে সহ্য হয়ে যায়। শুধু সহ্য হয়ে যায় নয়—সে বিরক্তি পর্যন্ত বোধ করে। তখন নতুন কিছু, প্রবলতর কিছু না হলে মনে দাগ কাটতে চায় না। মানিক-অবলার লড়াইটা এমনিতে যথেষ্ট উত্তেজক ছিল—চিন্তা করে দেখলে উত্তেজনায় হয়তো অসুস্থ বোধ করবে মানুষ, ছিঁড়ে যেতে চাইবে তার স্নায়ু—তবু মানুষ দু-চার মিনিটেই অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। মানিক কিংবা অবলা নতুন কোনো কেরামতি না দেখাতে পারলে মনোযোগ একান্ত হচ্ছিল না। এইজন্যেই কী এই বিরাট ভিড়ে কথার আর প্রসঙ্গের সংখ্যা ছিল না? ফাঁকে ফাঁকে জীবনের নানা কথার আলোচনা চলছিল? দুর্ভাগ্য এবং সুখ—কষ্ট ও যন্ত্রণা এমনকী প্রেম বা ভালো-বাসা, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও আল্লার দোজখ সব প্রসঙ্গই যেন ঘুরে ঘুরে আসছিল। কিন্তু এইসময় কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটে গিয়েছিল, না হলে সবার কথা একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে কেন? আর-কিছুই নয়—সেই মুহূর্তে ওরা দুজন—মানিক ও অবলা নিছক শারীরিক শক্তি পরীক্ষা করে দেখছিল। কোনো কলাকৌশল নয়, স্রেফ দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিল—ঘাড় সিধে রেখেছিল, শিঙের ব্যবহারও বাদ

দিয়েছিল। চঞ্চল নড়াচড়াও ছিল না আর। দুজনে মাথায় মাথায় দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অফুরান শক্তি প্রয়োগ করে যাচ্ছিল নিজের নিজের ঘাড়ে। বাইরে থেকে তেমন কিছু মনে হচ্ছিল না—শক্তি তো আর চোখে দেখা যায় না। ঘটনাটা নিঃশব্দে ঘটছিল। তবু বাহ্যিক লক্ষণ কিছু প্রকাশ পেল বইকি! তাদের চারটে চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। কখন যে চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে—বা কান দিয়ে রক্ত ছোটে, দুজনের একজনের ঘাড় মচ করে মচকে যায় কিংবা দুজনেরই শরীর বোমার মতো ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায় এমনি ভেবেই যেন প্রত্যেকেই চুপ করে আছে। সমস্ত ভিড়ের চোখ গিয়ে মল্লদের উপরে পড়ল। ষাঁড় দুটি কোনো ফাঁকে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঠিকই—কিন্তু এরা কী দমবন্ধ হয়ে যাবে প্রচণ্ড উত্তেজনায়! একচুল নড়ল না কেউ। শক্তি ভারসাম্য যেন অঙ্কের নিয়মে রাখল তারা—প্রায় সার্কাসের খেলার মতো বলা যায়—কেউ নড়ল না নিজের জায়গা থেকে! অবলা তো তার বেঁটে বেঁটে পাগুলো মাটিতে প্রায় পুঁতেই নিয়েছিল। মানিকের শরীরটা ছিল সামনের দিকে ঝুঁকে। বোঝাই যায় অবলার কাছে ব্যাপারটা পিছু না-হটার—মানিককে হটিয়ে দেবার নয়। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে দুজনে দুদিকে সরে গেল। তখন আবার কথা চলতে লাগল, উরে—কী সাংঘাতিক, মরবে, শালার একটা মরবে।

সোহ্য হয় না আর—চল দেহি, বারোয়ে খেদায়ে দিই···না হয় মারেই ফেলাই একডারে এ্যাহেবারে।

হয়েছে—আর বাহাদুরি কোবো না। ওদের কাছে যাবে কেডা জানডা খোয়াতি? চমৎকার নাটকের মতো জমে যায় দৃশ্যটা। একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রতিটি ঘটনাই আগের চাইতে প্রবলতর এবং চিত্তাকর্ষক—এজন্যে দর্শকরা আর অন্যদিকে মন দিতে পারে না। ওদের দুজনের প্রতিটি নাড়াচড়া, আক্রমণের ভঙ্গি, নৈপুণ্য বা কৌশল—দুজনের দুর্জয় সাহস—এইসব তাদের মুহূর্তে মুহূর্তে চমৎকৃত করে। মৃত্যুকে তাদের বিন্দুমাত্র ভয় নেই তা-ও পরিষ্কার বুঝতে পারে সবাই। কারণ যে-কোনো সময় একজন মৃত্যুর ফাঁদে জড়িয়ে পডতে পারে। কিন্তু তাদেব কোনো কাজের মধ্যেই সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতনতা নেই। কিসের তারা মোকাবিলা করছে তারাই জানে। কিন্তু মোকাবিলা করে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

রুষে-ওঠা অন্যান্য শব্দের মধ্যে মচ করে যে-আওয়াজটা ওঠে সেটা হয়তো ঠিক শোনা যায় না—কিন্তু মানিকের একটি শিঙের কালো খোলটি নিঃশব্দে উঠে

আসে। সেটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আস্ত শিংটির চাইতে খোল-ওঠা শিংটা ছোট—প্রথমে ধবধবে শাদা—তারপর রক্ত বেরিয়ে এল গোলাপী। কোনদিক থেকে রক্ত গড়াতে থাকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না—তবে আস্তে আস্তে পুরো শিংটাই রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় এবং যেন উপচে পড়েই তিন-চারটে রেখায় তার চোখের পাশ দিয়ে চোয়াল বেয়ে গলার দিকে নামতে থাকে। রক্তের গাঢ় লাল রঙের সরু সরু নালি সাদা লোমের উপর স্পষ্ট হয়ে বসে যায়। মানিক যেন কিছুই জানতে পারে না—সম্ভবত তার কোনো কিছুতেই যন্ত্রণার ছাপ ধরা পড়ে না। তবে দুর্বলমনা কোনো আধবুড়ো চাষী দৃশ্যটাকে সহ্য করতে পারে না। তার নাম রমজান শেখ, কালো লম্বা ছিরিছাঁদহীন কর্কশ চেহারা—খুব কাঠখোট্টা নীরস ধরণের। সে নিজে ভূমিহীন, অতি সামান্য জমি ভাগে করে থাকে, কংকালসার একটি বাছুর ছাড়া গোজাতীয় কোনো প্রাণী নেই তার, তবুও অভিভূত হলো সে। মাত্র একবার সে বিলাপ করে ওঠে, মারে ফালালোরে—আর বাঁচপে না আমাদের মানিক। এই বলে লোকটা ভিড়ের মধ্যে কারো তোয়াক্কা না করে কাঁদতে শুরু করে দিল। পুত্রশোক নয়, কিছু নয়—এত লোকের মাঝখানে কাঁদতে যেখানে স্বভাবতই লজ্জা পেয়ে যায় মানুষ—কী ফাঁদে যে আটকে যায়, সে কেঁদে কুলিয়ে উঠতে পারে না। চুপচাপ কেঁদে যাচ্ছিল সে—এমন নীরশ্রু ক্ষুদে রুক্ষ চোখ তার সে খুবই বেমানান লাগছিল জিনিসটা। মানিকের আঘাতটা নিঃসন্দেহে সাংঘাতিক হয়েছিল, দেখা গেল সে মাটিতে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। চারটে ঠ্যাংই উপরের দিকে তোলা, ক্ষুরগুলো সামান্য গুটিয়ে গেছে। অবলা যেন তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চায়। আদতেই তখন মানিককে অনেক ছোট দেখা যাচ্ছিল। অবলার এক-একটি আঘাতে মানিকের শরীরের অংশবিশেষ মাটি ছেড়ে উঠে আসছিল। গড়াগড়ি দিতে হচ্ছিল তাকে।

এই সমস্ত সময়টায় রমজান কেঁদে চলছিল। অবস্থাটার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অন্যেরাও চুপচাপ বসে থাকল। তারপর মানিক উঠল, বেচারার পা কাঁপতে শুরু করল থরথর করে। কিন্তু উঠে সে দাঁড়ালই। তখন আধো বিদ্রূপ আধো সমীহের সঙ্গে কার কথা ভেসে এল—ও রমজান চাচা, কাঁদতিছ ক্যানো? ওরে তোমার কী হলো?

মানুষগুলোর মুখ কঠিন হয়ে এসেছিল। দাঁতে দাঁতে আটকে গিয়েছিল। মানুষের কথার যোগসূত্র বোঝা দায়—মানুষ কথা দিয়ে কিসের অনুবাদ করে তাও ধরা যায় না—কখনো অনুবাদ করে মনের চিন্তার, কখনো-বা বাইরের দৃশ্যপট।

তাই নেহাৎই খাপছাড়াভাবে এই অবস্থায় কেউ গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে যেন রক্ত বের করে ফেলবে গলা ছিঁড়ে, এবার কোন শালা জমিতি আসলি, ধানে হাত দিলি, বাপ বলতি হবে না, জমিতিই মাড়ি নিতি হবে।

কৃষককর্মী রাত দশটার দিকে খবর আনে। শহরের ব্যবসায়ীটি লোকজন গুছিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত রাত থাকতে থাকতেই মাঠে এসে হাজির হবে। হাজার হলেও ভাড়াটে লোক—এজন্যে ঝঞ্ঝাট এড়ানোর চেষ্টা কেনই-বা তারা করবে না? চাষীরা প্রস্তুত হবার আগেই—অন্তত দৃঢ় প্রতিরোধ ঠিকমতো তৈরি করার আগেই যদি কাজ কিছুটা এগিয়ে যায়—বিভ্রান্তিকর একটি পরিস্থিতির মধ্যে কাজ হাসিল করে সরে পড়বার মোটামুটি একটা সুযোগ পেলে, টাকার বিনিময়েও কেনই-বা তারা সম্পূর্ণ পরের জন্যে জীবন বাজি ধরতে রাজি হবে? চুপিসাড়ে চোরের মতো আসাটা এইজন্যেই তারা পছন্দ করেছে যদিও দিনের আলোয় ডাকাতে রূপান্তরিত হতে বাধ্যও তারা। তাছাড়া এটাই সবাই জানে যে জমিতে প্রথম পা রাখারও একটি নিজস্ব সুবিধা আছে।

খবরটা চাষীরা শান্ত হয়েই গ্রহণ করল। একটু অবশ্য অবাকও হলো তারা। ধান এখনো ঠিকমতো পেকে ওঠেনি। কোনো বিশেষ কারণ না-থাকলে আর-একটু ধীরে-সুস্থেই ধানে হাত দিয়ে থাকে চাষী। কিন্তু ধান কেটে নিয়ে যেতে পারলে যার পুরোটাই লাভ—এবং কিছু কিছু নষ্ট হলেও যার গায়ে বাজে না, তার তো দেরি করা কোনোক্রমেই সাজে না।

অনেকে অনেকরকম কথা তোলে। থানার সাহায্য নেবার পরামর্শও দেয় কেউ কেউ। কিন্তু থানা অনেক দূরে এবং কর্মীটি খুব শান্তভাবেই জানায় যে থানায় ব্যবসায়ীটি আগেই খবর দিয়ে রেখেছে এবং সে যে ন্যায্য দাবি আদায় করার জন্যে আসছে একথাটাও বোধহয় বোঝানো হয়ে গেছে।

কৃষকনেতা ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছে। রোদে পুড়ে রঙটা তামাটে হয়ে গেছে তার। নোংরা মুখে ভারী অপরিচ্ছন্ন দাড়ি গজিয়েছে। গাল ভেঙে গেছে। কপালের নিচে গর্তের ভিতর থেকে চোখদুটি অস্বাভাবিক জ্বলছে। মোটা সুতির চাদরটা কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে। চোখের পাতাটা পর্যন্ত না ফেলে সে একদৃষ্টে জনতার দিকে চেয়েছিল। তারা তাকে ভাই বলে ডাকে, শ্রদ্ধাও করে—হয়তো গলে পড়ার মতোই শ্রদ্ধা—তবু যখন নীলচে ইস্পাতের মতো উত্তেজনা স্থির আছে জনতার মধ্যে, সেই অসহ ও তীব্র উত্তাপের সামনাসামনি একক কণ্ঠে দীর্ঘ ভর্ৎসনা

বেমানান তো হবেই। কাজেই কথা প্রায় কিছুই হতে পারল না। এমনকী কাউকেই কিছু বুঝিয়ে দেবার অবসর পাওয়া গেল না।

এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার যে কীভাবে একটি পুরো গ্রাম জেগে যেতে পারে। খুবই ধীরে ধীরে—প্রায় অলক্ষে—এমনকী পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তার আদান-প্রদানটা পর্যন্ত সীমিত করে দিয়ে সমস্বার্থের মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। অথচ কাজটা যে অত্যন্ত জটিল তা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হবে। বিপজ্জনক যে সেটা তো প্রশ্নের বাইরে। তা মনেই আসে না কারো। জীবন যেতে পারে নয় শুধু—জীবন যাবেই দু-চারটে এটা নিশ্চিত জেনেও কাজটা অবশ্যকরণীয় বলেই মানে তারা, বিপজ্জনক হিসেবে নয়। কাজটা জটিল নানা কারণে। প্রথমত প্রতিরোধ ব্যবস্থাটিকে প্রধানত আত্মরক্ষামূলক হতে হবে—জীবননাশক নয়। করণীয় হচ্ছে ধান কেটে আনা—কেটে নিয়ে প্রায় পালিয়ে আসা। এই কাজটা নির্বিঘ্নে ঘটতে দেবার জন্যেই পাহারা মোতায়েন করা, যাদের দায়িত্ব হবে প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখা। এসবই হলো অবশ্য পরিকল্পনা—সুস্থির চিন্তার ফল—বাস্তবে কী দাঁড়াবে তা বলার শক্তি কারোর নেই।

যাই হোক, অভিজ্ঞ লোকের অভাব কোথাও থাকে না—এক্ষেত্রেও নেই। অতিশয় ঠাণ্ডামাথা হিসেবে যাদের সুনাম, পরিকল্পনাটা রচনার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হয়েছে। তারা লোক বাছাই আরম্ভ করল, দেখা গেল এই কাজ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই টান পড়ল। মাত্র ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই একটি মাত্র কর্মসূত্রে বাঁধা পড়ে গেল প্রায় সকলেই—জড়িয়ে পড়ল বলা যেতে পারে। যুবকদের মধ্যে সামান্য দু-চারজন বাদে প্রায় সকলকেই ধান কেটে নেবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া ঠিক হলো। কারণ খাটুনে কৃষাণ হিসেবে এরাই সব চাইতে দক্ষ। কিন্তু সড়কি ও বল্লম চালানোর কাজটা বিশেষ দক্ষতাসাপেক্ষ, অভিজ্ঞতাই সেখানে বড় কথা। কাজেই হয়তো এমন দাঁড়াল যে যারা প্রতিরক্ষায় থাকবে তাদের অধিকাংশই প্রৌঢ় এবং শারীরিক দিক থেকে দুর্বল। তাদের কাছাকাছি থেকে যন্ত্রপাতি জুগিয়ে দেবার জন্যেও কিছু বিশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী মানুষ রাখতে হলো! এই-ভাবে প্রায় সকলেরই কিছু করণীয় থেকে গেল। এক পর্যায়ে এসে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে কাজটাই তাদের মন জুড়ে রইল—কী কারণে এই কাজে তারা নেমেছে তা আর মনেও থাকল না তাদের। নিজের নিজের কাস্তে পরীক্ষা করে নিল তারা। সড়কি এবং বল্লমগুলোয় মর্চে ধরে গেছে—দু-একটি বাতিলও হয়ে গেছে, ঢালগুলির বাঁশের ছাউনিতে ঘুন ধরেছে হয়তো। এইরকম অসংখ্য মেরামতের

কাজ করে নিতে হচ্ছিল দ্রুত হাতে। বাড়ি থেকে বাড়িতে সংবাদ আদান-প্রদান হচ্ছিল এবং গাঁয়ের পথে আজ অনবরত লোকজন হাঁটাহাঁটি শুরু করেছিল। মোট কথা যে-সময়ে গাঁয়ের মানুষ খেয়েদেয়ে কুপি নিভিয়ে দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে যায় —নির্বিবাদে মড়ার মতো পড়ে থাকে—এমনকী মহাবিপদেও যাদের জাগিয়ে তোলা কঠিন—ঠিক সেই সময়েই সমস্ত গ্রামটি উত্তেজনার অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু জ্বলে ওঠেনি কোনোক্রমেই, ধুমিয়ে উঠেছে। অসময়েই কামারশালে আগুন জ্বালানো হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কথার ধার বেড়ে গেছে এত বেশি যেন হিসিয়েই উঠছে ফিসফিস কথাগুলি।

কিন্তু যে ব্যাপারটা সবচাইতে বিস্ময়কর—রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য তা হলো নিশানাথকে ঐ রাতেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখা গেল। নানাধরণের কাজের জন্যে যারা বারবার যাতায়াত করছিল তাদেরই চোখে পড়ে দৃশ্যটা! এতে তারা যত না অবাক হয় তার চেয়ে বেশি ভয় পায়। নিশানাথ কি সদ্য সদ্য ভূতে পরিণত হয়েছে? তার মৃতদেহটি ঘরে পড়ে থাকতে থাকতেই? তারা নিশানাথের বাড়িতে চলে আসে। তার বউ তখন রান্নাঘরে বসে রুটি তৈরি করছিল! নিশানাথকে উঠে বসতে দেখে এমনিই অসহ্য আনন্দ হয়েছে তার যে বহু অনুনয়-বিনয় করে গফুরের মুদিখানা থেকে আধসের আটা এনে ফেলেছে ধারে। খুব নিবিষ্ট মনে কাজ করছিল সে। বাড়িতে হঠাৎ লোকজন দেখে ভারী চমকে উঠল।

উঠে বসিছ মনে হতিছে কবিরাজ?

এট্টু ভালো লাগতিছে এ্যাহন—বিরসমুখে নিশানাথ বলে। এতো রাত্তিরে কী মনে করে?

এই দেখতি আলাম তোমারে।

অ—নিশানাথ আবার হেলান দিয়ে বসল। তার ছেলেমেয়েগুলো যত্রতত্র শুয়ে আছে। বিছানা সবারই জোটেনি—চ্যাটাইয়ের উপরেই শুয়ে পড়েছে ময়লা চাদর মুড়ি দিয়ে। নিশানাথ বেশ আরামেই শ্মশান জাগিয়ে বসে আছে।

অসুখটা ভারী বাড়িছিল তো তোমার—তাই জিজ্ঞেস করতিছি।

হাঁপানীতে ওরহম হয়ে থাহে।

তার বউ রুটি নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, কবিরাজের ধন্বন্তরী এট্টু খাইয়ে দেলাম—তাই খায়ে উঠে বসল কবিরাজ—ওষুধটা খুঁজে বার করতি পরান বারোয়ে

গেছে আমার। মুখ টিপে হেসে সে আবার ঘরের বাইরে চলে গেল। নিশানাথ বাগিয়ে বসে খুব সইয়ে সইয়ে রুটি খেতে লাগল আলুবেগুনের তরকারি দিয়ে।

এ ব্যাপারটাও খুব তাড়াতাড়ি সবাই জেনে ফেলল। এবং এতে সবার উত্তেজনা বরং বেড়েই গেল। নিশানাথ কি অজেয় প্রাণশক্তির জোরে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এল তা ভেবে তাদের খুব অবাক লাগল। তাকে যে কতকগুলি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল—হতে পারে তারই জোরে সে ফিরে এসেছে। তবু অভিজ্ঞরা বলছে ভবলীলা সংবরণ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না—কারণ যে মানুষ খাবি খায় সে আর উঠে বসে রুটি খেতে পারে না। কাজেই বলতেই হয় ইতিমধ্যে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। এই সময় অনেক দূর থেকে মানিক বা অবলার চিৎকার শোনা গেল। গভীর মোটা ও ঘষা একটা গর্জন। খুব পরিষ্কার শোনা গেল—কারণ রাত বলে অন্যান্য কোনো শব্দ তো ছিল না। এত স্পষ্ট এল আওয়াজটা যে কারো কারো সন্দেহ হলো সেটা নিচে থেকে আসছে এবং এখুনি গভীর গর্জনে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

যত তাড়াতাড়িই হোক না—এতবড একটা কাণ্ড গুছিয়ে তুলতে একটু দেরিই হয়ে গেল। গাঁয়ের বাইরে আসতে আসতে কালো অন্ধকার আবছা হয়ে এল। নেতা বা কৃষককর্মী অনর্গল বক্তৃতা দিয়েও এটা এড়াতে পারল না। তবু খুশি হয়ে ওঠার কারণ ছিল তাদের। এত বড়ো কাণ্ডের নায়ক হিসেবে গর্ব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বাইরে এসে ঠাণ্ডা বাতাসে অত্যন্ত শীত করছিল তাদের—কানমাথা চাদর নিয়ে ঢেকেও হিম ঠেকাতে পারছিল না। এক জায়গায় গদাগদি দাঁড়িয়ে চাষীসুলভ নির্বিকার মুখে পুবদিকের লাল আকাশের দিকে চেয়ে তারা কী ভাবছিল তারাই জানে—প্রচণ্ড একটি শব্দে তাদের ভীষণ চমকে উঠতে হলো।

ঝোপঝাড ভেঙে লেজ উপরে তুলে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে অবলা প্রাণপণ দৌড় লাগিয়েছে, পিছনে মানিক। রাজকীয় বিশাল শরীর, উঁচু ককুদ সরু সরু সুঠাম পা। মাঝে মাঝে থেমে গর্জাচ্ছে সে। অবলা অ্যাতো জোরে দৌড়াচ্ছে যে তাকে লম্বাটে লাগছে।

ঘটনাটিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে দুর্বোধ্য কারণে সমস্ত মানুষ এক সঙ্গে গভীর খাদ থেকে চিৎকার শুরু করে তীব্রতার শেষ প্রান্তে গিয়ে থামে।

খাঁচা

সিঁড়ির কাছে এসে হাঁফ ধরল। বড্ড ঠাণ্ডা। কোনাভাঙ্গা আর স্যাঁতলা-পড়া। বড্ড পিছল। অধঃপাতের পথের মতো। সেখানে এসে ভাবল, যেতে পারছি না। তখন শিশিরের শব্দ। আর সেতার বেজে উঠল। গ্যাঁও-গ্যাঁও আওয়াজ অন্ধকারকে ধরে মুচড়ে দিলে কেউ যেন ব্যথায় কঁকালো। কই আলো আনো—কী করছো ছাই—আলো আনো না—ভারী অন্ধকার যে! সেতাব থেমে গেলে চিৎকার। আবার চিৎকার, আলো আনো।

অম্বুজাক্ষ বসে আছে সেতার কোলে। আমাকে খেপিও না এইভাবে। সরোজিনী উঠে এলে হারিকেনের আলো তাকে দেখে বিশ্রী হাসল। অম্বুজাক্ষের সবকিছু প্রকট হয়ে পড়ল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালে ল্যাপটানো শনের মতো হালকা চুল। দেয়াল ফাটিয়ে যে অশথ গাছটা উঠেছে তার কালো ছায়া পাগলের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

বসো—নিজেব পাশে মাদুরে বসার জন্যে অম্বুজাক্ষ সাদরে আহ্বান করে।

না—কাজ আছে।

একটু বসো। কাজের কথাই আছে তোমাব সঙ্গে। একটু বসো।

ছাদে বসে কাজের কথার ঢং ছাড়ো। কথা থাকে নিচে চলো।

তুমি ভাবছ তোমাকে বাইজি ভাবছি আমি তাই না?

হারিকেনের আলোয় সরোজিনীব শিরা-ওঠা শীর্ণ হাত তর্জন করে।

আমি এখন যাব।

ক'টা পান দিয়ে যাবে?

পান নেই বাড়িতে।

দোকান থেকে আনিয়ে দাও না—মাতালের ভঙ্গিতে সরোজিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে অম্বুজাক্ষ।

তখন উগরে দেয়। সরোজিনী গলগল করে উগরে দেয়। দ্যাখো কত বিষ আমার। অতি তিক্ত, অতি কঠিন গলায় সে বলে, ছাড়ো। ছাড়ো আমাকে।

সরোজিনীর সামনের বাঁদিকের দাঁতটা পড়ে গেছে। কথা বলতে গেলেই দুর্গন্ধ থুতু বেরিয়ে আসে। অম্বুজাক্ষ তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল।

পান আনিয়ে দাও না ক'টা দোকান থেকে—আবার বলল সে।

পয়সা নেই। আনবার লোক নেই কেউ এখন।

সূর্য কোথায়?

সে বাড়ি আসবে রাত বারোটার পর।

তুমি কি যাত্রা দলের ঘোষক—এঁ্যা!

একথার জবাবে হারিকেন রেখে সরোজিনী উঠল। যেয়ো না সরোজিনী যেয়ো না—তোমাকে আমার ভারী দরকার—এখুনি—সেতারে আকুল হয়ে এই কথাগুলো বাজাল অম্বুজাক্ষ এবং সরোজিনী সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। কাজেই বিকৃত হেসে অম্বুজাক্ষ সেতারে আলাপ চালাতে থাকে। শিশিরের শব্দ কানে আসে না, হাওয়া না থাকায় আলাপের বুকভাঙ্গা শব্দ ছাদেই ঘুরতে থাকে ভূতের মতো—তারপর সিঁড়ির ফাঁক পেয়ে সেদিক দিয়ে নামে—নির্জন বারান্দা ধরে নিবিষ্ট পায়রাদের ওপর দিয়ে শূন্য ঘরগুলোতে গিয়ে ঢোকে।

এইভাবে আজকাল সেতার বাজাচ্ছে অম্বুজাক্ষ। বিশ বছর পর। অবশ্য বিশ বছর আগে অম্বুজাক্ষের হাতে সেতার আনন্দিত হয়ে বেজে উঠত। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। অম্বুজাক্ষ হোমিওপ্যাথি ধরার পর। হোমিওপ্যাথি কঠিন জিনিস। মনোযোগের ব্যাপার। কিন্তু হোমিওপ্যাথি হোক আর এ্যালোপ্যাথি হোক আজকাল কেউ পয়সা দিতে চায় না। রোগ সেরে গেলে দুটো টাকা দিতে পারে। ক'সের চাল দিয়ে যেতে পারে। কিছু শাকসব্জি তরিতরকারি বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারে। কাজেই রোগ সেরে যেতে পারে—টাইফয়েড নিউমোনিয়া যক্ষ্মা ইত্যাদির মতো নির্দয় রোগ না হোক—নিদেনপক্ষে পেটের অসুখ, সর্দি, গা-গরম ইত্যাদি সারানোর মতো হোমিওপ্যাথি জানতে গেলে সেতার চলে না। থেলো হুঁকো হাতে বুড়ো বাপ এসে জিজ্ঞেস করলে, বাজনাটা ছেড়ে দিলি? ও-বাজনায় পাগল সেরে যায়—বেশ লাগত সন্ধেটা। ছেড়ে দিলি একেবারে? তাই অম্বুজাক্ষকে শুনিয়ে দিতে হয়, উপায় কী বলো? জমিজমা শেষ—তোমারও আর-কিছু করার শক্তি নেই, একপাল ছেলেমেয়ে। সংসারটা না দেখলে চলবে কেন?

শেষে হোমিওপ্যাথি?

আর কী করি?

একটা স্কুল—মানে একটা টোলের মতো করলে হয় না? আমাদের কুল-

বিদ্যা—বংশগতবৃত্তি।

অম্বুজাক্ষ বাপের দিকে চায়। হাতে থেলো হুঁকো, গায়ে ময়লা মোটা পৈতে —ঘোলা চোখ।

কী পেয়েছ জীবনে? কিছু পেয়েছ? খড়ম পায়ে চক্কোবত্তিগিরি করেছ। আর তো চলবে না, এখন পাকিস্তান হয়ে গেল—দেশ ভাগ হয়ে গেল—এখন কী হবে?

অতএব সেতাব পশ্চিমের অন্ধকার ঘরে সহায়হীন হয়ে ঝুলে থাকে। অম্বুজাক্ষ বাধক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু কবে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বঙ্গীয় রোগবিশারদ হয়ে যায়।

কিছু কী হচ্ছে? বাবা একেবারে ঘরের দরজায় দাঁড়ান।

অম্বুজাক্ষ খুচরো গুনছিল বাজিয়ে বাজিয়ে। ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। ঠিক যেন চিনতে পারছিল না একটু সময়। তারপর অন্যমনস্কের মতো বলে, এই আর কী। এই যেমন ধরো, বাবা—অম্বুজাক্ষ কথা শেষ করে না অথচ তার মাথাব মধ্যে বথা চলে এইভাবে, যেমন ধবো কেউ দিলে না—ধরো ছেলের পিলে বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু বাপ তার নিজের পিলের উপর ছেলেকে বসিয়ে নিয়ে এসেছে—এই অবস্থায়, হ্যাঁ জমির শেখের কথাই বলি আমি—এই অবস্থায় কার চিকিৎসা করা উচিত আগে আমি বুঝতে পারি না বাবা। আর পেটের পিলে থেকে কীভাবে টাকা বেরুতে পারে বলতে পারো। কিংবা পদ্মপিসির কথা ধরো—কুসীদ্দুটো দিলে, বাবা মাজ্জনা করে দে, আর পাবিনে, যমে নেয় না। এইরকম অবস্থা বাবা বুঝলে? এইবকম। থেলো হুঁকো যেন ফেটে যাবে—কালীপ্রসন্ন চড়াৎ চড়াৎ টানে—দম বন্ধ করে কাশে। হিরণ, (অম্বুজাক্ষেব ডাকনাম) অম্বু, আমার মানিক—বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস। আমি চিনি না ওকে। ও চেনে না আমাকে। বাবা, এই বয়েসে তোর কষ্ট মুছে দিতে চাই। প্রয়োজনে মরে গিয়ে। মরে গিয়েও।

খুচরো কতক্ষণ গোনা যায়। অম্বুজাক্ষ তাকায়। রোদের মধ্যে বাবা হেঁটে যাচ্ছে খড়মের আওয়াজ তুলে। কার্নিশে কাক ডাকছে। বাবা ফিরে এসো। অম্বুজাক্ষর ইচ্ছে করে। কালীপ্রসন্ন ফিরে এসে অম্বুজাক্ষের হৃৎপিণ্ড ধবে মুচড়ে দেয় কসাইয়ের মতো।

হিরণ, বাবা দু'আনা পয়সা দিবি? অসুবিধে হলে থাক।

কী করবে?

দাড়িটা কামিয়ে আসতাম। হাত কাঁপে, নিজে ক্ষুর ধরতে পারি না।

অম্বুজাক্ষ পয়সা দু'আনা ছুঁড়ে দেয়, যাও, যাও।

খড়ম করুণ হয়ে বাজে। ফিরে যায়। মহাদ্যুতিমান সূর্য প্রহার করে।

সকালে যে সর্বপাপঘ্নকে ডাকাডাকি করেছিল কালীপ্রসন্ন। সে।

কে যায়? অম্বুজাক্ষ হেঁকে ওঠে।

অরুণ।

শুনে যাও।

কেউ আসে না শুনতে।

কই অরুণ শুনে যা।

দূর থেকে সে বলে, পরে শুনব। জরুরি কাজে বেরুচ্ছি একটু।

এইসময় অরুণের মা সরোজিনী আসে। তার কাছে অরুণের ব্যবহারের অভিযোগ করলে সে উকিলের মতো জেরা শুরু করে, কী দরকার ওকে। অম্বুজাক্ষ কোনো দরকারের কথা মনে করতে পারে না। সে কিছুই মনে করতে পারে না। কোনো দরকারের কথাই তার মনে আসে না।

ওদিকটায় পাহাড় আছে, তাই না? দুহাতে মাটির উপর ভর করে সরোজিনী অম্বুজাক্ষের দিকে ঝুঁকে আসে, পাহাড় আছে বলছিলে না তুমি? রুগ্ন খুকির মতো বড়বড় চোখে সে চেয়ে থাকে, পাহাড় না থাকলে ওদিকে যাব না বাপু —আমার বাবা বলতেন—

ওদিকে পাহাড় কোথায় গো? অম্বুজাক্ষ খেতে খেতে বলে, নলহাটি থেকে তুমি পাহাড় দেখতে পাবে—ছোটনাগপুরের পাহাড়—ঠিক যেন নীল মেঘ, ভারী সুন্দর।

সেখানে যেতে পারব না? সরোজিনী ঠোঁট ফুলিয়ে আবদার করে।

আহা সে তো অনেক দূর—বিশ-ত্রিশ মাইল হবে। ওটা তো সাঁওতালদের জেলা।

তাহলে ওখানে বিনিময় বন্ধ করে দাও তুমি। কত কষ্টে দেশ ছাড়ছি। ইণ্ডিয়ায় গেলে বারবার কী বদলাতে পারব? বিনিময় যখন হবে একেবারে একটা ভালো জায়গায় যাওয়া ভালো না?

আচ্ছা সে করা যাবে—এত ব্যস্ত কেন? মনে হচ্ছে যেন আজই যাচ্ছ? অম্বুজাক্ষ বলে।

যেতে যখন হবেই—তখন তাড়াতাড়ি কী ভালো নয়? যত তাড়াতাড়ি মায়া কাটানো যায়। সবাই চলে যাচ্ছে। আমরাও তো যাব।

আমরাও যাব—আমরাও যাব। বাজে। বুকের মধ্যে। এইসব পরিত্যাগ করে, এইসবের মধ্যে মরে গিয়ে। একটা সজল আকাশ, একটি ঠাণ্ডা বাড়ি, পুকুর ঘাট, সাদা পথ, লতার মিষ্টি গন্ধ, জমির শেখ, পদ্মপিসি এইসবের মধ্যে মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওঠা। নতুন আলোয় চোখ রেখে নীল পর্বতশ্রেণী, উদ্রিক্ত সমুদ্র চেতনায় দোলে। আমরাও যাব। অম্বুজাক্ষ খুব তাড়াতাডি খেতে থাকে, আচ্ছা, আমাদের এই দেশেরই মতো দেখতে কোথাও গেলে হয় না? যেমন ধরো নদী আছে, গাছপালা একটু বেশি—কোনো ঠাণ্ডা জায়গায়? অম্বুজাক্ষ প্রশ্ন করে। অর্থাৎ একই পাখি দেখব—একই মেঘ আর আকাশ—এইরকম কথা বলে ফেলে সে।

কোথায় যাবে?

নবদ্বীপের কাছাকাছি কোথাও। শুধু নবদ্বীপ কেন—ও দেশটাই কতকটা আমাদের দেশের মতো। আমি গেছি তো—বেশ গাছপালা আর সব ছায়া ছায়া।

না বাপু জঙ্গুলে জায়গায় গিযে কাজ নেই। কোনো শুকনো জায়গায় চলো।

বাদ দাও এখন এসব কথা—অম্বুজাক্ষ বারান্দা থেকে হাত ধুয়ে ফিরে আসে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তিনটে বছর চলে গেল কিছুই করতে পারলাম না। বিনিময়ের পার্টি পেলেও হয় বনিবনা হচ্ছে না, না হয় গবমেণ্ট একটা কিছু বাঁধিয়ে বসছে। একটা-না-একটা গণ্ডগোল লেগেই আছে।

আমাদের কিন্তু পাকা বাড়ি চাই, এইরকম—সারোজিনী অবুঝ হবার ভঙ্গি করে।

সে তো বটেই। এতদিনের অভ্যেস কী ছাড়া যায়! পাকাবাড়ি ছাড়া বিনিময় করব না—অম্বুজাক্ষ ঘোষণা করেই আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল, সরোজিনী বলে, পান নিয়ে যাও। ভুলে যাচ্ছিলে নাকি?

বাইরের ঘরে আছি। ভ্যাবলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

ভ্যাবলা নেই বাড়িতে।

কোথায় গেছে?

জানি না—ও কোথায় যায় আমি জানি না।

তুমি ঘুমোও নাকি? জানি না—কী জানো তুমি আঁ? কী জানো সংসারের

—অম্বুজাক্ষ মুহূর্তে খেপে ওঠে এবং যত কথা বলে তত খেপতে থাকে! পাষণ্ডের মতো চেচাঁয়, তুমি আছো কী জন্যে? ছেলেপুলে এক-একটা মূর্তিমান হনুমান হচ্ছে। বড়বাবু দাড়িগোঁফ চাঁচতে শুরু করেছেন। এত বড় বেহায়া যে বাবার ক্ষুর নিয়ে গেছে চুরি করে। মেজোটি জনহিতার্থে মারামারি করে বেড়ান। তার পরেরটির পাত্তাই নেই। বলি এই যে শুয়োরের পালটি পোষা হচ্ছে—কেন শুনি?

সরোজিনীও রাগে দিশেহারা হলো, তোমার পিণ্ডি চটকাতে। তিন বছর ধরে তো খুব লাফাচ্ছ—ইণ্ডিয়া যাব, ইণ্ডিয়া যাব। কোথায়? হোমিওপ্যাথি করছেন—ছেলেপুলে এমনি মানুষ হবে, আকাশ থেকে টুপটুপ করে দেবপুত্র নামবে তোমার জন্যে!

শানের মেঝেতে খড়ম বেজে উঠল জোরে।

অন্ধকারে ধারালো ছুরির ফলার মতো চিৎকার সাঁৎ করে ছুটে আসে, সাপ, সাপ!

কোথায়, কোথায়? তিনি তো সাপ নন। সাপেদের রাজা তক্ষক। গৃহ-দেবতা। সবচেয়ে বড় আর সুন্দর ঘরটার উত্তর-পশ্চিম কোণ ফাটিয়ে যেদিন পান্নার মতো কচিপাতা নিয়ে অশ্বত্থ দেখা দিল, ঠিক সেদিনই অদৃশ্য চিড়গুলোর সূত্রপাত হলো। অশ্বত্থের পাতার ভিতরে সূক্ষ্ম জটিল জালের মতো চিড। তারপর সেই বর্ষার শেষে প্রথম শরতে তিনি এলেন, ডেকে উঠলেন—কট কট কট—তোক্কে তোক্কে এবং এবং মুহূর্তে পাতার আড়ালে চলে গেলেন। ছাদ ইতিমধ্যেই চৌচির হয়ে গিয়েছিল বলে ঘর থেকে বাস সরিয়ে নিতে হয়েছিল। সেই ভাঙা ফাঁকা ঘরেই প্রথম দর্শন হলো সেজো ছেলে অরুণের সঙ্গে! বেশ বড় একটা টিকটিকি, সবজে ছোপের সাদা রং। উপযুক্ত মারণাস্ত্রের খোঁজে বাইরে আসতেই দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা—কি ব্যাপার?

ঘরে একটা সাপ—মারব।

কই দেখি। দাদামশাই ঘরে এসে সেটার দিকে চেয়ে থাকেন। চোখ কুঁচকে উঠেছে, কপালে অসংখ্য ভাঁজ। কোনো প্রাচীনতাকে দেখছেন? তারপর আর কী? কাঁপতে থাকল ঠোঁট। চোয়াল-চিবুক ভেঙেচুরে কেঁদে ফেললেন, এতদিনে দয়া হলো? এসেছো আমার বাড়িতে? থাকো, অধিষ্ঠান করো চিরঞ্জীব! অরুণের দিকে ফিরে বললেন, ওরে সর্প নয়, সর্পরাজ রে দাদা। খবরদার ওর গায়ে হাত দিসনে।

এইসব কথা বলতে বলতে তক্ষক অশ্বত্থ গাছে চলে গেল। সেই থেকে

এখানেই আছে। আজ চিৎকার শুনে সরোজিনী দৌড়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তাড়াতাড়িতে কুপিটা নিভে গেল বাতাসে। চেরা গলায় চেঁচানি, সাপ কোথায় অরুণ, কোথায় সাপ দেখলি ?

এসো না, এদিকে এসো না। তোমার পায়ের কাছেই জঙ্গলে। খবরদার এগিয়ো না—আমি মারছি ওকে।

শুকনো লম্বা ঘাসে সরসর সব্দ। আগাছা আর ঘাস। লম্বা—প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সোনালী ঘাস। কাঁটাঝোপ। সেইখানে দাঁড়িয়ে সরোজিনী আপাদ-মস্তক থরথরিয়ে কাঁপে। ঐখানে বাঁধাঘাট ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে। কাকচক্ষু জল অন্তর্হিত। সেখানে এই অনাহুত নির্দয় ঘাস। দেয়ালে দেয়ালে বট আর অশ্বত্থ। সরোজিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে। কিসের খোঁজে যেন অরুণ দৌড়োদৌড়ি করে। প্রেতের মতো লাগে ওকে। অন্ধকারে শূন্য ঘরগুলো খোলা দরজা দিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে নৈঃশব্দ।

দাদামশাইয়ের ঘরে আলো নিভে গেছে। হয়তো স্থবির মাথায় কিছুই ঢোকে না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। হয়তো আবছা অতীত হানা দিয়েছে প্রাচীন মস্তিষ্কে। দুর্জ্ঞেয় কিছু চলছে-বা সেখানে। কাজেই আবার নৈঃশব্দ। অম্বুজাক্ষ বাড়িতে নেই—তামাক খেতে গেছে কোথাও। আর কেউ নেই বাড়িতে : কে ডেকে গেল যেন। পৃথিবী থেকে এইখানে। হাওয়ার মতো শিস দিয়ে উঠল। শ্বসিয়ে উঠল হালকা বড়বড় ঘাসে। হাওয়াই এমন প্যাঁচ কষল যে অগ্নিশিখার মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শুকনো ঘাস, কেমন লেলিহান হয়ে উঠল আর তার বিরাট দেহের জায়গায় জায়গায় ঢেউ উঠল। কেউ কাটে না এই ঘাস। সরোজিনী আপন মনে বলে। কী হবে পরিষ্কার করে—সব ছেড়ে তো যেতেই হবে। অম্বুজাক্ষই কি ফিসফিস করে উঠল ?

ইস, সব জঙ্গল হয়ে গেছে। অরুণ, ওদিকে যাসনে বাবা, পায়ে পড়ি তোর। কথা শোন।

চুপ করো তুমি—কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল।

সাপ মারতে হবে না, বাবা আমার।

সব ব্যাপারে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ কোরো না বলে দিচ্ছি। অরুণের হাতে লাঠি। লাঠি ঝাঁকিয়ে আস্ফালন করে চলল। এত নির্দয় যেন লাঠিই পড়ল সরোজিনীর পিঠে।

কোন দিকে গেলি ? বেরোও বাবা—সোনা আমার।

সেকি আর আছে রে—চলে গেছে। তুই বারান্দায় উঠে আয়।

খবরদার বুড়ি—রোষকষায়িত চোখে অরুণ চায়।

অন্ধকার লজ্জাহর। সরোজিনী অরুণকে দেখে না।

অরুণের কথা শেষ হয় না—অন্ধকারে আর-একটা আঁধার-বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। হিস-স-স। দিলি তো শালা কামড়িয়ে—পা চেপে অরুণ ঘাসের উপর বসে পড়ল।

কামড়িয়েছে? কামড়িয়েছে তোকে অরুণ? ভয়ঙ্কর চিৎকার করে সরোজিনী। ওরে তোকে তখুনি বললাম। কী করলি রে—তুই কী করলি?

চুপ করো, কামড়িয়েছে তো কী হয়েছে? কেঁউ কেঁউ করছ কেন?

তুই কী করলি রে বাপ—সরোজিনী বুক চাপড়ে চুল টেনে একটা কাণ্ড করে।

মারে যাব এই তো? বয়ে গেছে বাঁচতে। এই দ্যাখো কলা দেখিয়ে চলে যাব। অরুণ বিরাট অন্ধকারের মধ্যে বুড়ো আঙুল নাড়াতে থাকে।

হোমিওপ্যাথিতে সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে? অম্বুজাক্ষ কিছুতেই মনে করতে পারে না। একবার মনে হয় আছে—একবার মনে হয় নেই। আর্নিকা, পালসেটিলা, নাক্সভমিকা ইত্যাদি নানাকথা মনে আসে বাজে কথার মতো। তার বাবা কালীপ্রসন্ন অন্ধকার থেকে উঠে আসে না। শেষে সাব্যস্ত হয় হোমিও-প্যাথিতে সর্পদংশনের ওষুধ আছে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির মতো ওষুধ। তবে তার নাম মনে পড়ছে না। হতে পারে জানা নেই। বিদ্যে নেই। হতে পারে স্মৃতিবিভ্রম। যাই হোক ওঝার জন্যে অপেক্ষাই একমাত্র কাজ। ইতিমধ্যে অরুণ নেতিয়ে পড়ে গাঁজলা ভাঙে কষ বেয়ে।

আমি সত্যি করে মরে যাচ্ছি নাকি রে বাবা—ঘুমের ঘোরে অরুণ বলে। সরোজিনী বলে, অরুণ ঘুমোস না—ঘুমোস না অরুণ, অরুণ, অরুণ—অম্বুজাক্ষ ঝাঁকি দেয়, ঘুমিয়ো না অরুণ, ঘুমুলে সর্বনাশ হবে।

কী জানি শালা কী ব্যাপার—বলতে বলতে অরুণ নিদ্রার মধ্যে চলে গেল। ভোরের দিকে সে প্রস্থান করল চিরদিনের মতো।

জানো সরোজিনী, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল?

কিসের সব ব্যবস্থা?

বিনিময়ের—বলেই একটু বিব্রত হাসি হাসল অম্বুজাক্ষ।

অনেকদিন থেকেই তো শুনছি—সরোজিনীর হাতে একটা হাতা, রান্না

করছিল। রোগা মুখের ওপর চকচক করছিল চোখদুটো। একটু মেঘের মতো এসে সেটাকে ঢেকে দিয়ে গেল।

না এবার আর কোনো কথা নেই। আমাদের জমিসম্পত্তি সব দেখে গেছে।

পছন্দ হয়েছে? উৎসাহকে প্রশ্রয় না দিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল সরোজিনী।

পছন্দ হবে না মানে—এমন বাড়ি, এমন গাছপালা কোথায় পাবে। শুধু বলল, বড্ড জঙ্গল—পুকুরটার সংস্কার দরকার। আর বলল বাড়িটাকে তো শেষ করেছেন। অশ্বত্থ আর বটগুলোকে উৎখাত না করতে পারলে বাস করাই যাবে না। বাড়ি থাকবে না দু'বছরের বেশি। বললাম, আপনি এসে নতুন করে পত্তন করুন না। আমরা কী আর আছি এখানে? এ-বাড়িতে আমরা একরকম মরেই গেছি বলতে পারেন। কেন যাচ্ছেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। আপনারা কেন আসছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম উল্টো।

কী বললেন?

এই আর কী! ভবিষ্যৎ নেই—নিরাপত্তা নেই। যেমন আমরা বলি আর কী।

এখানে আসলে রাজা হয়ে যাবে ভাবছে না?

তাই তো মনে হলো। সব নাকি নতুন করে বানাবে।

আমিও তাই বলি—আমরাও সেখানে গিয়ে সব নতুন করে বানাব। এমন হয়েছে আজকাল যে চুল-নখ বড় হলে মনে হয় একবারে সেখানে গিয়ে কাটাব। তা ভদ্রলোকের বাড়ি কোথায়?

কাটোয়ার কাছে—অগ্রদ্বীপ।

খুব সুন্দর নাম তো!

এমনিতেও সুন্দর। ছেলেবেলায় গিয়েছিলাম একবার বাবার সঙ্গে। কী জন্যে যেন। খুব ছেলেবেলায়। ধবধবে সাদা মাটি আর বিরাট বিরাট মাঠ। মাঠের বুক চিরে রেললাইন গেছে। এদিকে কলকাতা, ওদিকে খাগড়া আজিমগঞ্জ, নলহাটি, ছোটনাগপুর ঘেঁষে বোলপুর হয়ে বর্ধমান—এইসব।

সরোজিনী রান্না বন্ধ করে দিল। এইসব শুনলে কিছুতেই কাজ করা যায় না।

কী বিরাট দেশ—অম্বুজাক্ষ বলে যায়, কোথায় যেতে চাও—দিল্লি, আগ্রা, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন? অতি অবহেলায় যেতে পার।

ওদের বাড়িটা কি পাকা?

হ্যাঁ পাকা। ঠিক জানি না। যেখানে খুশি যেতে পারবে—অম্বুজাক্ষ কথা শুরু করে।

কোথাও যাবার দরকার নেই আমার। কোথাও যাব না আমি। ভারী পরিশ্রম গেছে আমার সারাজীবন। চুপচাপ বিশ্রাম নেব সেখানে গিয়ে। আমাকে আর খাটাতে পারবে না তোমরা। একটা ছোট্ট বাগান করে দিও। শিউলি, বকুল, চাঁপা, গোলাপ এইসব গাছ দিয়ে—এককালে আমাদের যেমন ছিল।

ছেলেমেয়েগুলোকে এইটুকু বলেই অম্বুজাক্ষ থামল দম নিতে। সরোজিনীও কী বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে গেল। সূর্য আজকাল বাড়ি আসে না। লেখাপড়া ছেড়েছে বহু আগেই। যেখানে-সেখানে মারামারি, বদমাইশি করে বেড়ায়। তার পরের পাঁচজনের দুজনে বাড়িতে একটু-আধটু পড়াশুনা করে। বাকি তিন-জনে পরমানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝোপে-ঝাড়ে, মাঠে-ঘাটে—ছেড়ে দেওয়া গোরুর মতো। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে,ইণ্ডিয়ায় গেলে বাবা আমাদের ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, তাই না। নতুন জামা আর প্যান্ট দেবে।

ছেলেমেয়েগুলোকে ভর্তি করে দিতে হবে। গলা পরিষ্কার করে অম্বুজাক্ষ বলল। ওদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আজ যাব কাল যাব করে ওদের ইস্কুলেই দেওয়া হলো না তো। এই বলে একটু চুপ করে হঠাৎ অম্বুজাক্ষ বলে উঠল, হোমিওপ্যাথিতে কিছু নেই আজকাল।

কিছুতেই আর কিছু নেই—সরোজিনী বলে।

তাই মনে হয় আমারও।

তাহলে বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল বলছ?

প্রায়।

আবার প্রায়। এই না বললে হয়ে গেছে?

অনেকরকম বায়নাক্কা আজকাল—সহজে বিনিময় সম্ভব নয় আর।

আর কবে যাব? বুড়ো হয়ে গেলাম যে।

বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—তাই না?

অম্বুজাক্ষ অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। অশ্বত্থগাছ থেকে তক্ষক ডেকে উঠলে চমকে উঠল সে। বাইরে দুপুরের তীব্র রোদ। বাড়ির সামনের লম্বা ঘাসগুলো শুকিয়ে হালকা হয়ে গেছে।

ঠিক এখন আগুন দেবার সময়, অম্বুজাক্ষ ভাবল, একটিমাত্র দেশলাইকাঠি

খরচ করলেই হু হু আগুন জলবে, আগুন এগিয়ে যাবে ছাদে, বরগায়, শূন্য ধানের গোলায়—সরোজিনীর শুকনো হাড়ে। লাগিয়ে দিলে হয়, অম্বুজাক্ষ আবার ভাবল, তারপর সরোজিনীকে জড়িয়ে ধরি, বুকে টেনে আনি—তারপর আমি, সরোজিনী, বাবা, সূর্য, বরুণ, কমল, ভ্যাবলা সবাই দাঁড়িয়ে থাকি, সর্বনাশ দেখি—শেষে ধ্বংস হয়ে যাই। কী বিশ্রী কথা—অম্বুজাক্ষ ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না সম্ভবত, চোখ ঘষল বারেবারে, তখন দেখতে পেল অশ্বত্থগাছটা কত বড় হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠা করা গাছের মতো বিশাল, সবুজ—উত্তরদিকের দেয়াল-টায় তলা পর্যন্ত ফাট ধরেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে রোদ আরো তীব্র হয়ে উঠল আর যেন চোখের উপরেই চড়াৎ শব্দ করে দেয়ালটা চৌচির হয়ে গেল।

শীগগির একবার এদিকে এসো তো—সরোজিনী সোজা এসে ঘরে ঢুকল। অবাক অম্বুজাক্ষ তাকায়, কী হলো?

এসো না একবার।

অম্বুজাক্ষ ধীরে-সুস্থে ওষুধের বাক্স বন্ধ করে। ময়লা কোঁচাটা বার দুই ঝাড়ে ফটফট করে, চেয়ে দেখে সরোজিনী চলে গেছে। বাইরে এসে দরোজায় শিকল তুলে দেখল দ্রুতপায়ে সরোজিনী কালীপ্রসন্নর ঘরের দিকে যাচ্ছে। সেখানে এসে অম্বুজাক্ষ একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পায়—সরোজিনী দুহাতে আলিঙ্গন করে আছে কালীপ্রসন্নকে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে তাঁকে তুলতে। কালীপ্রসন্নের চোখ বোঁজা।

বাবার কী হয়েছে?

হঠাৎ পড়ে গেছেন। ধরো একটু, বিছায়ায় শুইয়ে দিই। কালীপ্রসন্ন তারপর নিঃসাড়ে বিছানায় পড়ে থাকেন।

কতবার বলেছি, বুড়ো মানুষ কোনো কাজ নিজে করার দরকার নেই। কিছুতেই শুনবে না। হলো তো—ভোগো এখন ছ'মাস। হোঁচট খেয়ে পড়েছে নিশ্চয়। অম্বুজাক্ষ ভারী তেতো গলায় এইসব কথা বলে। কিন্তু শোনা গেল কোনো কিছুতেই হোঁচট খাননি কালীপ্রসন্ন। খড়ম খুলেও যায়নি। হাঁটতে হাঁটতে বিনা কারণে পড়ে গেছেন।

অম্বুজাক্ষ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, শেষে বলে, তাহলে হয়ে গেল!

কী?

পক্ষাঘাত।

তক্ষকটা তক্ষুনি ডেকে ওঠে। কালীপ্রসন্ন চোখ মেলে ডাকেন, হিরণ।

অম্বুজাক্ষ বিছানার কাছে যায়। কালীপ্রসন্নের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, বাবা, কিছু বলছ ?

আমার কী হয়েছে হিরণ ?

কিছু হয়নি তোমার, এমনি পড়ে গেছ।

ডানদিকটা হঠাৎ কেমন অবশ হয়ে গেল, মাথা ঘুরে উঠল—

শরীর দুর্বল থাকলে অমন হয় বাবা, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কালীপ্রসন্ন ডানহাতটা নাড়াতে চেষ্টা করেন, হিরণ আমি হাতটা নাড়াতে পারছি না।

সব ঠিক হয়ে যাবে।

কালীপ্রসন্ন যেন কিছুই শুনতে পান না, দেখতে পান না, পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, তবে কী আমার পক্ষাঘাত হয়ে গেল রে ? না মরে গিয়ে আমি কী তাহলে ফাঁদে পড়ে গেলাম ?

অম্বুজাক্ষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কালীপ্রসন্নের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গাল ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেছে—জটিল গ্রন্থিতে দুর্বোধ্য লাগছে কদাকার মুখ।

মানুষ নিজের ইচ্ছায় মরতে পারে না হিরণ, তবে নিজেকে মেরে ফেলা যায় ইচ্ছে করলে। আমাকে মেরে ফেল বাবা, তোর পায়ে পড়ি, তোর ভালো হবে—আমি আশীর্বাদ করব তোকে।

কী পাগলের মতো বকছ—অম্বুজাক্ষের মনে আস্তে আস্তে বিরক্তি বাসা বাঁধে।

আমাকে একটা কিছু দে, খেয়ে মরি। আমি এক্ষুনি মরে যেতে চাই। হিরণ, বাবা আমার—কালীপ্রসন্ন জড়িয়ে জড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে।

এরকম করলে আমি এক্ষুনি চলে যাব।

তাহলে আমি কী করব বলে দে।

চুপচাপ শুয়ে থাকো।

বুড়ো মানুষকে কাঁদতে দেখলে অম্বুজাক্ষের বরাবরই আশ্চর্য লাগে, যদিও সে জানে একমাত্র বুড়োরাই কাঁদতে পারে ছেলেদের মতো। তবু শিশুদের কান্নার চেয়ে বৃদ্ধের কান্না অসহ, কারণ সে তার কান্নার মধ্যে সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ঢেলে দিতে পারে। কালীপ্রসন্ন সেই তেঁতো কান্না কাঁদে। তার স্বস্তিহীন কান্না নড়েচড়ে বেড়ায় ঘরের আনাচে-কানাচে—সবশেষে সরোজিনীকে কাঁদায়। সরোজিনী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দশ বছরের মেয়ের মতো কাঁদে। এই সময়ে ভারী নাটকীয়ভাবে সূর্য এসে ঢোকে। লুঙিটা হাঁটুর উপর তুলে পরেছে, খালি গা,

গুলিখোরের মতো চোয়াড় চেহারা—এসেই কালীপ্রসন্নের বিছানার দিকে চেয়ে চেয়ে স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

তার কথার কেউ জবাব দেয় না।

সঙের মতো সব দাঁড়িয়ে আছো কেন?

তোর দাদামশাইয়ের পক্ষাঘাত হয়ে গেছে রে সূর্য—ফোঁপাতে ফোঁপাতে সরোজিনী জবাব দেয়।

কী হয়েছে?

পক্ষাঘাত।

হয়ে যখন গেছেই কী আর করবে? কাঁদো কেন ফোঁস ফোঁস করে?

তার কথা এত রূঢ় আর অমানুষিক শোনায় যে কালীপ্রসন্ন পর্যন্ত লজ্জায় কান্না থামিয়ে ফেলে।

ওষুধপত্র করো আর কি, না মরা পর্যন্ত—সূর্য তেমনি হিসহিসে হিংস্র কণ্ঠে বলে, তারপর লোহার মতো কঠিন হাতে সরোজিনীর ডানহাতটা নাড়া দিয়ে আদেশ চালায়, দুটো ভাত দাও তো—খেয়ে একটু বেরুব—এই বলে সে বাইরে চলে যায়।

এই শহরেও শিয়াল ডাকে কেমন দ্যাখো—সরোজিনী চলে গেলে অম্বুজাক্ষ সেতার কোলে ভাবে। বাস্তবিকই, যেন হাজার হাজার শিয়াল চিৎকার করছিল একসঙ্গে। ভারী ঠাণ্ডা ছিল তখন বাতাস। এরই মধ্যে তক্ষকটা ডেকে উঠল কট-কট করে। সেতার থামিয়ে অম্বুজাক্ষ শিশটি অশথ গাছটার কাছে গেল। সাবধানে যেতে হলো। চুলের মতো সরু শিকড়গুলো এখন বড়বড় ফাটল হয়ে গেছে। হাঁ করে আছে। মাঝে মাঝে আজকাল ইট পর্যন্ত খসে পড়তে শুরু করেছে। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু অম্বুজাক্ষ জানে দু-একটি ফাটল এত বিরাট হয়ে গেছে যে, পা পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে ভিতরে।

অশ্বথ গাছটার নিচে গেলে ছাদ যেন দুলতে শুরু করল। সেখানে দাঁড়িয়ে অম্বুজাক্ষ তীক্ষ্ম চোখে তক্ষকটাকে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু পাতার ফাঁকে শরতের ঠাণ্ডা বাতাসই শুধু শিস দেয়। অনেক চেষ্টার পর হতাশ হয়ে অম্বুজাক্ষ হাত থেকে ইটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে আসে। ছাদে শেওলার আস্তর এত পুরু যে গালিচার মতো নরম লাগল তার, আর এই আবেশে থাকতে থাকতে এমন পিছল একটা জায়গায় এসে পড়ল যে, আর-একটু হলেই পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল অম্বুজাক্ষ। বহু কষ্টে সামলাতে হলো। তার বুকের ভিতরে হাতুড়ি

পেটার মতো ধক্‌ধক্ আওয়াজ সে শুনতে পেল।

সরোজিনী কী তাহলে আসবে না? এই ভাবতে ভাবতেই সরোজিনী এসে হাজির. নিচে চলো, খেয়ে নেবে। আমার কাজ আছে বিস্তার।

একটু বোসো না সরোজিনী—অম্বুজাক্ষ গলাটা কাঁদো কাঁদো করে ফেলে।

আজ তোমাকে কী ভূতে পেয়েছে? এরকম করছ কেন?

একটু বোসো সরোজিনী—অম্বুজাক্ষ মন্ত্রের মতো একটা কথাই আওড়ায়। মাদুরের এককোণে সরোজিনী বসে।

সে বসলে অম্বুজাক্ষ চুপ করে যায়।

আমরা আর যাচ্ছি না সরোজিনী—অনেকক্ষণ পর একটি একটি করে উচ্চারণ করে অম্বুজাক্ষ, তারপর কথাটার অনতিক্রম্য বিষাদ কাটিয়ে ওঠার জন্যে বলে হাসতে হাসতে, যাওয়া গেল না আর কী। সব গোলমাল হয়ে গেল। গিয়েই বা লাভ কী বলো? একই কথা। খবরাখবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয় এখানে তবু খেতে পাচ্ছি দুমুঠো—সেখানে লোকজন শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। সরোজিনী চুপ করে থাকে।

কোথাও যাব ভাবতেই ভালো—যাওয়া ভালো না। তাই না? এতদিন যাব যাব করে কাটালাম। এখন যেতে হবে না ভেবে দেখি কেমন লাগে—অত্যন্ত আবছা অস্পষ্ট কথা চালিয়ে যায় অম্বুজাক্ষ।

তাছাড়া সবাই কত ভালোবাসে—সবচেয়ে বড কথা বাবার এই অবস্থা, মানে মানে—না মরে যাওয়া পর্যন্ত—

কথাগুলো এত এলোমেলো হয়ে যায় যে, তার মাথামুণ্ডু ধরা যায় না। তাছাড়া সরোজিনী ঠিক প্রেতের মতো বসে আছে। সেজন্যে বাধ্য হয়ে অম্বুজাক্ষ আবার সেতার তুলে নেয় আর কত দ্রুতই না দেশ রাগের অভ্যন্তরে চলে যায়।

শেষ শরতের উছলে-পড়া কালো আকাশের মতোই স্থর উপছে উপছে পড়ে। হ্যারিকেনের লাল আলো আরো লাল হয়ে যায়। অম্বুজাক্ষ দুই চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ে তালে তালে।

এই সময়ে বিকট আওয়াজ করে সেতারের খোলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেলে অম্বুজাক্ষ চোখ মেলে সরোজিনীকে দেখতে পায়। সে তখন হাতের ছোট লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়েছে। সেটা চুরমার হয়ে গেলে সরোজিনী অম্বুজাক্ষের দিকে এগিয়ে আসে। অম্বুজাক্ষ বারবার চেঁচায়, মিনতি করে—সরোজিনী, আমাকে নয়, আমি নই।

জীবন ঘষে আগুন

রাজার হাতি এসে গেল। তার মেঘের মতো শরীর, তার স্থূলোদর, সেই মহাকায় পদচতুষ্টয় নিয়ে হেলতে-দুলতে মাঠের মাঝখানে দেখা দিল। সেখানে কোনো বৃক্ষ ছিল না, কোনো বট বা অশ্বত্থ—শুধু কিছু কাঁটাগাছ, পান্‌সে ছায়া বাবলা, বড়জোর শেয়াকুল ধরণের গুল্ম এইসব মাঝে মাঝে। আর অনেক বড় লাল মাঠ—গরমের তাড়সে পীড়িত অসংখ্য গর্ত ইত্যাদি। রাজার হাতির পা বসে যাচ্ছিল বারে বারে—এই রে ভগোমান—আতঙ্কে ও স্নেহে বলাবলি চলছিল—যারা মাঠ ভেঙে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিল রাজহস্তীকে তাদের মধ্যে। ভুস্ করে পা দেবে গেলে কখনো করী দাঁড়িয়ে গিয়ে আরশোলার মতো শুঁড় নাড়ছিল—কীরকম বোকা বোকা যেন ; তার পিঠের উপর পেটমোটা বাবুরা মহাবিপন্ন বদন ব্যাদান করে চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কতদূর, আর কতদূর। আসলেই অনেকদূর ছিল। হাতি গায়ে লাগাবে ডানদিকের দুটি গ্রামের ছায়া, আর কীসব নিবিড় চালচিত্রই বা পেরিয়ে গিয়ে তারপর সুউচ্চ মাটির স্তূপ। সেখানে রোদ-পোড়া মাটির গন্ধ আসছে আর তালগাছ বসানো সেই পাড়ির পরে মজা দীঘি। তবে তো স্থির জলরাশির দর্পণ সামনে-রাখা মহীরুহ বট পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে গ্রামের কোলে ধূলি দেখা যায়, মেঘসম, রুখু ধূলি, ইতস্তত সঞ্চরণশীল, এমন যে গাঁয়ের সবুজ রেখা অদৃশ্য হয় এবং বালকেরা দেখা দেয়। তাদের হাতে পাঁচন-বাড়ি—তারা সংখ্যায় অনেক, একটি বাহিনীর মতো। আদুল গা, ধূলিলিপ্ত, গামছা পরনে, কেউ-বা জন্মদিনের পোশাকে। তারা চেঁচায়, হাতি আলচে, মেলার হাতি আলচে। আবার বলে, হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি। এইরকম বলতে বলতে তারা হাতির পেছন নেয়। বৈশাখ মাসের শেষ দিনটির দুপুরের আকাশে কুত্রাপি মেঘ নেই—তাই আকাশের দিকে চেয়ে পেটমোটা বাবুদের চোখ টনটন করে—তারা আহা আহা করে ঘাম মোছে। হাতি বসে পড়তে চায়, ছায়া পেলে শুয়ে। কিন্তু ছেলেরা বলে, মাহুতের হাতে লোহার ডাঙা, শালা দেঁড়িয়ে পড়লে দেখিস শালার কী দশা হয়। আর পিছনের মাথায় বড় অতিশীর্ণ ছেলেটি ধূলির

উপর, হাতির পায়ের মসৃণ ছাপের উপর শরীর গড়িয়ে দেয়, হেইগো আল্লা, হেইগো আল্লা। ক্যানেরে গড়াগড়ি খেছিস ক্যানে, অরে ও গড়াগড়ি খেছিস ক্যানে? ধূলিশয্যায় থেকে লম্বা খেঁকটে মনুষ্যশাবকটি উত্তর দেয়, সুমুন্দি, অরে সুমুন্দি, হাতির পায়ের ছাপে গড়াগড়ি খেয়ে আমিও হাতির মতুন মোটা হব। তাই লিকি? তাই লিকি? অধিকাংশই তখন—সেইসব রাখাল বালকদের সবাই তখন মাটিতে লুটোপুটি খায়, হাতির মতুন গোদা করে দাও গো আল্লা—হেই আল্লা। তারা লালরঙের মাঠের উপর আপন আপন হাত উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে নাচতে নাচতে বলছিল তাদের পুরুষ্ট করে দিলে কত কী সুবিধা হয়। তারা লাঙল চালানোর মহড়া দিচ্ছিল, গোরুর গাড়ি চালানোর টোকা দিচ্ছিল টাকরায় জিব ঠেকিয়ে, চ, চ, দিঘেই, আর একে অপরের গায়ে হেসে কুটিকুটি হয়ে বলছিল, জমির ধানের ভাগ লিবি লিকি বে ভুঁড়িঅয়লা মাহাজোন? আয়না, এগু কল্লা দে। হাত উপরে তুলে ধরার জন্যে তাদের পেটের চামড়ায়, টান পড়ছিল আর তারা যে অভুক্ত এইরূপ অকাট্য প্রমাণ তাদের বিবর্ণ চামড়ায় দুর্বল পাঁজরে জিরজিরিয়ে নড়ে-চড়ে। আবার হাতির পা বসে যায় গর্তে—শুকনো বাতাস সেই গর্তের ধূলি নিয়ে পাক খেয়ে শূন্যেব দিকে উঠে যায়। ওরা চিৎকার করে বলে, হেই ভগোমান—তক্ষুনি পাশের ঝোপ থেকে একটি বিশাল বোডা সাপ নির্জীব-ভাবে এগিয়ে আসে, তারা আরো বলে, মধুসূদনই কাণ্ডারী—সে-ই বিপদ থেকে বাঁচায় গো; দেখছ না গর্ত থেকে বাইরে গিয়েছে মা মনসার চেলারা। বিশ্রাম লিচে ঝোপের ছেঁয়ায়, লয়কো? বালকেরা বলে।

রাজহস্তী পিছনের পা'দুটি টেনে-টেনে চলে। দেশটি বর্তমানে দিকহীন থ্যালানো একটি পাত্রের মতো—মাঝখানে ঢালু এবং কিঞ্চিৎ ঢেউ-খেলানো যার কিনারায় অস্পষ্ট গ্রামরেখা, কখনো-কখনো ছিন্ন—সেখানে ধোঁয়াটে দৃষ্টিহীনতা। এই পাত্র তপ্ত, তাতানো কাচের মতো ঠুনকো হালকা—কোনো কারণে বজ্রপাত হলে শূন্যে বিস্ফোরণযোগ্য—কারণ মাইলের পর মাইল কোনো ছায়ার ভাব নেই, সজলতার ওজন নেই। তাই জ্বলে—চিৎকারে কাঁপে কাসার পাত্রের মতো। রাজহস্তী হারিয়ে যেতে থাকে—তাব পিঠের উপর যারা ছিল তারাও। এমনকী শুঁটকো চেহারার যে-মানুষটি হাতির ঘাড়ে বসে-বসে তাকে উৎপীড়ন করছিল সেই মাহুতটিও। শেষ বোশেখের তীব্র রোদে প্রান্তর বিরক্ত বর্ণচোরা গিরগিটির ঘাড়ের মতো আগুনে-লাল। দিশাহারা হয়ে হস্তী দাঁড়িয়ে পড়ে—মাহুত দুর্বোধ্য চিৎকার করলে সে ধূলিধূসর খসখসে পিছনের পা-দুটি টানতে টানতে ইতস্তত

যায়। সঙ্গের মানুষগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলে, জল দাও ভগোমান—অমন ভুরকুট্টি করতে নেগো না। অর্থাৎ বৃষ্টি না হলে যাব কোথায় হে কাণ্ডারী—এখন এই যে আমাদের চোখ ধেঁধে গেছে, এজন্যে এই মাঠে হারিয়েছি। ছেলেরা অন্যমনস্কে বলে, শালোর হাতি কুলের আঁটিতে জব্দ—শালোর নোখের ফাঁকে কুলের আঁটি এটকে যায়নি তো মালিক!

উ একটু জল চায়গো--জলে চান করবে, জল তুলবে হুসহুসিয়ে—হাতি শালা জল চায়।

একটি ছেলে বলে, তা বাদে কলাগাছ খাবে খসর খসর খচমচিয়ে—এমনি শালো—গা ধুয়ে কেমন কালো কুচকুচে তেলপানা হবে। এই বলেই সেই ছেলে তার আরো বাল্যের স্বপ্নে ডুবল, গলায় গলায় ধূলি ভেঙে দুপুরের গরম রোদে পথ হাঁটতে হাঁটতে এমন স্বপ্ন জমে যায় তার যে সে, ঐ ছেলেটি অকূলে হাবুডুবু খায়, যেন তার হাতের বাঁশি এখুনি বাজছে, যেন পাকা আমের গন্ধে তার বর্তমানের শূন্য পাকস্থলী পাকিয়ে উঠছে। আরো সে দেখে, লোকের মেলা, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিরাট গাঁ-টির নিচু-নিচু ঘোরানো রাস্তায়—কত তারা গো—কত, কোথা থিকে আলচে এত নোক আর কী সব মেঠাইয়ের দোকান গ—অঃ, শালো জিবে পানি আসে যি আর হিঁদুরা কত পাঁটা কেটে লিয়ে যেচে—কাঁদে করে লিয়ে যেচে এন্তার পাঁটা—মাতা নাই একটোরও—সিসব কামারে লিয়েচে। মজা কত মেলায় আর নামোয় এত নোক, এত আওয়াজ, এত মজা—ওপরে হাতিটো কেমন কালো কুচকুচে, কলার পাতা খেচে।

বালকটির দিবাস্বপ্ন বড়ই সংক্ষিপ্ত—যেন-বা আরম্ভ হতেই শেষ হয়ে যায় এবং সে পিপাসায় যৎপরোনাস্তি কাতর, গলা তার শুকিয়ে কাঠ, তার নাড়ি পাক দিয়ে বমন উদ্রেককারী, সে সম্ভব করে তুলতে পারলে লাল ধূলিই খেয়ে নেয়এক আঁজলা আর এই অরণ্যে কোথাও জল নেই, রাজহস্তীর রং কটা, সেই নধর শ্যামজলধর-কান্তি পলাতক—ধুলোটে বিশ্রীই বরং—পরন্তু এখন খোঁড়াচ্ছেন তিনি। জল খেতে চাই, পেটমোটা বাবুরা বলে, কিন্তু এই মৃত ভূভাগে মনুষ্যই-বা কোথায়—জলাশয়ই-বা কোথায়—কাজেই অতঃপর বাবুরা চুপ করে যায়—চোখ মিটমিটিয়ে পেছনে জনতার দিকে চায়। ধান কাটার পর নাড়াগুলি জমিতেই রয়েছে অতঃপর এই ধান কোথায় যায় ভেবে একটি বাবু পেটে হাত রেখে গভীর উদ্গার তুলে বলে, জল খাব। সূর্য ঠিক তার তালুতেই বসে শাবল চালাচ্ছে, হাতির ছায়াটি শুয়োরের মতো—আরো অদ্ভুত, পিছনের জনতাটি অদৃশ্য হয়েছে। শুধু মাঠের

উপর শীর্ণ এক দঙ্গল ছায়া নেমে আসে। তখন প্রাণবন্ত সেই লখা ছেলেটি লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে বলে হাতিটো কানছে ক্যানেরা্যা—অ দেখ, অর চোখ থেকে লুই গড়াইছে। হাতি এই কথায় দাঁড়িয়ে যায় বটে কিন্তু স্বপ্ন-দেখা বালকটি আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে। তাতে বিকট শব্দ হয়—ছেলেটি তলপেট চেপে ধুলোয় মুখ ঘষে। দলপতি লম্বা বালক পা দিয়ে চিৎ করে তাকে, হাতি আলচে তো তোর বাপের কী—মেলা হবে কালকে, হাতি যাবে মেলায়, কত নোক আসবে। তা তু শালা এলি ক্যানে—তোর বাপের কি। বালকের ধূলিভর্তি কণ্ঠ থেকে লাল ধুলো আর ফ্যাঁস ফ্যাঁস আওয়াজ বেরোয়, আল্লার কিরে—আমি মেলায় যাব। এই বলে সে নিশ্চল হয়।

মৃতকে দেখার জন্যে যেমন সারি দিয়ে দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে যায় তেমনি ছায়াগুলি তাকে ঘিরে দাঁড়ায় কঠিন মুখে। হয়তো কিছু খেলে আর জল পেলে সে আবার মিছিলে থাকতে পারে এই সম্ভাবনায় তারা রাজহস্তীকে ঘিরে ধরে। কি জানি বা দাঁতে ছিঁড়বে কাঁচা হস্তীমাংস—সেই তাদের তীব্র চোখ জ্বলে, ও বাবুরা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? আমাদের কিছু দিয়ে যাও না বাবুরা—কিছু চাল না হয় পয়সা। মেলা এবার হচ্ছে না। কে যাবে মেলায় গো ? মায়ের বলি নাই এবার—মায়ের উপোস। যেমন ছেলের উপোস, তেমনি মায়ের উপোস। বাবুরা ফিরে যাও। তারা আরো বলল, দীঘির মাঝখানের গহীন হিম জলরাশি থেকে পাথরের মাতৃমূর্তি ঘাটে উঠে আসবে না এবার যেমন অন্য-অন্য বারে আপনি এসে আপন অপূর্ব মুখশ্রী তুলে ধরে কয়, বাছারা এলাম। তারা আরো বর্ণনা করল কেমন করে ভোরবেলাকার প্রথম বাতাসটি আসে—নেডামাথা বামুন বিশাল টিকি নেড়ে ফোকলা দাঁতে হেসে বিগলিত হয়—তারপর কীভাবে সর্বকিছু বন্ধ হয়ে গেলে মা মা রব ওঠে, গা ছম্‌ছম্‌ করে আর টুক করে মায়ের মূর্তি পাড়ের কাছে চলে আসে। এইসব অতিসত্বর বর্ণনা করে ছায়াময় জনতাটি বলে বাবুরা ফিরে যাও. ইদিকে কেউ বেঁচে নাই বটে—ফেরো বাবুরা ! সর্বশেষে তারা গালিবর্ষণ করে বলে, শালারা বাড়ি যা, মেলায় কেউ যাবে না, হাতি গিয়ে কি হাতি হবে ! বাড়ি যা—যেখানে গুড়গুড়ি হচ্ছে সেখানে চুলকোগে যা। আরূঢ় ব্যক্তিরা তখন অপমানিত হয়ে দু-একটি আনি-দুয়ানি-সিকি ছুঁড়ে আবার রাজ-হস্তীর পথ করে নেয়। কারণ আরম্ভ করলে ফিরবে কেমন করে ?

তথাচ তথায় জনসমাগম শুরু হয়েছিল। চারিপাশের জনপদসমূহ হতে দুর্জ্ঞেয় সংস্কারের টানে বা কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় অথবা অভ্যাসে বা শূন্যোদরের

প্রতিপক্ষ হিসেবে উৎকট উত্তেজনার খোঁজে যারা আসতে শুরু করেছিল মাঠ এবং বনবাদাড় ভেঙে তারা হয়তো ভেবেছিল আমরা এই মেলায় যাই ; অতি পবিত্র পীঠস্থান এইটি, আমরা মায়ের সন্তান—যদিও অন্নপূর্ণার ছেলে আমরা, আমাদের ধান উঠল বেজন্মা বাপের বাড়িতে, বিটি সেখানে দাসীবিত্তি করে। তবু আমরা মেলায় যাব, কারণ স্থানটি পবিত্র—এইজন্য যে সতীর দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙুলি এই স্থানেই ছিটকে এসেছিল। অতএব এটি আমাদের পীঠস্থান ; আরো মা যে খিদের চোটে তলপেট চেপে কঁকাচ্ছে—বেটি তো ইচ্ছে করলে কোনো ভুঁড়িঅলা জোতদারের ঘর করতে পারে—তবুও আমরা মেলায় যাব, যদিও দেশের আকালে কে কারে কথা কয়, নধরকান্তি কিছু দেখলেই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়, তবু যদি মেলায় গেলে কোনো ফন্দিফিকির হয়। আর-একদল ভাবল, আমরা মায়ের গল্পে বিশ্বাসী না, তবু মেলায় কতরকম রংবাজি, ঠকবাজির আমদানি সেখানে। খিদেয় যদিও চোখে দেখতে পাই না তবু আসমানের আল্লা আমাদের ভুলেছে বলে আমরা কী পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁদিয়ে বসে থাকব ? অতএব, দেশটি জলে ছারখার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, অতি ভয়ঙ্কর বাবুদের কটুগন্ধের মধ্যেও ; আর যেভাবে মরুভূমির মতো খোলা দেশে বিরাট বিরাট মাঠ ঝেঁটিয়ে হাহাকার আসছিল তাতেও সারি সারি মানুষের চলার বিরাম ছিল না। মেলায় যাবার পূর্বে দীঘিটি দৈর্ঘ্যে পাকা এক মাইল ছিল, তার পূর্ব-পশ্চিম দুই পাড় যেন অতি-কায় পাহাড়—অথচ তার গর্ভে একটু পানি নেই—হায়রে ঘাসও যা ছিল গোরুতে সাবাড় করেছে, কেমন পদ্ম ছিল এককালে, এখন তাদের বংশমাত্র নেই—দীঘিতে বিশাল নরমুণ্ড পাবার পর আর কি সন্দেহ থাকতে পারে সর্বনাশের ! জনপদসমূহ হতে এই দীঘির পাড়ে যারা আসতে থাকে, তাদের মহাপ্রস্থান পথের যাত্রী বলে মনে হয়—দলে দলে তারা আসে, হাঁটুভর্তি ধুলো আর ঘন বাদামি চামড়ার রঙ তাদের চোখে রুক্ষ ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। কিন্তু তারা কখনো পাঁঠাগুলিকে ফেলে আসেনি ! অন্তত একটি দিনের এই চমৎকার ভোজ্যের পায়ের খুর থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত যেখানে পুনঃপুনঃ লোভায় সেখানেও আছে শক্তিধর বাধা। মায়ের বলি কাজেই টুকটুক অনুসরণ করে তীর্থযাত্রীকে। অতএব স্থানটি অজে পরিপূর্ণ। এই পশুগুলির চোখের জলে তাদের লোমশ গণ্ডদেশ ভিজে—তাদের চিৎকারে শূন্যোদর ঢোলের মতো বাজে—তবু ভ্যা ভ্যা ভ্যাবানিতে অতিষ্ঠ পূজার্থীর আছাড়েই তাদের প্রাণ-বধের বাসনা হয়। আরো স্থানটি কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে অবস্থিত—একটি দীঘির পূর্বপাড—সেখান থেকে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী কাকচক্ষু জলে নামে—অন্যদিকে অনেক নিচে

গ্রাম গড়াতে গড়াতে যায়—পর্ণকুটিরগুলি আসলে মেলার দোকানপাট এবং বাম-দিকে উত্তরে স্কুল বর্তমানে মেলায় আগত অবলা শিশুদের দুগ্ধকেন্দ্র অর্থাৎ হংস-শুভ্র জলদানস্থল। আরো পুবে একই সারিতে এইমাত্র ক্যাঁচকোঁচ শব্দে নাগর-দোলাটি চালু হলো—তার পুবে একটি ছোট উঁচু টিলার বধ্যভূমি সিঁদুরচর্চিত যূপকাষ্ঠ। এই পটভূমিতে এখানে, উচ্চে, আওয়াজ আসে ক্ষীণ যদিও নিচে কোলা-হল এখনো নিম্নগ্রামেই আছে—কারণ পুজো আগামীকাল, মা এখনো ঘাটেই আসেনি—যদি না আসে কী বিষাদ! তাছাড়া দোকানপাট এখনো তৈরি না, কেবলই ঠকঠক শব্দ পেরেক পোঁতার বা বাঁশ কাটার। তাছাড়া মাটির উনুনগুলো এখনো চুপচাপ আছে। কাজেই শলাপরামর্শের মতোই কলরব যেন-বা গুনগুনানি মাত্র। আরো দূরে দীঘির ঢালু পাড়ে দুবার মাত্র ব্যাণ্ড বেজে চুপ—ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে কনসার্টওলা একবার ডেকে উঠেই নিঃশ্বাস পায়নি। তাদের সার্কাসের নোংরা তাঁবু ছিঁড়ে ছিঁড়ে আকাশের গায়ে ঝুলছে এমনি মনে হয়।

সেইদিন বিকেলে পশ্চিম আকাশে ন্যাবলা ন্যাবলা মেঘ, অল্পক্ষণ পরেই একটি উত্থানের মতো—এই-বা কোন যুদ্ধক্ষেত্রের ধূমস্তম্ভের মতো, এই-বা ভালুকের মতো নীল আকাশ গপগপ করে গেলে—কখনো-বা বিশাল গজরাজ শুঁড় তোলা, আবার পরের মুহূর্তেই যেন তুঙ্গ পবর্তশৃঙ্গ। সেইদিকে চেয়ে চিৎকার, ম্যাঘ আলচে খোদা, পানি হবে ইবার—ছয়লাব হবে দুনিয়া, মাঠে 'পর' হবে—ব্যাং ডাকবে—আমরা ভিজব গ। এসব বালকবৃন্দ ভাবে। আসলে তোমাদেব শস্যক্ষেত্রে বর্ষণ হলে আমরা মাঠে নেমে যাব—জমিতে ধান হবে—তোমরা ইদিক পানে এসবে না—তোমাদের গোলা ভরবে মালিক—তোমাদের দেনা শুদে বাড়ি আসব মালিক, তা বাদে কী করব আমাদের নিজেদের বিশ্বেস নাই। মুখে গামছা জড়িয়ে, বুকে হাঁটু সেঁটে এখন তো বিষ্টি চাই। মেঘটি ওজনে ভারী হয়ে অর্ধেক আকাশ গিলে ফেললে মেলার উচ্চতম স্থানটি থেকে লোমহর্ষক চিৎকার বাজে। সেই শুনে হস্তীটি চঞ্চল হয়ে একটু দোলে। আকাশে সে নিজের ছায়া দেখে চঞ্চল হয়—হস্তীপক্ষ প্রার্থনা করে নিদারুণ বৃংহিত হানে। আর যখন দেরি করা যায় না—কারণ আস্তে আস্তে মেঘ পানসে হয়ে আসছে, সামান্য লাল হয়ে চোখ রাঙাচ্ছে, তখন রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেতাদুটিকে আনা হয়। তাদের চামরসদৃশ লেজ ঘনঘন সঞ্চালিত হচ্ছে—তাদের বাঁকানো শিং চকচক করছে—তাদের ভুরুর উপর উত্তেজনার ভাঁজ। এই অতি তরুণ ষণ্ডদুটিকে সামনে রেখে পিছনে তারা বসে মাটির উপর উবু হয়ে। সেই উপবিষ্ট জনতার সামনে পুরোহিত, তার কপাল

চন্দনচর্চিত—তার পরনে গেরুয়া—তার চোখের বড়ই নিষ্ঠুরতা, কারণ সে-ই নির্বোধ ভক্তির একমাত্র অধিকারী। যুগে যুগে তাকেই মানা হয়েছে। দুটি বলিষ্ঠ যুবক এখন ষাঁডদুটিকে লাঙলে জোতে, সে-দুটি যে লাঙল কখনো দেখেনি তাই কিছুতেই বাগ মানতে চায় না। এইবার শুরু করা যায় বলে অতি ধীরে একটিমাত্র গভীর কণ্ঠ গড়িয়ে গডিয়ে বলে যায়, সুজলা-সুফলা এই বঙ্গভূমি, আমরা আদ্যন্ত আনন্দে আছি—খেয়ে-পরে বেঁচেবর্তে সুখে আছি—আমাদের পুকুরভর্তি মাছ, গোয়ালভর্তি গাভী, মাঠভর্তি ফসলের কোনোদিন অভাব হয়নি। এই কারণে এই মাটির কাছে আমবা ঋণী। এই মাটির জন্যই আমাদের দরজা থেকে কখনো কোনো অতিথি ফিরে যায়নি। গরিবগুর্বো, কামার-কলু, চাষী-তাঁতী, ছোটলোক, হাড়ি-বাগদি-ডোম সবাই আমাদের প্রসাদ পেয়েছে। এ পর্যন্ত বলতেই উক্ত ব্যক্তির বিরাট উদর থেকে ঢক্কানিনাদেব মতো এমন উদ্‌গারধ্বনি আসে যে তার চোখ-মুখ কুঁচকে কথা বন্ধ হয় এবং প্রথম সারিতেই উপবিষ্ট তেঁতুলে বাগদির দলটি একলাফে উঠে দাঁডায়। সেই মানুষ-গুলির পেশী দড়ির মতো পাকানো—তাদেব বুকের নিচে গভীর গহ্বর, এজন্যে তারা সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন হাতে কান ঢেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে মুদিতনেত্রে সঙ্গীতের ক্ষীণ চিৎকার তুললে তার গলার শিরা দৃষ্ট হয়। সে গানে বলে, ও তুই চোখে দেখবি অন্ধকার, আবার বলে, চোখে দেখবি অন্ধকার—বারবার একই কথা বললে অন্যদের চোখে কেমনধারা আগুন জ্বলে। এই ঘটনায় গোলাভর্তি ধান ও পুকুবর্ভতি মাছের কাহিনী আর শেষ হতে পারে না। দলে অতিবৃদ্ধটি হাত তুলে গান থামিয়ে বলে, তু মদ খেঁয়েছিস গ—অত্যন্ত মদ খেয়েছিস। ইটি তোর উচিত লয়। বাবুভাইদের কতার মধ্যে গানের কোনো কতা নাই। তা তু মদ খেঁয়ে এই কাণ্ডটি করলি বটে। অন্যেরা বলে, উ মদ খেঁলে সত্যি কতা বলে—এইটি উয়াব দোষ—তেবু মোদো-মাতালের কতা বাপু উতে কান দিলে ধম্ম থাকে না। কিন্তু তাতেও আর দুধভাতের গল্প জমে না—বক্তা তার শালগমের মতো ন্যাডামাথা পুনঃপুনঃ চুলকোয়। তখন বৃদ্ধটিই আবার বলে, ঠাকুরমশাইয়েব কাছে গড় কর তু—নমো কর—ই কথা কি তু জানিস না, এই জগতে কে তুকে তরিয়ে দিতে পারে? সেই গায়কটি তখনো যেন তুরীয়ভাবে থাকে—কিছুই সে শোনে না—তার চোখ বন্ধ, মুখ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত—বড় সাংঘাতিক নিঃশ্বাসের ঘডঘড় আওয়াজ আসে—তোলপাড, উক্ত ব্যক্তির জঠরদেশ তোলপাড়, পদদ্বয় কম্পমান। গায়কের এই ভাব দেখে বৃদ্ধ ভীষণ ক্ষিপ্ত

—তীব্র গালাগালি বর্ষণ করতে থাকে, খেঁকি কুকুর জন্মিত ধাড়ি শুয়োর তুর মা —এঁটোখেকো অতিখচ্চর তু। তু শালো ক্যানে আমার কথা শুনিস না? এতক্ষণে অন্যদের, ঐ তেঁতুলে বাগদির দলের চোখের আগুন নেভে। গায়ক একটি-বারমাত্র ডাকে, কাকাগো! আহ্বানটি সম্পূর্ণভাবে হাওয়ায় মিশে গেলে তার চোখে মৃদু জল আসে কিন্তু জলের গনগনে আঁচ পেয়ে আগুন পুনরপি চাড়া দেয়। তখন এমন যে সেই বৃদ্ধ—যার নাম অভিরাম—অতিবৃদ্ধ এমতো যে তার মুখের ভাঁজ গণনীয় না, গলিতদন্ত সে—সে প্রাচীন মহীরুহের মতো বড়ই রহস্যময় উপকথাবহুল—সেই বৃদ্ধ এমনভাবে ক্ষান্ত হয়ে গেল যে পূর্বকথিত পুরোহিত মহাশয়ের গল্প সম্পূর্ণত মাঠে মারা যায়। ইত্যবসরে স্বঠাম যুবকেরা মাঠের ঢালুতে সমবেত হয়েছে—তারা ষাঁড়দুটিকে নিয়ে হাস্যপবিহাসে মগ্ন। যুবকরা শক্ত দড়ি দিয়ে ষাঁড়দুটিকে জোয়ালে বাঁধে—শণেব তীক্ষ্ণ রশি তাদের কাঁধের মাংসে কামড়ে বসে যায়—বাবলা কাঠেব জোয়ালটিকে তারা খুবই অপছন্দ করে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা কবে। নতুন চকচকে ফলাঅলা হলটিকে জোয়ালে আটকে দেওয়া হলে তারা একবারমাত্র রাগত গর্জন ছাড়ে। উন্মুক্ত-ফলা উক্ত লাঙলটি এখন দোদুল্যমান, শুধ ফলাটি মাটি স্পর্শ করে মাত্র—পাথুরে মাটিতে ঘর্ষণজনিত খড়খড় আওয়াজ ওঠে। এমন অবস্থায় ষণ্ডদুটি ভারী চঞ্চল—কোথা থেকে-বা কিছু মাছি তাদের উত্যক্ত করে—তারা তরুণ, অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত. ভারী ব্যস্ত—হয়তো-বা এইসব ভিড-হুল্লোড-চিৎকারে নিদারুণ ভীত এ-কারণে পলায়নপর—তাতে যুবক-দের পরিহাসতরল হাহা হিহি হাস্যরোল—স্থূল বিদ্রূপ।

সমস্ত দৃশ্যটি বর্তমানে পরিপাটি। দীঘির পশ্চিম পাড়ে উচ্চতম স্থানে জনতা—সেই গম্ভীব নামাবলিধারী সান্তনাপরায়ণ পুরোহিত—সেই অতিরাগান্বিত জল-বিদ্যুৎ বর্ষণকারী তেঁতুলে বাগদির দল—বর্তমানে কিয়দপরিমানে নমিত; পশ্চিমে পাড় ঢালু হয়ে নিম্নে নামে—পাড়ের শেষে আদিগন্ত অকর্ষিত ধান্যক্ষেত্র। মেঘসকল একাকার, পশ্চিমে হিংগুল বর্ণ, আকাশ ভারী থমথমে, চুপচাপ—বায়ু সম্পূর্ণত স্থির, যেন-বা আতঙ্কগ্রস্ত। এইবার সমবেত যুবকদল হইহামারি সহকারে হলযুক্ত ষাঁড়দুটি নিয়ে ধান্যক্ষেত্রে নামে—উৎসাহে তাদের হৃৎপিণ্ড দ্রুত ধাবিত, পা নিশপিশ, অতি ক্ষিপ্র। তাদের কণ্ঠে উচ্চ মা মা চিৎকার—আমাদের ধন দাও, বল দাও, অন্ন দাও। তাদের চিৎকার—কই হে, কোথায় তোমরা? চুপ কেন? বলো, মা আমাদের অন্ন দাও। আমাদের ধান্যক্ষেত্র উর্বর করো, মা, তোমার আশীর্বাদে এই তরুণ ষাঁড় যারা এর আগে কোনোদিন লাঙল বয়নি, তারা তোমারই বর-

প্রাপ্ত—অত্র লাঙল যেমন ধান্যভূমি ছেদন করে বা স্পর্শ করে, সেই জমি উর্বর হোক—সেই-সেই ভূমিতে প্রভূত ফলন হোক। এই নিয়মে যাই—ষাঁড়দুটি নিয়ে প্রান্তরে প্রান্তরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াই, কর্ষণ করি। বলো তোমরা, এসো তোমরা। যুবকদল অতিষ্ঠে প্রতীক্ষা করে—ঠাকুরমশাই, আপনিই-বা কেন এই কথা প্রচার করেন না? শিখাধারী পুরোহিত নিদারুণ ভীত—বক্তৃতার উদ্যোগমাত্রেই বুক দুরুদুরু কাঁপে—যদি-বা এখানে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়—যদি বা তেঁতুলে বাগদির দল লম্ফে উঠে দাঁড়ায়—আর তাদের শূন্য উদর ঢকঢক বাজে। তখন? তখন কে রক্ষা করবে তাকে? মা কী এতই জাগ্রত। অধুনা দেবদেবী যে বড়ই বিস্মৃতিপরায়ণ এবং সুষুপ্তিমগ্ন অথর্ব। তবু অন্য-অন্য বৎসরে কঠিন শাসনে এবং লোকাচার যে রোষকশায়িত নেত্রে পুরোহিতকে ধমকানি লাগায়, তাতে সে বারবার কেশে গলা সাফ করে নিয়ে শুরু করতে যায়, এই দিনে শুভ হলকর্ষণ শুরু হলো—তোমরা মাঠে নামো,—তোমাদের মাটিতে যাও, তোমাদের সেবায়, তোমাদের ঘর্মে মৃত্তিকা তৃপ্ত হবে। এই আমাদের রীতি। এখন আকাশ জল দিলে বাঁচি। পবন যেন রুষ্ট না হয়, বরুণ যেন ক্ষিপ্ত না হয়ে ওঠে এই প্রার্থনা করি। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তোমরা মাঠে নামো। হল প্রস্তুত হয়েছে।

সেই স্থলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের যারা মুখে মলিন গামছা জড়িয়ে বসেছিল, তারা এই মজার দৃশ্য দেখে আর ভাবে, মায়ের কেচ্ছা, ভারী আচ্ছা উমদা কেচ্ছা বটে! এঁটে উদম হঁয়ে গেলচে—প্যাটের চামড়া মাজায় সেঁটে গেলচে, তেবু উয়াদের ভ্রুক্ষেপ নাই গ। আঁ, কী বেপার! পুরুত ঠাকুর পুনরপি বলে, যাও তোমাদের মাটিতে যাও, আর কী অদ্ভুত কাণ্ড—তেঁতুলে বাগদিদেব থুনথুনে বৃদ্ধ বকবক হাসে। তাই শুনে পুরোহিত কথা থামায়—সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বাগদির দল সমস্বরে দাবি করে, ই মাটি কার? ই কি মোদের? বলো গ—লিব্বাক হবে না খবরদার। কোন মাঠে যাব মোরা? মুখে গামছা জড়ানো দল মনে মনে ভাবে, ই মাটি তুমাদের। আমাদেরও বটে। তবে উয়ার ভ্যাতরে যাবার লেগে। কবর—লাশ হবার লেগে। ভাবনাতেই তাণ্ডব, নৃত্য আর সংগীত শুরু হয়ে যায়। রইরই চিৎকারধ্বনি, কথা বলো ঠাকুরমোশাই আমাদের বাপের গুরু, তুমার বউ কী ন্যাংটো হয়েচে কখুনো—ক্ষিদেতে মাটি খেয়েছে হে—রেতের কালে প্যাট বাজালছ ঢোলের মতুন ববম্ ববম্? বলো, ই মাটি তুমার বাপের কিনা? কী যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য নেমে আসে—সেই খোলা রঙ্গভূমি সামনে থাকে—ঢেউয়ের মতো এসে এসে আঘাত করে ফিরে যায় ক্ষুধার গর্জন। আওয়াজ পুনরপি ভয়ঙ্কর বীভৎস—

কারণ উক্ত আওয়াজে বহুকণ্ঠের একত্রাবস্থা এবং এইপ্রকার দাবি—ই মাটি কার, ই মাটি কার—বারবার মিশ্রিত, আরো, এইপ্রকার বাক্যসমূহের মধ্যে কখনো কখনো নিস্তব্ধতা, অথবা বিকট হাস্য, স্থূল অঙ্গভঙ্গি ও উরু প্রদর্শন বা তালমানহীন হিংস্র নৃত্য। ঠাকুরমোশাইকে উলটিয়ে দে—উয়াকে চিৎ করে দাও গো, কাছিম-টোকে চিৎ করে দাও হে, ধরণের বাক্যাবলিও উপছে উপছে মাঠের দিকে যায়। অবশ্যই এমনি নিষ্ঠুর প্রস্তাবসকল কিছুটা নিম্নগ্রামের এবং মুখমণ্ডলে গামছা জড়ানো সম্প্রদায়ের মন্তাজই এই ব্যাপারে অগ্রণী—কার! তেঁতুলে বাগদির দলটি স্তম্ভিত এবং চকিত ও বিভ্রান্ত ছিল। তবু তারা যেন-বা মিছিলে যাবে এমনিই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং মন্তাজের বিদ্রূপরত ক্রুদ্ধ দলটিও তাদের পিছনে। অতএব সমস্ত আয়োজনই বুঝি-বা নস্যাৎ। অদূরে লাঙলজোড়া ষাঁড়দুটির পাশে ভূম্যাধিকারী গ্রামীণ যুবকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়—তাদের দোদুল্যচিত্ততা প্রায় ভীতির পর্যায়ে গেছে। হঠাৎ ষাঁড়দুটি ক্ষিপ্র বেগে কোনো অমিততেজে অনুপ্রাণিত হয়েই যেন দীঘির ঢালুপাড বেয়ে নিম্নে নামে এবং লেঙ্গুর তুলে প্রান্তরের দিকে দ্রুত ধাবমান—তখন, কেবল তখনই একটি ভাঙন দেখা যায়—অধিকন্তু আকাশ গরর গরর শব্দে যে মেঘস্বর প্রেরণ করে তাতে হিরণপুরী মহিষের শিংতোলা মেদুর গর্জন প্রতিধ্বনিত। এজন্যেই গ্রামীণ যুবকেরা আর স্থির থাকতে পারে না—তারা উচ্চ চিৎকারে মায়ের জয় ঘোষণাপূর্বক ষাঁড়দুটির পিছনে পিছনে মাঠে নেমে গেলে সিঁদুর বর্ণের আকাশ থেকে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হয়। এই ব্যাপারটি তেঁতুলে বাগদিদের দলটির মত্ততাকামী রক্তে এমন একটি জ্বালা ধরিয়ে দেয় যে তারা ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়; এতক্ষণ যে নিদারুণ বিক্ষোভের আগুন তাদের তাতিয়ে তুলেছিল এবং তারা সকলে মিলে একটিমাত্র উপলব্ধিতে অভিন্ন হয়েছিল ও তাদের প্রত্যেকের রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-হাড় একত্রিত হয়ে আকাশচুম্বি এক পুরুষের জন্ম দিয়েছিল, সেই রাগী বিশাল পুরুষটিতে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তারাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাঠে নেমে গেল। যদিও গভীর ক্লান্তিতে বৃদ্ধ অভিরামের গায়ক ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহরকে ছেড়ে গেল না—কিংবা হতে পারে তার গান তাকে যে ভীষণ তিতিবিরক্তি এনে দিয়েছিল তাতে সে নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে নিজের মাংস নিজেই খাবার চেষ্টা করছিল এবং যদিও নব্বুই পেরিয়ে যাওয়া অভিরাম বর্তমানে হাঁটুদুটি কাঁধ পার করে মাথাটির দু'পাশে দুটি লাঠির মতো খাড়া রেখে চুপচাপ বসেছিল—তবু উক্ত তেঁতুলে বাগদিদের অনেক-অনেক যুবক-কিশোর-প্রৌঢ় হলকর্ষণের

উৎসবে যোগ দিয়েছিল। তারা হা রা রা চিৎকারে ষাঁড়দুটিকে বিদ্রূপ করত বিশাল মাঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। এসব দেখেশুনে মস্তাজের দল আর কিই-বা করতে পারে? তারা কয়েক দমকে হ্যা হ্যা হাসি হেসেছিল। যখন মান্যবর পুরুতঠাকুর বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলোতে বুলোতে ঈষৎ হতভম্ব এবং মানে মানে ভাগবেন কিনা চিন্তা করেন, তখন অনেক দূরে লাঙলজোড়া ষাঁড়দুটি শূন্যে লাফাচ্ছিল এবং তাদের পিছনে, পাশে, সামনে ছড়ানো মানুষগুলিকে খুবই ক্ষুদ্র দেখাচ্ছিল। এই দলটির পায়ের চাপে ধানের নাডাসকল মুড় মুড় করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল এবং তাদেব গায়ে লেগে থাকা অল্পবিস্তর ধূলি কিছুটা উপরে উঠে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎই হয়—সূর্য অস্তমিত হলে আকাশের হিঙুল বর্ণ বিবর্ণ, বর্ষার ঘোলা জলের মতো, বা কালো ভারী পর্দার কাছাকাছি—অতঃপর বিকট গর্জন পশ্চিম আকাশে—অদ্ভুত, অকেজো মন্ত্রপুত লাঙলটির পশ্চাদ্ধাবনরত মানুষগুলির মাথার উপর এবং ঐ স্থান থেকে দৃষ্ট হয়, দীঘির পূর্বপারে বটবৃক্ষের ছায়াময় আঁধারের গায়ে আবছা ভেসে-ওঠা গজরাজের অবিশ্বাস্য মূর্তি—যেন গলে গলে যায়-বা—শুধ তার শুণ্ডটি মরজাগতিক আগ্রহে বৃংহিত সহকারে পুনঃপুনঃ শূন্যে আন্দোলিত। হস্তীর উক্ত অঙ্গসঞ্চালন কি নৃত্যের মুদ্রা? আর সেই বিশাল প্রাণীর আগ্রহ, প্রার্থনার প্রভাবেই কি এই বৈশাখের শেষদিনে প্রদোষের ম্লান আলোয় ক্ষিপ্র বৃষ্টি নামল?

এইখানে এসে গ্রামরেখা দিগন্তেব কাছে কয়লাব গাদাসদৃশ্য—এবড়োখেবড়ো, সম্পূর্ণ স্তব্ধ—বুকের ভয় জাগিয়ে তোলা। প্রান্তরের মাঝখানে নতুন কাটা পুষ্করিণী উচ্চ লাল পাড। সেখানে অন্ধকাবে লুকিয়ে থাকা নবীন লকলকে জামগাছটির গায়ে জোয়ালটি খটাখট শব্দে আটকে গেলে ষাঁডদুটি লেজ প্রবল বেগে টানে এবং তাদের চোখের কোণে রক্ত দেখা দেয়। এই পরাক্রমে জামগাছটি থরথর করে কাঁপতে থাকলে ভূমধিকারী আধাবাবু যুবকের দল ঘর্মাক্ত কলেবরে, সঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সেখানে এসে উপস্থিত হয়—তাদের আশেপাশে ক্ষুধার্ত ছোঁক্ ছোঁক্ শিকারী কুকুরের মতো তেঁতুলে বাগদির দলটিও এসে হাজির হয়। এই দলটি চারিদিকে ছোট ছোট বৃত্তে পরিক্রমণ করে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ ছাড়ে এবং চামড়ার উপর দরবিগলিত স্বেদসহ সকলেই বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। ষাঁড়দুটি গাছ উপড়ানোর চেষ্টা ক্ষান্ত হয়ে ঘাড বেঁকিয়ে ক্রুদ্ধ গোখরোর মতো গরম নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকলে, একটি যুবক তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, শালারা গাছটা উপড়িয়ে ফেলবে মনে হচ্ছে—তবু ভালো বিষ্টিটা ঠিক

সময়েই এয়েচে ! নইলে অমঙ্গল হতো। তাই নয়রে ঘণ্টা ? ঘণ্টা দু-হাত নেড়ে রাত্রির মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে বলে, কী বলব মাইরি—ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল—এই তো আকাশের এ্যাল্লো—কোথা হাল লাঙলের দিনে রিগিরি দিয়ে বিষ্টি হবে, তা নয়···ইদিকে এই শালার বাগদি-গুলো ইল্লোতি মারছিল।

এ্যাই—ও খবরদার—ভয়ানক আক্রোশবাক্যটির চেয়ে বহুগুণ উচ্চ একটি মেঘ-গর্জন একই কালে ধ্বনিত হয়ে উঠলে উক্ত কথাগুলি শোন। গেল না—কিন্তু তেঁতুলে বাগদির দলটি একবারও বিশ্রাম না নিয়ে শুধুই অস্থির পাক খায়। তাদের মধ্যে কেউ হঠাৎ নিচু হয়ে পড়পড়িয়ে ধানের নাড়া তুলে নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখে। আরেকটি যুবক বলল, আচ্ছা, এই বাগদিগুলো এ্যামোন এ্যারকি মজাচ্ছিল কেন ? ওদের সঙ্গে আবার ক'টা ভাইসাহেব জুটেছে।

দাঁড়া শুধুই ওদের। হাঁরে ঐঃ র‍্যাঙা-র‍্যাঙা—জোর চিৎকারে আবছা আঁধারে তালগাছের মতো একটি মূর্তি বলে, ক্যানে গ, কী বুলছ ? ইদিকে আয়তো—ঐঃ শোন, ইদিকে শোন।

মূর্তিটি নিশুতি ল্যাম্পপোস্টের মতোই ভূতুড়ে—দুটি শীর্ণ হাতে বাতাস আঁচড়াতে আঁচড়াতে এগিয়ে আসে এবং ভারী বর্ষণের দরুণ অন্ধ হয়ে অন্যদিকে যায়—যুবকদের একজন বলে, কী মালই টেনেছে বাবা—শালা চোখে পেলয় দেখছে।

ওদের রকমই এই—ভাত উগ্‌রে মদ গিলবে।

ভাত কত ? ও শালাদের এখন ভাতের শানকিতে মুত। নিজেদেরই মুত। ঘণ্টা নামের যুবকটি আরো বলে, তাই খেয়ে বাগদিদের মেয়েগুলোর রকম দেখে আসিস।

তুই বুঝি মাঝে মাঝে গিয়ে চেখে আসিস নয় ?

মাংসের ব্যাপার গো—মাংস সবসময়ই একরকম।

তা বলছি না—ঐযে ঐ শানকিকে কী যেন বললি !

আধাবাবু আয়েশী যুবকগুলি ঘোররবে হেসে ওঠে। ইত্যবসরে সবটুকু আলো চলে যায়, এতক্ষণের বৃষ্টিতেও মাঠে জল দাঁড়ায়নি, উপরন্তু ভীষণ গরম ভাপ ছাড়ছে মাটি, কয়লার গনগনে আগুনের উনানে জল ঢালার মতো—কিন্তু আকাশ চরম গোঁয়ার, একটানা বৃষ্টির ফোঁটাগুলি আরো ঘন ও দ্রুত হয়, অন্ধকারে গভীর শব্দে বাজে। আরো একবার মায়ের জয় ঘোষণা করে যুবকরা উঠে দাঁড়ায় এবং তখুনি তীব্র আতঙ্কে তারা তেঁতুলদের দলটিকে আশেপাশে খুঁজতে থাকে। কিন্তু

তারা সেখানে ছিল না—জলের বাতাসে কোনোরকম গন্ধ নেই, বৃষ্টি একমনে হয়ে যাচ্ছিল—দু-একবার বিদ্যুৎ চমকায়নি বা মেঘও ডেকে উঠেনি—শুধু বাতাসের ঝাপটা আসছিল ; এরই মধ্যে বাগদিদের অতবড় দলটি কোনদিকে আত্মগোপন করে আছে এই কথাটা কোনো একজন শব্দে বলে, ব্যাটারা কোনদিকে গা ঢাকা দিল দেখো দিনি ! ব্যাপারটা এইরকম যে ওদের সঙ্গে না নিয়ে, পিছনে বা অন্ধকারে রেখে কোন সাহসে এগিয়ে যাওয়া যায় ! অনেকটা তফাতে নজর পড়লে তারা হঠাৎ দেখে নেংটি পরা মানুষের দলটি একটি আ আ চিৎকারে কীভাবে যেন বাতাস কাঁপিয়ে দেয়—পুরো একটি শুয়োরের পালের মতো—কিছু তাদের খুঁজে পেতেই হবে। এতে কীভাবে সামান্য আশ্বস্ত হয়ে যুবকদের একজন চিৎকার করে ওদের ডাকে, আয়রে, দক্ষিণমাঠ সার—এই বলে পাঁচ-সাতজনে ঠেলাঠেলি করে জামগাছ থেকে জোয়ালটি মুক্ত করে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ষাঁড়দুটির পেছনে পাঁচন মারে ! টগবগ করে ফুটে উঠে তারা আবার উদ্‌ভ্রান্তের দৌড় লাগায়—এতে লাঙলের ফলাটি কখনো কোনো জমি ছেদন করছিল, কোনো জমি স্পর্শ করে যাচ্ছিল, কোনো উঁচু আলে আটকে গিয়ে তাদের গলরজ্জুতে ভীষণ টান পড়ছিল—এবং তাদের আকার ছোট হয়ে গিয়ে তারা পিছিয়ে আসছিল। আবারও দৌড়াচ্ছিল—মায়িকী জয়—মায়িকী জয় এমন সব অবাস্তব চিৎকার করে হুড়মুড় হুলস্থূল, চৌদিকে ছোটাছুটিতে বিভ্রান্ত, ঐক্য বিনষ্ট—শৃঙ্খলা ভেস্তে যায়। একটিমাত্র লক্ষ্যবস্তুর জন্যে হারিয়ে যাবার হাত থেকে তারা নিস্তার পায় —যে জন্যে অন্ধকার, হাওয়া, বৃষ্টি, দিকহীন সমতল মাঠ ইত্যাদি সত্ত্বেও তারা লাঙলজোতা ষণ্ডদুটির কাছে ফিরে ফিরে আসে। এই সঙ্গে বৃষ্টি কমে এখন, ফলে টিপটিপ, হাওয়াটি স্যাঁতলা, মাটি নরম বিধায় উৎসাহপ্রদ—যেন-বা তেজবর্ধক, উপরন্তু ভেজা মাটিতে একটি অতিমিষ্টি সুগন্ধও আসছিল। এতে ষাঁড়দুটি নতুন উদ্যমে উন্মত্তপ্রায়, তাদের সবল লিকলিকে কেঠো কেঠো পা-গুলি প্রায়ই শূন্যে। এটিও যুবকবৃন্দের কাছে খুবই আনন্দদায়ক, কারণ এর মধ্যে মায়েরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং বিশ্বাস তাতে মঙ্গল অবধারিত। এখন শত চেষ্টাতেও ষণ্ডদুটির নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের আশীর্বাদে তারা কী তীব্র গতিতে দৌড়ায়—যেন এখানে অনেক অনেক বর্গমাইলব্যাপী চতুর্দিকের যাবতীয় কৃষিক্ষেত্র তারা স্পর্শ করবে, পরিক্রমণ করবে, তাদের হৃৎপিণ্ড টুকরো হলেও তারা বিরত হবে না। দূরে তেরছাভাবে ওরা কেবলই লাফিয়ে ওঠে—যুবকদল তাদের নিকটস্থ হবার সূচনাতেই তারা মৃদু আনন্দে শব্দ করে আরো দূরে যায়—হেথায় ভূম্যাধিকারী

যুবকেরা খুশিতে বাগ বাগ—তেঁতুলেদের কুচক্র বিস্মৃত, পরস্পরকে বিস্মৃত তারা আপন আপন খুশমেজাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উৎসাহে আশায় কে কোন দিকে ছিটিয়ে যায়। তারা প্রত্যেকই স্বেদগন্ধি, জামাকাপড় ভিজে সপ সপ, শরীর কর্দমাক্ত, হৃৎপিণ্ড বহির্মুখী—মাঠে মাঠে আকুল পদচারণা যেন-বা স্পন্দিত! বিরাট এলাকা জুড়ে তারা কে কোথায়—মাঠ তাদের গিলে ফেলেছে, তাদের অতিদ্রুত অঙ্গচালনাও হাস্যকর মনে হয়—সর্পধৃত ইঁদুরের ঠ্যাং নাড়ানোর মতোই বিষণ্ণ। কিন্তু উন্মত্ততার দৃশ্য সত্যিই সুসমাপ্ত। এই ব্যাপারটিং যুবকদলের কল্পনায় ছিল—গ্রাম্যভাষায় একেই বলা হয় অবস্থা মাঠে মাঠে বা ডালেচালে মিশ্রিত অর্থাৎ শুভ হলকর্ষণ খুবই বিস্তৃত হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন শুধু ব্যাপক বৃষ্টির প্রতীক্ষা—তারপর যতদূর চোখ যায় ফলন্ত ধান্যক্ষেত্র। এই চিন্তায় যুবকদের বুক ফুলে ওঠে! গোলাগুলি এখনই-বা পূর্ণ হয়ে এসেছে।

সামান্য বিশ্রামের জন্যে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে প্রতুল নামী যুবকটির উক্তি, হারামজাদা বাগদিগুনো আবার অন্ধকারে হারিয়ে গালো—

প্রত্যুত্তরে ঘণ্টা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, ও শালাদের একটারও বাপের ঠিক নাই—বুয়েচ?

তা তো বোঝলাম—তা এই শালারাই যদি তোর জমিতে হাত না দেয় কী করছিস? আমরা তো ঠুঁটো জগন্নাথরে—অঁ্যা?

জমি করবে না তো খাবে কী?

কত দিচ্ছিস খেতে? গোরু যে গোরু—সেও তো দুবেলা দোনা থেকে খড়টা খেতে পায়।

ঐ তেঁতুলেদের কথা আর বোলো না পিতুলদা, বুয়েচ, মদো-মাতালের জাত, মদেতেই সন্তুষ্টি—সব বিচে-কিনে মদ মারবে। ও শালাদের মাথায় পা দিয়ে দাবিয়ে রাখার পেয়োজন। বুঝলে না?

বকাসনে ঘণ্টা— মেলামারি বকাসনে।

সেই মুহূর্তে থেকে আবার দৌড়—কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত কারণ পঞ্চাশ গজ দূরে ষাঁড়দুটি জবুথবু, বোকা—দীর্ঘ টানা টানা নিঃশ্বাস—যেন ক্রন্দনপরায়ণ এবং যুবকদল নিকটে গিয়েই অতি উচ্চস্বরে হায় হায় শব্দে টলটলায়মান, ন্যাকা। সঘন নিঃশ্বাস কী ভয়ঙ্কর কর্ণবিদারী; এস্থলে নিঃশ্বাসই যে যন্ত্রণা! হায় কী নিদারুণ সর্বনাশ—যুবকদল অস্ফুটে বলে, কারণ লাঙলের উন্মুক্ত চকচকে ক্রুদ্ধ ফলাটি একটি পশুর পিছনের পায়ে বল্লমবৎ গেঁথে গিয়েছিল! তরুণ জানোয়ারটি

পা-টি খানিকটা পিছিয়ে দিয়ে মোহেনজোদারোর পৃথিবীখ্যাত তাম্রফলকে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল তৈলশিলার খনিজ তৈলের মতো। এই শোণিত আদিতে অসহ্য লাল, মধ্যে অনিঃশেষ ও বেগবান এবং অন্তে কালচে ও দ্রুত জমাট। যুবকদল ষাঁড়দুটিকে ঘিরে দাঁড়ালে সেই বৃত্তে প্রান্তরের বায়ুতাড়িত আঁধি প্রবেশ করতে থাকে। আর এর মধ্যে সামান্য অঙ্গচালনা টুকরো সংলাপ ইত্যাদি দৃষ্ট ও শ্রুত হবার সম্ভবনা ছিল।

খুবই অলুক্ষণে কাণ্ড হয়ে গালো—

ফালটা কেমন ভুঁকিয়েছে দ্যাখো দিনি—

শালারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্যি—

এখন মোচনদের ভোগে নেগে যাবে।

খবরদার ঘণ্টা, মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব তোর, ওই কথা আর একবার বলে দ্যাখ।

কেন, কী অন্যায়টা বল্লাম।

আরেকবার বলে দ্যাখ।

বল্লে করবি কিরে তুই?

ওরে শালার আগুরি—একবার বলে দ্যাখ না তুই।

এই বলে সেই যুবকটি, তার নাম অধীর, এমনিই তীব্র নরঘাতী আক্রোশে এগিয়ে আসে যে ঘণ্টা শুধুই বিড়বিড় করে। এমতাবস্থায় নায়ক প্রতুল বিশাল প্রান্তরের শ্রুতিগ্রাহ্য করে বলে, এ্যাই ফচকোমো মারা পেইচিস—সব জায়গায় ফচকোমো। ফালটা ছড়িয়ে দিতে হ ' না—এ্যাঁ।

কয়েকজনে মিলে ষাঁড়দুটির সামনে জোয়ালটি চেপে ধরলে, লাঙলের ফলাটা ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকে। ষণ্ডটি যন্ত্রণায় পাগল, তার বৃহৎ মুণ্ডটির একটিমাত্র আন্দোলনে যুবকদল দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

এইভাবেই শুভ হলকর্ষণের মহোৎসব ছিঁড়ে-ফেটে-টেঁসে যায়। ক্লান্ত ষাঁড় দুটি মাথা নামিয়ে ফেরার পথে। এসময় যদিও রাত্রি প্রথম প্রহর মাত্র—কিন্তু প্রসারিত মাঠে তেপান্তর, অপরিচয়, রহস্যময়তা ঘনীভূত এবং যেন-বা মধ্যরজনীর ঘোরা কর্ণপাটই ফাটিয়ে দেবে? একশ্রেণীর খড়-রঙ ঝিঁঝিঁ পক্ষ ঘর্ষণে উৎকট রি রি আওয়াজ তুলছিল এবং কিছু কিছু জোনাকি কাঁটাঝোপে টিপটিপ জ্বলছিল, বৃষ্টি পেয়ে ক্ষুদ্র ব্যাঙগুলি বেরিয়েছে. জলাভূমিতে আগুন দপদপিয়ে উঠে গড়িয়ে যায়—ছোটখাটো নাদুসনুদুস খরগোসের আকারের মেঠো ইঁদুরগুলি ধানের নাড়ার আড়ালে আড়ালে দৌড়োয়। উপরন্তু দু-একটি খেঁকশিয়াল খ্যা খ্যা শব্দে

এমন খেলো হাসি দেয় যা স্পষ্টতই স্নায়ুমণ্ডলিকে বিচ্ছিরিভাবে শিরশিরিয়ে দিচ্ছিল।

এর পর থেকে গাঁগুলি অনবরত মুছে যাচ্ছিল এইজন্যে যে সূর্যাস্ত থেকে রাত যতই দূরে যায় তত সাদা হয় এবং সেকারণে, কিছুটা হারিয়ে যায় বা চোখের আড়ালে যায়। রতনপুর, ট্যাকসোনা, ঢেঁড়িয়া, ঠ্যাঙাগড ইত্যাদি ঘাড় ঝুঁকিয়ে ঝিমোয় এবং যুবকদল অনতিবিলম্বেই রতনপুর যাবার পথে টাঁকসোন বা ট্যাকসোনায় প্রবেশ করে। শুকনো এলোপাথাড়ি বাবলা গাছের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে পটাপট পায়ে কাঁটা ফোঁটে। পথের আশেপাশেই তারা মুখিয়ে ছিল। তাদের এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না। শেষে পগার ছাড়িয়ে আসতেই সাদা রাত ফুরিয়ে এল। কুঁড়েগুলি দেখা দিতে শুরু করেছিল এবং অল্পসল্প আলো। আলো বদখত, ভয়ানক—প্রায় শ্মশানসম, যদিও শ্মশানে মৃত হলেও মানুষী দুর্গন্ধবাহী বায়ু থাকে এবং গলাপচা মৃতদের ভক্ষণরত শৃগালের চোখ চকচকায়। সেও তো প্রাণী বটে—নরবসার গন্ধ সেও তো প্রবল বটে, করোটিতে বাতাস বেঁধে লোমহর্ষক বাঁশি বাজে, তবু তা-ও শব্দ। কিন্তু এই গ্রাম গন্ধহীন, শব্দহীন, বায়ুহীন শূন্যতা—ধুলোভর্তি পথে কোনো মানুষ নেই—কোনো কুঁড়েতে মানুষের কণ্ঠ বাজছে না; চণ্ডীতলা, বৈঠকখানা ও দহজিল সম্পূর্ণত শূন্য এবং সমস্ত আলো আগ্রাসী অন্ধকারেই সঙ্গত। দারুণ অস্বস্তিতে যুবারা দ্রুত পথ অতিক্রমের চেষ্টা করে। তারা প্রায় এই বিভীষিকার এলাকা ছাড়িয়ে আসতে পেরেছিল, এই সময় তাদের পথটি আটকে যায়। ধুলো কেটে কেটে একটি শীর্ণ জলধারা আসছিল—প্রধান ধারাটি থেকে আরো সরু জলরেখা ধুলোর ভিতরে অদূরে শুকিয়ে গেছে। স্পষ্টতই এইসব ব্যাপার নবসৃষ্ট—কারণ নিকটেই একটি কুঁড়ে ছিল এবং তার চারিপাশ খোলা এবং পথটিই তার উঠান—এমন অবস্থায় কুঁড়ের দাওয়ায় কলসি জল ঢাললে পথেই জল আসবে বিচিত্র কিছুই না। যুবারা অন্যমনস্কে চলতে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে পা দেয়, চমকে ওঠে এবং পুরো দৃশ্যটাই দেখে ফেলে। সেখানে কুঁড়েটির দাওয়ায় অনেকগুলি লোক—এইটিই বিসদৃশ, এই মানুষের দেখা পাওয়া যাদের হাত-পা-চোখ-মুখ ইত্যাদি ঠিকঠাক আছে। এইসব মানুষ কারা, যুবারা ভীত হয়ে ভাবে এবং তারা কোনো কথা বলছে না বা শব্দ করছে না। বাতাস যদি এবং যখন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, কেরোসিনের লম্ফটির শিখা স্থির হয়ে জ্বলে, তখন একটি অশক্ত ভৌতিক চিঁ চিঁ আওয়াজ একটানা শ্রুত হতে পারে—এই বিশেষ আওয়াজটি বাদ দিলে মানুষগুলি নিঃশব্দে

কাজ করে যাচ্ছিল। তাদের কেউ কলসি করে জল আনে—কেউ লম্ফটি উঁচু করে ধরে ছায়াগুলিকে বিকট ও কম্পমান করে দেয়—তবে চার-পাঁচজন মিলে নিচু হয়ে কোনো একটি আদরের বস্তুকে বারবার ধুয়ে ফেলছিল। এদের প্রায় সকলের মুখেই ময়লা গামছা জড়ানো ছিল।

অধীর প্রতুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর প্রতুল শোনে, মড়া—না পিতুল?

তাইতো মনে হচ্ছে।

কত যত্ন দেখে—ঠিক যেন বিয়ের বর সাজাচ্ছে মাইরি।

প্রতুলের নিঃশ্বাসের সাঁইসাঁই আওয়াজ শোনা গেল—বোঝলাম, মোচনদের এই কাজটা বেশ। আমাদের শালা মড়া কেউ ছোঁবে না—বউও দূরে বসে ভ্যাবাবে—শেষে চ্যাটাই মুড়ে শ্মশানে দূরদার ঠেঙিয়ে পোড়াবে। ধুঃ শালা।

আসলেই সেটি একটি তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরের মৃতদেহ ছিল। সেটিকে উল্টেপাল্টে ধোয়া চলছিল। মৃত কিশোরটি সোজা ন্যাংটা—এ কারণ তার হাঁটু, কুঁচকি, বগল ও অন্যান্য ভাঁজের জায়গাগুলিতে কোঁচকানো চামড়া দৃশ্যমান। বস্তুত মরা চামচিকে বা শুকিয়ে অক্কা পাওয়া বাঁদরছানার সঙ্গেই মৃতদেহটির মিল ছিল বেশি।

শান্তি বা সুস্থিরতা কোনোটিই আদৌ বিঘ্নিত হয়নি। শুধু কিছুক্ষণ পরে, সম্ভবত ধোয়ামোছার কাজটি সমাধা হয়ে গেলে অকস্মাৎ অপরিচিত ভাষায় ঈশ্বর সংক্রান্ত গূঢ় কথা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। একটিমাত্র সুইচ টিপে দিলে কোনো কোনো বিশাল বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র যেভাবে বিনা ভূমিকায় চালু হয়ে যায়, অনেকটা সেইরকম। এই শুরুর পর থেকেই সবকিছু ভয়াবহ মানবিক—যথা হৃদয়-ছেঁড়া বাংলা কথা—আঃ আঃ জান্তব ধ্বনিও মানুষী হয়ে ফেটে পড়বে। শুধ্ না খেঁয়ে মলোরে—ই কি চোখে দেখা যায় বাপ—এই বাক্যটি কিন্তু একটি অনাহারী খাটুয়ে মর্মান্তিক বিলাপ—যে বালকটির আত্মীয় নয় আদৌ, শুধু একটুকু যে তার কথায় প্রত্যাশাভঙ্গজনিত হতাশা ছিল যে কিশোরটি যুবক, জোয়ান এবং আঁটোসাঁটো বলদের মতো মজবুত হতো—সেই চমৎকার পরিণতিকে মাঝামাঝি হাঁটু চালিয়ে মটাৎ করে ভেঙে দেওয়া হলো। তারপর ধরা যাক একটি বুড়ির কম্পিত ক্রন্দন, আমার সোনা, ক্যানে তু দুনিয়া ছেড়ে গেলি—আর আমি মলোম না—এটি খুবই সাধারণ অভিযোগ, অর্থহীন প্রায় শুধু বুড়িটির কষ্টটি ছাড়া—কিন্তু অন্য একটি স্ত্রীলোক বিনিয়ে বিনিয়ে বলছিল, তিনদিন বাপ আমার কিছুই খায়

নায় গ—ক্যার বাড়ি গেয়ে আমি কী মেগে আনব গ, ছ্যাশেহ যখন অকাল আল্‌চে —পোড়া ছ্যাশ জলে গেল বাপরে আমার—এইভাবে আধা গদ্যে আধা পদ্যে বলতে বলতে শেষে সম্পূর্ণ গদ্যে বয়ান করে যায়, কটো খুদ ছিলো—তাই রেঁধে দেলোম কাল রেতে। তাহ খেয়ে বল হলছিলো বোধায় শরীলে এটু—দোপোরে গেঁইছিলো হাতি দেখতে—বেঁহুস ছেলেকে নিয়ে এল লোকে—তা বাদে—

এসবই নিষ্প্রয়োজন যতক্ষণ পর্যন্ত না মোক্ষম কথাটি ছাড়া হলো, নির্বিকার নিষ্ঠুর কণ্ঠটি শুধু শ্রুতিযোগ্য—দাঁড়া, দাঁড়া, অগো লাপাইচিস ক্যানে, বেপার অতো সোজা লয়কো—সব কটোকে মরতে হবে এঁটে তুলে—দুদিন সবুর। ইঃ, সব এ্যাকবারে বোগল বাজিয়ে কাঁনচে যেন শালোরা বেঁচে থাকবে।

ঝটিতি সবই নিস্তব্ধ হয়েছিল, তবে শুধুমাত্র অনবচ্ছিন্ন চিঁচিঁ ক্রন্দনসম আওয়াজটি নিস্তব্ধতাকে শানিয়ে তোলে বা ঝলকিত যেজন্য যুবাদল পুনরপি নিদারুণ সন্ত্রস্ত এবং ইতিমধ্যে কেরোসিনের লম্ফটির শিখা ভয়ানক বাত্যাতাড়িত, সেহেতু ছায়াসকল আন্দোলিত ও এখন-তখন অন্ধকারে মিশ্রিত। এভাবে ক্ষণ-কালমাত্র অতিবাহিত হলে উঠোনের সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে—তখন তাদের মুখে গামছা এবং পরনে নেংটিমাত্র নজরে আসে—ধর্মত তাদের শরীরও দেখা যায় এইভাবে যে তারা প্রায় পোড়া কাঠের মতো কালো, বিশীর্ণ এবড়োখেবড়ো বা কতকটা কোল-কুঁজো অর্থাৎ সোজা কথায় এরা সবাই ভুতুড়ে, বেশ কিছুটা ছায়াময় প্রেতবৎ। তাদের কেউ কেউ অন্যমনস্কে দাঁড়িয়ে—কেউ কোনো চুল-কানির উপশমে ব্যস্ত—তবে প্রত্যেকেই চুপচাপ—একটু আগে যে নির্দয় ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারিত হয়েছে—যেন-বা সেটি নিয়েই মশগুল। বিলুপ্তি ভাবনাতেই যেন বিলুপ্তি নিরোধ হতে পারে।

নতুন বাঁশের খাটিয়ায় শবটিকে শোয়ানো হয় ধীরে ধীরে বিশেষ যত্নের সঙ্গে এবং এই খাটিয়াটি সামনে রেখে যে প্রার্থনার অনুষ্ঠানটি হয় তা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনিই অর্ধমনস্ক দায়সারা গোছের। কিছু কিছু গম্ভীর বাক্যাবলি এবং অল্প পরেই দু'হাত তুলে সকলে মিলে কিছু কিছু বাসনা প্রকাশান্তে অনুষ্ঠানটির ইতি টেনে দেয়। তারপর খুবই নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ছোট মিছিলটি সঙ্ঘবদ্ধ হয়। খবরের কাগজের ভাষায় এই মিছিলটিকে অনায়াসেই একটি ভুখা মিছিল বর্ণনা করা যেত কিন্তু আসলে তা তো নয়—এরা সবাই ছিল শবানুগামী। দল সারিবদ্ধ ভাবে রাস্তায় এসে পড়লে দুটি-একটি গগনবিদারী চিৎকারধ্বনি ওঠে বটে—কিন্তু কিছুতেই বিশেষ জোরালো হয়ে উঠতে পারে না—অতঃপর গুবরে পোকার মতো

এই চিৎকার নির্বোধ বৃত্তাকার—ঝোড়ো বাতাসের মতো হাহাকার ভরা নয়—তবে ভয়ঙ্কর শূন্য। এই শূন্যতার কোনো তুলনা ছিল না—গোপন ঘূর্ণির মতো রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই-ই একমাত্র তুলনা বা অনুভব যা-ই বলা যাক না!

মিছিলটি যখন যুবকগুলির কাছাকাছি আসে—তারা সামান্য চেষ্টায় একটু পাশে গিয়ে ঢাকা দিতে পাবে—কেউইং-বা দেখে তাদের? এইভাবে তারা পার হয়ে গেলে এবং ধোঁয়াটে আঁধারে মিলিয়ে যেতে থাকলে অধীর এগিয়ে এসে দ্রুত স্থানত্যাগের পরামর্শ দেয়। একরকম এলোমেলোভাবে সে বলে যে সে থাকতে হঠাৎ কিছু আগুন দেখেছে—যেটি জ্বলে উঠল বলে। কাজেই সময় থাকতে কেটে পড়া প্রয়োজন।

তাদের মধ্যে একজন সঠিক মন্তবটি করে, ক্ষিদেয় ক্ষিদেয় বেটাদের চেহারা আর মানুষের নাই—কী বলো পিতুল? কাজকম্মো নাই তো।

কাজটা করবে কোতা? তোমার ইয়েত? এই লোকটি বিশ্রী অমুদ্রিতব্য দুর্বাক্য উচ্চারণ করে।

কেন বাবা, জমিজমা কিছু কিছু তো সব বেটারই আছে।

তোর বাপকে শুধুস। এ গাঁয়ের সব জমি তো তোর বাপ উবু উবু গিলেছে।

ক্ষ্যামতা থাকলে সবাই গেলে গো—সবাই গেলে।

ওরে আমার সোনা—তাইলে চেপে যাও। ঠিকই তো বুয়েচ বাবা।

হাতি দেখতে গিয়ে ছোঁড়াটা হঃ হ করে ফোত হোয়ে গালো—কী আচ্চর্য ব্যাপার।

আচ্চর্যের কিছুই নাইরে দাদা। দাঁড়াও না, বর্ষাটা ঠিকমতোন পড়ুক আকবার—বহু শালাই ফোত হবে এবার।

কী দাদা, উদিকে যাওয়া হবে? উই যে গোর দিতে নিয়ে গালো। আকবার দেখে আসতাম।

কী দরকার—শালারা সব ভাদুরে কুকুরের মতো হয়ে আছে—একবার যদি ক্ষ্যাপে, ছিঁড়ে ফেলবে একদম।

অতএব, যুবাদল দ্রুত পা চালিয়ে ট্যাকসোনা অতিক্রম করে গেল।

মিছিলটি তৎপর হয় গাঁ-টি ছাড়িয়ে। চটপট পা চালিয়ে ঢালু পগারে পেঁ ৗছে গিয়েছিল তারা। এই পগাবের উত্তর পাশে একটি প্রাচীন আমগাছ ছিল—আশেপাশে কয়েকটি ছোটখাটো জঙ্গল ছিল—একটি বড় আকারের শিয়াল মাটি খুঁড়ে

বেরিয়ে দৌড় দিয়েছিল—কারণ এই পগারের পিছনে সমতল প্রান্তরের বিস্তৃতি অনিঃশেষ ছিল। মৃতদেহটির খাটিয়া নামিয়ে দিয়ে বাহকগণ গামছা দিয়ে ঘাড় ও কপালের ঘাম মুছে নিয়েছিল এবং ব্যজন শুরু করেছিল। সেখানে গুমোট অত্যধিক ছিল।

অনতিবিলম্বে পূর্বোক্ত কিশোর মাটির নিচে তলিয়ে যায়। জঙ্গলে দুটি-একটি জোনাকি জ্বলেছিল বা—সন্ধ্যার বৃষ্টিটুকু শুষে নিয়ে মাটির অভ্যন্তরে জ্বলে উঠেছিল আগুন। এই তাপ বাতাসে ছিল। কোদালগুলি ঝপাঝপ চলছিল না—সেগুলিতে কৃষকদের অবসাদ। এইভাবে সমস্ত কিছু বোবা। কারণ কৃষকদের প্রত্যেকেই মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে—যেভাবে জোয়াল ফেলে অসহায় মহিষ চোখ রাঙা করে বেখাপ্পা। এইসব লোক আপন আপন ভাবনায় মগ্ন—তালগাছের পাতা দাঁত দিয়ে ছেঁড়ে, মাটির চাঙড় হাতের চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো করে—কেউ নরম মাটি গায়ে মাখে। এরপর একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক হুঁ হুঁ করে শুরু করে। প্রথমে খুবই ধীরে, প্রায় শোনা যায় না, সে আশেপাশের সামান্য সামান্য শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিল তার আওয়াজ, পরে আওয়াজ ব্যক্ত হয়। সেটি হচ্ছে একটি ফাঁদে পড়া পশুর অবোধ কান্না। কাজেই কারো কিছু বলার নেই। চিৎকার বাড়িয়ে দিয়ে হাউ হাউ করে অতিষ্ঠ করে তুললে বর্ষীয়ান চাষীটি শান্ত ভারী গলায় প্রশ্ন করে, কিসের কারণে কাঁদাটো হঁচে বাপ?

এই প্রশ্নে সহানুভূতির লেশমাত্র না থাকলেও কান্নাটি ভীষণ ছড়িয়ে যায়। আরে এই ধেড়ে হনু—কাঁদাটো ক্যানো—অ্যাঁ।

আমাকে কবে নিয়ে আসবে চাচা—রোদনের ভিতর থেকে অব্যক্ত প্রশ্নটি ফেটে গিয়েছিল এবং কারও অপেক্ষা না রেখে যুবকটি কান্নার ভিতরে চুবিয়ে চুবিয়ে অশ্রুময় উত্তর টেনে আনে, তার বেশিদিন লয় গ, কবর-লাগ হলোম বলে। আর দুদিন সবুর—দুদিন সবুর—বলে যুবকটি থেমে যায়। এমন সব ব্যাপারে চাষীগুলি ভ্যাবা বনে যায়—যেন-বা প্রত্যেকেই কেঁদে উঠবে। বর্ষীয়ান চাষীটি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, তার হাই উঠছিল, এজন্যে নির্লিপ্ত স্থূল হয়ে যায় তার কথা, কবর-লাগ যেদি হঁতেই হয় বাপু—তাইলে তার এগু এটু আগুনে গা ঘষে লেগা—হাতগুনোকে একটু গরম করগা দিকিন। চলো গ—আর হথানে বসাটো কিছু লয়।

একসঙ্গেই সবাই ওঠে। সাদা রাত্রির কিঞ্চিৎ ঢালু আড়ে দাঁয়ে বিশাল প্রান্তরে দূরে দূরে এরা ছড়ালো। যেমন হেঁটে বেড়ায় ঘুমের ভিতর।

দুটি-একটি ন্যাড়া বেল বা তালগাছ, এক-আধটি খিঁচিয়ে-ওঠা শিমুল আর পুরু ধুলো জমা রেলপাতির জঙ্গল পার হলেই যুবাদলের গ্রামের অন্ত্যজ পাড়া। সেই-খানে এসে দল থেকে ঘণ্টা হারিয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে একটি চিৎকার,ঘণ্টা—উক্ত উচ্চধ্বনির রেশটুকু আ আ রবে প্রলম্বিত—বাতাসে ঢেউ সৃষ্টিকারী। তৎপর হি হি শব্দে প্রচুর হাস্য এবং ভয়ানক অশ্লীল মন্তব্য সকলের জড়াজড়ি। ঘণ্টা কিয়দ্‌কাল স্তব্ধ—তার দেহে রাত্রির নিজস্ব আঁধার; এই অন্ধকার তার দুই চোখে গভীর হয়ে জমেছিল এবং নিম্নাঙ্গে বেষ্টন করে তার পা-দুটিকে এমন অদ্ভুতভাবে গলিয়ে দিয়েছিল যে সে একটি বড় আকারের বোড়া সাপের মতো বুকে ভর দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল। এই পাড়াটি তেঁতুলে বাগদিদের—সেইহেতু সেখানে খড়ের কুঁড়েগুলি মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে খাড়া থাকে—পথ কষ্টদায়ক, সংকীর্ণ উঁচা-নিচা। উঠানগুলিতে কখনো কখনো গাছ আছে। সেইসব স্থান হতে শূন্যতার শব্দ আসছিল—খুবই ব্যাপ্তপ্রবল ধূলিঝড় তুলে যেন-বা উঠানের গাছগুলি বিনাশব্দে এককালে মাটিতে সেঁধোবে, কুঁড়েগুলি ভূমিস্যাৎ, লণ্ডভণ্ড, এবং এই এলাকায় প্রচণ্ড হা হা স্বর—সব শেষে স্থানে স্থানে ধ্বস নামে, গভীর বিবরে আঁধার, চতুষ্পার্শ্বে গহ্বরে কুণ্ডলি, কাঁটাগাছের হলুদ জঙ্গল—কোনো ধারালো বাতাসেও একটি ধূলিকণা নড়ে না। এরূপ শূন্যতার নিদারুণ আওয়াজে যুবকটির বুকে ভয়ে খিল ধরে যায়—যেহেতু সে প্রায় জন্মাবধি এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেনি। এই হাহাকারের বদলে সে নিয়মিত ঢোলকের বাদ্যে অভ্যস্ত—দ্রিম দ্রিম আওয়াজের সঙ্গে চেরা গলার মাতাল সংগীত—উঠানে, গাছের নিচে, পথিপার্শ্বে, যত্রতত্র কী জমাট আনন্দনিষ্ঠাই না ছিল! এসব কী জন্মাবধি দেখে আসছে না ঘণ্টা নামের আধা-বাদ্‌ট? অতএব সম্পূর্ণ অপরিচয় তার মধ্যে বাসা বাঁধে—তার ভাবনায় কুলায় না যে কীভাবে ঠা ঠা মরুতে তাজা চারাটি গজিয়ে উঠতে পারে—এ পতিত ভূমিতে কেমন করে দেখা দিতে পারে পিঙ্গলা—যেহেতু চতুর্দিকেই যেন উৎপাটিত মহীরুহ কেমন ছরকুটে, হস্তপদাদি বিক্ষিপ্ত, তা ছাড়া মাটির দেয়ালগুলি কোথাও ভাঙা, কোথাও হাড়ের মতো সাদা, চতুর্দিকেই ভাঙাচোরা কাষ্ঠখণ্ড, ছেঁড়া ন্যাকড়া, বৃক্ষপত্রগুলি কুটকুটি। এ যেন শুকিয়ে-ওঠা অরণ্য—এর মধ্যে পিঙ্গলার বাসের ঘরটি কোনদিকে হারিয়ে যায় বা। কাজেই যুবকটি সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে আসতে চেয়েছিল—তার প্রাথমিক উদ্দামতা শুকিয়ে খটখটে হৃদয়ে আর জল নাই। বেচারির কল্পনায় তো এসব ছিল না—সে তেঁতুলে বাগদিদের হল্লা এড়িয়ে কোনোরকমে পাড়ার প্রান্তে বিধবা মেয়েটির

কাছে আসতে চেয়েছিল—যেহেতু মাত্র কয়েকদিনই হয় সে তাকে বাগিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এইরকম দুঃসহ স্তব্ধতা সে জানত না—কোথায়-বা হল্লা চিৎকার—আগামীকাল কী বিরাট মেলা—মায়ের পুজো; এই তো কিছুদূরে আয়োজন প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে সে স্থলে আলো, গমগমে ভিড়, রাজহংস্তী সমস্ত ওজন পিঠে নিয়েছে—তবু এখানে এমন শূন্যতার শব্দ কীভাবে বাজতে পারে তা-ও বাবুটির মাথায় আসে না। এখন কোনোরকমে সরে যেতে পারলেই হয়।

কিন্তু সে কোথা থেকে সামনে আসে বুঝে উঠা দুষ্কর হয়ে ওঠে।

আকাশ ছিঁড়ে বা মাটি ফুঁড়ে অথবা বাতাস থেকেই চেহারা নেয়—বলা যায় না। যুবকটি সামনেই মেয়েমানুষটিকে দেখতে পায়। সে, মেয়েটি পথিপার্শ্বের তিন্তিড়ি বৃক্ষটির ঘন অন্ধকারের দিকে চেয়েছিল, তৎপর তার দৃষ্টি অনেক দূরে পথের অন্যপ্রান্তে গিয়েছিল। পতিত অঞ্চলটির সর্বত্র উক্ত দৃষ্টি শুকনা ও নিরবয়ব তামসিকতায় আচ্ছন্ন—সর্বশেষে তা ফিরে এসে নিজেরই দিকে চালিত হয়েছিল। এই খরদৃষ্টি বুভুক্ষায় আক্রান্ত ছিল—উপোসী পশুবৎ এবং পশুতুল্যই নগ্ন ছিল দেহটি—কারণ দেহাবরণটির বহুস্থানই ভিন্ন ভিন্ন; মেয়েটির উরুসন্ধি, কটিদেশ, বক্ষাঞ্চল বিপন্ন। তাকে বিবরসন্ধানী বলে ধারণা হয়। যেভাবে সে ঘণ্টার দিকে দৃষ্টি ফেলে, তাতে ঘণ্টাবাবু একটু ইতস্তত করে মেয়েটির পথ সামান্য আটকে দেয়।

কোথায় যেন একটি নিমন্ত্রণ ছিল।

তুই কে রে?

মেয়েটি চারপাশ দ্রুত দেখে নেয়, তারপর ভিতর থেকেই ফিসফিসানি উত্থিত হয়, তাতে তুমার কী গঁ,—এই কথা বলে সে চলে যেতে উদ্যত হয়।

যুবকটি তার বিপন্নতার পুরো সুযোগ নিতে পেরেছিল—একারণ যুবার মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে আসে—ঠোঁটদুটি পুনঃপুনঃ চাটে এবং সে ঘনঘন ঢোঁক গিল-ছিল। মেয়েটির আধখোলা বর্তুলাকার বুক দুটির দিকে চেয়ে একরকম মাথা কোটার ভাব এসে গিয়েছিল তার—যদিও মেয়েটি অতিশীর্ণ, তার চোয়ালের হাড় ফুটে উঠেছে, ভুরুর অস্থি যেন-বা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসবে, তামাটে চুলগুলি-বা ধাতব।

তোর নাম কিরে—কখনো দেখি নাই তো তোকে এই পাডায়?

আমি কালী গঁ। আমাকে দ্যাখ নাই কখুনো—বুলছো কী বাবু? মোর জরমো ই গাঁয়ে—আর কখনো দ্যাখ নাই মোকে—অঁা—এই বলে সে চিকুর হানার মতো এক শানানো হাসি হাসল।

এতো রাত্তিরে যাচ্ছিস কোথায় ?

এই রেতেই পাড়ায় তুমিই-বা কোতা যেচো বাবু ? মজার কতা লয়কো ?

মাঠ থেকে এ্যালাম—বাড়ি যাচ্ছি।

অ, তা যাও গঁ যাও—কালী রাস্তার একপাশে দাঁড়ায়।

যুবকটি তখন কী করতে পারত—সে কোনো অজুহাত হঠাৎ বানিয়ে ফেলতে পারে না।

যাও না বাবু, দেঁড়িয়ে রইলে ক্যানে ?

উক্ত যুবকটির চলে যাবায় উপায় ছিল না। অনুক্ত নিমন্ত্রণটি তাকে এমন টানেই টেনেছিল। তার ভাবটি একটি হতভম্ব শুয়োরের মতো যার একটিমাত্র সিদ্ধান্ত ছিল এবং সেটি-ই যেন-বা হারিয়ে গেছে একারণ সে নিজেরই অজান্তে অতি ধীরে মেয়েটিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছিল।

কালী আবার একটি সংক্ষিপ্ত চিকুর হানে, অমন করছ কেনে বাবু কঁইলে বাছুরের মতো ?

এতক্ষণে মনস্থির সম্ভব হয় ঘণ্টার, আমাকে একটু জল খাওয়াবি ? মাঠে মাঠে ছুটে ছুটে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে আমার। চল দেখি তোর বাড়িতে। একটু জল দিবি।

ছোটনোকের হাতে জল খেঁলে জাত যাবে যি গঁ তুমার' বুলছো কী—আঁ ?

ছোটজাত বুঝিন মানুষ নয়, না ?

তাইলে ছোটজাত মানুষ বটে বুলছো—আরি বাবারে বাবা। ছোটজাতের জলে দোষ নাই বটে, বাহারি বাহা ! ছোটজাতের আর কিসে দোষ থাকতে নাই বলো দিকিনি বাবু ?

তুই বল দেখি। বাবুর কিছু ভয় হয়েছিল যেহেতু মেয়েটি আদৌ হাসে না আর তার কথা পাথরে ইস্পাত ঘষার মতো, ঝিলকিয়ে ওঠে এবং কখনো বিকট হাস্য উদ্‌গতপ্রায়, প্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন অথচ এইসবের পিছনে একখণ্ড শ্রাবণ আকাশের বর্ষণমুখী মেঘ। সেহেতু ভিজে বাতাসও আসছিল মাঝে মাঝে।

আমি বুলবো কী করে গঁ ! ইকি মোদের কতা বটে ? উতো তুমাদের কতা। আমরা ঘ্যাখো শুয়োর খাই—কি বলো, শুয়োর খেঁয়ে থাহি মোরা, তাবাদে ধরো গিয়ে আমরা যোমের অরুচি লিচুজাত লিচু কাজকর্ম্মো করি, জাত বেবসা ছেড়েছি গঁ, আর মোরা জেলে লই, চাষবাস ধরেছি এ্যাকন। ই সবই তো

ছোট কাজ, লয় ? এ্যাকন মোদের পেটে ভাতও নাই, পরনে কাপড় নাই। ছোট জেতের সবেতেই দোষ। তবে একটোতে বোধায় দোষ নাই—কী বলো বাবু ?

কিসে দোষ নাই ?

ছোটজেতের মিয়েতে দোষ নাই। ঠিক কতা লয়, বাবু। মিয়েগুনো খায় না দায় না তেবু তাদের গতর হয় ধাড়ি শুয়োরের মতো লয় ? ভারী মজার কতা বটে !

মেয়েমানুষটির হাসি এতক্ষণে ফাটল। তবণটি উন্মত্তপ্রায়, বিশেষ, তার চুল খাড়া মাটির সমান্তরাল, বর্তুলাকার বক্ষদ্বয় ঘূর্ণায়মান, তার উন্মুক্ত উরুসন্ধিটি বিপরীত বিষম।

হাসিস না, অমন করে হাসিস না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঘণ্টাবাবু বলল।

হারামজাদা, হাড়বজ্জাৎ বদ্ বাবু—আমি বুলছি তুমাকে—তখন নাই বললে শুনব না কিন্তুক, দুটো ট্যাকা দিতে হবে মোকে। তার কমে হবে না।

একটি ক্ষতির ক্ষোভে যুবকটির বুকে আঘাত করে, তার হৃৎপিণ্ড ধ্বকধ্বকায় কারণ পিঙ্গলার বরাদ্দ আধুলিটি তার ট্যাঁকে আলাদা করাই ছিল। সে, যুবকটি অন্যদিকের ট্যাঁকে শুধু একবার হাত দিয়ে অনুভব করে এবং হেসে উঠে বলে, তাই নিবি যা। এখন চল, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

অন্ধকার নিচয়ের মধ্যে তাদের হাঁটতে হয়েছিল—কোথাও কোনো কলরব ছিল না—চারিদিকেই তো ধ্বংসাবিষ্ট সকল, পতিত হটের পাঁজার মতো। কাজেই কালী নিপুণা সাপিনীর মতোই আপন বিবর খুঁজে বের করে। সেখানে চক্রাকার নিম্নাভিমুখী সিঁড়ি বেয়ে পাতালপ্রবেশ চলে। একবার যুবকটি কবিত্ব ফলিয়েছিল, পথে কুড়িয়ে প্যালাম তোকে, কালী, ঠিক যেন আঁদার মানিকের মতোন। এই বলে সে নিজের কাঁপুনি টেকাবার জন্যে মেয়েটির হাত ধরতে চেয়েছিল। হাতটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এইভাবে যে বাবুর কাঁধের কাছে একটি খিঁচ-ধরা ব্যথা বিঁধেছিল। সেই সময় আরো শ্রুতি হয়, ঢ্যামনা মিন্‌সে—ঘরের আগে মোর গায়ে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি। সেই হেতু গর্তে ঢোকার ঠিক আগে অন্ধকারের দিকে চেয়ে যুবকটির ভীষণ ভয় হয়েছিল। কিন্তু হাত বাড়িয়ে আরো ভয় শিরদাঁড়ায় হিলহিল করে। ঘরের মেঝেটি তুহিন শীতল—যুবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে, এই ঘরে তুই একা থাকিস ? কী সাহস রে তোর, বাপারে বাপ !

ফস্ করে দেশলাই কাঠিটি জ্বলে উঠল। প্রথমত অবয়বহীনতা আবছায়ায় বিধৃত তৎপর কেরোসিনের লম্ফটি থেকে মরা আলো, মুমূর্ষু হরিণের চক্ষুবৎ কম্পমান—এতে এই দেখা যায় যে বস্তুনিচয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, যেমন মাটির শানকি

—কয়েকটি অন্ন তাতে আঠার মতো সাঁটা ; এছাড়া ভাঙা মাটির কলস, কয়েকখণ্ড চট দু-চারটি ইট—আরও উক্ত বাসস্থানের দেয়ালগুলি চতুর্দিকেই ভাঙা, উঁচানিচা পরিমাণে ইদুরে তোলা মাটির স্তূপ, মাথার উপর তালপাতার ছাদ, তালপাতাগুলি পুরোপুরি ছাতার মতো স্থাপিত। এই সমস্তে ধূলিমাখানো, রুখু ও আঁশ্‌টে গন্ধ অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত। একটি রোগা ও রোগী গলার আওয়াজ এই সময় চন্‌মনিয়ে বেজে ওঠে, পচা গ্রমোফোন রেকর্ডের মতো, কালী অ কালী, ইদিকে একবার আয় হারামজাদী, বিটি নচ্ছার—

এই ব্যক্তিটির শরীর কিছুতেই দেখা যায় না—কারণ সেস্থলে আলো পৌঁছায় না, ছায়া কালো শরীরের উপর কেঁপে যায়। রেকর্ডটি অবশ্য বেজেই যায়, কিছু খেঁতে দে গঁ—তোর পড়ি হারামজাদী অতো প্যাখম মেলিস না—হেইবে গঁ—

উক্ত তরুণীটি নিরুপায়, লম্ফটি তার হাতে, সে দ্রুত ঘরের দক্ষিণ কোণটিতে গিয়ে মেঝেয় আলো রাখে, শিখাটি উথালপাথাল আন্দোলিত—সে কোনো কিছু বক দিয়ে, মুখ দিয়ে, তার এলো চুল দিয়ে ফিসফিসিয়ে জবাব করে, তোর মুখে নুড়ো জ্বালি—মশানের শ্যাল তোর হাড় চেঁটে চেঁটে শাদা করে করবে গঁ, আমি হরিবোল দিয়ে বাড়ি এসবো।

এই কথায় ব্যক্তিটির সম্ভবত ক্রোধ জাগ্রত হয়—সে ঝটিতি ঘাড় তোলে কিন্তু বালিশটি তার ঘাড়ে আটকিয়ে থাকে। একটু পরেই অবশ্য আপন ভার-বশে সেটি চটাৎ শব্দে খসে পড়ে, এক প্রকার চটচটে ময়লা তাতে ছিল। এখন সব কিছুই ঘণ্টাবাবু মোটামুটি দেখতে পাচ্ছিল—যেমন মানুষটি একটি ছেঁড়াখোঁড়া চ্যাটায়ের উপর শুয়েছিল। দুখানি ইটের উপর তার ডান পা-টি পড়ে আছে, সেই পা-টি স্ফীত। ক্ষতটি কোথাও নিশ্চয়ই দগ্‌দগ্‌ করছিল কিন্তু দৃষ্ট হচ্ছিল না, তবে ভাগাড়ে পাঁচদিনের মরা-গলা কুক্কুরদেহের মতো কটু গন্ধ ছাড়ছিল এই পা-খানি। আরও, মানুষটির হাড়-পাঁজর সহজেই গণনযোগ্য, চক্ষুদ্বয় কপালের ভিতরে অবস্থিত। উক্ত ব্যক্তিটি মাথা তুললে লম্ফটি থেকে একটি পটপট আওয়াজ ওঠে—যেন জল পুড়ছিল—এই হেতু শিখাটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। এইরূপ আলোয় হয়তো সে যুবকটিকে সামান্য প্রত্যক্ষ করে থাকবে—কারণ তার দৃষ্টি থেকে কিছু কিছু কৌতুক, বিদ্রূপমিশ্রিত বিমর্ষতা এবং কোনো নিরবলম্ব জিজ্ঞাসা ঝুলে থাকে।

মেয়েটি অবশ্য খুবই ক্ষিপ্র, সে ঘরের পশ্চিম কোণের দিকে যায়, যখন ফিরে আসে তখন তার হাতে মাটির শানকিতে এক মুষ্টি অন্ন দেখা যায়, তার হাতের লোহার চুড়িটি শানকিতে ঠন্‌ঠন্‌ বাজে যেহেতু ভাতের সঙ্গে কিছু যেন সে চটকায়,

ডালের মতো কিছু। কয়েকটি পিণ্ড সহজেই তৈরি হয়ে যায় —অতঃপর মণ্ডগুলি শায়িত ব্যক্তিটির মাথার কাছে নামিয়ে দিয়ে সে বেমানান মমতার সঙ্গে একটি টিনের গ্লাসে জল আনে। এইভাবে সেবাকর্ম শেষ করে সে চোখের নিমেষে একটি ছেঁড়া চটের পর্দা টেনে দেয়। এই পর্দাটি টানিয়ে দিলে এতক্ষণে লোকটি অদৃশ্য হয়। একমাত্র তখনই ঘণ্টাবাবু মেঝেতে পাতা চ্যাটাইটি দেখে। তার মাথার উপর কি ভয়ঙ্কর তাত—মস্তিষ্ক গলে যায়-বা এবং পায়ের নিচে এমন ক্রুদ্ধ শৈত্য যে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে যেন। চটের ওপাশেই চপাৎ চপাৎ ভক্ষণের আওয়াজ—গলনালী অতিক্রমকারী খাদ্যস্রোত ফুঁড়ে ব্যক্তিটি আঁকুপাঁকু অস্ফুট শব্দগুলি বাইরে চালান করে, লরক, লরক। লরকে যাবি তু—কুনো বাপ আটকাইতে পারবে না তুকে—তু মাগী সোয়ামীর ছামনে লাং লিয়ে এলিগঁ—ই কি সববো-নাশ। ভগবান শালা, তু কি দেখিস গঁ—অাঁ? তু শালাও কি আমার মতুন চিৎপটাং শুয়ে মেগের ভাত গিলচিস? এইসব অভিশাপের পর আবার চপাৎ চপাৎ ভক্ষণের আওয়াজ ওঠে।

মেগের মাস খেছিস খা, কতা বলিস না খচ্চর মিন্‌সে—এই কথায় বাতাস শিউরে উঠে যেন চিৎকারধ্বনি দিয়ে উঠেছিল। অতঃপর মেয়েটির আর করণীয় কিছুই ছিল না—সে মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল, তন্মুহূর্তেই তার চোখে জল এসেছিল জোয়ারের মতো নিঃশব্দে—এতে উক্ত অন্ধকার জলে পরিপূর্ণ হয়েছিল—হয়তো হি-উ-উ শব্দে কোনো প্রখর ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল —যেহেতু এমনি মনে হয়েছিল যে মেয়েটি ক্রমান্বয়ে ডুবছে আর ভাসছে। এইক্ষণে বাতাসের কুশলতায় পুনরপি তার চোখে আলো এসে প্রতিফলিত হয় —সেই চক্ষুদ্বয় জলমার্জিত ছিল বলেই দৃষ্টি কোষমুক্ত তলোয়ারের ন্যায় হিংস্রটে হয়ে প্রকাশ পায়, দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে তুর মা দেখচিস লিকিন্ মা মেগো বজ্জাৎ —এই বলে কালী সম্পূর্ণত নিরাবরণ হয়েছিল। যদিচ অন্ধকার অধিক ছিল না—তার কারণ, ক্ষণিকের মধ্যেই কিছু দুঃসাধ্য প্রয়াসে আলোর শিখাটি নিবাত নিষ্কম্প তথাভূত অন্ধকার জালিকাটা নকশা ও অলংকারবহুল এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত এবং ঈদৃশ খণ্ডগুলি শিকারী বিড়ালবৎ সুযোগসন্ধানী গোঁফ-ফোলানো—যেন নিঃশব্দে কালীর বিভিন্ন অঙ্গে লম্ফ প্রদান করে। কিন্তু তাতে কিই-বা যায়-আসে; অচিরেই যে ঘরের বদ্ধ বায়ুতে সঘন নিঃশ্বাস বাজে, কোনো বিকট ছায়া মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয়—বিপরীতে দুটি হাত এমনি মুষ্টিবদ্ধ যে কণ্ঠের অজস্র শিরায় নির্মম টান পড়ে—দুই দন্তপঙক্তি পরস্পরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে

দিতে চায়—একটি মাংসের শরীর শুকনা কাষ্ঠে পরিণত হয়।

এইরূপ সুকঠিন সময়ে একটি প্রবল নিঃশ্বাসধ্বনি ঢাকের আওয়াজের মতো কড়কড়াৎ ডেকে ওঠে—ঘণ্টাবাবু পশু সংস্কারে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা মনুষ্যটিকে প্রত্যক্ষ করে। এই বেচারী লোকটি অনেকক্ষণের বদ্ধ নিঃশ্বাস এককালে ছাড়তে গিয়েই এমন শব্দ সৃষ্টি করে ফেলেছে—তার ডান হাতে শাণিত টাঙ্গিটি আক্রোশধৃত, বাঁহাতে পাকা বাঁশের লাঠি আলগাভাবে দোলে—তার ঘাড়টি বাঁকানো—সে ব্যাদিত বদন—সেহেতু দাঁতগুলি সবই দেখা যায়—মুখের কোণ বেয়ে সর্পবিষের মতো লালা ঝরছে। আমাকে মেরো না, আমাকে মেরে ফেলো না—ঘণ্টাবাবুর এই কথা এতই অনুচ্চ ছিল যে তা বাতাসে ফিসফিসানি মাত্র, কোনো শ্রবণ না থাকায় আদৌ শ্রুত হয় না। অতঃপর তড়িৎবেগে পোশাক সামলে ঘণ্টা দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে যায়। এই যে ইদিক পানে এসো গঁ—শালা ঢ্যামনা মাগীখোর—তুর যে নিদেন কাল হেঁকেছে—ইত্যাদি বাক্যাবলিসহ ব্যক্তিটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে হাতের টাঙ্গি তুলে ধবে। ঘণ্টাবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে যায়—হয়তো-বা আকাশ-পাতাল চিন্তায় সে দিশেহারা, তার চোখে কোনো পলক নেই—চোখের সাদা অংশটি ক্রমাগত বাড়তে চাইছিল—তার ডান হাতটি বুকের কাছে আধা উত্তোলিত, মাথাটি পিছনে হেলানো। পুনরপি বিড়বিড় করে কিছু কথা উচ্চারণের প্রয়াসী ছিল সে। তন্মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত বদলে টাঙ্গি লাঠি বদলাবদলি করে লাঠিটি ডান হাতে নেয় লোকটি। আঘাত হয়তো ঘণ্টাবাবুর মাথার উদ্দেশ্যেই এসেছিল—কিন্তু সে বড় এছোল-পেছোল; তার বাঁদিকের পাঁজর গুঁড়ানো আঘাত এল। সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে দু-তিনটি হোঁচট খেয়ে, হুমড়ি দিয়ে লাফিয়ে এইবার ঘণ্টাবাবু কিছু কাজ না খুঁজে পেয়ে ঘবের বাইরে চলে আসে। কিন্তু পথ তো তখন লুপ্ত, আকাশের নিচে বৃক্ষসকল খাবি খাচ্ছিল—তাদের উপর দিয়ে শীতের সাপের মতো বাতাস সামান্য হিলহিলে মাত্র আঁধার; চরাচর অসাড—এমতাবস্থায় বহুদূরে কণ্ঠের হুনহুনানি তীক্ষ্ণ বৃংহিতে কাটাকাটা। পুনরপি ছিন্নভিন্ন। ঘণ্টাবাবু সেখানে বার-দুয়েক গড়াগড়ি দেয় এবং পরক্ষণেই প্রবল তরাসে পদবিক্ষেপ বহু দ্রুত করে ফেলে। কিন্তু পদধ্বনিগুলি চারিদিকেই সোচ্চার—বিশেষ, বড় রাস্তার মুখেই আবার দুটি নগ্ন-প্রায় ছায়া তাকে আরো আরো মোক্ষম আঘাত দিয়ে সরে পড়ে। এখন তাব বাম স্কন্ধ থেকে বাহুসন্ধিটির জোড় বিচিত্র শব্দে খুলে যায়—একারণ ঘণ্টাবাবুর বাঁহাতটি ড্যাং ড্যাং ঝোলে। মেরে ফেলালে রে—এই চিৎকার আনতে গিয়ে

ঘণ্টাবাবু কি খেয়ালে সামান্য উক্ত করে যে, মেরো না আমাকে মেরো না গো— পায়ে পড়ি তোমাদের। কিন্তু কোনো শ্রবণ না থাকায় এসবও শ্রুত হয় না।

সে-স্থলে যেন-বা প্রস্তরময় ন্যাড়া পাহাড় বিদীর্ণ হয়েছিল, বনস্পতিসমূহ উৎপাটিত উন্মূল—এইরূপ মুহুর্মুহু বর্জনির্ঘোষ কোনো জনপদপ্লাবী জলোচ্ছ্বাসকে ডাকে। তবু এসবই ঘণ্টাবাবুর মগজের বানোয়টি বিপ্লব মাত্র। কারণ বহিঃপ্রকৃতি আশ্চর্য-রকম স্থির, জলদর্পণে সমস্ত কিছুই মারাত্মক স্তব্ধ। অচিরেই প্রশস্ত পথটি প্রান্তরের দিকে মোড় নেয়, ঘণ্টাবাবু কয়েকটি মুহূর্তেই শুধু আপনার মনকে আঁচড়িয়ে দেখেছিল।

যদি-বা নিজেদের পাড়ায় যাবার সংক্ষিপ্ত পথটি কোনোক্রমে অতিক্রম করা যায়, একারণ সে ঘন গুল্মতায় আচ্ছন্ন জগডুমুর গাছটির পাশে গিয়ে হাজির হয়। তবে কিনা এ জায়গাটি ভারি কঠিন ছিল, মানুষ দুটি গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলে দুঃখী ঘণ্টাবাবু বড়ই বেকায়দায় কোণঠাসা। মাথার উপর হাতদুটি সংস্কার-বশে তুলতে গিয়ে ডান হাতটিই উঠে আসে—তার বাঁহাত যথাপূর্ব আঁকাবাঁকা দোলে। এবার তার কঠিন মাথা থেকে ধাতব শব্দ বেরোয়, ঘণ্টাবাবুর রক্তটি বেশ করুণ ও নিঃশব্দ। কয়েকটি ধারা গড়িয়ে গেলে সে চোখে দেখে না যেমন, তার তেমনি কোনো ব্যথার বোধও ছিল না। তাছাড়া প্রপার্থিব ঔদাসীন্যও তাকে আক্রমণ করে বসেছিল। সে ন্যালা নুলো মানুষের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোল খায়—হয়তো-বা সেভাবেই দু-এক পা এগিয়ে থাকবে যখন সে ঢালু পাড় বেয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। তার শিরদাঁড়ায় জলস্পর্শ ঘটলে একবারই মাত্র ঘণ্টাবাবু খণ্ডবিখণ্ড সময় বা মুহূর্তের স্বাদ পায়, তৎপরেই এইসব মানুষের কাছে সে যেন-বা বেঢপ কোনো মৃত্তিকা স্তূপে পরিণত হয়েছিল— মানুষরা পুনঃ পুনঃ আঘাতের শ্রমে শ্রান্ত, এলিয়ে পড়া, সমস্ত অন্ধকারের দিকে চেয়ে তখনও নিঃশব্দ কোলাহলে কেঁপে কেঁপে উঠল, কেউ কেউ পেট চেপে মূর্ছা গেল, কেউ লেজ কামড়ানো পাগলা কুকুরের মতো আপন বাহু দংশন করছিল। এসবেতেই চরম বিশৃঙ্খলা সেজন্যে কাউকে বলতে হল, আর লয়, শ্যায় হ'য়ে গেলছে—এই বলে প্রচণ্ড লাথি কষে আবার বলে, সবই আক্রা গঁ—শুধু মেয়ে মানুষ শস্তা, লয়? শালো কুকুরে জন্মিত শুয়োর, মজাটো বোঝ কেনে এখুন। শালোকে ভদ্দর নোক পাড়ায় পাঁচ-গড়েতে দিয়ে আসি—নাকি গঁ—আঁ?

কতক সময় আগে থেকে ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। যে সমস্ত সংকীর্ণ খাঁড়ির শীর্ণ জলধারা এই অঞ্চলের শুকনা খটখটে হিঙ্গুল মাটির উপর হিংস্র পশুর শক্তিমান

নখরের আঁচড়বৎ—তারা নিজেদের অজ্ঞাতে শনৈঃ শনৈঃ পাথুরে মাটি কাটে। তীরের বশিষ্ঠ বৃক্ষসমূহের শিকড় জালের মতো ছড়ানো। এইরূপ শিকড় ধপধপে শুভ্র—খাঁড়িসমূহ ধীরস্থির পাকে পাকে অতি কষ্টে এগিয়ে চলে, হয়তো শেষে তাদের শুরুতেই ফিরে আসে; তাদের কিছু কিছু জল চাই, তারা সামনে যেতে যেতে আকাশ থেকে জলপানে নিরত হয়েছিল। এদেরই কেউ গুঁড়িয়ে ফেলেছিল, গভীর খাদ প্রান্তরের দেখা পেয়ে তার সমতল হয়েছিল—অতএব সেই সঙ্গমস্থলে জটিল গুল্মজাল ও কিয়ৎসংখ্যক বৃহৎ তরুর জঙ্গল আছে। এই বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে কাজেই কোনো কুটিরই চোখে পড়তে চায় না। কিন্তু ঐস্থলে একটি কুটির ছিল। কুটিরটি দারুণ গ্রীষ্মকালে গভীর ছায়ার থাবায় মাথা-রাখা কুকুরের ন্যায় বিশ্রামরত। ঐ কুটিরে কোনো কাষ্ঠনির্মিত দরজা ছিল না, সেই হেতু দরজায় ধাক্কা দেবার কোনোই প্রশ্ন নেই, শুধু অর্গলটির রজ্জুবন্ধন একটিমাত্র প্রবল লাথিতে ছিঁড়ে যায়। এবং অভিরামের ভ্রাতুষ্পুত্র গায়ক মনোহর সেখানে প্রবেশ করে। এই ব্যক্তির শরীরে প্রচুর কর্দম ছিল, কিছু কিছু রক্তের ছিটা, একটি গভীর ক্ষত উরু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বমান, আরও, তার চোখে ভয়ানক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, তার আপাদমস্তক ভিজে জবজবে—একারণ বদ গন্ধে টেকা দায় গৃহবাসিনী কৃষ্ণভামিনী মৃদু আর্তনাদে আপনার মলিন শয্যা ছেড়ে এসেছিল, তবে পরিচিত মানুষ দেখে সে সামান্য পরিমাণে আশ্বস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে শঙ্কা ও ভীতির বদলে প্রবল উৎকণ্ঠা মেয়েটিকে মূহ্যমান করে দেয়। সে তার দুই চক্ষের দৃষ্টি একত্র করে মনোহরের মুখের উপর আটকে ফেলে—যে মুখের উপর কেরোসিনের লম্ফের আলো পুনঃপুনঃ লক্‌লকে জিব বুলিয়ে যায় এবং উপরিস্থিত প্রশাখার আঁধার ছায়াও বারবার যাতায়াত করে কারণ তখন জোরালো বাতাস ছিল। এইভাবে মেয়েটি বারকয়েক তার দৃষ্টিবিন্দুকে স্থানান্তরিত করে, মনোহরের নাকের ডগায় একটি বৃষ্টির ফোঁটা ঝকঝক করছিল, যে কোনো মুহূর্তে ঝরে পড়বে এইরূপ; সে হতাশ মৌন আশ্রয় করে ভাঙা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসেছিল, তার পায়ের উপর মৃদুশব্দে জল বয়ে যাচ্ছিল, একটি বৃহৎ কেঁচো তার গোড়ালির ক্ষতে লটরপটর। তখনো কিছু কিছু বৃষ্টি হচ্ছিল।

তুর বাবা কুথা ভামিনী? মনোহর এইরূপ প্রশ্ন করে।

বাবাতো বেইরে গেঁইছে—আসে নাই আখুনো।

বটে?

হেঁ, সাঁঝের বেলা বাবা বেইরে গ্যালো। কিন্তুক তুমার কি হইচেঁ?

একটো মানুষ খুন করে ফেল্লম এই কতেক সোমায় এগু জান্লি ?

বলছ কি গঁ ?

হেঁ র‍্যা, বড্ডা ডর লাগছে—তাই তুর কাছে এলাম। যদি—এই স্থলে মনোহরের কথায় অস্বাভাবিক কোনো প্রত্যাশা থেকে থাকতে পাবে, সে কারণ তার কণ্ঠে দ্বিধার কোনো অন্ত ছিল না।

কে খুন হেঁালো বটে ? কারা খুন করলে গঁ ?

সি এ্যানেক নোক মিলে খুনটো করলে, বুইলি !

আরি আরি সববোনাশ কেনে মানুষ মারলে নোকে,—আঁ ?

বেপারটি মজার বটে র‍্যা। মানুষ খুন ? আরি বাপরে ইকি সোজা কতা ! তেবু নোকটো খুন হলো বটে। খুন শালো আমিও করলম। কথাটো বোঝ ক্যানে ভামিনী।

আমি যি বুঁইতে পারচি না গঁ—মুটেই বুঁহতে পারচি না—কৃষ্ণভামিনীর মুখের চেহারা এঁকাবেঁকা হয়েছিল—চোয়ালের হাড় নডবড়ে হলো।

হঠাৎ বৃষ্টি থেকে বায়ু-শব্দে কানে তালা লাগে—কুটিরটির চতুষ্পার্শ্বস্থ ঝোপে বাতাস আটকে হাঁজর-পাঁজর, উর্ধ্বে শাখা-প্রশাখা পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ে এবং মটমট শব্দে কিছু কিছু ডালপালা ভেঙে নিচে পড়ে, দূরে খাঁড়িসমূহের অতি উচ্চ পাড় অস্পষ্ট দেখা যায়—এই কালে ক্লান্ত হস্তা মর্মভেদী চিৎকারে সঙ্গী ডাকে। উক্ত বিব্রত অসহিষ্ণু আহ্বান তীরের বেগে প্রান্তবের উপর দিয়ে ছুটে কোনো অন্ধকারে আমূল গেড়ে গিয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে।

তু ঘুমিয়ে আচিস ভামিনী, আঁ, ধর তু ঘুমিয়ে আচিস, এই সোমায় কুনো শালা তুক এঁকড়ে ধবলে— সি যি শালাই হোক—ধর আমিই হলাম, কি করবি তু আঁ ? বল কি করবি ? একথায় ভামিনীর নডবড়ে মুখাবয়ব এবার যথাযথ—তাই নয় শুধু, মাংসপেশীগুলি কোনাকুনি সোজা বাঁধন চালিয়ে সেই তরুণ মুখ-মণ্ডলকে মজবুত কবে মেরামত করে দিয়েছিল। চোখের দৃষ্টি ঝকঝকে নীল হিংস্র হয়েছিল।

সি যি ঢ্যামনার কাজ, এমুন কে করলে বটে ?

এমুন কেউ করে না। ধর কেনে, তুর প্যাটে ভাত নাই, পরনে তেনা নাই—কি ক্ষিদের জ্বালায় তু জ্বলচিস গ—আঁ মাথায় বুদ্ধি নাই, হেদয়ে বিবেক নাই, বুকে দয়া নাই, শুদু প্যাটে আগুন জ্বলচে, প্যাটের ওপরে কিছু নাই—প্যাটের নামোয় সব শুকিয়ে গেলচে হায় গ—তুর মাথা যি খারাপ গ আঁ—এমুন কালে

পাড়ার বাবু টাকার তাড়া দেখিয়ে তুকে তার সাতে শুতে বললে—

এসব কথা-জাত উত্তেজনাহেতু ক্ষণিক বিরাম শেষে গায়ক মনোহর আবার বলে, ইতিমধ্যে বৃষ্টিতে বিরাম, ঝড়ো বাতাসে ক্ষান্তি, বৃষ্টিতে দগ্ধ দ্রব্যসমূহ হতে বড় কটু ভেজা ছাই-ছাই গন্ধ এবং এই যে ভয়াকুল বিপুল দেশে অস্থিসমূহ ছিটিয়ে আছে, কোথাও বা স্তূপীকৃত, হা-হা, দুর্ভিক্ষের উদরে ক্ষুধার সম্ভবার থরে থরে সাজানো ছিল—সে সমস্ত আকাশচুম্বী ও পাতালমুখী, সমুদ্রতরঙ্গবৎ, আসে ও চলে যায়, গভীর নিশীথে বা হায়েনার মতো ডাকে, তাই মনোহর চমৎকার সামঞ্জস্য করে বলে, আই গঁ ভামিনী, হ দ্যাশ শুকাল গেলছে ইখানে তুর গোরুটো রোদে পুড়ে ধরফরিয়ে মরে গ—পাঁচ কোশের মাথায় যমদূত শালা খাড়া আর এই পাঁচ কোশের ভিতরি একটো ঘাসও নাই—উরি বাবারি বাবা, কি ভংকর বেপার বটে। মাঘের ধানে খরা পেরোয় না, মাঠের ধান আসে নাহ, ই বাদে আবার বাবু-মশাইদের মিয়ে মানুষ চাহ—

মনোহরের এই বিবরণ আপন তীব্রতায় আপনিই ছিঁড়ে গেলে বেচারার হঠাৎ বাক্‌রোধ হয়, কিন্তু তাতে নিবৃত্ত হবে এমন লোক সে নয়, একারণ দু-চারটে ঢোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে সে আবার বলে, সি আবার কেমুন? সোয়ামী শালা গলে পচে হেজে গেঁইচে, আজ বাদ কাল মরবে, তা সি শালা দেখতে পেচে গ, প্যাটের আগুন লিয়ে, আঃ গ, চোখে জল লিয়ে বৌ এঁসে পরপুরুষের সঙ্গে—

শব্দহীনতা এইরূপ চরম ছিল যে, যে সময় কৃষ্ণভামিনী আপন কণ্ঠনালী বহু-ভাবে ছিঁড়ে ফেলে ক্রন্দনের চেষ্টা করছিল—সে শব্দ ন্যায়ত ধর্মত অবশ্যই অসহ্য ছিল। এতে মনোহর ভীত হয়ে শুধু'' ই বলে তার বিবরণ সমাপ্ত করে দিয়েছিল যে, পাড়ার সবাই মিলে উক্ত শূকরজাত বাবুটিকে নিকেশ করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এরূপ আরও আরও ভদ্দরনোক নিশ্চিতই নিধন হবে।

কিন্তু ক্রন্দনটি ক্রমাগতই অধিকতর অশান্ত হতে থাকে, আই গঁ আমাদের কি উপায়—আহা রি, ই পোড়া দ্যাশে কাজ নাই, ইখানে অন্ন নাই, ভদ্দরনোকে ভাত ছিটিয়ে মেয়েমানুষ ন্যাংটো করবে গঁ—আঃ হায় হায় রি—ইত্যবসরে মনোহর আপন অবিন্যস্ত কটা চুলগুলিতে হাত চালায় এবং ভীষণ ভাষায় থেমে থেমে বলে, মেয়েমানুষের হত্যাকার নখড সে কোনোক্রমেই সহ্য করতে পারে না—আরও বলে যে সে ভীত কারণ হত্যাকাণ্ডটি আগামীকাল কিছুতেই চাপা থাকবে না এবং পল্টন পল্টন পুলিশ লাঠি হাতে এই অচ্ছ্যুৎ পাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়বে—তবু মৃত্যু কি জীবনে একবারই আসে না? এবং সেইসব চিম্‌সে দুর্গন্ধ বদমবণ মরতে

যে দুঃসহ ক্লান্তিতে ভুগতে হয়—তার চেয়ে একটি উজ্জ্বল হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধ কি প্রচণ্ডভাবেই না কাম্য! এই কথা মনোহর খুবই ভালোবাসা এবং মায়ার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল এবং কথা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটিতে সামান্য কিছু নরম আলো পড়েছিল—এজন্যে বাক্যের তীব্রতা চলে যায়; উপরন্তু ভামিনীর আফসোসসহ অবিরত ক্রন্দন যথেষ্ট কোমলতা আনে, তার চক্ষুজাত অশ্রুবিন্দুগুলি সামান্য রঙিন, নিঃশ্বাসেও যেন সুরভি আছে—তাই ধীরে ধীরে মনোহরের উত্তেজনা শান্ত হয়, সে মেয়েটির পুরা নাম উচ্চারণ করে, কৃষ্ণভামিনী!

বল গঁ।

কাঁদচিস্ ক্যান বল দিকি? অঁা—

এ্যামুন বেপদ ক্যানে? আমাদের এ্যামুন বেপদ ক্যান—মেয়েটি পুনরায় ফোঁপাবার উদ্যোগ নেয়, ই কি অত্যাচার গঁ?

সেই লেগেই খুন হলো।

একন কি হবে?

কি আবার হবে—বদমাইসরা লিকেশ হবে। ইবার আমি মরব, তার বাদ তুমি মরবি। তা বাদ? ই হি রে—আমরা যি রক্তবীজের ঝাড়—লয়কো?

এসব কথা বলে মনোহর কৃষ্ণভামিনীর হাতে হাত দিয়েছিল—অতঃপর লম্ফটি নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং মেঘদল দূরে ভেগেছিল, বায়ু শুষ্ক হয়েছিল—খাঁড়িসমূহের জলপ্রবাহ ঘটাতে থাকে—এসবের মধ্যস্থিত বাক্যসমূহ দুর্মর প্রাচীন পাথরের গায়ে খোদাই-লিপির মতো—যেমন তাতে এমন অতি সাধারণ স্বীকারোক্তিগুলি ছিল, তুকে ছাড়া আমি মরব ভামিনী—কিছুতেই বাঁচব না গ—এমনি আমার অবস্থা, আমি বুঝি না কিচু—অঁা।

এমুন করিস না—এমুন করিস না।

ক্যানে, তুর ভয় লাগে ভামিনী?

হি—তরাসে পেরান যায় আমার।

খালি এই রাতটো তা বাদ কি হবে ভামিনী পুলিশ আসবে গঁ। পাড়াটো বরবাদ হবে। অতঃপর নিজেই আবার গর্জন করে ওঠে, দেখি শালা কি করে। খুন একন হবে ভামিনী। একটো লয়, দুটো লয়—বহুৎ বদরক্ত বার করবো বুঁইচিস।

আজ রেতে মায়ের পুজো লয়?

উ কতা আর বুলিস না ভামিনী। পুজো লাফ মারচে।

ক্যানে গঁ—রেতে পুজো হবে না? ডাকবে না তুকে?

উ কতা আর বলিস না বাপু। যি বেপারটো হলো, আমি আজ ঘর যাব না।

খুঁজবে যি তুকে। তু ছাড়া বাবুদের পুজো যি হবে না।

ভামিনী, আই ভামিনী খুনটোব কতা এই রেতে জানাজানি হলে আমারও হঁয়ে যাবে। বলিদান হঁয়ে যাবে। ঠাউর মশায়ের হাতে খাঁড়াটো আমি দেখতে পেচি পষ্ট। ঐ খাঁড়া লিজের হাতে লিয়ে ঘণ্টাবাবুর বাপ কোপ বসাবে আমার ঘাড়ে। লয়কো?

এই রেতে জানাজানি হবে ক্যানে? বাবুর বাড়ির লোক ভাবচে পুজোর ফুর্তিতে মজা মারচে বাবু। মদ টদ খেঁয়ে কোতা হয়তো গড়াগড়ি খেঁচে। নাইলে মোদের পাড়ায় এসে পড়ে আচে।

এরপর উক্ত খাঁড়াটি ঝুলতেই থাকে। এসব আলাপের পর, বৃষ্টি থেমে গেল এবং হাওয়া পড়ে গেলেও। একারণ রাত্রিটি ভয় মাখানো—অর্থাৎ পিছল—যথা মনোহর পুনঃপুনঃ পা রাখতে গিয়ে পড়ে পড়ে যায়, তদুপরি ঘণ্টাবাবু পটল তোলার পরেও চোখ খুলে আছে। এই দয়া কারও হল না যে তার চোখদুটি বন্ধ করে দেয়, মৃতের জগতের অন্ধকার তার দু'চোখে লেপে দেয়। অতএব সে চুর্ণ মস্তক জোড়খোলা অঙ্গাদিসহ দুইটি চক্ষু মেলে রইল। এই দৃশ্য প্রকৃতই ভয়ঙ্কর। মনোহর ভামিনীকে নিকটে আকর্ষণ করেছিল, কোতা কোতা সব চলে গেইচেঁ, লয়কো ভামিনী?

কার কতা বুলচো?

পাড়ার নোকের কতা বুলচি।

কোতা গেইচেঁ?

তা আমি জানি না। এখন কেউ আর বাইরে নাই। তুর বাবা কখুন আসবে?

কি জানি!

সি আর এই রেতে আসবে না।

সম্ভবত সময়টি এখন দ্রুত সরে সরে যাচ্ছিল—কেমন যেন পলায়নপর মনে হয়েছিল—যে কারণ মনোহর আপন আবেগ সামলাতে অক্ষম হয়, ভামিনী, তুকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছেলম গঁ—তা আশটোর দিকে তাকা দিকিনি—উরে বাবারি, রোদে যেন চোখ ধেঁদে যেচে—পুড়ে যেচে সব—তুর ঘর নাই, বাড়ি নাই, জমি জেরাত নাই, কলুর বলদের মতুন খেটে যাবি গঁ শুদু—তা বাদ এই আকাল। হাড় চরচরানো আকাল—

মনোহরের নিঃশ্বাস বইছিল ঘন ঘন—মুখে ফেনা ভেঙে গাঁজলা ওঠার মতো—যখন ভামিনীর সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠতর হয় এইসব শ্বাস দীর্ঘায়িত, প্রান্তর ইতিমধ্যেই শুষ্ক একারণ হাওয়া বিব্রত, শুকনোও বটে, মনোহর বাইরে মাঠের দিকে চেয়ে তথায় কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না, তবু যেন যবনিকা উঠছে।

তাদের কথা অমৃতের মতো—যদিও তাতে ক্রমাগত বিষ্ঠাপাত হয়।

মনোহরের পা টলছিল। তার এইরূপ মনে হয়েছিল যেন মগজ চল্‌কে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়বে—বিশেষ, সর্বত্রই অদ্ভুত রকম নেতি, লুপ্ততা, ভয়াবহ আঁধার পুনরপি মেঘদল আকাশে সাজছিল, যখন খুশি আকাশ বর্ষণমুখী হয়ে যাবে। তেঁতুলে বাগদিদের পাড়া থেকে ভদ্রপল্লীর দূরত্ব কি অতি সামান্যই নয়? এদিকে পথ পোড়ো ভিটের উপর দিয়ে—অর্থাৎ কোন পথই নেই, শুধু ভাঁট, আসশ্যাওড়া, জগডুমুর ইত্যাদি—কিছু বিশীর্ণ শিমুল ও বুনো আতা বা আমড়ার সমাবেশ—কিছু লোমওঠা শিয়াল এবং বনবেড়ালের নিঃশব্দ অস্তিত্ব। এসবের মধ্যে মনোহরের পা টলে—সংক্ষিপ্ত ক্ষেতটুকু পার হয়ে সে বালুময় প্রশস্ত গ্রামপথে পা বাড়ায়। তার কাছে ডাক এসে গেছে। এই স্থলে, এই ফাঁকায়, দুর্দান্ত তেজে কাড়া নাকাড়ার শব্দ চলে আসে। এতক্ষণ এই শব্দ দূর আকাশে মেঘের গর্জনবৎ ছিল—গুরু গুরু, ঢ্যাপ ঢ্যাপ—বর্তমানে নবক গুলজার—কাঁসিটি মাথার ভিতরে ঝাঁই ঝাঁই শব্দে বাজে—যেন-বা পৃথিবীর ভিতর থেকে উত্তপ্ত জল, বাষ্প ইত্যাদি ছিটকে বেরিয়ে আসবে। মনোহর আপন গোড়ালির ক্ষতটি ভিজে ন্যাকড়ার পটি দিয়ে কিঞ্চিৎ আড়ালে ঢাকতে চেয়েছিল—ন্যাকড়াটি খসে গেছে।

সমস্ত কিছুই সুষুপ্ত এমন প্রতীয়মান হতে পারে—ওপাশে মেলার উপর আকাশ আবছা আলোকিত, তবে সম্পূর্ণতই ঘুমন্ত—আমার কি হবে গ—একথা ভেবে মনোহরের খুবই ভয়, অধিকতর আক্রোশ ও ক্রোধ দেখা দেয়। সেই শিরখ্যাঁচা গানের মতো—ও তুই চোখে দেখবি অন্ধকার—অন্ধকার শব্দটিকে বিশ্রীভাবে এলিয়ে দিয়ে অন্ধকার উচ্চারণের মতো। মনোহর গামছাটিকে কষে কোমরে বেঁধে নাভিমূলে গিঁঠ বাঁধে। অতঃপর গুটি গুটি এগিয়ে পাষাণপুরীটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। স্থানটি পূজাস্থল বটে—মন্দিরও এখানে স্থাপিত; কয়েক একর পরিমাণ জমি প্রাচীর বেষ্টিত, যেমন কারাগার; প্রাচীর সুউচ্চ, বড়ই মসৃণ ও সিধা, পবিত্র ধপধপে। এই বিশাল চতুষ্কোণ দেবস্থলে প্রবেশ ও নির্গমনের দুটি মাত্র ফটক—ক্ষতবিক্ষত কঠিন শালের দরজা, ভিতরে প্রবেশ মাত্রই বিচ্ছিন্ন, সহায়হীন, যদিও প্রায়শই খেঁকি কুকুর অনন্যপূর্ব পন্থায় অন্দরে প্রবেশপূর্বক দেউলের গায়ে মূত্রত্যাগ করে

থাকে। মনোহর ফটক পেরিয়ে, ধূপধুনার ভারি বাতাস ঠেলে সরিয়ে রঙ্গস্থলে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মানুষজনের চক্ষুসকল আনন্দে জ্বলে ওঠে—বাজনদারদের হাতে নাকাড়াগুলি চড়বড় শব্দে কানে তালা ধরিয়ে দেয়, ঢাকগুলি নদীতে ভূমিধ্বসের বিকট আওয়াজ করে। আলো অতি সামান্য—মাত্র দুটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল, কিন্তু ঘরভর্তি লোক—তাদের পরনে রক্তবর্ণের বসন, ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, কপালে রক্তচন্দন, যেন-বা কাপালিকসমূহ ; তাদের তাগা-বাঁধা বাহু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে—এ সময় কোনো বাজনদারের বাবরি ছড়িয়ে যায়—সে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে দুই পা দিয়ে বাতাসে ট্যাঁড়া কাটে। এইসবের মধ্যে পুরোহিতটি অতিমাত্রায় গম্ভীর; আপন মহিমায় সে এখন হাস্যকর, কারণ তার দন্তহীন মুখগহ্বরের মধ্যে ঠোঁট দুটি ঢুকে গিয়েছিল—তার চোয়াল ভেঙে চুরমার, তার মস্ত টিকি সম্বলিত ন্যাড়া মাথাটি খ্যাংরা কাঠির মাথায় বসানো নারকেলসদৃশ ছিল এবং তার মদ্যপ চরিত্রহীন চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি একরূপ কাতর, নিস্পৃহ অথচ নিষ্করুণ। এই ব্যক্তির শীর্ণ ঠ্যাং—কিন্তু উদর জালার মতো সে হাত তুলে ইঙ্গিতে বাজনা থামাতে বলে।

মুহূর্তেই স্তব্ধতা আসে। মধ্যরজনীর ভার আসে। এইসব স্থলে ঢলঢলে পাঁকের মতো অন্ধকার সেঁধিয়ে যায়, হু হু করে ধুনা পোড়ে। যেভাবে গলগলে ধোঁয়া বেরোয় তাতে সকলেই একটি সাদা পর্দার আড়ালে চলে যায়। পর্দার অন্তরাল থেকে পুরুত বলে, মা, মাগো।

মনোহরের গায়ে কাঁটা দেয়, সমবেত চিৎকার ওঠে, মা, মাগো।

পুরুত বলে, এইবার মায়ের বলি হবে—

পুনরায় মনোহরের গায়ে কাঁটা দেখা দেয়।

এইবার বলি—মায়ের বলি—সমস্বরে প্রেতকণ্ঠ যেন-বা প্রতিধ্বনি তোলে।

মায়ের মহিমা কে জানে—কে বলতে পারবে মায়ের পুণ্যকথা—

ঐ পাশে মূর্তির সামনে, পর্দার আড়ালে অসংখ্য শব্দ—ভারি বুড়োটে, বদ্খত শব্দের স্রোত—মনোহর চোখ মটকে দেখে একটি পাশে, বাইরে অভিরাম ঘাড় গুঁজে বসে আছে—বাক্যস্রোত এক প্রকার, মা হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী সর্বাঙ্গসুন্দরী কল্যাণময়ী মূর্তি, কখনো ক্ষুদ্র ফুটফুটে একটি বালিকা, কখনো যৌবনবতী কুমারী কন্যা, কখনো বিবাহিতা তরুণী ভরপুর তৃপ্তহাসিনী, কোলে নানা বয়সের অপোগণ্ড ছেলেপিলে—মা তখন পরমা সাধ্বী—মা, এই আমাদের মা। বৃদ্ধ-পুরোহিতের অতিলৌকিক কণ্ঠ একনাগাড়ে বর্ণনা করে, এই কাহিনী এতদ্দেশে প্রচলিত আছে—মায়ের কি অপার মহিমা—কি অপার করুণা সন্তানের প্রতি দেখ

—এই কাহিনী প্রচলিত আছে যে মা কখনো কোনো একদিন কোনো নির্জন খর-রৌদ্রের দ্বিপ্রহরে যখন কোনো শাঁখারী এই গ্রামের পথে পথে ডেকে ফিরছিল—ঐ ব্যক্তি ঘর্মাক্ত, অবসন্ন, খদ্দের পায়নি, বেটা নেহাৎ হতদরিদ্র হতভাগা অন্নহীন সে আমাদের বিশাল দীঘির বাঁধা ঘাটে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছিল, দীঘির উচ্চ পাড়ির উপর চতুষ্পার্শ্বে বট এবং অন্যান্য বিটপীসমূহের ঘন নিবদ্ধ ছায়া এবং স্থানটি ঠাণ্ডা ও জনবিরল—এই অবস্থায় একটি ষোড়শী বালিকা—আহা কি তার রূপ, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, গুরুনিতম্বিনী, আহা কি অপরূপ ঐ বালিকা, সে এসে আপনার সুডৌল সুগৌর হাতদুটি নিঃসঙ্কোচে শাঁখারীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বসে। শাঁখারী বেচারী বড়ই উল্লসিত হরষিত মনে আপনার মনোমতো শ্বেতশুভ্র শাঁখা ঐ দুটি হাতে পরিয়ে দেয়। এইস্থলে পুরুতটি আবেগে কেঁদে ফেলে ক্রন্দন-পরায়ণই থেকে যায়—অতএব সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে, নাক মুছতে মুছতে বলে শাঁখারী কি ভাগ্যবান সে মেয়েটির হাত ধরতে পেরেছিল—অহো, সে কি পরম সৌভাগ্য নিয়ে এই পৃথিবীতে শাঁখা বেচতে এসেছিল—কিন্তু গরীব বেচারার নগদ পয়সা জুটলো না—কারণ শাঁখা পরা শেষ হলে সেই মেয়ে বলে, মন্দিরের পুরুতের কন্যা সে, তাকে গিয়ে মেয়ের শাঁখা পরার কথা বললেই শাখারী আপন পাওনা বুঝে পাবে। এখন এই পুরোহিত কি মহাপূণ্যবান অনুধাবন করো—আমারই পূর্বপুরুষ, হায়রে মানবজন্ম, কেউ শূকরবৎ অস্পৃশ্য কেউ-বা দেবতা—এ মহিমা কে বোঝে—যাই হোক, পুরুত ঠাকুরের কোনো কন্যা ছিল না, তিনি শাঁখারীর দাবি অগ্রাহ্য করেন। শাঁখারী বলে, মশয় আমি আপনার কন্যাকে শাঁখা পরিয়েছি—বেটিকে খুব মানিয়েছে। পুরুত ঠাকুর বলে, কি আপদ, আমি বর্তমানে বিপত্নীক জীবৎকালে আমার স্ত্রী কখনো সন্তানবতী হয়নি। শাঁখারী বলে, মশয়, কেন মহা-পাপের ভাগী হচ্ছেন আজ্ঞা? আপনার কন্যা দীঘির বাঁধা ঘাটে স্নানরতা, স্নানপূর্বে আমার কাছে শাঁখা পরেছে। অতএব দুজনে বাধাঁঘাটে উপস্থিত হয়ে দেখেন ঘাট শূন্য, পাকা শানের উপর গুটিকয়েক পায়রা শস্যকণা খুঁটে খুঁটে খায়। দীঘির অতল কালো জল নিস্তরঙ্গ। কন্যা কোথায়? পুরুত দাব করে। কিন্তু তাতে এই ফলমাত্র হয়েছিল—যেহেতু মা পরম করুণাময়ী এবং শাঁখারী মাকে কোনো প্রকার হতচ্ছেদা করেনি বরং ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, এইতো ছিল—কোথা গেল গ—অতএব এই ফল হয়েছিল যে দীঘির স্তব্ধ জলতল ভেদ করে দুটি শাঁখাপরা হাত নিঃশব্দে উঠে এসেছিল এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জলে রূপের ঝিলিক তুলে পুরুত ঠাকুরকে বেকায়দা হতভম্ব করে, বুকে তীব্র আকুলতা জাগিয়ে উক্ত মণিবন্ধ দুটি পুনরায় জলনিম্নে

অন্তর্হিত হয়েছিল।

এইভাবে গল্প শেষ করে পুরোহিত ঠাকুর চোখ উল্টে দেয়, মুখভাব প্যাঁচার মতো, অল্প অল্প দুলে মায়ের মহিমা উপলব্ধি করে, উপস্থিত কেউ কেউ অবশ্য উশখুশ, বৎসরে বৎসরে এই গল্প চলে আসছে, তবু বুড়ো গল্পটাকে কিভাবেই না রসায়—আঁ, বাপু রসায় মন্দ না—তবু কাহিনীটা এট্টু রসেছে, নয় ? বাসি মাছের মতোন। বাজনদারের দল ফসফস শব্দে বিড়ি টানে—ঢাকের কাঠি দিয়ে কানের পাশ চুলকোয়—এসব এজন্যে যে তারা কস্মিনকালেও কোনো কথা শোনে না—তারা ঢাকের ওজনই সইতে পারে না, মাথা ঘাড়ের উপর ঢুলে ঢুলে পড়ে যায়, চোখেও যেন ভাল ঠাহর হয় না—অবশ্য কিছু কিছু ভক্তিমান ভদ্রব্যক্তি অকস্মাৎ খিঁচিয়ে ওঠে, কি দাঁত বের করে হাসিস ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে ? কি সব হয়েছে আজকাল ! দেবদ্বিজে ভক্তি—আ-ছি, ছি—

পুরুত ঠাউর গ্যাঁজা খেয়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি পুরুত ঠাউর গ্যাঁজা খায়, ব্যোম ভোলানাথ বলে গ্যাঁজার কলকেয় দম দেয় ঠাউর মশাই।

এই কণ্ঠটি কোনো ফাজিল কিশোরের—অতএব নিস্তব্ধ দেবস্থলে রিন্‌রিন্ শব্দে বেজে ওঠে। কিশোরকে দেখা যায় না, কিন্তু তার ছিবলেমি হাসি প্রমাণ দেয় যে কথাটি মিথ্যা। তৎক্ষণাৎ এইরূপ বেয়াদবিতে পুরুত ঠাকুর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রক্তবর্ণ করে—কারণ সে জীবনে গঞ্জিকা সেবন করেনি এবং অদ্য রজনীতে কারণ-বারি ছাড়া অন্য কিছুই স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।

কে বললে এই কথা ? কে ? প্রবীণ ব্যক্তিরা বলে, হায়—এই দেবস্থলে—কি সর্বনাশ !

সব গ্যাঁজা—গুলি মারো, গুলি মারো—অন্ধকারে কণ্ঠস্বর হারায়। পুরোহিত শেষ বলে দেয়, নির্বংশ হবে, নির্বংশ হবে।

এতে আর কি সুরাহা হবে, বহুক্ষণ সময় না কেটে যাওয়া পর্যন্ত পরিবেশ আর উপযুক্ত গম্ভীর হয় না। ভারি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শ্রুত হয়, আলো কমে, ধোঁয়া স্থির হয়ে জমাট বাঁধে—অতএব ভাবগম্ভীরতা ফিরে আসায় ঐ স্থান আবার ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে—ভীমকণ্ঠে পুরুত বর্ণনা করে, তার শিখাপুঞ্জ খাড়া, ব্যক্তিটি খুবই উদ্দীপ্ত প্রৌঢ় মেড়ার মতো নিষ্ফল ঢুঁ মারে—তার কপাল-জোড়া সিন্দুর—সে পুনরায় মহিমান্বিত বোধ করে বর্ণনা করে, এই স্থান অর্থাৎ এই চাকলা মহাপুণ্যভূমি একটি পীঠস্থান, দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে সমস্ত কিছুর বিনাশ সাধন করে আপনকার গভীর শোক প্রশমনের জন্যে সতীর দেহ চক্রে স্থাপন পূর্বক বসুধা

বিভক্ত করেছিলেন। সেই সতীর দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুল এই স্থানে ছিটকে এসে —হ্যাঁ এই স্থানে ছিটকে এসে পড়েছিল। আঃ, এখন আর সেদিন নেই, একদিন এখানে লক্ষ বলি হতো, মনুষ্য বলি হতো, মহিষ বলি হতো—অসংখ্য ছাগ বলি হতো। এখন ভক্তি নেই। এখন আর কিছুই নেই। এখন সবই কঙ্কাল। তোমরা সবাই দেখ, আজ এই মহাপুণ্যের দিনে, বৎসরের এই একটি দিনে, বৈশাখী সংক্রান্তির রাত্রি, মায়ের পুজোর রাত্রি, এই দিনে জননী কতই না ক্ষুধাতুরা, তৃষ্ণাতুরা ; আহা, বেটির জিব শুকিয়ে গেছে। একদিন জননীর ভোগ্য ছিল চমৎকার নরমাংস—এখন সেসব দিন গেছে—এই তেঁতুল বাগদি অভিরামের বংশের জোয়ান সন্তানরা যুগ যুগ ধরে মা-কে রক্ত দিয়ে আসছে—অচ্ছ্যুৎ বাগদি হলো মায়ের খাদ্য। একারণ এই বংশ ষাট কাঠা জমি নিষ্কর ভোগ করে থাকে। কিন্তু সমস্ত অস্তাচলে যাচ্ছে, উচ্ছন্নে যাচ্ছে, বুড়ো বাঁদর অভিরামের কাল থেকেই এই বংশে আর ভক্তি নাই। এখন আর আগের মতো নরমাংস দেবার উপায় নেই—কলিকালে সবই সম্ভব—মা কয়েক ফোঁটা রক্ত পেলেই খুশি। অভিরামের ভাইপো মনোহর এমনি নষ্ট দুষ্ট নচ্ছার বজ্জাত যে তাকে ডেকে মায়ের পুজোয় পাওয়া যায় না—আরে বাপু মায়ের তিন বিঘে খাচ্ছিস্—মাকে দু'ফোঁটা রক্ত দিবিনে? কলিকালে সবই সম্ভব—কপালে সিঁদুর লেপা ভুঁড়িঅলা প্রৌঢ়ের দল সমস্বরে আক্ষেপ করে। জটিল শাখা-প্রশাখাময়, বিপুল উপকথাবহুল অভিরাম দু-হাঁটুর মধ্যে আপন অশক্ত ঘাড় গুঁজে নির্বাক—শুধু মনোহর চকিত, আতঙ্কিত—কারণ এই স্থলে আবদ্ধ, চারিদিকেই প্রাচীর—মায়ের কথা বলা যায় না, তবে তাঁর মনে দয়ামায়া খুব নেই, বিশেষত মায়ের মহিমাপ্রচারী বাবু ভাইদের দল আসলেই নরখাদক। এরা মাংস রান্না করে খায় না। ঐ কাকা অভিরামই একমাত্র বটবৃক্ষ।

এইকালে প্রদীপ নিবে যেতে থাকে, তৎহেতু অন্ধকার ফুর্তিবাজ বিড়েলের মতো চারিদিক থেকে হুমড়ি খেয়ে ঘরে এসে পড়ে—মূর্তির বেদীটি শুধু আলোকিত—কালো শিলায় তৈরি মূর্তিটি নিজ নাক মুখ চোখ এবং ঘাড়ের পাশ দিয়ে ক্রোধ ও পৈশাচিকতার বাষ্প উদ্গীরণ করতে থাকে। হয়তো এই স্থলেই প্রকৃত পাষাণ-খণ্ডের সঙ্গে এই মূর্তির পার্থক্য—পাষাণও কখনো কখনো গলে। বিশাল ঘরটির ভিতরের রঙ সম্পূর্ণত ছাই ছাই হয়ে এলে প্রতিটি মানুষ আপন আপন অবয়ব হারিয়ে ছায়ামূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এখন কোনো গান নেই।

জ্যৈষ্ঠের আকাশে কোনোরকমের ছায়া নেই।

সেখানে কোনো বৃক্ষও নেই।

লাঙল, গরু, জোয়াল, মাংসপেশী, নারী, স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের জন্যে কোনো মাটি নেই।

পুনরপি কোনো গান নেই।

মনোহর ঘাড় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। বাজনদারের দলটি পরস্পর ঠেলাঠেলি শুরু করেছিল—বৃদ্ধ মহিষের মতো ঘাঁউ ঘাঁউ শব্দে কেউ কেশেছিল। ধূপের ধোঁয়া প্রবল ছিল।

মনোহর, এগিয়ে আয়—পুরুত ঠাকুরের আত্মবিশ্বাস এখন বড়োই সুস্থির—মাদক রস সম্ভবত জমে এসেছে, কণ্ঠে প্রবলতা ধ্বনিত হয়। কি হতে পারে—কি হবে এই ভেবে মনোহর পায়ে পায়ে, এগোয়। আঃ, ঘাড়টা শিরশির করচে গ—অক্তে কেঁচো যেন। মনোহর এলোমেলো, পুরুত ঠাকুরের কাছে আর পৌঁছুতে পারে না—ঐ দূরত্ব জ্যামিতিক, বৃত্তাকার—কেউই দূরে নয়, কারো কাছেই যাওয়া যায় না—শেষে ব্যক্তিটি সদর্পে এগিয়ে এসে, মনোহরের ঘাড়ে হাত দিয়ে হিড়হিড় টেনে মূর্তির সামনে বেদীর নিচে গিয়ে ব্যাটা প্রণাম কর, এই বলে মুঠোভর্তি সিঁদুর মনোহরের কপালে লেপন করে। অতঃপর গম্ভীর শ্লোকসমূহ উচ্চারিত হয়—আমরা এই ব্যক্তিটিকে, এই অন্ত্যজ অস্পৃশ্যটিকে বলিদান করি, উহার রক্তে মা, জননী, তোমার তৃষ্ণা মিটুক—হায়, পূর্বেকার দিন আর নেই, এখন সবই প্রহসন—এইরূপ ভণিতাপর্বের পর অতিদ্রুত পুরোহিত মনোহরের বৃহৎ উস্কোখুস্কো জটিল চুলভর্তি মাথাটিকে পার্শ্বে স্থাপিত যুপকাষ্ঠে ঢুকিয়ে খিল এঁটে দেয়। তার হাঁটু দুটি মাটিতে প্রোথিত হয়—মেঝে কঠিন পাষাণময়, আলোর রেখাটি তেরছা, বাজনদারের দল এখনো স্তব্ধ; তার কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে যায়, শিরদাঁড়ায় হিম রক্তস্রোত বয়, এখন সে সম্পূর্ণ মাটিতে ডুবে যাবে। এইরূপে সময় কেটে যেতে থাকলে উক্ত ভীমদর্শন পুরোহিত মহোদয় বিশাল খাঁড়াটি হাতে তুলে নেয়। সেটিও সিন্দূররঞ্জিত, অধিকতর পিশাচ স্বভাবের—পুরুত ঠাকুরের হাতে পড়ে সেটি এতই ব্যাদিতবদন যে তার আলজিহ্বা পর্যন্ত দেখা যায়। গায়ক মনোহরের সবকিছুই গুলিয়ে যায়—তার দৃষ্টি মেঝেয় স্থির নিবদ্ধ, হাঁটুতে প্রবল যন্ত্রণা ময়লা ধুতিটি সরে গেছে, কিন্তু অতদূর হাত পৌঁছায় না—এই কালে প্রবল শব্দে কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোল-কাঁসি বেজে ওঠে, দেয়ালসমূহ কাঁপে, প্রদীপ শিখাটি হিসহিস নেচে ওঠে, বাইরে শুকনো সাইক্লোন—ভিতরে হাত ও হাতের অংশ, চোখের কোণ, পায়ের টুকরো, উলঙ্গ উত্তাল পশ্চাদ্দেশ—কি প্রাগৈতিহাসিক রেখাসমূহ, আলোয় খুবলে খাওয়া ছায়া—

একটি মুচকুচে কালো কেউটে, গায়ক মনোহরের ঘাড়ের ভিতর দিয়ে সাঁৎ করে শিবদাঁড়া বেয়ে চলে যায়।

মা, মা. মা উন্মত্ত চিৎকারের সঙ্গে খাঁড়াটি ধীরে ধীরে নামবে—সেটি সামান্য সময় মনোহরের ঘাড়ে থেকে অল্পকিছু রক্ত সংগ্রহ করে আবার উঠে যাবে—মনোহর তখন মুক্ত হবে। কিন্তু তৎকালেই প্রবল কোলাহলে এহ কথা গ্রামপথে প্রচারিত হয়, ঘণ্টাবাবু, সাধের ঘণ্টাবাবু, সাধের ঘণ্টারাম নিহত হয়েছে—হন্তারক-দের জানা যায়নি, আহা, কারা তাকে পিটিয়ে নিধন ব বেছে—তবে সকলই বোঝা যায়, যাবেই। উপস্থিত বাবুদের চোখে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে রক্ত আসে—পুরোহিতের হাতের খাঁড়া মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয়—মনোহরের জানু হতে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বমান ক্ষতটিতে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা চিরে কেটে বসে যায়। খড়্গ ধীরে ধীরেহ নামে। তেঁতুল বাগদিদের দলটি আশ্চর্যভাবেই উপস্থিত। ঠাকুরমশাই স্পষ্ট দেখে, মনোহর বারকয়েক হুমড়ি খেয়ে দাঁড়াতে পারে।

অতি প্রত্যুষে বাতাস জটিল আবহসংগীতের ন্যায় ঘুর ঘুর স্থানে স্থানে বিদ্যমান—এতে শুকনা পাতার মর্মর মিশ্রিত ছিল, ফ্যাকাশে আলো পড়েছিল, আকাশে কোনো একরূপ নিশ্চিন্ততা ছিল—এরূপ সময়ে কোনো একটি শূকর উৎকট চিৎকার করছিল, সেটিকে পিটিয়ে পিটিয়ে বধ করা হচ্ছিল। এই দৃশ্যে আদৌ করুণার উদ্রেক হয় না—বরং হত্যাকর্মে হাত লাগিয়ে অতিদ্রুত কর্মসমাধার বাসনা জাগে। পশুটির চারটে পা একত্রে বাঁধা—তাকে চিৎ করে শুইয়ে আকাশ দেখানো হয়। বলিষ্ঠ ডোমটি একাদিক্রমে লাঠি চালায়—তার কপালে ঘাম, দেহে আর বল নেই—সে মধ্যে মধ্যে শূকরের মুখে মুখ রেখে জড়িত উচ্চকণ্ঠে বুকফাটা গান গায়—উরে, দেকে লে জনমের মতো, ইবার তু বিন্যাশ জাবি গ। শূকরটি এই গানে চুপ—পরক্ষণেই লাঠি চললে আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার জমায়।

এই শূকর দীর্ঘ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত খুন হতে থাকবে—তাকে মোক্ষম আঘাত কেউ করে না, সে বিনা বাধায় চতুষ্পার্শ্বে নরক রটাতে থাকে। তার চিৎকার গাঁক গাঁক, কটু অশ্লীল; পাখিগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে যায়। চিৎকার খোলা মাঠে ছড়ায়। চারিপাশের প্রান্তরসমূহে জনগণ বিন্দু বিন্দু, কালো কালো ফুটকির মতো—বিশাল এলাকা জুড়ে জীবনের খেলা জমেছে। দিকে দিকে গ্রামসমূহ খালি, সেই সব গ্রাম আপন আপন প্রান্তরে মানুষজন বমি করে দেয়। এরা বন্যার মতো মেলার দিকে ধেয়ে আসে। কিভাবে তেপান্তর পার হয়ে জনগণ—এইসব রুক্ষ চাষী—তাদের লেংটি তেলচিটে লাল ধূলি মিশে কিম্ভুত—তাদের কালো শরীরে সূর্য, তাদের

মাথায় মুখে গামছা জড়ানো, পদে পদে শূন্যতা মাপে, তারা খোলামাঠের নাড়ার দিকে অন্যমনস্কে চায়—এই ভয়ংকর শূন্যতার ওপারে কোথায় পোষমাস? কিসের মদ্য এখন তারা পান করবে? ইতস্তত জনপদসমূহের যত্রতত্র নবনির্মিত মৃতশালা—শৃগাল জাতি নধরকান্তি হয়ে উঠেছে। বৃক্ষগুলিতে শীর্ণ প্রশাখার মতো ঝুলন্ত মরদেহ, ঝোপঝাড়ে মৃত—পুকুরে মৃত, সর্বত্র তারা ছড়ানো। মৃতেরা বড়ো কঠিন নিষ্ঠুর, হয়ার্কিপ্রিয়, জীবিতের দয়ামায়া রক্তমাংস কোথায় পাবে—এজন্যে অন্ধকারে মিশে, শেয়ালের চিৎকার, পেঁচার ডাক, কুকুরের কান্নায় মিশে লোকালয় শ্মশান করে তোলে। অতএব জীবিতেরা সবাই দানোয় পাওয়া—তাদের কিছু বলা বৃথা—তাদের উদরে একটি করে তীক্ষ্ণসূচিমুখ ছোরা বিঁধে আছে, তারা চোখে কিছু দেখে না। এই সব ধু ধু মাঠ পিছন ফেলে অর্থাৎ ধুলোভর্তি নেতি পিছনে রেখে তারা পিলপিল মেলার দিকে আসে। পথগুলি সাদা প্রকৃতিতে কেঁচোর মতো ঘিনঘিনে, এঁকেবেঁকে, বুকে হেঁটে চারিপাশ হতে বিশুষ্ক বিশাল দীঘিটির সুউচ্চ পাড়গুলিতে মেশে। জনগণ এইখানে একত্রিত হয়ে মেলার দিকে যায়।

অবশ্য মেলাস্থল ভয়ঙ্কর জমাট। গ্রামলগ্ন দ্বিতীয় দীঘিটিতে জল তোলপাড়—বাঁধাঘাট কাদায় ছরকুটে আছে, মেয়েরা শাড়িতে জল বয়ে গ্রামপথ কাদিয়ে দেয়। বলবান গেরস্থ পাড় থেকেই হাতের পাঁঠা জলে ছোঁড়ে, তাদের চোখের কোণে রক্ত জমে, তারা আজ মা ছাড়া আপন মা-ও চেনে না, তাদের জায়ারা মাগীমাত্র, পুত্রকন্যা শুয়োরের ছানা, এইসব গৃহস্থ মায়ের বলি পাঠা এনেছে সঙ্গে—সেগুলি আপন মনে ভেবিয়ে যায়, তবু তিরতির করে সঙ্গে করে আসে, ছপাৎ শব্দে জলে পড়ে একবারমাত্র অবাক বিব্রত ভ্যা শব্দে খাবি খায়—কাছি টেনে পাড়ে তুললে বাঁচবে বলে গা ঝাড়ে, শুকনো পাতাটি মুখে নেয়। তবে তখুনি পটাপট শব্দে পাঁঠার সামনের ঠ্যাঙ দুটি ভেঙে পিঠের উপর উঠে যায়, যাগ্‌ বলি হয়ে গালো—ভেবে গেরস্থ বলির দিকে চায়—তার চোখের কোণের রক্ত সমস্ত চোখে ছড়িয়ে যায়, হারামজাদা কামার, বলির মুণ্ডু তুই পাবি বলে পাঁঠার মাঝখান কাটবি নাকি—অঁঃ? আর এটু হলে যে সামনের ঠেং মুণ্ডুর সঙ্গে চলে যেত।

যেত তো কী করব মশায়—কোপ এ্যাটা মেরেছি—কত মেরেছি জানি না—গ্যাজাও খেয়েচি, মদও খেয়েচি। না পোষায় অন্য কামার দ্যাখেন মশয়।

বলি হয়ে গালো—এখন কামারের ইয়ে ধুয়ে জল খাব?

মুণ্ডুটা রেখে বলি নে যান।

এইভাবে এইস্থান কর্দমাক্ত। রক্তে, জলে ও ছাগের পেচ্ছাবে। বড় অসহ্য

দুর্গন্ধ এইস্থানে মিশ্রিত। কাঁচা রক্ত, মাংস, চর্বি, মানুষের ঘাম, মাঠের শুকনা মিষ্টি ও তেলেভাজা—এসব গন্ধ একত্র মিশ্রিত। সিংহের মতো ঘাড়ে লোমঅলা বোকা পাঁঠাগুলির উপস্থিতির তীব্রতা দশদিক ভেস্তে দেয়—যদিও দ্রুত তারা লোপ পায়। এদের ব্যাপারটি সহজ নয়, গেরস্থ বোকাগুলির কাছে হার মানে, ভুলিয়ে ভালিয়ে জলে নিয়ে যেতে হয়, পাছায় লাথি দিলে তারা ব ব শব্দে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। এদের জন্যই যত্রতত্র হাড়িকাঠ পাতা—অন্যভাবে তাদের কাবু করা সম্ভব হয় না। মা মা শব্দে তুমুল রোল ওঠে—কী সাংঘাতিক কলরোল পাঁঠা-ঘাড়ে উগ্রক্ষত্রিয়ের পিঠ বেঁকে যায়—সেই পিঠ জুড়ে রক্ত।

সমস্ত স্থান চর্বির গন্ধে ভরে যায়। অতএব অতিশয় দাহ্য—চর্বি কাঁচাও পোড়ে, তার জল পটপট শব্দে উবে যায়। একথাও অবশ্য যথার্থ যে সূর্যের গোলাটি মন্ত্রবলেই যেন আকাশের মাথায় উঠে এসেছে—মরণরত শূকর তাকে আহ্বান জানায়, সে প্রত্যূষের স্নিগ্ধতা ছিঁড়েখুঁড়ে চোখ রাঙিয়ে বেরিয়ে আসে—মুহূর্তেই হাওয়া অদৃশ্য উজ্জ্বল তামার পাতে পরিণত হয়—পাখিগুলি ভেগেছে, আর উপায় কী? এই দেশ এখন খুবই দাহ্য—পাহাড়ের মতো সুউচ্চ দীর্ঘ পাড়গুলি নির্ধূম অগ্নিগিরি, আপনকারদের নিষ্ঠুরতার প্রচণ্ড ভার নিয়ে ছড়িয়ে আছে, তাদের গায়ে সামান্য সামান্য কাঁটাগাছ রোদে ঝলসায়, তামাটে ঘাস কেটে কেটে পথগুলি পর্যন্ত অল্প এগিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—এইসব বিভিন্ন পথ দিয়ে আরও দাহ্য মানুষজন নীরবে আসে।

বহুবিধ কারণে মেলাস্থল খুবই রগরগে। জনসমাগম নিশ্চিতই ভীতিকর—চোঙা ফুঁকে নানারূপ চেতাবনী দেওয়া হয়—শিশুর নিখোঁজ সংবাদ, মেলা কমিটির বহুবিধ আবেদন ও সাবধানবাণী গগনবিদারী কণ্ঠে প্রচারিত হয়—আকাশের উন্মত্ত নাগরদোলাটিও দেখা যায়, মড়ার মাথার খুলি আঁকা জাদুর তাবু—সংক্ষিপ্ত চিড়িয়াখানা—এই মেলাস্থল কত দ্রুতই না জমে ওঠে। এইখানে কিছু ঘটে বা—কারণ সমস্ত কিছুই বিচিত্রভাবে অবাস্তব—জাদুকরের কিম্ভুত পোশাক—উক্ত অবাস্তব প্রাণীটির চুন দিয়ে আঁকা চোখ, সেতার শীর্ণ হাত শূন্যে দোলায়। এখন দুপুরের দিকে সার্কাসের তাবু গোটানো—রূপকথার ঘোড়াটি যেটি তারের উপর দিয়ে যায়, আকাশে অদৃশ্য হয় সেই ঘোড়া, তার শিয়ালের মতো রঙ, পিছনের একটি পা খোঁড়া—সেটি এখন ঘাসের নামে পোড়ামাটি চিবিয়ে খায়—যে ভয়ঙ্কর শ্বাপদ বুক ফুলিয়ে আকাশ ফাটিয়ে গর্জন করে সেটি এখন আপন খাঁচার মধ্যে অসুস্থ বেড়ালবৎ ঘুমোয়, তার চোখে পিঁচুটি ও অবসাদ—এই সবকিছু ঝকঝকে সাদা

রোদে নিদারুণ অবাস্তব। জনগণ শুধুই মেলার পথ পরিক্রমণ করে—গোলোক-ধাঁধায় ছুঁচোর মতো—ঘুরে ঘুরে তাদের হাঁটু ফুলে যায়—চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। এখানে জলই বা কোথায়—দোকানদারগণ নিজ নিজ দোকানে বসে ঢোলে—আম কলাদি পচে যায়, ভুঁড়েল ময়রাগুলি কি দোব বাবু এই বলে হাসিটি মুখে সেঁটে রেখে দেয়। শুধু মাছিদেরই আনন্দ—ময়রাদের বাহুতে ব্যথা ধরে যায়, তারা রাগবশত মাছিদের খচ্চর বলে থাকে।

কিন্তু রাজহস্তী কোথায়? আপন স্থূলোদর, থামসদৃশ পদতুষ্টয়—সে যেন চলন্ত পর্বত, দিগন্তে দেখা দিয়েছিল, তার গলার ঘণ্টার কি বিষন্ন স্বর, রোদ-জ্বলা প্রান্তরে অন্যমনস্কে দুঃখ ছড়াতে ছড়াতে যায়—এমনিই তাত যে সামান্য দূরে ধাঁধা ঠেকে, মেঠো ডোবাসমূহে জল নেই, শাপলাগুলি বিবর্ণ, প্রান্তর দিনে-দুপুরে দিপদিপ আওয়াজ করে—এই অবস্থায় রাজহস্তী কি বিদীর্ণ হয়েছে? মানুষেরা ভাগাড়েও হাড় খোঁজে—হস্তী কি ছরকুটে গেল, তার অস্থিসমূহ কি রৌদ্রে শুকায়? যার কালো শরীর ধুলোটে হলো, পেছনের কামানের মতো ঠ্যাং ঘেষটে মেষটে যায়—চতুর্দিকের প্রবল তরাসে, অগ্ন্যুৎপাতে সেই রাজহস্তী এখন কোথায়! দীঘির ঈশান কোণে বিরাট বটের নিচে কটা রঙের মেঘ নিশ্চল ছিল, ঐ মেঘের শুঁড় নড়ে—হাত আপন মনে সূর্য ঢাকা দিয়ে রোদের মাথায় ছায়া চেপে ধরে। কাজেই জনগণ ঘুরে ঘুরে এখানে আসে—দেখে রাজহস্তীর পাছা বসে গেছে, এক ঠ্যাং মেলে ধরা—দুটি বটের পাতার লোভে মাটি থেকে তামার পয়সা তোলে, একটি পচা কলা পেলে কুক দেয়। হাতির সেই নবজলধরকান্তি যেন চিন্তির খেয়ে গেছে—সে কখনো কখনো ক্ষুদে চোখে পাগলের মতো চায়। কিন্তু মানুষেরা আর কোথায় বা যাবে—ঘুরে ঘুরে এইখানেই আসে। এই স্থলে বসে সুবিশাল প্রান্তর দেখে, গন্‌গনে আকাশ দেখতে পায়—শরীরে আগুন ধরানো নেই এই স্থানেই স্পষ্ট হয়। তবে বটের ছায়ায় মাথার তালুটি ঠাণ্ডা—দীঘির কালো জলের দৃশ্যে চোখ নরম হয়ে আসে—এই স্থান থেকে নিচু গ্রামের রাস্তার মেলার ধুমধাম, প্রচণ্ড চেল্লানি অস্পষ্ট সাগর গর্জনের মতো মিঠে লাগে—অতএব মানুষজন ঘুরে ফিরে এখানে আসে।

মন্তাজ তার গামছাটি অপসারিত করে মুখ থেকে। তার দাড়িগুলি খ্যাংরা কাঠির মতো—মুখমণ্ডল বড়োই ঝাঁঝালো, তার ক্ষুদ্র চোখ আর কিছুতেই শান্ত হয় না—কিন্তু এই চোখ ক্রমান্বয়ে হাসে—হাসি দেখে মনোহর বলে, জানি না, আমরা কি করে বলব গ—আঁ?

উ কথাটো আর আমাকে বলিস না মনা—মেলাটো ভেঙে গেলচে পেরায়, পাঁচগড়ের পূব পাড়ে লোকে ছয়লাপ—এক শালো তেঁতুলে বাগদি দেখলোম না ক্যানে ?

তেঁতুলে বাগদিরা যাবে কেনে গঁ—বাবুদের কাজে বাঁধা দিছি লিকিন মোরা ?

অয়—মনা, তুকে ঠিক বিলুই বিলুই লাগছে—ইন্দুর খেয়ে বিলুই গোঁফ চাটে, লয় ?

বাগদিরা সব ঘুমুইচে, না—সারারাত মদ খেঁয়েচে যি।

দুপুরটা পেরুইতে দাও বাবাজী, থানা থেকে পল্টন এলো বলে—ঘুম বার করবে।

পুলিশ এসবে লিকিন ?

না তা ক্যানে আসবে, বাবুরা বসে বসে এঁটে চাপড়াবে, লয় ?

আমরা ইসব জানি না, কিচুই জানিনা।

মন্তাজ অকস্মাৎ অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়, একারণ তার মাথার টিকির কিছু কিছু চুল খাড়া হয়ে ওঠে—এইদিকে মরুভূমির মতো প্রান্তর—বায়ু শুষ্ক দম বন্ধ হয়ে যায়—ওদিকে ক্রমাগত সারি সারি গোর দৃষ্ট হয়, সে অতিষ্ঠ অস্থির, সে এছোল পেছোল পছন্দ করে না, বড্ড স্যায়না হঁয়েছো। লিজের চোখে লাশ দেখে এ্যালোম—চামনাটোকে পিটিয়ে লিকেশ করেছে। তেঁতুলে বাগদিদের আমি চিনি না লয় ?

মনোহর গোড়ালির ক্ষতটিতে হাত বুলোয়—গতরাতের পুজো কেমন লণ্ডভণ্ড হলো, পুরুত মশাই কেঁপেছিল, কি জানি যদি-বা হাত ফসকে খাঁড়া পড়তো মনোহরের ঘাড়ে—যদি-বা ঠাকুরের হাতের খাঁড়া ছিনিয়ে নিয়ে বাবুদের কেউ ঝেড়ে বসাতো কোপ ?

আমাদের পরাণের জ্বালায় নিজেরাই বাঁচি না। উসব ক্যা খুন হোল না হোল আমরা জানি না।

মন্তাজ ঘাড়টি বাঁকিয়ে প্রশ্ন করে, তুদের আবার জ্বালা কিরে ? বেশতো তুদের মায়ের পেসাদ মেশাদ খেচিস। হাল-লাঙল করচিস কুদ্দুম কুদ্দুম, খেটে খেটে তু শালোদের পরনের কাপড় মাথায় উঠেছে, বাবুদের ঘরে ধান জোমা হচে দিনকে দিন—আচিস বেশ তুরা।

মনোহরের চক্ষুদ্বয় অঙ্গারবৎ, সে আপনার কথাদ্বারা বাতাসকে কয়েকবার তীব্র কশাঘাত করে, উসব বুলো না বলেছি—মা আছে আপনার সিংহাসনে, ই শালোর

বাবুরা মা লিয়ে কতো ধাষ্টামো করে গঁ ?

তেঁতুলে বাগদিরা সব ঘুমুইচে, লয় ? আবে, ইকি গান বানাইচিস লিকিন আমার কাচে ? মন্তাজের হাসিতে কিয়ৎ পরিমাণ মাটি চিড় খায়—তেঁতুলেদের যে বিরাট দলটি রাজহস্তীর দিকে আসছিল, অঙ্গুলী নির্দেশে সেদিকে দেখিয়ে মন্তাজ পুনরপি বলে, তেঁতুলে বাগদীরা সব ঘুমুইচে, লয় ?

মাটি যেন টগবগিয়ে পায়ের নিচে ফোটে—শুষ্ক বৃক্ষ শাখাটি পড়েই বা জ্বলে যায়—কোনোদিকে অন্তরাল নেই—শেষে হস্তীর আড়ালেই মানুষেরা যায়, তথায় অতি উষ্ণ ধোঁয়া—এই অকুস্থলে অভিরাম—তার মাথাটি কোনোরূপে ঘাড়ে আছে, তার চক্ষে অমেয় অমানিশা বা, সে প্রক্ষিপ্ত—এই আধুনিক বাগদি দলে সে আদিম সংস্কার, কোনো কথা না বলে শুধুই শিরশ্চালনা করে, তাকে ঘিরে তেঁতুলে বাগদির দলটি সারি সারি দণ্ডায়মান, প্রস্তরমূর্তি এইরূপ এদের মুখ শুকনা, চোখ রুষ্ট রুঠা —এরা নির্বাক।

খুনটা আমরাই করেছি—এই কথা মনোহর ভেবেচিন্তে বলে। আপন জাত-ভাইদের মুখের দিকে একবার চোখদুটি বুলিয়ে সে পুনরপি বলে, বড়ো জ্বলায় জ্বলছি মোরা, আই গঁ আবার কি শুদোও চাচা, পেটের মধ্যে যন্তনার কি ব্যাপার বলো—একথায় চতুর্দিক হা হা হু হু শব্দে তীব্র বাতাস প্রেরণ করে—ঢেউয়ের পর ঢেউ যেমন—কা জানে মোরা ইর পর কি করব, আঃ গঁ—মোদের পেটের মধ্যে জ্বালা, ঢ্যামনা বাবুরা মোদের উপোষী মেয়েমানুষ চাঁটে—খিদেয় মানুষ ফাঁসি যোয় —লিজেরা লিজেরা লটকায় গাছের ডালে—সোনার পুত শুকিয়ে মরে বটে—এই কথায় মন্তাজ বলে আঃ মনা, মানুষ না মেরে মানুষ বাঁচে লিকিন ? মানুষ কুকুর হলছে—সি মানুষ মারলে কুকুর মরে।

ঐ স্থলে সত্বর মনুষ্যপ্রাচীর তৈরি হয়েছিল—চতুর্দিক থেকে মানুষসকল তখনো আসছিল, এদের আঙুলের ফাঁকে শুকনা ঘাম জমে আছে, লাল ধুলো এদের বেষ্টন করেছে—তারা কি দুর্বোধ্য টানে মেলায় আসে—কিসব কর্মহীন ধান্দায় ? এদের পটভূমিকায় শূকরের চিৎকার—সূর্য মধ্য-গগনে যেন উড়ে এসেছে। ধূলি উত্তাপ মানুষ্যচিৎকার পরস্পরে মেশে—সেইকালে প্রবল, প্রবলতর, নিষ্ঠুরতম অসংখ্য ঢাক বেজে ওঠে।

মেলাস্থলের মধ্যে উচ্চভূমিতে বৃহৎ যূপকাষ্ঠ স্থাপিত। সেটি চোখ ধাঁধানো সাদা আলোয় দাঁড়িয়ে, অগ্রভাগ দ্বিশাখাবিভক্ত ত্রিশূলবৎ মোটা খিলটি পাশেই পড়ে আছে—এটি এতই উচ্চে অবস্থিত যে সেখানে বৃহত্তম অজেরও ঘাড় পৌঁছায়

না—বস্তুত এই যূপকাষ্ঠ ছাগজাতির জন্যে উত্তোলিত হয়নি—জননীর সর্বশেষ খাদ্য একটি বৃহদাকার মহিষ। সেই ভোজনপর্ব এইভাবে স্থিরীকৃত যে সূর্য মধ্য গগনে যাবে, ছায়াসকল হ্রস্বতম হবে—সূর্য মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে। মধ্য রজনীর ন্যায় গভীর সেই কাল সমাগত—কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠেছে। যূপকাষ্ঠ ফাঁকায় আকাশের দিকে চেয়ে আছে, সেটি ছায়াহীন, ভয়াবহরূপে একাকী, কাছাকাছি কেউ নেই—দশ গজ দূরত্বে মানুষ সকল বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান। এইসব মানুষ পুষ্ট পুরুষ্ট, আদুল গা, ঘর্মে সিক্ত বসন, কপালের সিঁদুর গলে গলে মুখ বেয়ে পড়ে—এরাই পূজার্থী, সকলের হাতেই ছোটোখাটো খাঁড়া।

মহিষটিকে অকস্মাৎ দেখা যায়—মানুষের বৃত্ত ভেঙে ভিতরে আসে—জীবটি ইতিমধ্যেই নির্জীব, জননীর নজর লেগেছে—মহিষ সশব্দে মূত্রত্যাগ করে, যূপকাষ্ঠ কেমন বা ভেসে যায়। কিন্তু উক্ত প্রাণীর পিছনের পায়ে আঁট নেই, বিশেষ, পিছনের বাম ঠ্যাং তুলতে গেলেই থরথরিয়ে কাঁপে, পশ্চাদ্দেশ গোময়লিপ্ত, আরো, মহিষের ঘাড়ে মোটা শিরা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়—এইস্থলে ক্রমাগত গব্যঘৃত মর্দন করা হয়েছে কারণ এককোপে ঘাড় নামানো চাই—অন্যথায় মায়ের অভিশাপে সমস্তই ছারেখারে যাবে। কোনো অদৃশ্য ইঙ্গিতে ঢাকঢোল থামে—ঐ স্থানে শব্দহীনতাও স্থির, পূজার্থী সকল আধ্যাত্মিকতায় প্রস্তরমূর্তি, জিঘাংসা ও শয়তানি মুখমণ্ডলের রেখাসমূহে সযত্নে রচিত হয়েছে। নিদ্রাবেশে ঢুল ঢুল রুগ্ন মানুষটি এতক্ষণে মঞ্চে আবির্ভূত হয়। এই ব্যক্তির হস্তে বিশাল খড়্গ সে যেন ভারবহনে অক্ষম, তার চক্ষুদ্বয় বুঁজে আসে, তার শুকনো হিংগুলবর্ণ, তার কোমরটি এরূপ ল্যাকপ্যাক যেন-বা হঠাৎই মট শব্দে ভেঙে পড়বে। সে একটি পাশে হাতের খড়্গে আপন দেহভার অংশত রক্ষা করে দাঁড়ালে বলবান কিছু কিছু গেরস্থবাবু মহিষটিকে যূপকাষ্ঠে জোতে—তার সামনের পা সামান্য মাটিছাড়া হয়, একারণ ঐ পূজাস্থলে মহিষটি যেন শূন্যে লটকানো আছে এরূপ প্রতীয়মান হয়। মহিষের মুণ্ডু ধরে এমনি টান পড়ে যে তার ঘাড় লম্বা একগোছা দড়ির মতো—শুধুই রবারের মতো বাড়ে। এইরূপ সংকটের কালে মনুষ্যসকল রক্তমুখী—ভেদবমি রক্ত—সূর্য সংক্ষিপ্ত দূরত্বে—জ্বলে জ্বলে যায়, কড়াকড় কড়াকড় শব্দে নারকীয় ঢাক ইত্যাদি বাজে—মা মা ধ্বনিতে দিগন্তসকল প্রকম্পিত হয়েছিল—বিশাল খড়্গটি মন্ত্রবলেই উঠে অনিবার্য গতিতে নিচে নামে।

তৎকালে তদ্দণ্ডে তন্মুহূর্তে পোড়া চিমসে গরম বাতাসের হলকা আসে—কোনোরূপ সাবধানতার পূর্বেই : এই মেলাস্থলে অসংখ্য অগণ্য মনুষ্যসমূহের নিঃশ্বাস

এককালেই বন্ধ হয়—সূর্যের আলোর অত্যাচারে ধূমই দেখা যায়, অগ্নি অদৃশ্য—তেঁতুলে বাগদিদের পাড়া থেকে স্ত্রীলোক বৃদ্ধ শিশুর বুক ফাটানো শির খোঁচানো আর্তনাদের বিকট চিৎকার শোনা যায়—চতুর্দিক হতে আগুন আগুন এইরূপ আহ্বানও ভাসে, তবুও অগ্নি অদৃশ্য—শিখাসমূহ সূর্যালোকে মিশেছে, শুধুই বাতাস কাঁপে, কিছু কিছু ধোঁয়া দৃষ্ট হয়—পোড়া ছাই উড়ে উড়ে আসে—ফট ফট শব্দে বাঁশ ফাটে।

অতএব অগ্ন্যুৎপাতের আর কোনো অপেক্ষা নেই। অগ্ন্যুৎপাৎ সম্পূর্ণ হতে থাকে। এই বিশাল ভূখণ্ড ভয়ঙ্কর দাহ্য ছিল ; নেলাখেপা রাজহস্তী আপনার বেঢপ পদচতুষ্টয় দিয়ে জরিপ করে করে এই সত্য জানে ; প্রান্তরের গর্তসমূহ হতে বাষ্প নির্গত হয়—ধানের নাড়া অকস্মাৎ দপদপিয়ে জলে ওঠে—এই হেতু বিকট শব্দ অগ্ন্যুৎপাতজনিত বিপর্যয়ে এত বড়ো অঞ্চল টুকরো টুকরো, খণ্ডে খণ্ডে আকাশে ছড়ায় ধূমশিখা অগ্নিপিণ্ড ইত্যাদি চতুর্দিকেই যায় ; মেলা ভাঙে, ইতস্তত দোকান-গুলি ধ্বসে যায়, দ্রব্যাদি সবই বিক্ষিপ্ত, লণ্ডভণ্ড, জনগণ তীব্র চিৎকারে উন্মাদ, ওরা এই বাংলাদেশ, হৃদয় ফাটিয়ে দেয়, জালিয়ে দেয়—বাবুরা মোদের পাড়ায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে গঁ—ভাইরা শোনো শোনো—এই কথায় গান কই, উল্টে মনোহরের পায়ের ক্ষতে অপূর্ব বিস্মরণ, সিংহের হৃদয় এসে ঠাঁই নেয়। এছাড়া কর্তিত মহিষ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকে, মানুষ নেই, দেবীমূর্তি মুহুর্মুহু লাঞ্ছিত—আগুনের বাতাসে জাদুগৃহের কালো পর্দাগুলি পৎ পৎ, সার্কাসের ঘোড়াটি শূন্যে অবাস্তব দৌড় লাগায়, হঠাৎ মধ্যে কোনো কোনো মানুষের চোখের ঝলকটিই দেখা দেয়, আয়, শালোরা, দাদ লি, আয় ভাই জুলুমের লিকেশ দেখি—এই ধ্বনি অতি সূক্ষ্ম তরবারিবৎ সোঁৎ করে মেলায় এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত ফুঁড়ে দেয়—মন্তাজ গামছাটি মুখ থেকে খুলে কোমরে বাঁধে।

মাহুতকে দূরে ছুঁড়ে আপন শিকল ছিঁড়ে রাজার হাতি পেট খালি করে দম নিয়ে ঝাঁ ঝাঁ বৃংহিত দেয়।

বৃংহিতই সংগীত।

রাজহস্তী উদ্দাম নাচে।

ভূষণের একদিন

সেই সময়টা এপ্রিল মাস। ভূষণ একটু আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আকাশ দেখছিল। রোদ তখনো ঝাঁ ঝাঁ করছে—খালের পশ্চিম পাড়ের বড় গাছগুলোর ছায়া এখনো পানির উপর এসে পড়েনি।

কিন্তু ভূষণ আর দেরি করতে পারল না। সে শালতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার মেজাজ ভীষণ খিঁচড়ে আছে। শালতি ঘুরলেই রোদ সোজাসুজি তার মুখে এসে পড়ছে, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি-গোঁফের বাইরে মুখের যেটুকু বেরিয়ে আছে সে অংশটুকু আয়নার মতো চকচক করে উঠছে। তখন দেখা যায় মানুষের মুখ কতটা বীভৎস হতে পারে। ভূষণ রাগের চোটে দাঁত খিঁচোচ্ছে—মুখ খারাপ করে গালাগালি করছে। এপ্রিল মাসের বেলা আড়াইটার রোদকে তো বটেই—আশেপাশে যা-কিছু তার চোখে পড়ছে সব কিছুকেই সে খিস্তি শুনিয়ে দিচ্ছে। অথচ মুখটা বন্ধ করলেই ভূষণ একেবারে বেচারা। ছোট ছোট চোখদুটো কপালের ভিতর থেকে পিট-পিট করে। ভূষণ কেমন শান্তভাবে বলে. এজ্ঞে আমার নাম ভূষণ দাস। তবে আমরা সেই দাস নই যাদের ঋষি বলে। একটু লজ্জিতভাবে ভূষণ বোঝাতে চেষ্টা করে যে জাতব্যবসায় সে মুচি নয়।

ভূষণ হচ্ছে জাত চাষী। তার এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে সে চাষের কাজ ছাড়া অন্য কিছুই করেনি। এই সত্যটা তার শরীরের পেশীতে লেখা রয়েছে—যে কেউ পড়ে নিতে পারে। তার পেশীগুলোর সবই পাকিয়ে গিয়েছে—পায়ের ডিমটা লোহার বলের মতো, গোড়ালি থেকে একটা মোটা আঁকাবাঁকা শিরা উঠে হাঁটু পেরিয়ে গিয়েছে।

এসব থেকে সহজেই বোঝা যায় ভূষণ সমস্ত জীবনেই চাষী। মাটি ছাড়া এই মানুষ আর কোথাও কাজ করেনি। বীজ ছড়িয়েছে—চারা পুঁতেছে, জমি নিড়িয়েছে, ধান কেটেছে—ফসল বয়ে নিয়ে গিয়ে গোলাজাত করেছে।

অথচ এটাও সত্যি, নিজের ভিটে আর ভিটের সঙ্গে লাগোয়া দশ কাঠা জমি বাদ দিয়ে ভূষণের কোনো জমি নেই। এ প্রসঙ্গে ভূষণের মন্তব্য হলো, আমার

বাপ-পিতামো বড়লোক ছিল—বলতি গেলি জমিদার ছিল। এইরকম কথা বলে ভূষণ তার ছোট ছোট চোখ পিট-পিট করে দূরের দিকে চাইবে—একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত। নজর দিয়ে একবার মাঠটাকে জরিপ করে নেবে। লোকটার হাড় মোটা—হাতের থাবাদুটো বড় বড—সমস্ত জীবন ধরে হাল চষে, কোদাল চালিয়ে থ্যাবড়া হয়ে গিয়েছে হাতের পাতা, বোঝা বয়ে বয়ে মাথা বসে গিয়েছে ঘাড়ের ভিতর—ভূষণের সেই বিখ্যাত মাথা—চৌকো ধরনের বিরাট বড় গামলার মতো। তার চুলগুলো শক্ত তার যেন—কর্কশ আর কাঁচাপাকা। কখনো সে তা আঁচড়ায় না। টিকিটা ঠিক তালুর উপরে—যে কারণে মনে হয় সে পরচুলা পরে আছে—টিকি ধরে টান দিলেই সব উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে তার ইস্পাতের মতো শক্ত মাথার খুলি।

ভূষণ শালতি আস্তে আস্তে বাইছিল। দুদিকে সমতল বিলের মাঝখান চিরে খালটা নিচু—বেশ নিচু—পানি কমে এসে তলায় ঠেকেছে। বিল শুকিয়ে খটখটে। দিগন্ত পর্যন্ত সমতল, খোলা, গাছপালা বিশেষ নেই। ভূষণ ঘাড় উঁচু না করে বিল দেখতে পায় না শালতি থেকে। খালের পাড় বেশ উঁচু এবং দু'পাড়ে যথেষ্ট গাছপালা রয়েছে বড় বড় জাম-কাঁঠালের সঙ্গে সঙ্গে ঝোপঝাড়ও প্রচুর। কোনো ফুলের তীব্র গন্ধ ভূষণের নাকে এসে লাগল। এপ্রিল মাসের এই ফুল কোনো ঘাসফুল হতে পারে—ঝোপের মধ্যে লুকোনো তারার মতো দেখতে ঘুঁইফুলও হতে পারে। কিন্তু ভূষণের মেজাজ একটুও ভিজল না। সে সমানে খিস্তি করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘাড উঁচু করে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বিলের দিকে চেয়ে সে বলছে, হারামজাদা কমনেকার, বাড়ি এসবি শুধু ভাত গিলতি—শুয়োর, তোর কপালের নেকন খণ্ডাবে কেডা—দুক্ষু আছে তোর কপালে বলে দেলাম।

ভূষণের এই একটা মুদ্রাদোষ রয়েছে—সে কাজ করতে করতে অকারণে ঘাড তুলে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে। কখনো-বা হাঁ করে আকাশপানে। কিছুক্ষণ এইভাবে চুপচাপ চেয়ে থেকে আবার ঘাড় নামিয়ে কাজ করে। বহুদিনের অভ্যাস এটা ভূষণের। আকাশ বা দূরের দিকে চেয়ে কী যে সে ভাবে সে-ই বলতে পারে।

মেজাজ খারাপ হবার অনেকগুলি কারণ রয়েছে অবশ্য। এখনো বিলের মাঠে ধানের নাডা রয়েছে—যতদূর চোখ যাচ্ছে জড়াজড়ি করে রয়েছে—ধান খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে পাখিগুলি—অথচ তার বাড়িতে একমুঠো ধান নেই। গত বর্ষায় মালিকের কাছ থেকে নেওয়া টাকা ধানে শোধ দিতে গিয়ে ভাগে পাওয়া ধানটা

সব শেষ হয়ে গিয়েছে। গোরুদুটোকে খেতে দেবার জন্যে এক মুঠো খড় পর্যন্ত নেই। ধুঁকছে গোরুদুটো। হারামজাদা ছেলেটা পর্যন্ত পাঁচ মিনিট বাড়িতে থাকবে না যে বলদদুটোকে একটু মাঠের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।

সকালে সে বেরিয়েছিল একটা কাস্তে হাতে করে। যদি কোনো কাজকর্ম পাওয়া যায়। কাজ সে পেয়েছিল মল্লিকবাড়ি—বেড়া বাঁধার কাজ। আপন মনেই কাজ করছিল সে—তিনটি ছেলে এগিয়ে এল। ভূষণ ওদের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। পুলিশের হাতে যেমন বন্দুক—তেমনি বন্দুক ওদের হাতে। দুজনের খালি-গা, লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে পরা—একজনের গায়ে জামা আছে। খালি-গা দু'জনকে ভূষণ চিনতে পারল—পাশের গাঁয়ের ছেলে, স্কুলে পড়ত, আজকাল চাষের কাজই তো করে ভূষণ জানে। জামা-গায়ে ছেলেটিকে ভূষণ চেনে না। কী করতিছ ও ভূষণ? খালি গা একটা ছেলে বলল। দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল ভূষণ। সে কথা বলতে পারল না, ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

আমাদের সঙ্গে আসতি হবে বুজিচো? পরিচিত দু'জনের একজন বলে।

এই বন্দুক ধরতি হবে—লড়তি হবে এমনি করে।

একজন খালি-গা তার বন্দুক আকাশের দিকে তাক করল। কড়াং করে একটা বিকট আওয়াজ উঠল। ভূষণ চমকে উঠে কাস্তে ফেলে দিল।

দিলে তো ঘ্যাওড় করে—কী আওয়াজ, বাপরে—ভূষণ কাঁপা গলায় বলে।

জামা-গায়ে ছেলেটি এইবার বলে, তার চোখের রং পিঙ্গল, দৃষ্টি চিলের মতো—নাকের দু'পাশ কোঁচকানো। সে বলল, দেশ নিজের করে নাও ভূষণ—স্বাধীন করে নাও। পাকিস্তান আর রাখা যাচ্ছে না।

ভূষণ কিছু কিছু গণ্ডগোলের কথা শুনেছিল। ঢাকায় নাকি ভারী গোলমাল চলছে—মারামারি-কাটাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছে—খুলনাতেও হাঙ্গামা চলছে। ভূষণ এসব শুনেছে মাত্র। গণ্ডগোল তো এদেশে লেগেই আছে—তেমনিই কিছু হবে হয়তো।

এখন সে অস্ত্র দেখে আর বিকট আওয়াজ শুনে খুবই ভয় পেয়ে গেল।

সবাইকে আসতে হবে আমাদের সাথে—কী কও রাইফেল ধরতি পারবা না।

জামা-গায়ে ছেলেটা আরো এগিয়ে এল ভূষণের কাছে, শোনো কাকা, তোমরা ভয় পেলে কোনো কাজই হবে না—তোমাদেরই তো অস্ত্র ধরতে হবে—তোমরাই তো ছ'কোটি মানুষ আছো এদেশে—এই তোমরা যারা চাষী—জমিজমা চাষবাস করো। আমাদের দেশটা শুষে খেয়ে ফেললে শালারা। ভালো

ভালো অস্ত্র দিয়ে ঢাকায় খুলনায় সব জায়গায় আমাদের মেরে মেরে শেষ করে দিলে। অস্ত্র না চালালে এখানেও আসবে ব্যাটারা। লুকিয়ে বাঁচবে ভেবেছ?

এইসব বলে ছেলে তিনটি চলে গেল।

ভূষণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। পুলিশের বন্দুক ওদের হাতে, এটা ভীষণ সাংঘাতিক কাণ্ড মনে হলো তার কাছে।

কাজ করে দেড় টাকা পেয়েছিল ভূষণ। দুপুরে কড়া রোদে বাড়ি এসেই কিন্তু মেজাজ তার গেল বিগড়ে। গোরুদুটো ঠায় বাঁধা আছে। দুপুরে রান্না হয়নি—সকালের দুটো ভাত পানিতে ভেজানো ছিল। তাই নিয়ে এল ভূষণের বউ। ছোট ছেলেদুটো ন্যাংটো হয়ে উঠোনে পিটুলি গাছের ছায়ায় ঘুমোচ্ছে। ভূষণের বাড়ির চারদিকই খোলা—পিটুলি গাছটাতেই যা একটু ছায়া হয়েছে—না হলে রোদে পুড়ে যাচ্ছে যেন তার ভিটে। ভূষণ জিজ্ঞেস করল, হরিদাস কনে?

ওর বউ জবাবে বলে যে সকাল থেকেই সে উধাও।

এই কথা শুনেই ভূষণের খুদে খুদে কটা চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, উরে হারামজাদা শুয়োর, ওরে যদি না আজ গাড়ে পুঁতি—আসুক শালার বিটা আজ।

গোরুদুটোর কোনো ব্যবস্থা করা গেল না। ভূষণকে দেখে তাদের বড় বড় কালো চোখ আশায় ঝকঝক করে উঠল। পারলি কিছু খাতি দিস—ভূষণ বউকে বলল।

আমি দেব কনে থে—বউ বলল।

মুখে মুখে জবাব করিসনি দিনি—যা কলাম, পারলি করিস।

এই কথা বলে ভূষণ গিয়ে দাওয়ার খালতিতে উঠেছিল। এপ্রিলের রোদে তেতে খালের ঘোলা পানি গরম হয়ে উঠেছে—বাতাসটাও আগুনের মতো গরম। মাঠের ঘাস পুড়ে যাবার পট-পট শব্দ ভূষণ শুনতে পাচ্ছিল। সে ঘাড় উঁচু করে শুকনো বিলের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে দেখছিল দিগন্তের কাছ বরাবর দুপুরের তাপ ঝকঝক করছে। সেই সাদা ধোঁয়া পেরিয়ে গ্রামগুলি গভীর সবুজ উঁচু-নিচু রেখায় স্থির হয়ে রয়েছে।

কিন্তু ভূষণ ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কী আরম্ভ হয়েছে দেশে—দুধের ছেলেরা বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পঞ্চাশ বছর আগে ভূষণ যখন জন্মেছিল এই বিলের ধারের গ্রামে—সরু সরু খালে ক্ষতবিক্ষত—

কোনাকুনি লম্বালম্বিভাবে ফালা ফালা করে চেরা—কিছু আম, জাম, কাঁঠাল, কিছু ঝোপঝাড, লতাপাতা আর ছোট ছোট গোলপাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর; ক'ঘর জেলে, গুটিকয়েক চাষী পরিবার—এই অসহ্য একঘেয়ে গ্রামে পঞ্চাশ বছর আগে যখন ভূষণ পৃথিবীতে এল, তারপর থেকে অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছে। এই কথা ভূষণ শুনতে পায়, কিন্তু সে নিজে থেকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারেনি।

খুব ছোটবেলার কথা ভূষণের মনে পড়ে। উঠোনের পুবদিকে ছিল একটা বড় আমগাছ—ভূষণ পরিষ্কার দেখতে পায় গ্রীষ্মকালের লম্বা দুপুরে সে সেই আমের ছায়ায় ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে। নিজের কোমরের ঘুনসিটা পর্যন্ত ভূষণের নজর এড়ায় না। ওর বাপের ছিল ঝুলে-পডা কাঁচা-পাকা এক-জোড়া গোঁফ। ভূষণ তার বাবাকেও স্পষ্ট দেখতে পেল। বাবাকে আরো ভালো করে দেখবার জন্যেই যেন ভূষণ ঘাড় তুলে বিলের উপর দিয়ে অনেক দূরে চেয়ে রইল। রোদ এখন পডে এসেছে—খালের দু'পাড়ে বড বড় গাছগুলো থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া দিতে শুরু করেছে—ভূষণ দেখল কচি নতুন পাতা বেরিয়েছে গাছগুলোয়—জামগাছের নিচে দিয়ে যেতে একটা ঝমঝম শব্দ এল বাতাসের। লতাগুলো এগিয়ে এসে খালের পানিতে ঝুলে পডেছে।

আমি তো কিছুই দেখতেছিনে—ভূষণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এল, কী হইছে দেশের, এই বিল যেমনকার তেমনি রইছে, কেডা এই বিলের মালিক ভগোমান জানে। বাবাও যা করত আমিও তাই করছি—খালের ধারে এই জাম গাছটা পর্যন্ত যেমন তেমনি রইছে।

ভূষণ তার সেই বিকট অদ্ভুত ধরনের মাথা খুব গম্ভীরভাবে নাড়লো, হারাম-জাদা হরিদাসটা পর্যন্ত—ভূষণ মাথা ঝাঁকিয়ে দিতে তার মোটা মোটা কর্কশ চুল-গুলো মাথার চারপাশে সমানভাবে ছড়িয়ে পডল। তেমনই বিরসমুখে সে শালতি বাইতে লাগল। যাচ্ছিল সে পাড়ের কোল ঘেঁষে—তার চোখের উপর এসে পডেছিল আগোছালো চুল—খুবই অন্যমনস্ক হয়ে ভূষণ একটা লম্বা ঘাস ছিঁড়তে গেল। ফোঁস করে গর্জন করে উঠে যেন সেই ঘাসই ফণা তুলে তার সামনে দুলতে থাকল। ভূষণ দেখল তেজী একটা গোখরো—লালচে গায়ের রং, খালের পশ্চিম পাড়ে একটা বড জামরুল গাছের পাশে বিকেলের হালকা রোদে দুলছে। সাপটার খোলা চোখে সূর্যের আলো ঠিকরে পডে খুব ছোট দুটি বিন্দু ঝিকমিক করছে। ভূষণের মনে পডল তার বাপ মরেছিল সাপের কামড়ে —দু ঘণ্টার মধ্যে মারা গিয়েছিল। ভূষণ তার বাঘের মতো হাতের থাবায় বৈঠা

ধরে একটি নিশ্চিত আঘাতে সাপটার কোমর ভেঙে দিল। হিসহিস করে তখনো গর্জন করে যাচ্ছিল সাপটা—ভূষণের শালতি এক দমকায় খালের মাঝ খানে চলে এসেছিল। আনন্দে আর আক্রোশে ভূষণের চৌকো মুখ গারদের লোহার দরজার মতো আটকে গেল—তার চোয়ালের পাশে মাংসপেশী কাঁপতে থাকল—চোখে এপ্রিলের সূর্য ঝিকঝিক করতে শুরু করল। শালতি আবার পাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে সে সাপটাকে থেতলে দিয়ে এল।

হাট কাছাকাছি চলে এসেছে। ভূষণ পিছনে চেয়ে দেখল, খাল রুপোর পাতের মতো এঁকেবেঁকে বিলের ভিতর দিয়ে দক্ষিণে চলে গিয়েছে, বহুদূর পর্যন্ত কোনো লোকালয় নেই। এই পথটা একা কতদিন পাড়ি দিয়ে এসেছে ভূষণ—আজ হঠাৎ একটু ভয় করে উঠল তার। হাট থেকে ফিরতে নিশ্চয়ই রাত হয়ে যাবে—হরিদাসকে না পেলে সে ফিরবে কেমন করে। এই অদ্ভুত সমস্যায় ভূষণ কিন্তু এর আগে কোনোদিন পড়েনি।

হাটের একেবারে মাঝামাঝি গিয়ে রতনের মুদির দোকানের পিছন দিকটায় শালতি বেঁধে রেখে ভূষণ লাউশাক, কাঁচাকলা আর লাউদুটো মাথায় নিয়ে নেমে এল। রতনের মুদিখানার উত্তর পাশ দিয়ে একটা ঢালু সুঁড়িপথ ধরে তরকারির হাটে আসা যায়।

সেই পথটা দিয়ে উঠে আসতে গিয়ে বারকতক ভূষণের পা হড়কে গেল। খুবই খাড়াই পথটা, দু'পাশে আবার কিছু কাঁটাঝোপ আছে। কিছুতেই এগুতে দেয় না। উঠে এসে তরকারির হাটের মুখটায় দাঁড়িয়ে ভূষণ হাঁফাতে লাগল। দেরি হয়ে গিয়েছে তার—হাট অনেকক্ষণ জমে উঠেছে, মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে জায়গাটা, আশেপাশের গাঁ থেকে সমর্থদেহ প্রায় প্রত্যেকটি পুরুষমানুষ এসেছে হাটে। ভিড়টা আজ বড্ড বেশি মনে হলো ভূষণের—মানুষের কোলাহলে এমন একটা গম্ভীর শব্দ উঠছে যে কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। ভূষণ হঠাৎই দেখতে পেল সামনের চায়ের দোকানটায় হরিদাস আড্ডা দিচ্ছে আর হ্যা হ্যা করে হাসছে। অসহ্য রাগে ভূষণ কাঁপতে শুরু করে—তার কটা চোখদুটি জ্বলে ওঠে আর মুখের আকার পুরোপুরি চৌকো হয়ে যায়। ভূষণ নিশ্চয়ই বাঘের মতো গিয়ে হরিদাসের উপর লাফিয়ে পড়ত—কিন্তু তার মাথায় শাক আর লাউয়ের বোঝা—হাতও জোড়া। সে কী করবে ভেবে পেল না। শেষে ধড়বড় করে মাথার আর হাতের বোঝা মাটিতে নামিয়ে রেখে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূষণ দাঁত কিড়মিড় করতে করতে হরিদাসের দিকে ছুটে গেল। দোকানের পৈঠায় দাঁড়িয়ে সে হাঁক দিল,

ইদিগে আয়, হারামজাদা শুয়োর, শালার বিটা পিচেশ, আজ তোর একদিন কী আমার একদিন—

ভূষণকে দেখে হরিদাসের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সে ভয়ে ভয়ে নেমে আসছিল দোকান থেকে। ভূষণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল দোকানের নিচে, নাগালের মধ্যে এলেই হরিদাসের মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবে এই ভঙ্গিতে—ঠিক তখন একটি গম্ভীর গুড়গুড় শব্দ খালের দিক থেকে ভেসে এল। ভূষণ জানে এহ শব্দ লঞ্চের, লঞ্চ যখন ঘাটে ভেড়ে এই শব্দ পানির ভিতর থেকে উঠে আসে। কিন্তু এই খালে তো কখনো লঞ্চ আসে না।

হরিদাস ততক্ষণে সামনে এসে গিয়েছে, ভূষণ তবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মুহূর্তে বিকট একটি বোমা ফাটার শব্দে হাট কেঁপে উঠল। ভূষণ দেখতে পেল বড় তেঁতুল গাছটা আমূল থরথরিয়ে উঠল, কিছু কাক বসেছিল, ভয়ানক চিৎকার করে ঘুরে ঘুরে উড়তে শুরু করলো। শব্দটা আবার এল—প্রথমে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ, কান ফাটিয়ে দেয়, তারপরেই লোহার তৈরি কোনো যন্ত্র থেকে বেরুনো একটা পাতলা ও তীক্ষ্ণ ধাতব প্রতিধ্বনি। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভূষণের ধুতি পট করে তার পায়ে বাড়ি খেল। এমন তার পা-দুটি যেন মাটিতে আটকে যায়—সামনেই বিহ্বল হরিদাস। হাটের কোলাহল থেমে গেল—স্তব্ধতা নেমে এল তখন। এই স্তব্ধতাকে বর্ণনা করা যায় না—আকাশ কাঁপিয়ে-তোলা আতঙ্ক আর আর্তনাদ সেই স্তব্ধতাকে শানিয়ে তুলেছে আর তার ওজনকে করেছে দুর্বহ।

থেকে থেকে সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ চলতে থাকে। প্রথমে ভয়াবহ গম্ভীর গুম্‌ম্—তারপরই ধাতব প্রতিধ্বনি—চাঁইই। তারপর ভূষণ আর লঞ্চের শব্দ শোনে না—একটা নতুন শব্দ শুনতে পায়—ফররররর। জমির নাড়ার ফাঁক দিয়ে খুব দ্রুত পাখা নেড়ে মাটির উপর দিয়েই উড়ে যাবার সময় একজাতীয় ছোট পাখি যেমন শব্দ করে—শব্দটা অনেকটা তেমনি। এই শব্দ শোনবার পরেই হাটের এক প্রান্ত থেকে রক্ত জমানো হাহাকার ভরা চিৎকার কানে আসে, আর হরিদাসের আতঙ্কভরা চোখের চাউনি অনুসরণ করে ভূষণ পিছন ফিরে নদীর দিকে চেয়ে দেখতে পায় গলিপথ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আসছে একজন মানুষ—তার পরনে খাকি প্যাণ্ট আর খাকি জামা—মাথায় কপাল-ঢাকা টুপি তেরছা করে বসানো—ফরসা, লম্বা, পাহাড়ের মতো জোয়ান। ভূষণ মানুষটার চোখের দিকে চাইল। প্রথম যৌবনে সে সুন্দরবনে খুব কাছ থেকে একটি বাঘের একজোড়া

চোখ দেখেছিল। অতি, অতি দ্রুত ভূষণের মনে পড়ে গেল। মানুষটা ভীষণ চিৎকার করছিল যা বোঝার ক্ষমতা ভূষণের ছিল না—শুধু বেইমান, মালাউন, কাফের এইরকম শব্দ সে শোনে আর একদৃষ্টে লোকটার হাতের লোহার কালো বেঁটে বন্দুকটার দিকে চেয়ে থাকে। চোখের পলকে লোকটা যেন দুটো হয়ে গেল। ভূষণ দেখল তার পাশে ঠিক তারই মতো আর-একজন। সুঁড়িপথ ধরে ধরে খটখট শব্দ তুলে একজনের পর একজন উঠে আসছে—উপরে এসেই নদীর কিনারা বরাবর ওরা ছড়িয়ে গেল। এবং এতক্ষণে একটানা শব্দ উঠে এল কট্ কট্কট্। কান ঝাঁঝা করতে থাকে—হরিদাস দু'পা সরে গিয়েছে, ভূষণ ভেজা চোখের মতো এপ্রিলের আকাশের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো—রোদ তখনো ঝিকমিক করছে বড় বড় গাছগুলোর মাথায়। আবার একটানা শব্দ উঠল কট্ কট্ কট্ কট্—তখন ভূষণ দেখল গোড়া কেটে ফেললে গাছ যেমন তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ে, মানুষ তেমনি করে মাটিতে পড়ছে।

এর পরেই সে রক্ত দেখতে পায়—কোনো মানুষের মাথা থেকে, কারো পা থেকে, কারো কাঁধ, বুক বা পেট থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে—রক্ত ছোটার কলকল ঝরঝর শব্দটাই যা ভূষণ শুনতে পায় না—কিন্তু দলে দলে মানুষ মাটিতে শুয়ে পড়ছে এটা সে দেখতে পায়।

ভূষণ এতক্ষণ নড়তে পারেনি—হাটের কোনো মানুষও কিছুক্ষণ নড়েনি। হঠাৎ সেই ভয়াবহ স্তব্ধতা কেটে যায়—চিৎকার করতে করতে মানুষজন তীব্র-বেগে দৌড়ুতে দৌড়ুতে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কেউ মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে একবার নদীর দিকে তাকায়, তারপর তলপেট চেপে মাটিতে বসে পড়ে—আর রক্ত ছোটে কলকল ঝনঝন শব্দে। শানের মতো মসৃণ সাদা পথের উপর দিয়ে রক্ত এত দ্রুত গড়িয়ে যায় যে তাতে সাদা ফেনা দেখা যায়—কোথাও ঘাস ভিজে যায়—ডগায় রক্তের বিন্দু নিয়ে লম্বা ঘাস দুলতে থাকে।

একভাবে কট্ কট্ কট্ কট্ শব্দ চলতেই থাকে—এখন বস্তার উপর বস্তার মতো মানুষের উপর মানুষ স্তূপীকৃত হতে থাকে—কেউ প্রবল বেগে হাত-পা নাড়ে, কারো চোখের পাতাটি শুধু কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যায়। মানুষেরা ঘোলা চোখে এপ্রিলের আকাশের দিকে কঠিন চোখে বা যন্ত্রণার চোখে বা অভিমানের চোখে চেয়ে থাকে। ঈশ্বরের নামে বাতাস চিরে যায়—বহুলোক একসঙ্গে একযোগে ঈশ্বরকে ডাকে এবং যেটুকু সময় চুপ করে থাকে সেই সময়টার

মধ্যে মানুষ ইতস্তত মাটিতে শুয়ে পড়ে। শাকসব্জি ভর্তি বাজারের থলে কাঁধে নিয়ে কাৎ হয়ে এক-পা গুটিয়ে কেউ পড়ে থাকে, আশী বছরের বুড়ি বুলেটে চুরমার হয়ে যাওয়া বুক অগ্রাহ্য করে কোমরে ছেঁড়া কাপড়ের কসিটা আঁটবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হরিদাসের হাত ধরে টানতে টানতে ভূষণ এতক্ষণে তেঁতুল গাছটার আড়ালে গিয়ে পৌঁচেছে। ভূষণ আর কোথায় যেতে পারে ? সে সেখানে দাঁড়িয়ে শুনল সমানে কট্ কট্ শব্দ চলছে আর এখন হাটের যতদূর চোখ যায় কোথাও কোনো মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। অজস্র মানুষ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—কেউ কেউ তখনো চিৎকার করছে, ভগবানকে ডাকছে, পানি চাইছে, হাত-পা ছুঁড়ছে। হাটের ছোটি ছোটি চালাগুলো গুঁড়িয়ে ভেচে পড়ছে মাটিতে—শনশন শব্দে চারদিকে বুলেট ছুটছে। ভূষণ দেখল এর মধ্যে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে তার কালো কুতকুতে বাচ্চা কোলে তেঁতুলগাছের দিকে এগিয়ে এল। ঠাস করে একটি শব্দ হলো। মেয়েটি বাচ্চার মাথায় হাত রাখে। ভূষণ দেখে মেয়েটার হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত আসছে—শেষে রক্ত-মেশানো সাদা মগজ বাচ্চাটার ভাঙা মাথা থেকে এসে তার মায়ের হাত ভর্তি করে দিল। মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল, বাচ্চার মুখের দিকে চাইল, পাগলের মতো ঝাঁকি দিল তাকে ক'বার—তারপর অমানুষিক তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাচ্চাটাকে ; দুহাতে ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল তার ময়লা ব্লাউজটাকে। তার দুধে-ভরা ফুলে-ওঠা স্তনদুটিকে দেখতে পেল ভূষণ। সে সেই বুক দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, মার হারামির পুত, খানকির পুত—এইখানে মার। পরমুহূর্তেই পরি-পক্ব শিমুল ফুলের মতো একটি স্তন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ছিটকে এসে সে পড়ল তেঁতুলতলায়।

আক্রোশপূর্ণ ভয়শূন্য চাউনি নিয়েই সে মরে রইল।

এর মধ্যেও ভূষণ হরিদাসকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তখুনি ছুটে সে তার কাছে যাচ্ছিল, কিন্তু হরিদাস হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। ভূষণ ফিরে তাকিয়ে দেখে একেবারে সামনে, একহাতের মধ্যে সেই মানুষ—হাতে বেঁটে একটা বন্দুকের মতো জিনিস,—ফরসা বিরাট মুখ ঘামে ভিজে গিয়েছে, রাগে রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। খুব কাছ থেকে ভূষণ লোকটার কুতকুতে চোখদুটো দেখল, তার গায়ের ঘামের গন্ধ পর্যন্ত পেল সে। লোকটা গলা ফাটিয়ে বলল, এই কামিনা, তুম মালাউন হো ?

ভূষণ এইবার আর কিছুই দেখছিল না—তার সেই বাঘ-থাবা হাত ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল—সে দু'বার লোকটার ফুলে-ওঠা গলনালীর দিকে তাকাল—চুপচাপ চেয়েই থাকল একটু সময়। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করল ভূষণ—একটিমাত্র প্রচণ্ড লাফে সে হরিদাসের কাছে পৌঁছে গেল।

তখন হরিদাস শুয়ে—সমস্ত শরীর স্থির, শুধু চোখদুটিতে তখনো আছে জীবনের তাপ। ভূষণ তার মুখের উপর মুখ নিয়ে অতি আদরে ডাকল, বাবা হরিদাস, বাপ আমার, মানিক আমার—এই বলে সে তার রুক্ষ কর্কশ হাত ছেলের গায়ে-মাথায় অতি ধীরে বোলাতে বোলাতে অস্ফুটে আবার ডাকল, বাবা হরিদাস!

এরপর আবার যখন বিচ্ছিন্নভাবে একটিমাত্র আওয়াজ উঠল কড়াং করে, তখন ভূষণের চৌকো থামের মতো দেহটা বার দুয়েক ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে যেতে সে সমস্ত বোধের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

নামহীন গোত্রহীন

সেই লোক বিকেলের ট্রেনে নামল। এই প্রথম শীতে সে পরেছে টুইডের খসখসে মোটা কোট। কোটের শেয়ালে রংটা তার গায়ের তামাটে ময়লা রঙের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গেছে। পুরনো কিন্তু দামী একটা টাই বেঁধেছে আগাছালোভাবে। প্যান্টের রং গেছে জ্বলে—উরুর কাছে দুটো-তিনটে মোটা সেলাই আছে। সকালে নয়, বিকেলের ট্রেনেই সে নেমেছিল।

বিকেল দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। সে প্লাটফর্মের দক্ষিণ কোণের দিকে অন্য-মনস্কভাবে চেয়ে আছে। ছায়া পশ্চিমদিকে সবে সবে যাচ্ছিল এবং পুবদিকের বড় বড় বাড়ি ও উঁচু গাছগুলির মাথা থেকে লালচে ঠাণ্ডা রোদ মিইয়ে আসায় সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছিল।

লোকটা স্টেশন থেকে সোজা পশ্চিমমুখো ধুলোভর্তি রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল। রাস্তার পীচ এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে—সাদা ধুলোয় আগাগোড়া ঢেকে আছে। রাস্তার দু'পাশে টিনের তৈরি ফাঁকা গুদোম তার চোখে পড়ল। এই বিশাল গুদোমগুলোর পাশ দিয়ে কালো কালো গলি চলে গেছে। অতবড় চওড়া রাস্তায় যতদূর চোখ যায়, কোনো লোকজন তার চোখে পড়ে না।

হিসহিস শব্দ করে ইঞ্জিনগুলো চলাচল করছিল। জনমানবশূন্য এই জায়গায় ইঞ্জিনগুলো নিজেরাই কী চলাচল করছে? সে লক্ষ করে তাদের কারো কোনো ব্যস্ততা বা নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই যেন। রেল স্টেশনের পুবপাশে নিচু ছাদঅলা বাড়িগুলো অন্ধকারে খুব তাড়াতাড়ি ডুবে যাচ্ছে—সেগুলোর ইটরঙের চিমনি অস্পষ্ট দেখা যায়।

খুবই আনমনে সে তার হাতের চামড়ার ফোলিও ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে স্টেশনের গেট পার হয়ে বাইরে চলে এল। এই সময়ে সে প্লাটফর্মে বা আশে-পাশে কাউকে দেখতে পেয়েছিল এমন মনে করতে পারে না। কিন্তু বাইরে আসার সময় গেটের পাশে একটা ছোট ঘরে সে ঠাসাঠাসি করে বসা কিছু-

সংখ্যক সৈন্য দেখতে পেল। তারা রাইফেল হাঁটুর উপর রেখে গল্পগুজব করছিল। তাদের টুপি ভুরুর উপর নামানো। খুব ঠাণ্ডা হিম চোখে তারা ওকে দেখল—কিন্তু কিছু বলল না। নিজেদের মধ্যে নিচু চোয়াড়ে গলায় কথা-বার্তা বলতে লাগল। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে গেট পার হবার সময় একজন সৈন্য রাইফেল তুলল। নেহি নেহি, আভি নেহি—এই বলে তার পাশের সৈনিকটি হাত বাড়িয়ে রাইফেলের নলটা নামিয়ে দিল। যে রাইফেল তুলেছিল, বড় বড় দাঁত বের করে নির্বোধের মতো হাসল সেই সৈনিকটি। গেট পার হয়ে সে বাইরে এল। এই জায়গাটা বৃত্তাকার—মাঝখানে ফাঁকা এবং সেখানে ধুলোভর্তি ঘাস রয়েছে। সে হাঁটতে লাগল, বাঁধানো রাস্তায় তার জুতোর শব্দ উঠতে লাগল। বৃত্তটাকে সে একবার ঘুরে এল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। সে দাঁড়িয়ে পড়ে অন্যান্য রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে। এইসব রাস্তা বিভিন্ন দিকে গেছে। কোনোটা ভাঙা, পীচঢালা কোনোটা খোয়া বাঁধানো, সাদা ধুলোয় পূর্ণ। যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গেছে, মনে হয় সেটা মাটির। তার দু'পাশে কোনো বাড়িঘর নেই—অথচ সাদা সাদা পোড়ো ভিটে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

স্টেশনের বাইরের বৃত্তটকে একবার ঘুরে এসে বাঁদিকে টিনের দেয়ালঅলা রেস্তোরাঁটি তার চোখ পড়ল। সে সোজা সেখানে ঢুকে গেল। তার খিদে পেয়ে-ছিল। ঘরের ভিতরটা ভীষণ ঠাণ্ডা আর যে বাল্বটি জ্বলছিল তা ধোঁয়ায় ঢাকা। সামান্য মরা আলোয় ঘরের নোংরা চেয়ার-টেবিলগুলো অস্পষ্ট দেখা যায় মাত্র। প্রথমে কোনো মানুষ সে দেখতে পায়নি পরে রেস্তোরাঁর উনুনের লালচে আলো দেখতে পায় এবং দরজার পাশেই যে লোকটি টেবিলে থুতনি রেখে বসেছিল তাকেও নজর করতে পারে। লোকটা যখন চোখ তুলে তার দিকে তাকায় তখন সে কাঁচুমাচু করে তার সোনালী খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকে এবং বলে, কিছু খেতে পাওয়া যাবে?

কুছ নেহি—বিরক্তস্বরে টেবিলের ওপাশ থেকে লোকটা জবাব দেয়।

কোনো খাবার নেই?

নেহি, কুছ নেহি—মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে লোকটা হাত নাড়ে। কিন্তু সে তার টুইডের কোটের বাঁদিকের বুকের উপর যে ধ্যাবড়া অন্য রঙের সেলাই ছিল, তার উপর ফাটা আঙুল চালাতে চালাতে বলে, চা পাওয়া যাবে কি এক কাপ?

কুছ নেহি মিলেগা—চলো চলো আপনা রাস্তা দেখো।

যখন সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, লোকটা একদৃষ্টে পিছন থেকে তার পিছন দিকে, তার চওড়া কাঁধের দিকে চেয়ে থাকে। সে বাইরে এসে দেখতে পায় ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে, রাস্তায় কোনো আলো নেই। বড় চওড়া রাস্তাটা ধরে সে এগোয়। ধুলোর উপর তার জুতোর ধপধপ আওয়াজ ওঠে। যতদূর মনে পড়ে এই পথ এত বৃক্ষহীন কোনোদিন ছিল না। এইখানে রাস্তার দক্ষিণে একটা সাইনবোর্ডের দোকান ছিল। ওখানে একজন হোমিওপ্যাথ বসতেন। সন্ধের পর ঝকমকে আলো জ্বলত—শুকিয়ে-ওঠা চেহারার ডাক্তার বসতেন উত্তরদিকে মুখ করে। চেয়ারে বসে নাকের সামনে খবরের কাগজ তুলে পড়ত ক'জন বুড়ো। কেন এখানে এসেছে মনে করার চেষ্টা করে সে। কী যেন হিসেবপত্র বাকি রয়েছে—কেউ যেন তার কাছে টাকা পাবে বা সে কারো কাছ থেকে কিছু পেতে পাবে এইরকম মনে হলো তার। ঝড়-বৃষ্টির কালো আকাশে যেমন এলোমেলো বিদ্যুৎ চমকায় তেমনি ছোট ছোট স্মৃতি তার মাথার মধ্যে চিড় খেতে থাকে। যেমন সকালে উঠে দাড়ি কামানো বা কাগজ পড়া। প্যাট্রিস লুমুম্বা খুন হয়ে গেলে সেই খবর পড়ে কেঁদেছিল, কোনো একদিন দুপুরবেলায় হো চি মিনের কবিতা পড়েছিল—পাহাড়তলীর দিক থেকে ডিং ডং করে ঘণ্টা বাজে—স্বাস্থ্যবতী তরুণীরা ছোট ছোট পা ফেলে উপত্যকা থেকে নেমে আসে। ছোটবেলায় লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে তাড়াতাড়ি মাটি সরিয়ে দেখতে পেয়েছিল বড় বড় গোল আলু ধরে আছে—মাঝখানে মূল বীজ আলুটা পচে শুকিয়ে গেছে।

কোনোদিক থেকে কোনো মানুষ এল না। সে বাঁদিকের সরু গলি ধরে গুদোমগুলোর মাঝখান দিয়ে গভীর অন্ধকারে নেমে গেল। রাস্তার দু'পাশে ঘন ঘাসে কখনো কখনো তার পা বসে যাচ্ছিল। সে গুদোমের টিনের দেয়ালে হাত দিয়ে দেখল শিশিরে ভিজে আছে আর ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। এইভাবে সে নদীর ধারে পৌঁছে গেল। জায়গাটা এখন চিনতে পারে। বাজারের দোকানপাট রাস্তার দু'পাশ দিয়ে সারি বেঁধে রয়েছে।

সমস্ত দোকান সে বন্ধ দেখল। নদীর বাঁধানো পাড়ই হচ্ছে রাস্তা—এই রাস্তার দু'দিকে দোকানঘরগুলো। নদীর দিকে কোনো দোকানেরই নিচে মাটি নেই, নদী এসে ক্ষয় করে দিয়ে গেছে। সেদিকে সমস্ত ঘর মোটা মোটা বাঁশ বা গাছের গুঁড়ির উপর ভর দিয়ে শূন্যে ঝুলছে। দু'বার কান পেতে সে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ

শুনল অন্ধকারের মধ্যে। তার মনে হলো ঠিক পায়ের নিচে নদী এসে মাথা খুঁড়ছে। দোকানপাটের ফাঁক দিয়ে বাদিকে চেয়ে সে স্তব্ধ নদী দেখতে পেয়েছিল—আলো-হীনতায় বিশাল হয়ে বয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু অস্পষ্ট আলো দেখতে পেয়ে সে নদীর বুকে নৌকোগুলোর অস্তিত্ব টের পায় এবং বুঝতে পারে ঘন হয়ে কুয়াশা জমে আছে পানির উপর।

নদীর ভয়ে এককালে কারা এই রাস্তা কালো পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিল। পাথরগুলো এখন উঁচু-নিচু হয়ে গেছে—কোথাও কোথাও উঠে গেছে। সে হাঁটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। কিন্তু এসব লোকটা গ্রাহ্য করেনি—সে শুধুই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। কেউ তার সামনে আসছিল না, বা তার সঙ্গে কোনো আলাপ করছিল না। কোথাও কোনো আলো জ্বলছিল না। দু'পাশের ঘরগুলোর বিরাট দরজা শক্ত করে বন্ধ করা। কোথায় যেন কার ভয়ে দাঁতকপাটি লেগেছে—লোহার তৈরি কিছু একটা দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দাঁত ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার—এমনি মনে হলো তার আর ভীষণ কৌতূহলে সে রাস্তা ছেড়ে নিচু বারান্দায় উঠে একটা বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দেবার চেষ্টা করল। কিছু সে দেখতে পেল না —দু'হাতে প্রাণপণে চাড দিয়ে দরজা একটুও ফাঁক করতে পারল না। শুধু ঝাল-মশলার তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। সে ফিরে আসবে—অন্ধকারে একটা কালো রঙের ছাগলের উপর পড়ে সে ছিটকে রাস্তায় চলে আসে। পাথরের রাস্তায় ভয়ানক শব্দ হয়।

এইসময় সে প্রথমবারের জন্য ভারী বুটের শব্দ পায়। অনেকগুলো বুটের শব্দ। অন্ধকারের নৈঃশব্দ থেকে উঠে আসছিল খট খট খট এই শব্দ। তারপর বিজাতীয় কণ্ঠে বিকট হাঁক উঠল. কৌন হ্যায় উধার? এই চিৎকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড়াং শব্দে রাইফেলের গুলি ফাটে। সে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনল—বুটের শব্দ অন্যদিকে যাচ্ছে। আবার রাইফেলের গুলি ফাটলো। সে তার ফোলিও ব্যাগটা বগলে রেখে বুকে হাত বেঁধে একটু দাঁড়াল এবং পরে সাবধানে হাঁটতে লাগল। এইভাবে বন্ধ সারি সারি দোকানপাটের ভিতর দিয়ে, ফাঁকা শূন্য রাস্তা ধরে, অসংখ্য গলিঘুঁজি অতিক্রম করে—যেগুলি অন্ধকারের মধ্যে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গোলকধাঁধার মতো শুধুই ঘুরছে, একটির পর একটি, জনশূন্য নিশ্চুপ—এইসব গলির ভিতর দিয়ে শতপদী কেন্নোর মতো সে পিলপিল করে এগিয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে সে শহরের বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। একটির পর একটি এই-সব রাজবর্ত্ম সে অতিক্রম করে গেল। এসব রাস্তাও অন্ধকারে ডুবে রয়েছে

দেখল। তারপর সে একটি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। কোথায় একটা আলো ঝোলানো রয়েছে। লাল আলোয় একবারের জন্যে সে দাঁড়িয়ে নোনাধরা পলেস্তরাখসা দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। সোঁদা আর ভ্যাপসা একটা গন্ধে নিঃশ্বাস আটকে এল তার। এই ঘোরানো সিঁড়ি সুড়ঙ্গের মতো। কোনো একটা দিক থেকে বুঝি বাতাস আসছিল। ভীষণ হিমে সে কাঁপতে থাকল। এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালের গায়ে হাত রাখলে তার আঙুল বেয়ে ঠাণ্ডা উঠে আসতে থাকে। নোংরা ভিজে দেয়ালের উপর পেনসিল দিয়ে মেয়েমানুষের মুখ আঁকা রয়েছে—পাশেই লাল রঙের ইট দাঁত বের করে আছে। ঠিক কোনদিক থেকে আলো আসছে সে কিছুতেই ধরতে পারল না। আবার সে সিঁড়ি বেয়ে একতলা, দোতলা, তেতলা, চারতলায় উঠছে। একেবারে সিঁড়ির মাথায় এসে বন্ধ দরজায় ঘা মারল, চিৎকার করে ডাকল, অসিত আছো? অসিত আছো নাকি? অসিত কি বাড়িতে আছো?

সেই কড়া নাড়ার শব্দে সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠল। ভূমিকম্পে যেমন হয়, সমস্ত বাড়িটার ভিত নড়ে গেল। সে দরজায় হাতের মুঠো দিয়ে একনাগাড়ে অস্থিরভাবে আঘাত করতে করতে ডেকে চলল, অসিত কি বাড়িতে আছে? অসিত কোথায়?

দরজার ওপাশে খুট করে আওয়াজ হলো। কোনো ভীত মেয়েমানুষের গলা শোনা গেল, কে? কে? বাইরে কে?

সে কোনোদিকে কান না দিয়ে অসিত অসিত বলে ডেকে চলল। এই চিৎকার সে থামাল যখন দরজার একটা পাট খুলে গেল। বন্ধ পাটির আড়াল থেকে একটা মুখ উঁকি দিল। স্ত্রীলোকটির ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সে খুবই লজ্জিত হলো। দেখল তার বড় বড় চোখ বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে। সরু সরু হাত দিয়ে প্রাণপণে দরজা চেপে ধরে ভীষণ আতঙ্ক-ভরা কণ্ঠে মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, কাকে চাই?

অসিত নেই? অসিত এই বাড়িতে থাকে না?

না. অসিত নামে কাউকে আমরা চিনি না। আপনি কে?

অসিত বলে কেউ কি কোনোদিন এই বাড়িতে থাকত?

জানি না। আমরা এখানে নতুন এসেছি—এই বলে মেয়েটি দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল। যে লাল আলোটা আসছিল সেটাও যেন হঠাৎ ডুবে গেল। সিঁড়ির মাথায় ঠাণ্ডার মধ্যে সে দাঁড়িয়ে রইল। সেখানে রেলিঙে ভর দিয়ে সে গভীর

অন্ধকারে পূর্ণ সিঁড়ির কুয়োর মতো গর্তটার দিকে চাইল একবার। তারপর লাফ দেবার জন্যে তৈরি হলো। তুলোর উপর বেড়াল যেমন লাফ দেয়, তেমনি করে শূন্য অন্ধকারের ভিতর লাফ দিয়ে তলিয়ে যেতে চাইল কিন্তু একটু পরেই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ তুলে সে নিচে নেমে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে ঘুরতে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে, শ্যাওলার উপর আলতো করে নাক ঘষে, মারমুখো অশরীরীর মতো সে নিচে যেতে লাগল। বাইরে এসে রাস্তায় একটা নিচু কালভার্টের ঠাণ্ডা শানের উপর হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে পড়ল।

অনেক দূরে রাইফেলের আওয়াজ সে পায়—কিন্তু কান খাড়া করেও কোনো বাতাসের শব্দ পায় না। লোকটা একবার মুখ তুলে আকাশের দিকেও চেয়েছিল। কোনো তারা ছিল না এবং মেঘ দেখা যায়নি। সে কোনো বীভৎস শব্দের প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু কিছুই না ঘটায় সে বিরক্ত হয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। চৌকো চৌকো বাড়িগুলো রাস্তার দু'ধারে ছড়িয়ে রয়েছে—নিচু ছাদ আবছা অন্ধকারে চকচক করছে আর এইসব বাড়ির পাশ দিয়ে ছোট ছোট ধুলোভর্তি পথ বা কালো পাঁচের রাস্তা এঁকেবেঁকে আতঙ্কের অন্তঃপুরের দিকে চলে গেছে।

তার পেছনদিকে কোনো অনির্দিষ্ট রাস্তা থেকে এখন সে ভারী গাড়ির আওয়াজ পায়। ইঞ্জিনের গম্ভীর গুড়গুড় শব্দে কিছুক্ষণের মধ্যে কানে তার তালা ধরে যায়। শব্দটা ওঠার পর থেকে আর কিছুতেই দূরে যেতে চায় না—অজস্র মোড়ওয়ালা প্যাঁচালো কোনো রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে বলে শব্দটা কখনো দূরে চলে যায়, শুধু রেশটা থাকে মাত্র। আবার ঘুরে এসে বুকের ভিতরে ঢোকে। আওয়াজটা কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছিল না। স্ক্রুর মতো প্যাঁচ কেটে কেটে পাতালে নেমে আবার সেই ভাবে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে আসছে যেন। এতে সে ভারি একঘেয়ে বোধ করল।

তার ঠাণ্ডা লাগছিল। কোটের কলারটা যতটা সম্ভব টেনে তুলে কান ঢাকা দেবার চেষ্টা করল। তারপর খুব জোরে জোরে দু'হাত ঘষে নিল। দু'পাশের বাড়িগুলো নিঃশব্দ—কোনো আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিল না, কেউ কাউকে ডাকছিল না, কারো সঙ্গে কোনো আলাপ হয়নি, কেউ দরজায় ধাক্কা দেয়নি, প্রতিটি দরজা শক্ত করে বন্ধ করা ছিল।

যখন সে ডানদিকের রাস্তায় মোড় নিয়ে একটা বড় বাড়ির অন্ধকারের আড়ালে চলে গিয়েছিল, সেই সময় অতি দ্রুত একটি জিপ এসে ঘ্যাঁস করে ব্রেক কষে বড় রাস্তার উপরেই থেমে যায়। সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্ত্রীলোকের

গোঙানি শুনতে পেয়েছিল। লোকটা তার বুকের ভিতর খুব একটা কষ্ট অনুভব করেছিল। একবার সে মাটির দেয়াল চাপা পড়েছিল, নাকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল গুঁড়ো মাটি, কিছুতেই নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। সেই রকম। সে জীপটার কাছে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, কোথায় কিভাবে সে ছিল এবং তার জীবন স্বপ্নের ভিতরে কোনো স্বপ্নের মতো কিনা বা বাস্তব—এসব প্রশ্ন হঠাৎ গুলিয়ে গেল বেচারির এবং ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠলে একজন বিজাতীয় মানুষের নিষ্ঠুর মুখ এবং একটা মুখবাঁধা স্ত্রীলোকের অবয়ব হঠাৎ দেখে ফেলল। সে এগিয়েই যাচ্ছিল—তক্ষুনি কেউ লাফ দিয়ে জীপে উঠল এবং তীব্র গতিতে সেটা চলে গেল।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখল চাঁদ উঠেছে। সে শহরের প্রশস্ততম রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁদ খুব তাড়াতাড়ি আকাশে উঠে গেল। সিধে চওড়া রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত সে দেখতে পাচ্ছিল। মরুভূমির মাঝখানে অতি প্রাচীন ও জনমানবশূন্য অট্টালিকা শ্রেণীর মতো দেখাচ্ছে এই রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর। বিকেলের মরা আলোয় মাটি খুঁড়ে উন্মোচিত পুরনো ঘরবাড়ি ভাঙাচোরা, সব ছাদ সমান উঁচু নয়, চওড়া রাস্তা আর চমৎকার জলনিকাশের বন্দোবস্ত, সরু সরু পথ—সব রয়েছে এই রকম দেখাচ্ছিল এই শহর। সাদা রং-করা বাড়িগুলো ধপ ধপ করছিল—এক একটা বাড়ি অন্য বাড়ির উপর, রাস্তার উপর ঘন কালো ছায়া ফেলেছিল। কোনো কোনো বাড়ির সামনে দিয়ে লম্বা পাঁচিল চলে গিয়েছিল। পাঁচিলের ওপাশে ছিল ফুলের গাছ, অযত্নের কাঁটালতা, স্যাঁতলা-ধরা ইটের খোয়া। কোনো বাড়ির গেটের পাশে লেখা ছিল—সাবধান, কুকুর আছে। কিন্তু কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা যায়নি। বাড়ীগুলোর কোনোটা উঁচু কোনোটা নিচু, কোনোটা নতুন, রঙ-করা, কোনোটা পুরনো আর সোঁদা গন্ধ-অলা ভিজে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার; বাতাবি লেবুর গাছ, ঘন পাতাবাহার। কিছু কিছু পোড়ো জায়গা আশেপাশে। এই রাস্তা দিয়ে, এইসব গলিঘুঁজি অতিক্রম করে, কখনো ছায়ার ভিতর দিয়ে, কখনো বা জ্যোৎস্নায়, মাথা উঁচু করে, সে, অনেক লম্বা, সোজা, মোটা কোট গায়ে, ধুলোভর্তি বুট জুতো ঘষতে ঘষতে হাঁটতে লাগল। ঠিক যন্ত্রের মতো, তার গতি দ্রুত নয়, ধীর নয়—ঘড়ির কাঁটার মতো অবিচ্ছিন্ন, ক্রমাগত এইরকম। এইভাবে কখনো হয়ত তার খারাপ লেগে থাকবে, মাটির উপর সে বসে পড়ে পা থেকে জুতোজোড়া খুলে ফেলে। টান দিয়ে মোজা থেকে পাদুটো মুক্ত করে আঃ শব্দ করে আরাম জানায়। পটাপট শব্দে মোজা

ঝাড়ে, জুতোজোড়া পীচের রাস্তায় ঠোকে, তারপর হাতে জুতো মোজা নিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ে।

গলিটার আধাআধি যখন পার হয়ে গেছে, তখন বড়ো রাস্তার দিক থেকে জুতোর আওয়াজ আর কথাবার্তা শুনতে পেল সে। সে শুনতে পায়, শালা বোলো, তুমলোক জয়বাংলা হো ?

নেহি—কেউ উত্তর দিল।

জরুর জয়বাংলা হো—এই কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভোঁতা আওয়াজ তার কানে এল। তখন এক বিচিত্র বোধে জুতো হাতে নিয়ে, বগলে ফোলিও ব্যাগ পুরে সে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার দিকে এগোয়। জ্যোৎস্নায় সে কিছু মানুষ দেখতে পেল।

তুম হিন্দু হো ?

নেহি—আবাব কেউ বলল।

জরুর তুম হিন্দু হো।

জ্যোৎস্নায় সে দেখল আট-দশজন একজনকে গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে। মাঝখানের লোকটার খালি গা, পরনে কালো হাফপ্যাণ্ট।

তুমারা ঘর কাঁহা ?

সে চুপ করে আছে।

জয়বাংলা কাঁহা হ্যাঁয় ?

লোকটা কোনো কথা বলছে ন'।

একজন তার মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসালো। কালো প্যাণ্ট পরা লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

শালা, তুমকো গুলি করেগা।

আভি করো—উঠে বসে মুখ মুছতে মুছতে সে বলে।

তুম মুক্তিফৌজ নেহি হো শালা, বাঙালি কুত্তা ? শালা, মুজিবকা পূজারী।

নেহি।

তুম হিন্দু নেহি হো ?

নেহি।

লো ভাই, গুলি কর দো।

নেহি, নেহি, গুলি নেহি করেগা—দেখো হাম কেয়া করে।

কয়েক মিনিট পরে গলি থেকে সে দেখতে পেল সামনের একতলা বাড়ির

ছাদের দিকে কালো প্যাণ্টপরা লোকটা উঠে যাচ্ছে। তার মাথা মাটির দিকে। পা দুটো একসঙ্গে বেঁধে একতলার ছাদের লোহার রডে দড়ি আটকে কপিকলের মত দড়িতে টান দিচ্ছে কয়েকজন সৈন্য। কালো প্যাণ্টপরা লোকটার মাথা মাটি থেকে ফুট পাঁচেক উঠে গেলে একটি কণ্ঠ বলে, ব্যাস, রোখো। কেয়া, তুম জয়-বাংলা নেহি হো?

নেহি

সেই কণ্ঠ বলল, দো ভাই দড়ি ছোড় দো।

পাঁচ ফুট উপর থেকে প্যাণ্টপরা লোকটার মাথা শরীরের সমস্ত ওজনসহ বাঁধানো মেঝেয় এসে ঠুকে পড়ল। ঠাস করে একটি শব্দ উঠল—প্যাণ্টপরা লোকটা তার বুকের ভিতর থেকে বলল, আঃ।

আবার তার মাথা মাটি ছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

তুম জয়বাংলা হ্যায় কি নেহি?

কালো প্যাণ্টপরা লোকটার গলা থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হয়—সেই আওয়াজটাকেই কথায় পরিণত করে সে বলে, বাঙালি তুমলোগোকো খতম করেগা—আভি ভাগ যাও বাঙাল মুল্লুকসে—কথা শেষ হবার আগেই আবার সেই মাটিতে কাঁচা মাংস থ্যাঁতলানোর আওয়াজ।

গলি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এধার টলতে লাগলো সে। মাতালের মতো দুলতে দুলতে অন্ধকার ঠেলে গলি ধরে, রাস্তার ধার দিয়ে গলি গলি গলি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি একতলা বাড়ির ছোটো মাঠে এসে সে দাঁড়ায়। নিচু একটি পাঁচিল দিয়ে মাঠটুকু ঘেরা—এককোণে একটি স্থলপদ্মের গাছ। সে লাল চওড়া বারান্দায় চুপি চুপি উঠে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মোলায়েম গলায় ডাকল, মমতা আছো? মমতা?

কেউ সাড়া দিল না। অনেকবার ডাকল সে। শেষে দরজায় হাত দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার। সে ঘরে ঢুকে ডাকল, মমতা আছো? মমতা? ছোটো ছেলে শোভনকেও ডাকল দু-একবার। সে ঘর থেকে বেরিয়ে ভিতরের বারান্দায় গেল—কেউ নেই। ওপাশের ঘর দুটোয় ঢুকল; রান্নাঘর, বাথরুমে গেল। এমন ভাবে তন্ময় হয়ে সে মমতাকে ডাকছিল যে মনে হলো সে তক্তপোশের উপর হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করল, মমতা কই? টেবিলের কোণে হাত বুলিয়ে আলমারির কাছ দিয়ে যেতে যেতে একই প্রশ্ন মনে মনে করেছিল।

তারপর ভিতরের উঠোনে নেমে এসে বাড়িটাকে সে দেখছিল। চারদিকে বড় বড় উঁচু বাড়ির চাপে এই বাড়িটাকে কুয়োর মত মনে হচ্ছিল। অনেক বাড়ির কালো ছায়া এই বাড়ীর উপর পড়েছিল। উঠোনের প্রায় চায় ভাগের তিনভাগ ঘন অন্ধকারে ঢাকা ছিল। আর শুকনো পাতায় উঠোন পূর্ণ ছিল। সে মড়মড় শব্দ তুলে পায়চারি করছিল—শুকনো পাতায় গোড়ালি পর্যন্ত ডুবিয়ে সে মরা গাছটার কাছে গেল—বুঁজে যাওয়া কুয়োটার ভিতর একবার উঁকি দিল। শেষে পুরনো জংধরা একটি কোদালে তার হাঁটুতে জোর আঘাত লাগে।

লোকটা জুতোজোড়া খুলে ফেলে দিল একদিকে—ছুঁড়ে ফেলল ফোলিও ব্যাগ। কোট, টাই আর শার্ট খুলে ফেলল একে একে। গেঞ্জির ভিতর দিয়ে তার লোমশ বুক ফুলে ফুলে উঠছিল। তার সামান্য পাগলাটে চোখের দৃষ্টি আরো গোলমেলে হয়ে উঠল। সে তার শিরাবহুল পেশল হাতে কোদাল তুলে নিল। দুবার তিনবার নাক আর মুখ থেকে হ্যাঁক হ্যাঁক করে আওয়াজ বের করে উঠোনে কোপ দিল সে। তারপর হেঁট হয়ে একটি পাঁজরের হাড় তুলে নিল হাতে। হাড়টা তলোয়ারের মত বাঁকা। সেটা তুলে নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকলো—হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল। তারপর আবার চলল উঠোন কোপানো। একে একে উঠে আসছে হাতের অস্থি, হাঁটুর লম্বা নলি, শুকনো সাদা খটখটে পায়ের পাতা।

সে প্রচণ্ড তেজে কোদাল চালাচ্ছে। কখনো কোদাল রেখে জন্তুর মতো নখ দিয়ে আঁচড়ে যাচ্ছে মাটি। দরদর বে ঘাম ছুটছে তার সমস্ত দেহ থেকে—ঠোঁট চেটে নোনা স্বাদ সে গ্রহণ করছে। খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোটো হাত পেয়ে গেল সে—সেটাকে তুলে আপনমনেই লোকটা বলল, শোভন, সাবাস। তারপর উঠে এল দীর্ঘ চুলের রাশ, কোমল কণ্ঠাস্থি, ছোটো ছোটো পাঁজরের হাড়, প্রশস্ত নিতম্বের হাড—তারপর করোটি। খুলিটা হাতে নিয়ে সে ওটার চোখের শূন্য গহ্বরের দিকে চেয়ে রইল। তার নিজের চোখ নিয়ে গেল করোটির চোখের গর্তের খুব কাছে, একদৃষ্টে চেয়ে রইল সারি সারি দাঁতের দিকে। ফাঁকা মুখ-গহ্বরের ভিতর নিঃশব্দে বিকট হাসি হাসল করোটি।

মমতা—লোকটা বলল। বলে সেটা পাশে নামিয়ে রেখে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। পৃথিবীর ভেতরটা নাড়িভুঁড়ি-শুদ্ধ সে বাইরে বের করে আনবে।

আটক

প্লেনগুলো সকালে আসে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করার আগেই। আবছা কুয়াশার ভিতর। কয়েকবার চক্কর দিয়ে চলে যায়। ফিরে আসে দশটার দিকে। কর্কশ ঘঘর শব্দে খুব নিচু দিয়ে চক্কর দিতে থাকে। কিন্তু কিছুই করে না। খুব বডো বডো বৃত্তে ঘুরতে থাকে। বৃত্তগুলো এত বড়ো যে একসময় প্লেনগুলো চোখের আড়ালে চলে যায়—মনে হয় চলেই গেল বুঝি। কিন্তু তাদের ফিরে আসা থেকেই বোঝা যায় তারা চক্রাকারে ঘুরছে। এলি-পটিকালও হতে পারে তাদের গতি।

তৃতীয় দিনে বেলা দশটার দিকে বহুদূর থেকে একটা গম্ভীর শব্দ আসে। প্লেন-গুলোকে দেখা যায়। ভোরে এসে চলে গিয়েছিল। বোঝাই যায় পাইলটরা চা শেষ করে আয়েশ করে ধূমপান করার পর আবার এসেছে। এবার তারা আব কিছুতেই চলে যেতে চায় না। বৃত্ত যেন ছোটো করে আনে। তেলের ডিপো আর পাওয়ার হাউসের মাথার উপর বার বার ঘুরতে থাকে নাছোড মাছিব মতো ভন ভন করে। জবরদস্ত অধ্যবসায়ী ভীমরুল যেমন চিট লেগে থাকে ফুলেব চারপাশে।

ওরা কি বোমা ফেলবে ? স্কুলের হেডমাস্টার জিজ্ঞেস কবেন।

ওরা এখানে বোমা ফেলবে কি জন্যে ? ওরা তো আমাদের শেষ করতে চায় না। আমাদের সম্পদ নষ্ট করে দিয়ে ওদের কি লাভ ? অধ্যাপক নজমুল বলেন।

ওরা প্লেনে বসে আপনার কথা কি শুনতে পাচ্ছে ? ভীষণ শব্দ হচ্ছে না কি ? আর একজন অধ্যাপক বলেন।

প্লেনগুলো কিন্তু কিছুতেই চলে যাচ্ছে না। যত হাওয়া আসছে উত্তর থেকে, পাগলের মতো মানুষ গায়ে জড়াচ্ছে চাদব বা শাল, যার যা আছে লেপ কাঁথা বা কম্বল ; বুড়োরা বসে আছে বিছানার উপর ঘোলাটে ছানিপডা দৃষ্টি বাইরে মেলে দিয়ে, প্রচণ্ড হাওয়া উঠেছে আবার হিম কনকনে, শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করে ভিতরে চলে যাচ্ছে, যেন তরমুজের ভিতর ছুরি ঢুকছে নিঃশব্দে—তবু

কি উষ্ণ উত্তেজনা শিরায় শিরায়! হাঁ করে লোকজন তাকিয়ে রয়েছে প্লেনগুলোর দিকে। এদিক সেদিক থেকে বিশৃঙ্খলভাবে কাঁপা কাঁপা সাইরেন বাজছে। কিছু উত্তেজিত রাজাকার থ্রি নট থ্রি রাইফেল উঁচিয়ে প্লেনগুলোর দিকে গুলি চালাচ্ছে। ভারী মেশিনগানের কট কট আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। শেষ পর্যন্ত চলে গেল প্লেনগুলো। আকাশ তখনো গম গম করছে।

পিছনে বড়ো রাস্তা অসম্ভব ফাঁকা হয়ে আছে। গতকাল সন্ধে থেকে শুরু হয়েছে সেনাবাহিনীর পিছু হটা। সারারাত অন্ধকারে কারফিউর মধ্যে ভারি সাঁজোয়া গাড়িগুলো ফিরেছে। গম্ভীর দুম দুম শব্দ করে ফিরেছে বড়ো বড়ো ভ্যানগুলো। প্রথমদিকে হেডলাইট জ্বালানো ছিল—তীব্রবেগে অন্ধকার কেটে ছুটে গেছে আলো, রাস্তার দু'পাশে গাছগুলোকে দেখিয়েছে ধপধপে শাদা শ্বেতকুষ্ঠের মতো! আলো পড়তেই গাছগুলো ম্রিয়মাণ, ঠিক ঝলসে যাবার মতো। রাত বাড়তে কুয়াশা বাড়তে হেডলাইটগুলোর আলো আর এগোতে পারে না। ইঞ্জিনগুলো যেন গাড়িগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নয়—বরং হেডলাইটের আলোগুলোকেই এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অমন কষ্টকর পরিশ্রমের ঘর্ঘর আওয়াজ দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারা হেডলাইট নিভিয়ে দিয়েছিল; পিছু হঠছিলো অন্ধকারের মধ্যে। ট্যাংকগুলো থেকে ভারি ইস্পাতের চেনের বিকট শব্দ আসতে লাগল—পীচ উঠে খাঁজ পড়ে যেতে লাগল রাস্তায়, যেখানে কংক্রীট আছে সেখানে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকল আর রাস্তার দু'পাশে মাটি দুপ দুপ গুড় গুড় শব্দে কাঁপতে লাগল। নজমুল যে খাটে শুয়েছিল সেটা দুলতে শুরু করল কতকটা নাগরদোলার মতো। এর মধ্যে আরও তীব্র বেগে সোঁৎ সোঁৎ শব্দে জীপগুলো পেরিয়ে যেতে লাগল—ওভারটেক করে এগিয়ে যাবার জন্যে ভ্যানগুলো ঝন ঝন শব্দে পাকা রাস্তা ছেড়ে মাটিতে নেমে এল। তারপর ভারি হাতের গীয়ার বদলানোর সেই শব্দ হতে লাগল যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় ঐ শব্দে রয়েছে বিকট আর বর্বর শক্তি। কারা ফিরছে? ওরা কারা? কোথায় ফিরছে? কাদের কাছে ফিরছে? এই বাস্তব ও দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর বের করবার চেষ্টায় কাল রাতে নজমুল তার মাথা প্রায় ফাটিয়ে ফেলেছিল। ফিরছে পাকিস্তানী বাহিনী—পিছু হঠছে। আপাতত দক্ষিণের এক সীমান্ত শহরে চলে এল। আর জায়গা নেই। ওরা কি মানুষ মারতে শুরু করবে? কী হবে কাল সকালে? নজমুল শুয়ে শুয়ে গাড়ির শব্দ শুনতে লাগল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় টিনের চাল কট কট করে আড়মোড়া ভাঙছিল, বড় বড় পাতা থেকে শিশির

গড়িয়ে পড়ার টপটপ শব্দও সে কখনো কখনো শুনতে পাচ্ছিল। ঘুম না এসে এমন একটা বিভীষিকার ঘোর এল যে মনে হলো তার ভিতরেই ফিতের মতো চওড়া আর পলকা কিছু একটা বেয়ে দৈত্যাকার ট্যাংকগুলো উপরে ওঠার চেষ্টা করছে আর পিছলে পিছলে নিচে নেমে আসছে। এমনি সারারাত হলো আর ভোর হতেই প্লেনগুলো ফিরে এলো।

গত দুদিন প্লেন আসছিল, চক্কর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তিনবার আসছিল দিনে। আজ কিছুতেই চলে যাচ্ছে না, সাড়ে দশটা বেজে গেছে—দশ মিনিট ধরে ঘুরছে, সরে গেছে, এখন আবার সরে গেল, কিন্তু অল ক্লিয়ার সাইরেন শেষ হবার আগেই ফিরে এল। কি ব্যাপার? ওরা কি বোমা ফেলবে? লোকেরা বলাবলি করতে করতে বোকার মতো রাস্তায় বেরিয়ে এল। দোকানগুলো বন্ধ না করেই দোকানদার বাইরে চলে আসে। মিষ্টির দোকানের ভুঁড়িঅলা ময়রা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক বুদ্ধুর মতো চর্বিদার ভুঁড়ি চুলকোতে থাকল। বাজারের খদ্দেররাও আকাশের দিকে চেয়ে রইল। প্লেন আক্রমণের সময় কিছুতেই রাস্তায় থাকতে নেই, উপরের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে নেই, কৌতূহল বা উত্তেজনায় ছুটোছুটি করতে নেই, এসব নিয়ে জনসাধারণকে বার বার সাবধান করা হয়েছে; বাড়ির উঠোনে, সব্জি বাগানে, খেলার মাঠে আরো বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানী বাহিনীর লোকেরা জোর করে অসংখ্য ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়েছে কিছুদিন থেকে। কিন্তু লোকেরা সব ভুলে গেল, হুড়হুড় করে সব বাইরে চলে এল। ট্রেঞ্চগুলো দেখাতে থাকল খুঁড়ে রাখা কবরের মতো ফাঁকা, নিচে থেকে চুঁইয়ে জল উঠে আসছে, পরিষ্কার কালো সর-পড়া জল। ঝুঁকে থাকলে ছায়া পড়ে। তিন ইঞ্চি গভীর জল দেখায় অতল।

প্লেনগুলো যখন বার বার ফিরে আসছে, চলে গিয়েও যাচ্ছে না তখন নজমুল আন্দাজ করল অন্য দুদিনের থেকে আজ কিছু তফাৎ হবে। কিছু ঘটবেই। এই আন্দাজটা অস্পষ্টভাবে কাল রাতেই সে করেছে পশ্চাদপসরণ শুরু হবার পর থেকে। প্লেনগুলো লক্ষ্যবস্তু পেয়ে যাচ্ছে। ভোরে, ডিসেম্বরের সেই কুয়াশাপূর্ণ স্থির রহস্যময় ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই নজমুল প্লেনের আওয়াজ শুনেছিল। প্রথম দফার আবির্ভাব। একঝাঁক মৌমাছির মতো গুণ গুণ করতে করতে বহুদূর দিয়ে চলে গেল। যেন একটু বিরক্ত আর অধীর—আওয়াজ কখনো জোরে আসছিল, খুঁজে খুঁজে হয়রান হবার মতো, শেষে যখন প্রায় মাথার উপর দিয়ে বিকট শব্দে উড়ে গেল সেটা শোনালো অট্টহাসির মতো। শেষে ঠোঁট-টেপা কৌতুক

আর সামান্য উত্তেজনা মেশানো মনে হলো আওয়াজটা।

অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু সকাল সকাল উঠে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে পেচ্ছাপ করার জন্যে বাইরে আসতেই নজমুল হকচকিয়ে গিয়েছিল। পিছু হঠাটা ঘটেছে প্রায় চোখের আড়ালে। অন্ধকারে বিশালকায় দৈত্যদের চলাফেরার মতো ব্যাপার। উঃ কি ভয়ানক কাণ্ড—এইরকম বার বার মনে হচ্ছিল তার। কিন্তু পিছু হঠাটা যে গায়ের উপরে এসে পড়েছে এটা তার হিসেবে আসেনি। দরজা খুলতেই সে তিনজন পাকিস্তানী সৈন্যের একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল। ফের ঘরে ঢোকার জান্তব টানে সে পিছুতে চেয়েছিল কিন্তু কেমন করে তার চোখ আটকে গেল একটি সৈনিকের কপিশ রং-এর চোখের সঙ্গে। খুব ভালো করে তাকে লক্ষ্য করছিল সৈনিকটা—তার সঙ্গের অন্যগুলোও। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা যখন নজমুলকে দেখছিল, নজমুল সৈনিকদের খুদে কটা চোখ খুব ভালো করে দেখতে পেল, ফরশা উঁচু মোটা-হাড়ের কাঠামো তাদের, নিঃসন্দেহে সুপুরুষ, কিন্তু সেইসব মুখে নেই ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধির ছাপ; অত্যন্ত স্থূল নির্বুদ্ধিতা সেই ঝকমকে চেহারায় সেঁটে আছে আর রয়েছে এক ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা। এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলতে বাধ্য হতে হয় যে এই মুখে রয়েছে এমন এক পাশবিকতার দেয়াল যেখানে মহত্তম মানবিক প্রবৃত্তি, করুণতম আবেদন বা যন্ত্রণার চূড়ান্ত স্তরের আর্ত চিৎকার মাথা কুটে মরলেও কোন চিড় ধরাতে পারবে না। একারণে নয় যে তারা নিষ্ঠুর, এই কারণে যে তারা মানুষ নামক জীবের বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নজমুল এটাও লক্ষ্য না করে পারল না যে এরা খুবই ক্লান্ত, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, নিজের নিজের হেলমেট এরা হাতে ধরে আছে, রাইফেল ধরে রয়েছে খুবই শিথিলভাবে।

নজমুল একটি তপ্ত বুলেটের জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। তার ঈশ্বরের নাম মনে আসছিলো না অর্থাৎ খুবই খারাপ অবস্থা যখন, সামনের সৈনিকটি তাকে হাত ইশারা করে সরে যেতে বলল। ঘরের ভিতর চলে এসে সে জানলার কাছে দাঁড়ালো। তখুনি সে প্রথম দেখতে পেল ঝোপঝাড়ের আশে-পাশে অসংখ্য সৈনিক ঘোরাফেরা করছে। ছোট ছোট দলে ঘুরছে তারা। ঝোপের নিচে কালো ছায়ার মধ্যে খুব ক্লান্তভাবে আধশোয়া হয়ে রয়েছে কিছু সৈনিক, কেউ কেউ বন্দুক মাটিতে নামিয়ে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। কিছু ইতস্তত ঘুরছে মুরগি যেমন আস্তাকুঁড়ের মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়ায় ঠিক তেমনি করে। কেউ কাউকে কোনো কথা বলছে না। এত লোক একসঙ্গে

রয়েছে—কিন্তু সবাই সঙ্গীহীন। কিসে তাদের এমন একা করে দিয়েছে ভেবে পেল না নজমুল।

ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে পেরে নজমুল হাতমুখ ধুয়ে বাইরে চলে এল। এখন ওরা কাউকে মারতে পারবে না। বাইরে এসে আবার সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকারে বড়ো রাস্তায় যা হচ্ছিল এখন দিনের আলোয় ঠিক তাই হচ্ছে। সৈনিকরা পালাচ্ছে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে জীপগুলো চলে যাচ্ছে এক-একটা চলন্ত জঙ্গলের মতো। প্রত্যেকটি স্বয়ংক্রিয় যানের উপরে চাপানো রয়েছে খেজুর আর নারকেল পাতা। বড়ো বড়ো অশ্বত্থ বা বটগাছের কাঁচা পাতাশুদ্ধ ডাল এনে চাপানো হয়েছে। যে সমস্ত গাড়ির এসব জোটেনি সেগুলো চাপিয়েছে ফ্যাকাশে সবুজ শ্যাওলা রঙের দড়ির জাল। সৈন্যরা বিষণ্ণ আর সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছে। ভারি ভারি চেহারার অফিসাররা বিব্রত ও হতভম্ব। কিছু কিছু গাড়ি আবার ফিরেও যাচ্ছে। নজমুল দেখল দ্রৌপদীর শাড়ির মতো যুদ্ধের এই সমস্ত গাড়ি আসছেই—শেষ হবার কোন লক্ষণ নেই। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট মাঠে ঝোপঝাড়ে জঙ্গলে, লন-অলা পাঁজর-বের করা বিরাট ফাঁকা পোড়ো বাড়িগুলোর মধ্যে সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়ছে। মিশে যাচ্ছে তারা লোকজনের সঙ্গে।

রাস্তায় রাস্তায় জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। সেনাদলের অবস্থাটা বুঝে ফেলেছে মানুষ। তাদের সম্পর্কে ভীতিটা কেটে গেছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু প্লেনগুলোর গত দুদিনের রুটিনমাফিক আসা আর ফিরে যাওয়া আর আজ কিছুতেই ফিরতে না চাওয়া এটা লোকজন বুঝে উঠতে পারছে না। তারা কখনো যুদ্ধ দেখেনি। কিন্তু সৈনিকেরা ঘন ঘন আকাশের দিকে চাইছে।

প্লেনগুলো আর একবার চলে গেল। খুব মজা পেতে লাগল স্থানীয় বাসিন্দারা।

এখানে ওরা বোমা ফেলবে কি করতি? মিষ্টির দোকানদার বলল, ভয় দেখাচ্ছে।

তবে আজ খুব ঘন ঘন আসতিছে। আবার ফিরে আসবে মনে হয়।

নজমুল এদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটার কথা শেষ হবার আগেই সে কড় কড় শব্দ পেল। দুটি প্লেন আসছে অনেক নিচে দিয়ে। শব্দে কান ফেটে যাবার দাখিল। লোকজন ঠিক আগের মতোই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু সৈনিকেরা গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে নেমে রাস্তার দু'পাশের খানায় উপুড় ও নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়তে লাগল আর হাত নেড়ে লোকজনকে শুয়ে পড়তে বলল।

কেউ তাদের কথা শুনল না।

প্লেনদুটি অবিশ্বাস্য বেগে খুব নিচে নেমে চক্কর খাচ্ছে—তেলের ডিপো আর পাওয়ার হাউসের কাছেই যাচ্ছে তারা ঘুরে ফিরে। রাজাকাররা থ্রি নট থ্রি রাইফেল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাচ্ছে প্লেন লক্ষ্য করে। একজন সৈনিক তার পাশের রাজাকারটিকে হাত নেড়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে কি যেন বলল—নজমুল কেবলমাত্র বুরবাক শব্দটি শুনতে পেল। রাজাকারটি আব রাইফেল তুলল না।

নজমুল দৌড়ে এসে একটা বড়ো পাকা বাড়ির বারান্দা থেকে লক্ষ্য করতে লাগল। চারটের বদলে মাত্র দুটি প্লেন ঘুরছে—খুবই ছোটো দুটি হাণ্টার প্লেন। সামনে মাঠ থাকায় নজমুল সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। সে শীতের আকাশের ম্রিয়মাণ নীল রঙ দেখতে পায়। সেই ঠাণ্ডা আকাশের নিচে উন্মত্ত কাঁকড়া বিছের মতো হুল-অলা লেজ খাড়া করে প্লেন দুটি ছোটাছুটি করছিল। বাতাস বন্ধ ছিল এই সময়টায়—শব্দটা আসছিল সোজাসুজি, কংক্রিটের রাস্তার উপর লোহার চাকা গড়িয়ে যাবার মতো। নজমুল ভাবছিল একটা ট্রেঞ্চে চলে যাওয়া উচিত! কিন্তু আশেপাশে কোন ট্রেঞ্চ ছিল না। বাড়িটাতেও কোন লোক নাই। বিচিত্র অনুভূতি হলো তার। জীবন আর মৃত্যু এই দুই চরম বাস্তবে সে যেন কখনো আসেনি—তার সমস্ত জীবনেও নয়। এতদিন জীবন-ধারণ করে একটি মুহূর্তের জন্যেও সে যেন জীবন কি ব্যাপার বুঝতে পারেনি—মৃত্যুর সম্বন্ধে তো প্রশ্নই ওঠে না। মৃত্যু তো দর্শনের আর ধর্মগ্রন্থের সেই চির অন্ধকার অবিশ্বাস্য অতল আর রহস্যময় বিষয়। কিন্তু এখন সে একসঙ্গে দুটিরই মুখোমুখি হলো। সে সোজা তাকিয়ে রইল তাদের দিকে—যেন তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি দেখতে পাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড কম্পমান শ্বাসনালী ফুসফুস দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে জীবন আর মৃত্যুর সবল সরল পেশী, মেরুদণ্ড আর রক্ত আর রক্তকণিকায় খেলে বেড়াচ্ছে যেসব অতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য কণা যা বাঁচায় আর মেরে ফেলে। সে তাকিয়ে দেখল শীতে আক্রান্ত বিমর্ষ পৃথিবীর দিকে, গাছপালার সমস্ত পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে। কি অসম্ভব আকুলতা এল তার মধ্যে।

প্লেনগুলো হঠাৎ উপরে উঠে গেল। সেইভাবেই আগে দুবার চক্কর দিল। তারপর নামছে, নজমুল দেখল ঈগলের মতো ডানা মুড়ে প্লেন দুটি নেমে আসছে। হাণ্টারের ডানা অবশ্য এভাবেই পিছনের দিকে ফেরানো। একটানা নেমে এল প্লেন দুটি—অনেকটা নিচে নেমে এসে গতি থামিয়ে স্থির হয়ে আবার

উর্ধমুখ হলো।

ঠিক সেই সময়ে অকল্পনীয় গর্জনের একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ এল রুম-ম-ম। ভাগ্যক্রমে তখন নজমুলের জিভ মুখের ভিতরে ছিল, দাঁতের নিচে থাকলে নির্ঘাত দুভাগ হয়ে যেত।

মরে যাওয়া সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকায় নজমুল মনে করল সে বেঁচে আছে। সে দ্রুত সরে যাবার জন্যেই ভারি সেগুন কাঠের পুরনো দরজাটা তার ঘাড়ে পড়ল না। দরজাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তার পায়ের কাছে পড়ল। প্রত্যেকটি দরজা জানলা দেয়ালের বাঁধন খুলে বাইরে ছিটিয়ে গেল। বারান্দার এক পাশে নজমুল হাতখানেক লম্বা ক্ষুরের মতো ধারালো সের চারেক ওজনের একটি স্প্লিনটার দেখতে পেল। আবার সে ভাবল, বেঁচে আছি।

বিস্ফোরণের পরের মুহূর্তেই এল ভয়াবহ স্তব্ধতার মুহূর্ত। লোকজনের সোরগোল ওঠার আগে। ঠিক এই মুহূর্তটিতে নজমুল আর একবার মাঠের দিকে তাকালো। কিছু গরু ইতস্তত দৌড়ুচ্ছে। বিরাট আকারের একটা টকটকে লাল রঙের মোরগ তৃপ্ত আহারের পর ঠিক ছুরি শানানোর মতো তার শক্ত হলুদ ঠোঁট মাটিতে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। মোরগটা বুক ফুলিয়ে তার চমৎকার গ্রীবা দুলিয়ে বেপরোয়াভাবে চলে গেল।

তারপরেই চিৎকারের রোল উঠল। চারদিকে লোকজন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটছে। কিছু না ভেবেই নজমুল বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে অনির্দিষ্টভাবে দৌড়োতে শুরু করল। প্লেনদুটি অনেক আগেই চলে গেছে। থমকে একবার দাঁড়িয়ে পড়ে নজমুল পুবদিকে চেয়ে দেখলো কুণ্ডলি পাকিয়ে বিরাট একটা এলাকা জুড়ে কুচকুচে কালো নিরেট ধোঁয়ার দেয়াল উঠছে। সে সেদিকেই ছুটল।

পাটের একটি বিরাট গুদোমের উপর বোমা পড়েছে। কিছু সৈন্য সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। নজমুল ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সৈন্যদের লাশ দেখতে পেল কিন্তু কোনো সৈন্য দেখতে পেল না। গুদোমে পাট ছিল না, নজমুল প্রথমে ভেবেছিল পাটে আগুন লাগারই ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু আসলে বোমারই ভিতরের বারুদের ধোঁয়া আসছিল। বারুদের বিশ্রী পোড়া গন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছিল না। কোনো সাইরেনের শব্দ ছিল না। বিপদের কিংবা বিপদ কেটে যাবার।

গুদোমের সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে নজমুল সৈনিকদের লাশগুলো দেখল। তিনটে কি চারটে হবে। ওরা যখন জ্যান্ত ছিল কেমন ছিল তাদের চেহারা ঠিক

মালুম করা যাচ্ছে না। রক্তে-মাংসে মিশে একাকার এইসব অপরিচিত রক্তপিণ্ড বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারল না তার মধ্যে। সে মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ রকম পুরু কালো ধোঁয়া কিভাবে পাৎলা ছাই ছাই হয়ে শীতের ধুলোয় আবছা আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে যায় লক্ষ করল আর দেখল গুদোমের বিরাট টিনের চাল দুমড়ে মুচড়ে দেয়ালশুদ্ধ মাটির ভিতর ঢুকে গেছে। বেশ বড়োসড়ো একটা ডোবা তৈরি হয়ে গেছে গুদোমটার ভিতরে—যদিও দু'একটি দেয়াল এখনো খাড়া রয়েছে। কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে আশেপাশে।

হঠাৎ দেয়াল ফাটার চর চর শব্দে নজরুল চমকে উঠে চেয়ে দেখল একটা বিরাট দেয়াল ধীরে ধীরে ধ্বসে পড়ছে। চিড চিড করে সরু ফাট দেখা দিচ্ছে প্রথমে, চুনকাম করা দেয়ালে পড়ছে মিহি চুলের মতো কালো কালো রেখা, তারপর বড়ো হচ্ছে ফাটটা, আস্তে আস্তে হাঁ করছে, প্লাস্টার খসে পড়ছে ঝুরঝুর করে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগল নজরুল। খুব ধীর গতিতে কিন্তু প্রচণ্ড শব্দ করে ধ্বসে পডল দেয়ালটা। তখুনি একটা অমানুষিক চিৎকার এল। লোকজন দ্রুত সরে যেতে যে ফাঁক তৈরি হলো সেদিক দিয়ে নজরুল দেখল দুই দেয়ালের কোণে একটা লোক আটকা পড়েছে। কি করে ও ওখানে গেল ভেবে পেল না সে।

একটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে—বিশাল তার ছাতি, গায়ে জামা নেই, কাঁধে একটা রঙ জ্বলে-যাওয়া গামছা। তার শরীরের নিচের দিকটা আটকা পড়েছে। একটিমাত্র চিৎকার দিয়ে সে জানায় যে মৃত্যুর দুই চোয়ালের মাঝখানে সে আটকে গেছে। তারপর আর কোনো শব্দ না করে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড়ো করে সে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু আর একটি দেয়ালের ধ্বস আস্তে আস্তে অনিবার্যভাবে নামছে। তিল তিল ইঞ্চি ইঞ্চি করে। তার দিকে দু' পা এগিয়ে গিয়ে নজরুল বিস্ফারিত চোখে এই অসহনীয় আর কঠিন সংগ্রাম দেখতে লাগল। ছেলেটা তখনো কোনো শব্দ করছে না—তার দুচোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠল নজরুল তার কোনো অর্থ করতে পারল না। হয়ত মানবজাতির সমগ্র প্রজ্ঞা দিয়েও তার কোনো অর্থ করা যায় না। তাকে ভীত, অবাক, মরিয়া, হতাশ সব রকম বিশেষণই দেওয়া যায়, কিন্তু সে দৃষ্টির অর্থ তবু অব্যাখ্যাত থেকে যাবে।

প্রাণপণ চেষ্টায় ছেলেটা সামান্য বেরিয়ে এল। এতে তার বুক থেকে কোমর পর্যন্ত কোনাকুনি সাদা দাগ পড়ল, ভাঙা ধারালো ইট আর সিমেন্টের ঘষা

লেগে প্রথমে চর্বি দেখা দিল এবং পরে মাংস ছিঁড়ে ফেঁসে গেল। কিন্তু ছেলেটা তা খেয়াল করল না। সে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল।

ততক্ষণে বেশ কিছু লোক পড়ন্ত দেয়ালটা আটকাতে হাত লাগিয়েছে। কিন্তু একই গতিতে সেটা নেমে আসছে। লোকগুলোর জন্যে তা মারাত্মক হবার আগেই তারা দেয়াল ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

ছেলেটার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। বাইরের লোকজন কি আরামে নিশ্বাস নেয়, ওর জন্যে কোনো বাতাস বরাদ্দ নেই—নজমুল নিজেকে ছেলেটার অবস্থায় কল্পনা করার চেষ্টা করল। ফাঁদ, উদ্ধারহীন আটক—এ ছাড়া আর কিছুই তার মনে পড়ল না। দেয়ালের চাপ আর একটু বেশি হতে আচমকা ছেলেটা ফুসফুস ভর্তি বাতাস নিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

সে কার কাছে এই মর্মান্তিক আবেদন করল বোঝা গেল না—শুধু সে আর একবার ভয়ঙ্কর জোরে চ্যাঁচালো, বাঁচাও—আর নজমুল দেখল বাতাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো তার অতবড়ো ছাতি দেয়ালের চাপের নিচে চুপসে যাচ্ছে, ভেঙেচুরে দুমড়ে যাচ্ছে। শেষে বুটপরা পায়ের নিচে যেমন কুড়মুড় শব্দে মরা শামুকের খোল গুঁড়িয়ে যায় তেমনি করেই গুঁড়িয়ে গিয়ে সে দেয়ালের নিচে চাপা পড়ল।

বিকেলের আগে আর প্লেন আসছে না।

কেউ আসেনি

ড্রাইভারকে গফুর সামান্য চিনতো। সারা পথে তার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। ঢোক গিলতে গিয়ে গফুর লক্ষ করে তার দুই ঠোঁট শক্ত আঠা দিয়ে যেন আটকানো। সে কোনো কথা বলতে পারেনি। মনে হয়, সে কোনো কথা বলতেও চায়নি। শহরে ঢুকে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে যখন ভ্যানটা গিয়ে হাসপাতালে পেঁছিলো তখন রাত কতটা হয়েছে গফুরের কোনো ধারণা নেই। ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঝাঁকি দিয়ে ভ্যানটা থেমে যেতেই চটকা ভেঙে সে ফ্যালফ্যাল করে হাসপাতালটার দিকে চেয়ে রইলো। ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নেমে গেল। তখন গফুর খুবই অন্যমনস্কভাবে আড়মোড়া ভেঙে রাইফেল হাতে লাফিয়ে নামল।

চার-পাঁচটা লোক একটা স্ট্রেচার নিয়ে গজগজ করতে করতে এগিয়ে আসে। গফুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখে। পিছন দিক দিয়ে ভ্যানে উঠে তাদের একজন মোটা তেরপলটা টেনে একপাশে সরাবার চেষ্টা করল—তার সাধ্যে কুলোল না, তেরপলটা বারকতক ঘ্যাঁষোর ঘ্যাঁষোর করে আপত্তি জানায়, তারপর একটা পেরেক না কিসে শক্ত হয়ে আটকে যায়। লোকটা হঃ ইঃ করে টানে, একটু হাঁপায়, আবার টানাটানি শুরু করে। তারপর বাজখাঁই গলায় ফেটে পড়ে, এই শালারা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতিছো, না?

লোকটা এমন চিৎকার করে যে গফুর চমকে উঠে একটা লাফ দিয়ে ফেলে। তার বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে—অন্ধকারের মধ্যে সে আপন মনেই হেসে ফেলে। গালাগালি শুনে আরো দুজন লোক ভ্যানে উঠে আসে—তেরপলটার জারিজুরি আর খাটে না। গফুর স্পষ্ট বুঝতে পারে ওরা তেরপলটা একপাশে সরিয়ে রাখল।

হাসপাতালের এমারজেন্সি ওয়ার্ডের ওদিকে লোকজন ছিল কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। ঘরের ভিতর থেকে একফালি লাল ম্যাটমেটে আলো এসে গলি-বারান্দাটায় পড়েছিল। গফুর সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। টায়ারের

নোংরা একপাটি স্যাণ্ডেল ছিটকে এসে তার পায়ের কাছে পড়ল। ভ্যানের মধ্যে ওদের একজন হুড়মুড় করে আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল, উরে বাবা রে— গেছি রে। আর একটি লোক মোটা ব্যাড়বেড়ে গলায় বলল, আরি শালা, কি পেছলা। খুব আবছা আলোয় গফুর দেখে পাৎলা চকচকে একটা স্রোত ভ্যানের তলা দিয়ে এগিয়ে আসছে। গফুর কোনো কোনো লোকের মাথা বা পেট থেকে গল গল করে টাটকা রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখেছে—কিন্তু এখন এই পানসে ক্ষীণ স্রোত দেখে সে বিনা কারণেই শিউরে ওঠে। ভ্যানের ভিতর থেকে একটা আঁশটে গন্ধও তার নাকে এসে লাগে। গাড়ির চাকার গায়ে স্ট্রেচারটা ঠেকিয়ে রেখে বাকি দুজন লোক এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এখন তারাও ভ্যানে উঠে যায়—একজন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে, এই মড়াগুলোকে বয়ে আনিছে ক্যানো।

ভিতরে অনেকগুলো দেহ গাদা করা ছিল। লোকগুলো একসঙ্গে এইবার কাজে লাগল। ঝটপট তারা এক-একটা দেহ নামিয়ে স্ট্রেচারে করে বয়ে এমারজেন্সি ঘরের সামনে গলি-বারান্দায় আলোর ফালিটার মধ্যে রাখতে থাকে। একটার পাশে আর একটা। একটার উপরে আর একটা। পাশে একটা, উপরে একটা, কোনাকুনি একটা, আড়াআড়ি একটা, উপরে একটা, পাশে একটা। আড়াআড়ি কোনাকুনি পাশাপাশি গলাগলি। রাখে, রাখতে থাকে, মন্তব্য করে, মড়াগুলোকে কি কামে বয়ে আনিছে?

আসলে সবাই পড়ে থাকে। কাউকে উপরে নিয়ে যেতে হয় না। তাদের যত উঁচু করে গাদাগাদি করে রাখা হয়, ম্যাড়মেড়ে আলোটা তত বিচ্ছিরি হেসে উপরে উঠে যায়। শেষে একজন গুঙিয়ে কাৎড়ে উঠলে লোকগুলো থমকে দাঁড়ায়, হাতের কাজ বন্ধ রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। ভাবনা শেষ করে বলে, আছে। এইরকম মোট তিনজন সম্বন্ধে তারা বলে, আছে।

গফুর এগিয়ে সেই তিনজনের কাছে গিয়ে তাদের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। গত পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম সে কথা বলে, আসফ আলি—আসফ আলি, আমারে চিনতি পারো? আমি সয়বাবাতের গফুর বলতিছি—আমারে চিনতি পারো? লোকটা কোনো জবাব না দিয়ে কাৎড়াতে থাকে।

যখন তাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হলো—ওরাই নিয়ে এল স্ট্রেচারে করে—তখন দেখা গেল, আসফ আলি ঠিক লোক নয়, কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ছেলে।

হাসপাতালের ডাক্তার একটু পরেই এসে দেখল তাকে। লোকটা আশেপাশে তাকিয়ে দেখল, নার্স-টার্স কেউ ছিল না। স্ট্রেচার-অলারা একটা মিনিট দেরি করেনি, তারা প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে। গফুর তার রাইফেল হাতে নিয়ে আসফ আলির শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল তার—কিন্তু ঘুম পেয়েছিল তার চেয়েও বেশি। চোখ তার আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে আসছিল—খুলতে গেলেই একটা কডকডে যন্ত্রণা হচ্ছিল চোখের মধ্যে। হাসপাতালের মসৃণ মেঝের উপর শুয়ে ঘুমোতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল তার। সে ভেবেছিল গাদা-করা মড়াগুলোর ভিতর একবার খুঁজে দেখবে আসফকে। কেন খুঁজবে তা সে জানতো না। তার ধারণা ছিল ছেলেটা নিশ্চয়ই মরেছে। গফুর ঠিক করেছিল আসফের মরা মুখটা একবার দেখেই সে তার গাঁয়ে ফিরে যাবে। এখন, আসফ বেঁচে রয়েছে দেখে ভীষণ বিব্রতবোধ করল সে। তার ভারি ঘুম পেয়েছিল।

ডাক্তার কাউকে দেখতে না পেয়ে গফুরকে বলল, একে চেনেন নাকি! এমনিতে তাকে আপনি বলত না ডাক্তার, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে গাঁয়ের চাষা। কিন্তু গফুরের হাতে রাইফেল ছিল, পরনে খাকি ছিল, আর চোখে ছিল একটা ঝকঝকে ধার। কতদিন ধরে কি বিচিত্র জীবন সে কাটিয়েছে সে সম্বন্ধে ডাক্তারের কোনো ধারণা ছিল না। মাত্র দু-চারদিন ওরা ফিরতে শুরু করেছে যুদ্ধ শেষ করে—ঠিক কিরকম ব্যবহার ওদের সঙ্গে করতে হবে ডাক্তার বুঝতে পারছিল না। তা নাহলে রাত, এইসময়ে সে হাসপাতালেই থাকে না। গফুর চোখের তারা নাচিয়ে, ভুরু ঝাঁকিয়ে জানাল, চেনে।

প্যান্টটা খুলুন দেখি।

গফুর রাইফেলটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে আসফ আলির খাকি প্যান্টটা খুলতে শুরু করল। হাঁটুর একটু উপর পর্যন্ত গিয়ে প্যান্টটা আটকে যায়—টান দিতেই ককিয়ে উঠল আসফ আলি। তার প্যান্টের উপরের দিকে বড়ো একটা ছ্যাদা—সেই জায়গাটা উরুর সঙ্গে আটকে রয়েছে।

ডাক্তার বলল, খুলে ফেলুন।

চড়চড় শব্দ করে একটানে প্যান্টটা খুলে ফেলল গফুর—রক্ত হিমকরা একটা চিৎকার করল আসফ আলি। ডাক্তার নির্বিকার মুখে অন্যদিকে চেয়ে রইল। আসফ আলিকে ঠিকমতো ন্যাংটো করা হলে ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে তার হাঁটুর ঠিক উপরে জানুর ক্ষতটা পরখ করে দেখল। জায়গাটায় একটা গোল ফুটো ছিল—

ফুটোর ভিতরটা কুচকুচে কালো। চারপাশে রক্ত শুকিয়ে কামড়ে বসে গেছে। ডাক্তার পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে খুব ভাল করে দেখল জায়গাটা।

দেখা-টেখা হয়ে গেলে ডাক্তার চলে যাচ্ছে। সে দরজা পর্যন্ত পেঁছুলে গফুর নিরুত্তেজ ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল, কি দ্যাখলেন ডাক্তার সাব?

কাল পরশু না দেখে কিছু বলা যায় না—ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে টুকটুক করে নেমে গেল। মনে হচ্ছিল ঘুমোবার জন্যে মরে যাচ্ছে লোকটা। কিছু না ভেবে গফুরও নিচে নেমে এসে নদীর পাড়ে দাঁড়ায়। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছিল তার, পেটের মধ্যে একটা ব্যথা চিন চিন করছিল। এখন কিন্তু আর তেমন খিদে নেই। গফুর ভাবল সে হাঁটবে এখন, এই নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে যাবে, বস্তিটা পার হয়ে যাবে, তারপর অন্ধকার চোখে সয়ে এলে নদীকে সবসময়েই বাঁহাতে রেখে একটার পর একটা গাঁ পেঁছুবে—শেষ বাদুরটা যখন ডানা ঝটপট করতে করতে তেঁতুলগাছে মাটির দিকে মুখ করে ঝুলতে থাকে।

বাকি দুজন জখমিও ঠিক জুটে গেছে দেখল গফুর। আসফ আলির খাটের একটু দূরে দূরেই তাদের খাট। তাদের কারো জ্ঞান ফিরে আসেনি। সে লোক-দুটো ভীষণ গোঙাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সকাল নটার দিকে আবার ডাক্তার এসে তাদের সবাইকে দেখল। সকলের ঝকঝকে রোদে ঘরটা ভরে ছিল। ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে গফুর আসফ আলিকে দেখল। খুব ভালো তাকে চিনতো না সে গাঁয়ের ছেলে। সে যদি কালকেই মরে যেত, তাহলে গফুর এতক্ষণে নিজের গাঁয়ে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু সকালবেলায় আসফ আলি চোখ মেলে তাকিয়েছে। সে কিছুক্ষণ গফুরের দিকে চেয়ে দেখেছে—বেশ কিছুক্ষণ, তারপর কোনো কথা না বলে গফুরের একটা হাত চেপে ধরেছে দুহাত দিয়ে।

ডাক্তার খুব খুঁটিয়ে আসফ আলির জানুর ক্ষতটাকে দেখছিল। ওটার চারপাশে ঘন নীলচে কালো কালো দাগ পড়েছে। খুব হালকা পচা-মাংসের গন্ধ একটা নাকে এসে লাগে। ডাক্তার ভীষণ গম্ভীরমুখে চলে যাচ্ছিল—সিঁড়ির গোড়ায় তাকে ধরে ফেলল গফুর।

ডাক্তার সাব, ছেলেটা বাঁচবে না মরবে কন তো? গত নমাসে গফুর সোজা-সুজি কথা বলতে শিখেছিল।

ডাক্তার কোনো ভূমিকা করল না, হাঁটুর ওপর থেকে পাটা কেটে ফেলেতে হবে—মাংসে পচ ধরে গেছে।

কবে কাটবেন।

কাল—খুব দেরী হলে পরশু।

না কাটলে কি হবে?

সমস্ত শরীর বিষাক্ত হয়ে ও মরে যাবে।

বাকি লোকদুটোর কি হবে? বাঁচপে?

এখনো বলতে পারি না।

ডাক্তার আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। গফুর হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সেও চলে যাবে কিনা। মনে হচ্ছিল তার চলে যাওয়াই উচিত। ডিসেম্বরের রোদে তার সমস্ত দেশ ভেসে যাচ্ছে। যুদ্ধের ঝামেলায় ধান কাটা ঠিকমত শুরু হয়নি। এখন যুদ্ধ শেষ। গফুর বুঝতে পারছে না ধান কাটা বলতে সে নিজেকে কি বোঝায়। তার নিজের তো কোনো জমি নেই। যুদ্ধের আগে সে কামলা খাটত। এখন সে বাড়ি গিয়ে কি করবে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ। দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল। এখন ধান কাটা শুরুর মানে কি? সে কি আবার গিয়ে কামলা খাটবে রাইফেল খাকি-টাকি ফেরৎ দিয়ে? নাকি অন্য ব্যবস্থা কিছু হবে·

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শহরে লোকজন ফিরে আসার শব্দ পাচ্ছিল। তাদের উন্মত্ত চিৎকারে কানে তালা লাগার জোগাড়। যুদ্ধের গাড়িগুলো রাস্তা কাঁপিয়ে ছোটাছুটি করছে—দলে দলে লোক এখন রাস্তায়, চেঁচাচ্ছে, হল্লা করছে শ্লোগান দিচ্ছে। লুঙ্গিপরা, রাইফেল-হাতে কোনো মুক্তি-যোদ্ধাকে মাথায় তুলে একটা দল নাচতে শুরু করেছে। গফুরের শুধু মনে হলো, আসফ আলি এখনো মরেনি, তাকে ফেলে যাওয়া যায় কিনা? শহরের এইসব হৈচৈ গাঁয়ে কি পৌঁচেছে—নাকি সেখানে শুধু পাকা ফসলের উপর শীতের রোদ পড়ে আছে, নালার পানি শুকিয়ে গেছে, ঘাস হলুদ হয়েছে, নদীগুলো সরু সরু রোগা রোগা হয়ে গেছে? গফুর বিয়ে করেছিল—কিন্তু বউ নেই তার। যুদ্ধের আগের বছর বউ চলে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। তাকে খেতে দিতে পারেনি সে। বৌটা বেঁচে আছে কিনা গফুর জানে না। সে বউয়ের জন্যে গফুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। আর তার বুড়ো মায়ের জন্যে, খেতে দিতে না পারলেও যে পালায়নি। পা টানতে টানতে প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে গফুর আসফ আলির কাছে ফিরে এল। তার মাথার কাছে বসে বললো, আমায়ে চিনতি পারিছ।

পারিছি।

পায়ে কি খুব বেদনা করতিছে ?

না—আসফ আঙুল দিয়ে একটু টিপে দেখল, তেমন বেদনা করতিছে না।

হাড ভাঙে বুলেটটা বাবোয়ে গেছে—গফুর বলে ফেলল।

আমি কি বাঁচপো ? আসফের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে, হনুর হাড় দুটো চামড়া ফুঁডে জেগে ওঠে। তিন-চারবার ঢোক গিলে আস্তে আস্তে সে আবার জিগগেস করল, আমি কি বাঁচবানে ?

গফুর কথা বলতে পারল না।

তুমি বাড়ি যাবানা ?

যাবো।

কবে যাবা।

দেহি—

আমারে কেউ দেখতি আইছিলো ?

না। ডাক্তার সাব দেখে গিছে।

তুমি বাড়ি যাও। আমার মাবে কয়ো।

কি কবো।

আমি হাসপাতালে মরিছি।

আমি এখন বাড়ি যাতিছি না।

কয়ো যে আমি হাসপাতালে মরিছি।

তুমি বাঁচবা। ডাক্তার সাব বলিছে। তুমি আর আমি এক সঙ্গে বাড়ি যাবো।

সে কথায় কান না দিয়ে ঘষা গলায় আসফ আলি বলল, হাসপাতালে মরিছি এই কথা আমার মাবে কবা। ঠিক তো ? আর বলবা, তার কবর হইছে কিনা জান না। হাসপাতালে তারে কেউ দেখতি আসেনি। মরে গেলে টান মারে ফালায়ে দিছে কিনা সেকথা তুমি কতি পারো না—এইকথা মারে বলবা। আসফ আলি তার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে কড়ি-কাঠের দিকে চেয়ে রইল। গফুর কপালে হাত দিয়ে দেখল অনেকটা জ্বর রয়েছে তার। একটু ইতস্তত করে সে আবার আস্তে আস্তে কথা শুরু করল, দশ বারো দিনের মধ্যে তুমি বাড়ি যাতি পারবা।

তুমি এখানে থাকবা আমার কাছে ? আসফ আলি শান্ত গলায় জিগগেস করল।

হ্যাঁ, থাকবো ?

কোয়ানে থাকবা ?

হাসপাতালেই থাকবো। বারান্দায় ঘুমাবো।

রোদ এসে আসফ আলির মুখের উপর পড়েছে। গফুর দেখল কাঁটা দিচ্ছে তার শরীরে।

শীত অরে ?

না।

একটা পাখি আস্তে আস্তে নদী পেরুচ্ছে রোদের মধ্যে। গফুর চেয়ে রইল সেদিকে। নদীর ওপারটা কাছে এসে গেছে। খুব সরু দেখাচ্ছে নদী, স্রোত টের পাওয়া যায় না। পানি নোংরা, আরো নোংরা পচা ডালপালা, কচুরি-পানা খুব ধীবে ধীবে নিচেব দিকে নেমে যাচ্ছে, এপারের নৌকোগুলোর তলায় কাদা থকথক করছে। পাখিটা সমান তালে পাখা নাড়তে নাড়তে ওপারে পৌঁচে গাছপালার মাথার উপর দিয়ে অদৃশ্য হলো। আসফ আলির হয়তো শীত করছিল, কিন্তু কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে যাচ্ছিল তার।

ফসল হইছে এবার খুব—গফুর ফের কথা শুরু করল। আসফের চোখদুটা কেমন যেন দেখাচ্ছে, সে কোনো কথা বলল না।

সয়রাবাতের খালটা মনে পড়তিছে ? গফুর জিগগেস করে।

পড়তিছে।

দশ বারো দিন পর তুমি সুস্থ হয়ে উঠবা।

এই দশদিন তুমি খাবা কি ? আসফ আলি হঠাৎ জিগগেস করল।

আমার পয়সা আচে—হোটেলে খাবানে। দশ বারো দিন পর তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে দুজনে বাড়ি যাবো। সয়রাবাতের খালে শীতের দিনে কেবল চিংড়ি-মাছ পড়ে মনে আছে ?

দেশ তো স্বাধীন হইছে, না ? আসফ আলি আবার জিগগেস করে।

হ্যাঁ।

স্বাধীন হলি কি হয় ?

সয়রাবাতের খালে এক একটা চিংড়ির ওজন কি, বাপরে। তিনটে চিংড়িতে একসের।

দ্যাশ স্বাধীন হলি কি হয় ? আসফ আলি বোকার মতো জিগেগস করে।

এতদিন ধরে শুনতেছো না কি হয় ? না জানলি যুদ্ধে গিইলে ক্যানো ?

কই, কেউ তো এসে আমারে কলো না যে দ্যাশ স্বাধীন হইছে। কেউ তো কলো না এখন কি হবে? আসফ আলি সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

গফুর তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, এত ব্যস্ত হলি কাজ হয়? আস্তে আস্তে সব হবে। কথা বলার সময় আসফ আলির চোখের ধার বাড়ছিল। গফুর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে নেতিয়ে পড়ে। বিড়বিড় করে বলে, যদি আমি কালই মরে যাতাম।

কিছু বুঝতে না পেরে গফুর হড়বড় করে বলে ফেলল, ডাক্তার-সাব কাল বলিছে তুমি ভালো হয়ে যাবা তবে—গফুর একবার থামল, শেষে খুব অসহায়-ভাবে বলে চলল, তবে, তোমার ঐ পা-টা কেটে ফালায়ে দিতি হবে। আসফ আলি অজান্তে হাত বাড়িয়ে তার ক্ষতটাকে আঁকড়ে ধরল—কিন্তু তার চোখ চেয়ে রইল গফুরের দিকে। এত ঠাণ্ডা তার চাউনি যে গফুরের শীত করল।

আসফ আলি আস্তে আস্তে বলল, আমার মা আমার বিয়ে ঠিক করে রাখিছে। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে বিয়ে করবো।

গফুর ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে আসফ আলির গায়ে হাত দিয়ে দেখল—চড়চড় করে জ্বর বাড়ছে তার।

আমার বৌ খুব সোন্দর। অস্বাভাবিক তীব্র চোখে আসফ আলি গফুরের দিকে চেয়ে রইল। রক্তজবার মতো লাল তার চোখ।

দ্যাশ স্বাধীন হইছে, আমি বিয়ে করবো, আমি যুদ্ধ করিছি।

রোদ বাড়ছে, শহরের লোকজনের শব্দ শোনা যায়। চারিদিকে চলন্ত ইঞ্জিনের আওয়াজ। এদিক সেদিক রাইফেলের শব্দ। বাকি দুজন জখমির একজন শুয়োরের মতো কর্কশ চিৎকার করছে। আর একজন চুপ করে আছে। তার গায়ে লাল কম্বল। আসফ আলি ফের বলল, আমি কোনোদিন মেয়েমানুষের সাথে শুইনি—আমার বউয়ের নাম জেন্নত, খুব সোন্দর আমার বউ—তুমি বাড়ি চলে যাও—আমার মারে কবা যে আমি হাসপাতালে লড়াই করতেছিলাম—করতি করতি মরিছি। আসফ আলি চোখ বন্ধ করে চুপ মেরে গেল।

সবুজ রং-করা জানলার কাচের ভিতর দিয়ে বিকেলের আলো আসছিল। হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল আসফ—গালের উপর তার দাড়িগুলো বড় হয়ে আছে, রগের কাছে কালো বিবর্ণ চামড়া কুঁচকে রয়েছে কিন্তু তাকে দেখাচ্ছিল বারো

তেরো বছরের বালকের মতো। গফুর লক্ষ্য করে দেখল একটা দুটো করে বড়ো বড়ো নীল রঙের মাছি এসে জুটছে, আসফের কম্বল-ঢাকা পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। কম্বলের নিচে একটা পায়ের আভাস পাওয়া যায়, গফুর জানে তার আর একটা পা নেই। লাল কম্বলটা তুলে ফেললে আসফকে কেমন দেখাবে মনে করতে পারল না গফুর। খুব অল্প সময়ের জন্যেই সে অবস্থায় তাকে দেখেছিল সে।

আগের দিন সকালে যখন ঠ্যাং কেটে ফেলার জন্যে আসফ আলিকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়, গফুর তখন হাসপাতালে ছিল না। রাইফেল কাঁধে নিয়ে সে শহরের ভিতরে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসেছিল। সত্যিই, পয়সা তার তখনো ছিল। রেস্তোরাঁটায় লোকের ভিড় ছিল খুব—কিন্তু গফুর একটাও চেনা লোক দেখতে পেল না। কেউ এসে তার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। দু-একজন কেমন ভয়ে ভয়ে তার পোশাক আর রাইফেলটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। পয়সা গুণে নেবার সময় রেস্তোরাঁর মালিক তার দিকে একবারও তাকাল না।

দুপুরের দিকে গফুর হাসপাতালে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে শহরটা সে চষে ফেলেছিল হেঁটে হেঁটে, মারাত্মক ছিল তার বুটের আওয়াজ, নিজের জুতোর আওয়াজ শুনতে শুনতে বেচারার ঝিমুনি ধরে গেল, পায়ের শিরায় টান ধরে ব্যথা করতে লাগল—সে তখন ফিরে এল। আসফ আলি মড়ার মতো শুয়ে ছিল নিজের বিছানায়, তার পাশেই দু জন আহত লোক ছিল তাদের একজনের বিছানা খালি, অন্য লোকটা ঠিকই আছে। ডেটলের কড়া গন্ধে ঘরটা ভর্তি কিন্তু তার চেয়ে একটু তীব্র একটা গন্ধে গফুরের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সে আসফ আলির মুখের কাছে একবার ঝুঁকেই টের পেল তার জ্ঞান নেই।

আসফের জ্ঞান ফিরেছে আজ সকালে। সেই সময়ে একবার তার কাটা পা-টা দেখতে পেয়েছিল গফুর। আসফের ডান পা টা ওরা হাঁটুর উপর থেকে কেটে ফেলেছিল। যেরকম ভেবেছিল তেমন কিছুই মনে হলো না গফুরের। আসফের শরীরের নিচের দিকে চেয়ে শুধু উল্টো মনে হচ্ছিল তার। তবে একটু পরেই হাসপাতালের লোকেরা যখন বিশ্রী খসখসে লাল কম্বলটা দিয়ে আসফ আলির গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল, গফুরের তলপেটটা ভীষণ খালি লাগল। সে ঘাড় বাঁকিয়ে শরীরটা শক্ত করে বসে রইল।

জ্ঞান ফিরে আসার সময়ে আসফ আলি অনেকক্ষণ ছটফট করছিল। দুপুরের

দিকে সে তার চোখের প্রায় সমস্ত শাদা অংশটা বের করে গফুরের দিকে চেয়ে রইল। তার কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গফুর নিচু গলায় বলল, আমারে চিনতি পারতিছো? আমি সয়রাবাতের গফুর। এই কথা সে আগেও বলেছিল। অন্য কি কথা বলা যায়, সে ভেবে পায়নি।

আসফ আলি কোনো জবাব দেয়নি। সে একইভাবে চেয়ে থাকে। তার মুখের উপর তেলতেলে হয়ে ঘাম জমে, কিন্তু একটু পরেই আবার শুকিয়ে যায়। চেয়ে থাকতে থাকতে আসফ বলল, কি? গফুরের মনে হলো এই কথা বলে সে হাসল, কিন্তু গফুর সে হাসি দেখতে পায়নি।

আমি গফুর।

আমার ঠ্যাং কাটে ফালায়ে দিইছে?

হ।

কাটা ঠ্যাংটা কনে?

জানিনে।

আনে দিতি কও। আমার ঠ্যাং আনে দিতি কও। আমি দ্যাখপো।

ও আর দেখতি নেই—গফুর বোঝালো।

আমি বাড়ি যাবো। আমার ঠ্যাং নে বাড়ি যাবো। আমার মারে দেখাবো।

গফুর মহাবিপদে পড়ে গেল। সে কোনো জবাব দিতে পারে না। এই সময় ডাক্তার এসে দাঁড়ায়। গফুর চেঁচিয়ে বলে, আসফ আলি, ডাক্তার সাব আইছে—তুমি ভালো হয়ে যাবা। আসফ কথা বন্ধ করে আগের মতোই চোখের শাদা অংশ প্রায় সবটা বের করে ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে। দু-তিনবার ঢোক গেলে, তারপর বলে, আমার ঠ্যাং কাটিছো ক্যানো—আনে দাও, আমি বাড়ি যাবো। আমার জিনিশ আমারে আনে দাও। ডাক্তার সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকে। তারও কোনো জবাব তৈরি নেই। অসম্ভব ধারালো চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে আসফ আলি।

বিকেলের রোদ মিইয়ে এল। ডিসেম্বরের শীত ভয়ংকর আক্রমণ করতে করতে লম্বা লম্বা শুকনো মরা ঘাসের উপর দিয়ে মাঠ পেরিয়ে গ্রাম ভেঙে এগিয়ে আসছিল। গফুর তার রাইফেলে ভর দিয়ে চুপ করে বসেছিল আসফ আলির মাথার কাছে।

সাড়ে চারটের দিকে আসফ আলি মরে গেল। এই সময়টা খুব চুপচাপ সে একদৃষ্টে কড়িকাঠের দিকে চেয়েছিল। খানিকক্ষণ পর পর হিক্কা উঠছিল।

বলতে কি, যখন ধীরে ধীরে তার দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল, গফুর ভেবেছিল সে খুব আরামের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ছে, গফুর এইভাবে কাউকে মরতে দেখেনি।

একটু পরে হাসপাতালের একজন পুরুষ নার্স এসে আসফ আলির দিকে একটু চেয়ে থেকে ঠাণ্ডা গলায় মন্তব্য করল, মারা গেল। বলে সে লাল কম্বলটা দিয়ে তার মাথাটা পুরো ঢেকে দিল। আসফ আলি মরে গেছে জানতে পেরে গফুর শেষবারের জন্যে তার মরা মুখটা দেখতে চেয়েছিল। খুব সহজেই সে তা দেখতে পারত—কিন্তু তার মাথা থেকে গফুর আর কম্বলটা সরালো না। রাইফেল হাতে নিয়ে সে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তাকে ভীষণ বোকা আর বেঢপ দেখাচ্ছিল।

দরজার কাছে এসে সে একবার ফিরে তাকাল। আসফ আলির পায়ের দিকে যে জখমি লোকটা তখনো ছিল, সে তার কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে আধো উঠে বসেছে। মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখতে পেল গফুর—তার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, সমস্ত মুখটা নড়বড় করছে, বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঘাম জমেছে মুখে। কনুই ভেঙে লোকটা তার বিছানায় হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

বাইরে এসে একটিমাত্র নিঃশ্বাস ফেলে গফুরের মনে হলো সে অনেককিছু তার ভিতর থেকে বের করে দিতে পেরেছে। ঠাণ্ডা খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসছিল বটে—কিন্তু লাল রোদটা তখনো ছিল। গফুর এখন তার গাঁয়ে ফিরে যাবে।

আলেফকে একটু পা টেনে হাঁটতে হতো, এছাড়া আর কোনো অসুবিধে ছিল না তার। কিন্তু আজ একটানা বেশি হাঁটতে গিয়ে সে টের পায় অসুবিধে হচ্ছে। মোটা দড়ির মতো একটা শিরা কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত এমন টান হয়ে আছে যে মনে হয় পা চালালেই বুঝি ছিঁড়ে যাবে। অথচ শিরাটা এতক্ষণ দেখা দেয়নি। বোঝা গেল বেশি হাঁটাহাঁটি চলবে না।

আলেফ বসে পড়ল। বসে পড়ে বুট জুতো দুটো প্রথমে খুলে ফেলে সে। পায়ের সঙ্গে এমন কামড়ে বসেছে যে খুলতে গিয়ে আলেফ হাঁপিয়ে ওঠে। ডান পায়ের জুতোটা খুলতেই হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। অন্ধকারে কোথায় পড়ল সেটা আলেফ দেখতে পেল না। বাঁ পায়ের জুতোটা হাতে নিয়ে শুকনো ঘাসের উপর বসে আলেফ কেমন করে খোঁড়া হয়েছিল সেই ঘটনাটা একবার মনে করে দেখার চেষ্টা করে। গুলিটা হাঁটুর নিচে মাংসের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। এই ঘটনার আগে আর একদিন পনেরো মিনিট ধরে গুলিবৃষ্টি হয়েছিল। বুলেটগুলো দিনের আলোতে দেখা যায়নি—শুধু ধারালো শিস দেবার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। গুলি কি সাপের জিব? স্‌ঁই শব্দে বেরিয়ে গেলেই মনে হয় একটা গোখরো বুঝি তীক্ষ্ণ জিব বাড়িয়ে হিসিয়ে উঠেছে! বোকার মতো কপালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কেবলই পরখ করছিল আর ভেবেছিল হাতে রক্ত যখন লাগছে না তখন নিশ্চয়ই গুলি লাগেনি।

আশ্চর্য, এত অজস্র গুলির মধ্যেও আলেফের গায়ে কুটোটি পর্যন্ত লাগল না। অথচ এই ঘটনার দিন পনেরো পরে উটকো একটা গুলি এসে তার পায়ে সেঁধোলো—সে টেরও পেল না। বড় ভোঁতা একটা ছুরি দিয়ে ওসমান ডাক্তার কচকচ করে মাংস কেটে বুলেটটা আঁতিপাতি করে খুঁজেছিল। আলেফের ব্যথা করেনি। আগে কয়েকটা ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল তাকে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ছুরিটা চালাতে গিয়ে ওসমান ডাক্তারের হাতের পেশী ফুলে উঠেছে আর থমথমে মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে। এঃ—এ গোশ্‌ত না কাঠ—ছুরির কাজ নয়,

কুড়ুলটা আনলেই ভালো হতো—বিরক্ত বিব্রত মুখে ওসমান ডাক্তার মন্তব্য করেছিল আলেফের মনে পড়ে যায়। তাদের দলের নেতা শরীফ বুক চিতিয়ে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে—আলেফ এই অন্ধকারের মধ্যেও ছবিটা স্পষ্ট দেখে।

আলেফ দেশের জন্যে যুদ্ধ করছে—এই কথা শরীফ একটা একটা করে বলে।

মাসখানেক পরে ওসমান ডাক্তার মারা যায়। তার বেলায় কোনো কাটা-কুটি করতে হয়নি। গুলি ডাক্তারের মাথায় লেগেছিল। শরীফ এখন কোথায় আলেফ জানে না। আজ বিকেলে যখন হাসপাতাল থেকে আলেফ বেরিয়ে এসেছিল তখন বড় গাছগুলোব মাথায় রোদের সামান্য লাল রঙের ছোঁয়া ছিল। সেই রোদে কোনো গবম ছিল কিনা আলেফ জানে না—কিন্তু নিচের ভাঙা রাস্তা দিয়ে নদীর পাড়ে পাড়ে যখন সে শহর থেকে বেরিয়ে আসে, তার খুব শীত করছিল। শীতের কামড় সে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, তার কপালে ঠাণ্ডা ঘাম জমেছিল। সেই ঘামটুকুও এতক্ষণে শুকিয়ে উঠল। বাঁ পায়ের বুট জুতো হাতে আলেফ নদীর ধারে মাঠের মধ্যে বসে শীতে কাঁপতে থাকে। শীত-কালের রাতে মাঠের মধ্যে থাকলে আকাশ এত খোলা আর বড় দেখায় আলেফ কখনো খেয়াল করেনি। অন্ধকারটা তেমন ঘন নয়, শাদা রঙের সঙ্গে কি একটা যেন মেশান রয়েছে, প্রায় সব কিছুই আবছা দেখা যাচ্ছে। আকাশ আলকাতরার মতো এত উঁচুতে উঠে গেছে যে আলেফ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হলো বাড়িতে সে আর পৌঁছুতে পারছে না। এইখানে ঠাণ্ডায় জমে সে মরে যাবে—দিনের আলোয় তার মরা দেহটা যে কারো চোখে পড়তে পারে—এমন আশা সে কিছুতেই করতে পারল না।

আমি যুদ্ধে গিইলাম ক্যানো?

দক্ষিণবঙ্গের লোকের কথায় সামান্য যে একটা টান থাকে সেই টানের সঙ্গে সে বারদুয়েক ভেবে দেখার চেষ্টা করল, আমি যুদ্ধে গিইলাম ক্যানো? বাঁ পায়ের বুটটা সে তখনো ছাড়েনি—হাঁটুর উপরে সেটা চেপে ধরে ডান হাতে রাইফেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে আর একবার কেন যুদ্ধে গিয়েছিল ভেবে দেখার চেষ্টা করে। কঠিন কথা ভেবে দেখার সময় লোকের যেমন ভুরু কুঁচকে ওঠে, চোয়াল শক্ত হয়ে যায়—আলেফেব ভুরুতে তেমনিই গিঁট পড়ে, আর তেমনিই শক্ত হয়ে যায় তার চোয়াল। দেশের জন্যি যুদ্ধে গিইলাম—আলেফ ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল—এইটুকু মাত্র বিদ্যা সম্বল করে সে দেশ, যুদ্ধ, জনগণ এইসব

কঠিন প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে তৈরি হয়। আজ বিকেলে হাসপাতাল থেকে চলে আসার সময় সে আমিনের মুখের দিকে চেয়ে দেখেনি ; হাসপাতালের লোকেরা তাকে লাল কম্বল দিয়ে ঢেকে গেলে তার কিছুই করতে ইচ্ছে করেনি। আমিন মরে গেলে কম্বল সরিয়ে তার মরা মুখ দেখার জন্যে আলেফ হাসপাতালে তিনদিন বসেছিল—আসলে আমিন মরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাই তার কাজ ছিল। তার মাকে সে সঠিক খবরটা দিতে চায়। আমিন ফিরে আসবে—এই আশায় অনর্থক কেন বুড়ি বসে থাকে—তার সম্পর্কে পাকা খবরটা পেলে বরং তার কিছু কাজ হয়। ডান ঠ্যাংটা কেটে ফেলে দেবার তিন দিন পর সমস্ত শরীর পচে দুর্গন্ধ হয়ে আমিন মরে গেল। কোথায় তার কাটা ঠ্যাং আর কোথায় তার সেই পচা শরীরটা ? আলেফ বুঝতে পারে বহু বহু লোককে তার অনেক কথা বলার আছে—কিন্তু ঠিক কি কথা সে বলবে আর কাকে কাকে বলবে তার মাথায় ঢোকে না। সে উঠে দাঁড়ায়। ক্যানভাসের তৈরি মোটা ব্যাগটা কাঁধে ঝোলায়। রাইফেলটা তুলে নেয়। লুঙ্গিটা বেশ আঁটো করেই পরে নিয়েছিল। এখনো আলগা হয়নি। বাঁ হাতের বুটটা সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয় আলেফ। সবকিছু নামিয়ে রেখে সে বুটের ডান পাটিটা খুঁজতে থাকে। আশেপাশে হাতড়ে খুঁজে না পেয়ে তার মনে হয় জুতোটা পাওয়া গেলে আবার পায়ে দিতে হবে। ভাবতেই দুই পা-ই তার শিউরে ওঠে। আলেফ জুতো খোঁজা বাদ দিয়ে বাঁ পাটটা প্রাণপণে নদীর দিকে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু এবার দাঁড়াতে গেলে পায়ের দড়িটায় এমন টান পড়ে যে আলেফকে কুঁজো হয়ে যেতে হয়। সেই অবস্থাতেই সে ঝোলা কাঁধে রাইফেল হাতে এগুতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে থেমে যায়। কোন্ দিকে যাবে ?

তার নিজের গ্রাম থেকে শহরে বহুবার গিয়েছে সে এই নদীর পথ ধরে। মাত্র গত আট মাস সে এদিকে ছিল না। এখন আর বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। নদীর ডান পাড় ধরে যেতে যেতে ডান দিকে মোড় নিয়ে তাকে তার গাঁয়ের রাস্তা ধরতে হবে। সামনে একটি খাল থাকার কথা, অন্যমনস্কভাবে কয়েকটি খাল সে ইতিমধ্যেই পেরিয়ে এসেছে। আলেফ অসহায়ভাবে চারপাশে তাকায়। দিক-টিক সব গোলমাল হয়ে যায়। মাঠে ধান পেকে গেছে—কিন্তু লোকে এখনো কাটতে শুরু করেনি। ঘাসও শুকিয়ে খড়ের মতো। আলেফ কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ পেল না—একটুও বাতাস নেই। আকাশের দিকে চেয়ে আবার তার ভয় ধরে গেল। তবে সে বুঝতে পারে ভয় নয়, শীতেই কাবু হয়েছে

বেশি। তলপেট থেকে একটা ঢেউ উঠে বুকের মধ্যে আটকে যায় খিল ধরার মতো। খুব ঠাণ্ডার মধ্যে হাঁটতে গেলেও যে হাঁপাতে হয় আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ধারণা ছিল না আলেফের। দুটো হাত আর সমস্ত শরীর এমনভাবে কাঁপতে থাকে যে সে দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না। অবশ্য বাড়ি সে পৌঁছে যায় ভোরের দিকে ঠিকই। যেমন আন্দাজ করেছিল তার অনেক পরে। গাঁয়ের রাস্তায় সে উঠে আসে। তার পিছু পিছু খালের দিক থেকে একটা ভারি কুয়াশা এসে গাঁয়ের দিকে চলে যায়। আলেফ দেখল তাদের বাড়িটা আগাগোড়া কুয়াশায় মোড়া—বলতে গেলে বাড়িটায় ঢোকার রাস্তা সে প্রথমে খুঁজে পায়নি। বুটজুতো জোড়া সে ফেলে দিয়ে এসেছে, এজন্যে যখন তাদের একমাত্র ঘরের ভাঙা দরজার দিকে এগিয়ে যায়—উঠোন পেরোনোর সময় সে বেড়ালের মতোই নিঃশব্দে দাওয়ায় ওঠে—কোথাও কোনো শব্দ হয় না। আলেফ দরজায় ধাক্কা না দিয়ে ডাকল, মা।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আলেফ আর একটু গলা চড়িয়ে ডাকল, মা। এবারেও সাড়াশব্দ নেই। আলেফ কথা বলতে চাইছিল না। সে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করে। দু-চারবার ধাক্কা দেয় আর কান পেতে শোনে। এই রকম কয়েকবার চলবার পর আলেফ ঘরের ভিতর খসখস আওয়াজ শুনতে পায়। ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলল—সে তাও টের পেল। কেউ দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। বাড়িতে তাহলে আর কেউ আছে নাকি? অন্য লোক? মা কি তাহলে মরে গেছে? সাড়া না দিয়ে কথা না বলে মা তার দরজা খুলবে না আলেফ জানে।

একেবারে ফাঁকা মাথায় আলেফ দাঁড়িয়ে থাকে। দরজা খুলে কুপি হাতে যে মেয়েমানুষটি দাঁড়ায় তাকে সে চিনতে পারে না। শিরাওঠা ফাটা হাতের খানিকটা আর রোগা চিমসে মুখের অংশ আলেফ দেখতে পেল।

কিডা?

আমি আলেফ।

কুপি-ধরা হাতটা জোরে কেঁপে ওঠে। তাড়াতাড়ি যেভাবে সে আরেকটি হাত দিয়ে মুখের উপর ময়লা কাপড়টা টেনে দেবার চেষ্টা করে তাতে আলেফ মেয়েমানুষটিকে তার বউ বলে চিনতে পারে। খুবই অবাক হয়ে যায় সে। বউ তো এখানে ছিল না। একবার পর পর তিন দিন তাদের খাবার জোটে না। আলেফ চেষ্টার কসুর করেনি—মজুর খাটার জন্যে খুব ঘোরাঘুরি

করল। মজুরি কম নিতে চাইল—কিন্তু কাজ জুটল না তার। শেষে যা হয় হোক বলে সে একটি হাটে বসে থাকে—রাতেও আর বাড়ি ফেরে না। এই ঘটনায় কেমন করে তার বউয়ের ধারণা হয়ে যায়, আলেফ তাকে খুন করার জন্য বিয়ে করেছে। সে যে ইচ্ছে করে তাকে উপোসী রাখছে না এই কথা পর পর তিন দিন সে বিশ্বাস না করে কাটায়। তার আগে একদিন দুদিন উপোস দিয়েও বউটার ভাবভঙ্গির বিশেষ অদলবদল হয়নি। উপোসী শরীবে রাতে আলেফের আদর পর্যন্ত সে সহ্য করে গেছে। কিন্তু তিন দিনের ঘটনায় তার আস্থা একেবারে চলে যায়। চার দিনের দিন আলেফ কিছু চাল জোগাড় করে বাড়ি ফিরে আর বউকে পেল না। সে বউ এখন কোথা থেকে এল? আলেফ শুনেছিল সে পাশের গাঁয়ে কার কাছে যেন থাকে। সেই লোকটার সঙ্গে তার আর একবার বিয়ে হবে এমন কথাও তার কানে এসেছিল।

মা কই? আলেফ জিগগেস করে। বউ ঘরের কোণের দিকে যায়—কুপির আলোয় এতক্ষণে আলেফ মাকে দেখতে পায়। একটিও কথা না বলে ঘরে ঢুকে শান্তভাবে সে তার কাঁধের ঝোলা নামায়, বন্দুক এক কোণে ঠেসান দিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে বউ কোনরকম আওয়াজ না কবে অদ্ভুত কায়দায় মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। ঘুমভাঙা বিস্ফারিত চোখে বুড়ি বলে, ও কিডা? ঘরের কোণ থেকে আলেফ জবাব দেয়, মা, আমি—আমি আলেফ। মায়ের বুঝতে সময় লাগে—উঠতে সময় লাগে, আলেফের কাছে আসতেও একটু সময় যায়। আলেফকে জড়িয়ে ধরলে পড়ে যেতে পারে বলে আলেফই তার মাকে জড়িয়ে ধবে। এসময় তার কিছুই হয় না—কোনো রকম আবেগের চোট পেয়ে সে ঘায়েল হয়ে গেছে এমন বোধ হয় না। মায়ের খরখরে কাগজের মতো শুকনো হাত আলেফের মুখে মাথায় পিঠে কাঁপতে কাঁপতে চলাফেরা করে—থুতুভরা মুখ এগিয়ে এসে চুমু খায় আর বুড়ি বিচিত্র শব্দে কাঁদতে থাকে। মা মরে যায়নি—শুধু এই একটি ব্যাপার আলেফকে খুশি কবে আর হঠাৎ সে পা থেকে কোমর পর্যন্ত দড়িটার অস্তিত্ব টের পায় না—শীতেব ভাবটাও একদম চলে যায়। এইটুকু মাত্র।

সে বাড়ি ফিরে এসেছে। আলেফকে জড়িয়ে ধরে তার মা প্রায় ঝুলতে থাকে।

আলেফ রে, উরে আমার বাপরে। এতদিন কনে ছিলি বাপ?

আমি ফিরে আইছি মা, বাঁচে ছিলি তালি?

তোর জন্যে মরিনি, তোর জন্য বাঁচে আছি বাপ।

ভালো করিছ—আলেফ হাসে। কুয়াশা খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

আলেফের হাসিটা আবছা দেখায়—সে মায়ের মুখটাও ভালো দেখে না।

ভালো ছিলি আলেফ? মা বলে।

হ।

কিছু হয়নি তো তোর?

সামান্য উপদ্রুত মনে হয় আলেফকে। সে বলে, না, কিছু হয়নি। লোক আইছিল আমার খোঁজ নিতি?

একদিন মেলেটারী আইল গাঁয়ে আগুন দিতি।

আগুন দিইছে?

হ। আগুন দেলে—সব বাড়ি পোড়ায়ে দেলে। কয় ছ্যামরা আমার বাড়ি আস্যে তোর খোঁজ নেলে অনেক।

তুমি কি বললে?

আগুনে গাঁ পোড়তে লাগল—সেকি আগুন তোরে কবো আলেফ—ছ্যামরা। কডা আমারে কয়, ও বুড়ি আলেফ কনে?

আমি বললাম, আলেফের খোঁজ জানে কিডা? আমি মরতিছি নিজের জালায়। সে শুয়োর কোঁয়ানে মরতিছে তার আমি কি জানি? আলেফ, আমি ঠিক বলিনি?

ঠিক বলিছ? তোমার আলেফ ছিল কনে কও তো দেহি।

তুই নড়াইয়ে ছিলি বাপ—আলেফের মা সোজা হয়ে দাঁড়াল। বউয়ের দিকে ফিরে আবার বলল বুড়ি, বউ ফিরে আইছে দেহেছিস?

দেহিছি।

বউ যেদিন ফিরল—বুড়ি বকবক করে। আনন্দে তার ঘাড় নড়বড় করে দোলে। মুখ থেকে থুতু ছোটে। মা কিছুতেই থামতে চায় না। আলেফ তাকে অনেকক্ষণ বলতে দিয়ে হঠাৎ বলে, ঠিক আছে মা। বুড়ি চুপ করে। তারপর ঘরের বাইরে চলে যায়। বউ অন্ধকার কোণে গিয়ে লুকিয়েছে। মা চলে গেলে আলেফ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এখন সে কি করবে বুঝতে পারে না। মায়ের নোংরা বিছানার কাছে গিয়ে সে সটান শুয়ে পড়বে কিনা চিন্তা করতে থাকে। ফর্সা হয়ে আসছিল। ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা বাতাস এসময় হু হু করে ঘরে এসে ঢোকে।

দরজাটা বন্ধ করে দে—ঠাণ্ডা বাতাস আসতিছে—আলেফ বউয়ের দিকে ফিরে বলে। বউ দরজা বন্ধ করতে গেলে আলেফ একবার ঘরের ভিতরটা নজর

করে দেখে।

বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। একপাশে তার ব্যাগটা পড়ে আছে—ঘরের কোণে রাইফেলটার নল এবং আবছা আলোতেও চকচক করছে। দরজা বন্ধ করে বউ ফিরে আসতে আলেফ ক্লান্ত গলায় বলে, কবে ফিরে আলি তুই। বিড়বিড় করে সে কি বলল বোঝা গেল না। আলেফ হেঁকে উঠল, অঁা?

বউ বলল, শ্রাবণ মাসে।

ফিরলি কেন?

না ফিরে কি করবো?

তালি গিইলি ক্যানো?

লাল ম্যাডমেডে আলোব মধ্যেও আলেফ দেখতে পায়, বউয়েব দু'-চোখ জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কোথা ছিল?

মজমপুর।

খেতে পাইছিলি। খাবাব জন্যিই তো গিইলি। তা খাতি পাইছিলি তো?

আলেফের বুকের ভিতরটা জলতে থাকে। মায়ের বিছানায় বসে পড়েছিল সে। উঠে দাঁড়ায়। বউয়ের খুব কাছে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সে। অনেকদিন মেয়েমানুষের কথা ভাববার তার উপায় ছিল না। এতদিন পর তার নিজের বউকে সামনে দেখেও তার অদ্ভুত লাগতে থাকে। একনাগাড়ে তার বুক জলে যায়, এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলি তুই? প্যাট এতই বড তোর? তা এখন কি জন্যি ফিরিছিস? খাতি পাবি ভাবিস?

বউ খুব জোবে জোরে মাথা নাড়ল। জমা জল ঝবে পড়ল ঝরঝর কবে।

তয়?

আমি অনেকদিন আগে আইছি। তখন তুমি ছিলে না।

আমি কোঁয়ানে ছিলাম?

তুমি লড়াইয়ে ছিলে। আলেফ মনে করে দেখল—একটু আগে তার মাও ঠিক এই কথাটাই বলেছে।

চুপ কব—আলেফ অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার কবে উঠল। বউ থমকে যায়। আমি মারা যাতিছিলাম জানিস—আলেফ বসে পড়ে লুঙ্গিটা গুটিয়ে হাঁটুর উপরে তুলতে তুলতে বলে, এইখানে গুলি ঢুকেছিল। বউ সেখানেই মাটিতে বসে পড়ে, চোখ খুব কাছে এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুকনো ক্ষতটা দেখে। আলেফ নিজেও

কোনোদিন ভালো করে দেখেনি। জায়গাটার রং এখনো ফ্যাকাশে শাদা—কাটা আর ছেঁড়া মাংস জোর করে সেলাই করে দেওয়ায় উঁচু হয়ে আছে।

আর এট্টু উফর দিয়ে গেলে হাঁটুর হাড়টা ভাঙে যাতো—আলেফ বলল।

তালি কি হতো?

হাঁটু থে কাটে ফালায়ে দিতি হতো। আর তাতে হতো কি আমি মরে যাতাম—হাসতে হাসতে এই কথা বলতে গিয়ে আলেফের আমিনের কথা মনে পড়ে গেল।

তোমার কোনো বেকায়দা হয়?

ঠ্যাংটা এট্টু খাটো হয়ে গিছে।

আলেফের ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। মায়ের ছেঁড়া কাঁথা বিছোনো দুর্গন্ধ বিছানার উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়তে গেলে সে কোমর থেকে পা পর্যন্ত মোটা দড়িটার আর একবার সন্ধান পায়। সে আবার বলে, এই ঠ্যাংটা এট্টু খাটো হয়ে গিছে। চোখ বন্ধ করেও আলেফ ঘুমোতে পারে না—ঘুম ঘুম গলায় সে জিগগেস করে, লড়াই শেষ হয়ে গিছে জানিস? দ্যাশের কি হল ক দিনি?

দ্যাশ স্বাধীন হইছে—বউ যেন মুখস্থ বলল।

আলেফ প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে—ঘোঁৎ করে একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে জেগে গিয়ে সে বলে, আমরা রাজা বাদশা হবো নাকি বল তো? রাজা বাদশা হবানে মনে হয়।

বউ প্রতিবাদ করল, তা ক্যানো? রাজা বাদশা হবো ক্যানো? আমাদের দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না।

মানে?

ভাত কাপড় পাবানি।

ঠিক কচ্ছিস? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আলেফ চোখ খুলে টক টক করে চেয়ে রইল বউয়ের দিকে। তার মাথায় একটা কথাও ঢুকছিল না—একঘেয়ে গলায় সে বলল, স্বাধীনতার মানে ভালোই বুঝিছিস বলে মনে হচ্ছে। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলেফের নাক ডাকতে শুরু করে—তবে আরো একবার সে আধো-ঘুমের মধ্যে বলে বলে ওঠে, ললিতনগরের খালে চিংড়ি ধরবানে দেহিস, এক একটা চিংড়ি আধসের ওজনের—এই পেল্লায় বড়ো চিংড়ি।

কয়েকদিনের মধ্যেই আলেফ বুঝতে পারে রাইফেল নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর কোনো মানে নেই। ইতিমধ্যে তার মতো অনেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে

রাইফেল ঘাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা দলে দলে এসে যুদ্ধে জিতে যাবার খবর দিয়ে যায় আর বুকে থাপড় মেরে জানিয়ে দেয় দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। এই বুক থাপড়ানো আর স্বাধীন হবার খবর জানানো ছাড়া আর তাদের কিছুই করার ছিল না। কাজেই, দুদিনে রাইফেলের মতোই যুদ্ধে জিতে যাবার খবর, স্বাধীন হবার ব্যাপার ইত্যাদি পুরনো হয়ে যায়। গাঁয়ের লোকদের অন্য ধান্দা আছে।

মা বলে, কোথা তোর গুলি লাগিছিল আর একবার দেখানা বাপ। আলেফ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে গুলি খাওয়া জায়গাটা বের করে মাকে বোঝাতে শুরু করে, গুলিটা লাগিলো ঠিক এইখানে। আমি ভাবতিছি শালা খানেরা বোধ হয় ভয়ে পলান দিছে। ঝোপ থেকে বারোয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্তর আর স্যুঁই করে গুলিটা একেবারে—

তোরে সরকার থে ডাকপে না?

আলেফ হাঁ হয়ে যায়, সরকার আমাকে ডাকপে? ক্যানো?

তোরে ডাকপে নাতো কারে ডাকপে? গুলিটা যদি তোর মাথায় লাগতো আলেফ?

তা সরকার আমাকে ডাকপে ক্যানো?

তোরে একা না ডাকুক, তোরা যারা লড়াইয়ে ছিলি তাদের ডাকপে না? আমি আমার এই ভিটের চেহেরা ফেরাবো আলেফ কয়ে দেলাম—আর জমি নিবি এট্টু। এট্টা গাই গরু আর দুটো বলদ কিনবি—আর—

হইছে—তুমি থোও দেহি—আমিনের পচা দুর্গন্ধ লাশটার গন্ধ এসে হঠাৎ ভক করে আলেফের নাকে লাগে।

সে বলে, দুটো খাতি দাও—আমি একবার বেনেপুর যাবো।

বেনেপুর যাবি? ক্যানো?

বেনেপুরের এক ছ্যামরা ছিল আমাদের সাথে। গুলি তার উরতে লাগিলো। হাসপাতালে তার ঠ্যাংটা কাটে ফেলায়ে দিলো। তিনদিনের মধ্যি, পচে গন্ধ হয়ে ছ্যামরাটা মরিছে। তার মারে খবরটা দিতে যেতি হবে।

ছ্যামরাটা কি মাটি পাইছে আলেফ? মা ব্যগ্র কণ্ঠে শুধোয়।

মাটিতে ফালায়ে দিলিই তো মাটি, আলেফ বলে।

বেনেপুর থেকে সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরে আলেফ। খবরটা সে সেখান থেকে সংগ্রহ করে। অবশ্য রেডিও শুনলে আগেই পেয়ে যেত। তিনদিনের মধ্যে যার যেখানে যত রাইফেল বা যুদ্ধের অন্য অস্ত্র আছে সরকারের কাছে জমা দতিে

হবে। এই কদিন রাইফেলটা ঘরের কোণেই ঠেসানো ছিল। বাড়ি ফিরে আলেফ মা আর বউকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে আসে। সন্ধের আবছা অন্ধকারের মধ্যে রাইফেলটা হাতে নিয়ে সে বলে, অমা, এইটা দিয়ে লড়াই করতি হয় জানো?

মা ভয়ে ভয়ে বলে, জানি বাবা।

কেমন করে করতি হয় জানো? এই দ্যাহো, এর মদ্যি এমনি করে গুলি ভরতি হয়। রাইফেলটা আলেফের হাতে খটাখট খটাখট করে অদ্ভুত ছন্দের সঙ্গে একগাদা শব্দ তোলে, এই দ্যাহো, বন্ধ করে দেলাম। এইবার আলেফ হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। মা আর বউয়ের দিকে রাইফেলটা তাক ক'রে সে মুখে টারারারা শব্দ করে নলটা আধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে আনে। আলেফ দেখে বউয়ের মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মায়ের মুখের ভাব সে বুঝতে পারলো না।

আলেফ আবার বলল, এইভাবে এমনি করে টারারারা ঠাঠা—বলতে বলতে হো হো শব্দে হাসে আলেফ। তার হাসির শব্দও ঠা ঠা করে বাজতে থাকে।

এই ঠা ঠা ঠাস—আলেফ হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে যায়।

উঠে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায় মা তার থপ থপ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আলেফ গম্ভীর হয়ে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ডাকে, বউ।

আলেফের বউ কথা বলল না।

এখানে থাকলি খাতি পাবি ভাবিস? হয়তো খাতি পাবি না।

না পাই।

আবার পালাবি না তো?

না।

তোর যা পেটের জ্বালা! ঠিক কচ্ছিস খাতি না পেয়ে মরে গেলেও পালাবি না?

আগের মতো জোরে জোরে মাথা নাড়লে ঝর ঝর করে তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে।

আলেফ রাইফেল হাতে বাড়ির পিছনে ডোবার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর গায়ে যত জোর আছে সব দিয়ে রাইফেলটা ডোবার মাঝখানে ছুঁড়ে দেয়।

বাড়ির দিকে ফিরে আসতে আসতে আলেফ ভাবে, ডোবাটা ছোটো—রাইফেলটা খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হবে না।

পাতালে হাসপাতালে

এমারজেন্সির লোকটি মুখ নিচু করে টেবিলে কিছু একটা দেখছিল। অন্যমনস্ক-ভাবে চোখ তুলে তাকাতেই দেখল তার থেকে মাত্র হাতদুয়েক দূরে দুজন আধ-বয়েসি আর এক বুড়ো একটা লোককে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়োর পাৎলা লম্বা নাকটা একদিকে বাঁকা! কাঁচা-পাকা খুদে খুদে দাড়ি বেয়ে ঘাম ঝরছে। যাকে কাঁধে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর মুখ দেখা যায় না, তার একটা পা ঝুলছে আর একটা পা আঁকশির মতো বুড়োর কাঁধে আটকানো। লোকটার শরীরের বাকি অংশ আধবয়েসি দুজনের ঘাড়ে কুকুরকুণ্ডলি হয়ে আছে। তিনজনে একসাথে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল।

টেবিলের সামনে চেয়ারে-বসা এমারজেন্সির লোকটা চোখ তুলে তাকাল, কিছু দেখল না। এই সময় একবার টেলিফোন বেজে উঠল। লোকটার ভুরুতে একটা গিঁট পড়ল। দ্বিতীয়বার টেলিফোন বাজল। তার ভুরুতে দুটো গিঁট পড়ল। তিনবারের বার সে চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে টেলিফোন তুলে বলল, হ্যাঁ এমারজেন্সি। তারপর একটু শুনে নিয়ে বলল, জানি না। তারপর আবার একটু শুনে বলল, পারব না, লোক নেই। বলে টেলিফোন রেখে দিল। মুখ নিচু করে সে আবার টেবিলের উপর কিছু দেখতে দেখতে সরু লম্বা আঙুল চালিয়ে নাকের ভিতর থেকে লোম টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল। ফের টেলিফোনের শব্দ। লোকটা টেলিফোন তুলে বলল, হ্যাঁ এমারজেন্সি। একটু শুনে বলল, তাতে হয়েছে কি? মাথা কেটে নেবেন নাকি? আবার শুনে বলল, বেশ করেছি, এখান থেকে কাউকে ডেকে দেওয়া হয় না, লোক নেই। তারপর কিছুই না শুনে একনাগাড়ে বলে চলল, ভদ্রতা, ভদ্রতা দেখাচ্ছ আমাকে···তুমি কি নবাবপুত্তুর —যা যা, যা পারিস কর, বেশি তড়পাস না। বলে ঝড়াৎ করে টেলিফোন রেখে দিয়ে বলল, তুমি আমার কলা করবে।

দক্ষিণদিকের খোলা দরজা জানালা দিয়ে হুস্ করে গরম হাওয়া ঢুকল। সাথে-সাথেই আবার ফোঁস-স করে নিশ্বাস ফেলে আধবয়েসি দুজন কাঁধ

বদলাল। যে ওদের ঘাড়ে চেপে আছে, তার মুখ এখন দেখা যায়, পোড়া ফরশা, ফ্যাকাশে। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে সে জুলজুল করে তাকাল। এমারজেন্সির লোকটি একসাথে পটাপট ভুরুতে গিঁটের পর গিঁট তুলে বলল, কি? এই একটিমাত্র কথা বলতে গিয়ে রাগে তার দুটি বড় বড়, কান লাল হয়ে উঠল।

ঘাড় থেকে আঁকশিটা একটু সর'নোর চেষ্টা করে বুড়ো একদিকে মাথা হেলিয়ে বলল, হুজুর!

টেলিফোন বেজে উঠল। তিনবার বাজার পর টেলিফোন তুলেই সে ঝট করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে যেন মুখস্থ বলে গেল, জি স্যার, না স্যার, ঠিকই স্যার, ঠিকই স্যার, জি স্যার, না স্যার, আচ্ছা স্যার! বলে টেলিফোন রেখে দিয়ে আর দম পেল না, সঙ্গে সঙ্গেই একহাতে কপালের ঘাম মুছে কানের কাছে রিসিভার তুলে একগাল হেসে বলল, আরে তুই। কি খবর? না না গিয়েছিলাম তো, কাল গিয়েছিলাম, না না পরশু, হ্যাঁ পরশুই গিয়েছিলাম। দুপুরবেলা, কেউ ছিল না···অত জানি না··কিছুই জোগাড় হয়নি··ওরে বাসরে, সিনেমা দেখার সময় কই, ডিউটির চোটে অন্ধকার···কালকে ব্যাডলাক ছিল, বিশটা টাকা বেরিয়ে গেল··মাগিকে চেনা আছে, শোন্ দুলু এসেছে, বাপের গলায় ক্যান্সার হয়েছে—মানে হয়ে গেল আর কি···না ভাই, পারব না, বৌ পাছায় ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে।

আবার একগাল হেসে টেলি‹ ন রেখে দিয়ে লোকটা এবার স্পষ্ট করে জিগগেস করল, কি ব্যাপার?

লোক তিনটি নেতিয়ে পড়েছিল। বুড়ো ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, হুজুর রুগী এনেছি।

এমারজেন্সির লোকটা খেঁকিয়ে উঠে বলল, বেশ করেছ। নাচব?

কথি রাখব?

আমার মাথায়। বলে গলা পাল্টে বলল, নামাও, আরে মেঝেতে নামাও।

তাড়াতাড়ি করে লোক তিনটে ঘাড় থেকে যেন জোয়াল ফেলে দিল। তাদের কাঁধ থেকে লোকটা ধুপ করে মেঝেয় পড়ে। তার যে পা-টি বুড়ো চাষীটার কাঁধে আঁকশির মতো আটকানো ছিল, সেই পা-টিকে বাঁচাতে বুড়ো হাঁটু গেড়ে বসতে যায়। এই করতে গিয়ে তার কোমরের লুঙির কষি আলগা হয়ে খুলে পড়ল। বুড়ো হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে। লুঙি সড়াৎ করে

হাঁটুর কাছে চলে আসে। এমারজেন্সির লোকটি তার অনেক আগেই টেবিলে মন দিয়েছে। সেখানে কি মধু আছে সেই-ই জানে। চাষী তিনজন গোছগাছ হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। একজন মাথা থেকে গামছা খুলে নিয়ে হাওয়া খায়। বুড়ো লুঙি ঠিকঠাক করে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে লোকটি টেবিলের উপর দিয়ে একদৃষ্টে তাদের দিকেই চেয়ে আছে। সে বলে, হুজুর।

এমারজেন্সি দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালে।

যাকে বয়ে আনা হয়েছে তার একটা পা ফুলে ঢোল হয়ে আছে। সেই পা-টা মেঝেয় লম্বা করে দিয়ে অন্য পা-টি গুটিয়ে দেয়ালে আধা হেলান দিয়ে সে চুপ-চাপ শুয়ে চোখ পিটপিট করতে থাকে। ফোলা পায়ের তলা থেকে রস গড়িয়ে পড়েছে। একটা বড়ো নীল মাছি দুবার তার পায়ের তলায় বসে খোঁজখবর নিয়ে আপন লোকজনদের খবর দিতে চলে গেল। পুরো বাহিনী এসে পৌঁছুতে বিশেষ দেরি হলো না।

কি আশ্চর্য। এমারজেন্সির লোকটা আবার জিগগেস করল, কি ব্যাপার? বুড়ো ফের বলল, হুজুর। অন্য দুজন চাষী কুতকুতে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইল।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

তালপুকুর থিকে—বুড়ো বলে।

পায়ে কি হয়েছে!

হুজুর, ছার—বুড়ো শুরু করে, লোকটা মরে যেছে, পায়ের ব্যাদনায়—

হুড়মুড় করে তিন-চারজন লোক ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে সামনের ছোকরাটি উৎসাহে টগবগ করছে। সোজা টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলে, দেখেছেন?

এমারজেন্সিব কর্তব্যরত বলে, কি? বলে নখ খুঁটতে থাকে। দেখেননি, আজকের কাগজ দেখেননি, বলতে বলতে সে টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে। বাকি কজন তাড়াতাড়ি চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিলের কোণ দখল করে উৎসুক মুখে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

আজকের কাগজে বেতনের স্কেল দিয়েছে। দেখেননি।

ঢাকার কাগজে?

না, এখানকার কাগজে। একই কথা, এটাও জাতীয় দৈনিক।

ঘোড়ার ডিম হবে—কর্তব্যরত বলে, গবমেণ্ট কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ঘোড়ার ডিম পাড়বে।

এক হাজার টাকা বেতন দিচ্ছে—ছোকরাটা বলে। আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে কথা চালিয়ে যায়, কোন্ গ্রেড দেবে আমাদের ? সিক্সথ না সেভেন্থ ? সেভেন্থ কেমন করে দেয় একবার দেখব।

বেঞ্চির উপর থেকে একজন বলল, বেতন বাডিয়ে লাভ ? জিনিশের দাম না কমলে বেতন বাড়লে কি হবে ? দুশো টাকায় এক মণ চাল আর একশো টাকার বউয়ের একটা শাড়ি কিনতে হলে লাভটা কি হবে ? বেতন বাড়ানো খুব সোজা ? কাগজ ছাপিয়ে দিলেই হলো ?

আর একজন বলে, বাবা, অর্থনীতির মারপ্যাঁচ। পোঁদে বাঁশ চলে যাবে ; বেতন বাড়িয়ে দরকার নেই, জিনিশের দাম কমাও। মানে উৎপাদন বাড়াও।

বেঞ্চি বলল, বেতন দিয়েই বা দরকার কি। বৌ সারা মাসের একটা ফর্দ করে দেবে—সরকারকে দিয়ে দেবো। সেইসব জিনিশ তুমি গরমেণ্ট সাপ্লাই করো। বেতন চাই না।

সেই জন্যেই তো সরকার বলছে, উৎপাদন বাড়াও।

বেঞ্চি ভয়ানক রেগে গেল, তুই চুপ কর শালা, তোর পাছার গর্ত মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে ধানগাছ লাগাব। উৎপাদন বাড়াও। ঐ চাষাগুলো বসে আছে—বলে সে আঙুল দিয়ে বুড়ো আর আধবয়েসি দুজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওদের বলে দ্যাখ উৎপাদন বাডাও।

কি চাচা, উৎপাদন বাড়াবে ? উৎপাদন ? সে বুড়োকে জিগগেস করে।

বুড়ো নড়েচড়ে বসে বলল, হুজুর ছার।

বেঞ্চি দাঁত বের করে হ্যা হ্যা হেসে বলল, ঐ দ্যাখ, উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়েছে।

ছোকরাটি একটু দমে গিয়ে বলল, তাহলে বেতন বাড়িয়ে সরকারের উদ্দেশ্য কি ?

বেঞ্চি বলল, তোর মুত পেয়েছে কি ? যা মুতে তলপেট খালি করে আয়।

এমারজেন্সির কর্তব্যরত বলল, সব গুলপট্টি। ঢাকার কাগজে বেরিয়েছে কি ?

ছোকরাটি আবার বলল, কথা হচ্ছে বেতন বাডাবে কি বাড়াবে না।

এতক্ষণ কথা বলেনি একজন বলল, বাড়াবে।

বাড়াবে ? কেন ?

সরকার শিক্ষিত লোকের মুখ বন্ধ করতে চায়।

শিক্ষিত লোকের মুখ এমনিতেই বন্ধ আছে। বন্ধ থাকলেই ভালো। খুললে দুর্গন্ধে দেশে টেঁকা দায় হবে। শিক্ষিত লোক মারিওনা, ঢাকা আছে।

তবু কথা বললে যারা বলতে পারে তাদের খাইয়ে-দাইয়ে সরকার খুশি রাখতে চায়।

ওসব মামদোবাজি গণতান্ত্রিক সরকার করে। মিলিটারি গরমেণ্টের আবার খুশি-অখুশি কি।

এমারজেন্সি এবার অস্থির হয়ে বলল, এই চুপ, চুপ, হাসপাতালে বাজে কথার ইয়ে করি। বেতন বাড়াবে বাড়াবে। যাও দেখি এখন।

লোকগুলো উঠে চলে গেল। গনগনে আগুনে-গরম তামার পাতের মতো হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকল। চাষীদুটো একভাবে বসে আছে। একজনেরা আবার ঢুলুনি এসেছে। ভিতরের দিকে বারান্দায় টুকটুক করে হাসপাতালের মেয়েমানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। মাড় দিয়ে করকরে করে ইস্তিরী করা তাদের শাদা পোশাক দরজার ফাঁক দিয়ে একবার একবার দেখা যায়।

পায়ে কি হয়েছে?

বুড়ো আবার গোড়া থেকে শুরু করে, হুজুর, ছার।

একটা হাত তুলে এমারজেন্সি বলল, জিগগেস করছি পায়ে কি হয়েছে? বুড়ো ফস্ করে বলে বসে, পরশুদিন নাপিতের কাছে গেছিল তারপর—

নাপিত, তার মানে?

বুড়ো হড়বড় করে বলে যায়, হুজুর ছার, মনে করেন মাসখানেক আগে একটা কাঁটা ফুটেছিল। মনে করেন সকাল বেলায় বাড়ি থিকে জন খাটতে যেছে, এমনি সোমায় এই বড়ো একটা বাবলার কাঁটা—কি বাপ জমিরুদ্দি, অক্ত বেরুচ্ছিল—বুড়ো পা-ফোলা জমিরুদ্দিকে জিগগেস করে।

এমারজেন্সি বলল, কে হয় তোমার?

আমার কেউ নয়, গেরাম সম্পক্কে আমি উয়ার চাচা হই।

ঐ লোকদুটো ওর কে হয়?

কেউ হয় না হুজুর, এই ভাই বুলে ডাকে।

এখানে এনেছ কেন?

ওর বাপ নাই হুজুর।

দুত্তেরি, বাড়িতে টাঁসতে কি হয়েছিল। এখানে এনেছ কেন?

বুড়ো ভয়ে ভয়ে বলল, হুজুর হাসপাতাল বুলে।

হাসপাতাল তো কি হবে ?

হুজুর, গরিবের আর কি উপায় আছে ? পর্শুদিনকে নাপিত পা কেটে কাঁটাটো বার করতে গেলছিল, তাপর একদিনের মধ্যে এই আবস্তা, পায়ের ব্যাদনায় — পা-ফোলার হয়ে বুড়ো নিজেই ককাতে শুরু করে। চাষী দুজন দেয়ালে হেলান দিয়ে একভাবে বসে আছে।

এখানে কিছু হবে না — বলে এমারজেন্সি দরজা দিয়ে বাইরের গরম রোদের দিকে চেয়ে রইল।

আউটডোরে নিয়ে গিয়ে টিকিট করাও। আজ আর হবে না। কাল ওখানে গিয়ে টিকিট করাবে। বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে এমারজেন্সি বলে।

বুড়ো কিছুই বুঝতে না পেবে তার দিকে বোকার মতো চেয়ে থাকে। তার কাঁচা-পাকা দাড়ি থেকে এখন আর ঘাম ঝরছে না। ফোলা পা-টা তেমনি করেই মেঝেয় ছড়িয়ে অন্য পা-টি গুটিয়ে জমিরুদ্দি পিটপিট করে চাইছে।

এমারজেন্সি এতক্ষণে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। রোগা-চেহারা, বাঁদুরে হাত-পা, কানদুটো বড় বড়। লোকটা লম্বা ছিল, কিন্তু শিরদাঁড়াটা যেন মচকে গেছে। এগিয়ে এসে সে জমিরুদ্দির ফোলা পায়ের তলাটা দেখল। বেশ ঘন রস গড়াচ্ছে একটা ফুটো থেকে। নীল মাছিগুলো মহাব্যস্ত। পায়ের পাতার আঙুল দিয়ে টিপে সে জিগগেস করল, ব্যথা লাগে ? জমিরুদ্দি আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানাল লাগে।

এখানে হবে না বলে উঠে দাঁড়িয়ে এমারজেন্সি ঘরের বাইরে যাবার জন্যে এগিয়ে যায়। সে দোরগোড়ায় পৌঁচেছে, জমিরুদ্দি হাসপাতালের শব্দ, শুকিয়ে-ওঠা বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে হুস্ করে একটা ভয়াবহ নিশ্বাস ফেলল। বাইরে পা বাড়িয়ে এমারজেন্সি ফিরে তাকাল, ফের বলল, নিয়ে যাও এখান থেকে, হাসপাতাল ছাড়া টাসার কি আর জায়গা নেই ? বলে সে বাইরে চলে গেল।

এখন ঘরে তারা চারজন ছাড়া আর কেউ নেই। দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁসে একটা উঁচু সরু অয়েলক্লথ-মোড়া বেঞ্চি আছে। সেটার পাশে স্ট্রেচার মইয়ের মতো ঠেসানো। বুড়ো ফিস্‌ফিস্ করে বলে, এখুন কি হবে ?

চাষীদের একজন হাই তোলে, ঘুষ লেবে লিকিন ?

বুড়ো বলল, লিলে দেবে কে ? আমার কাছে পাঁচ আনা পয়সা আছে।

তাহলে ফিরে লিয়ে যাই। জমিরুদ্দি ফিরে যাবি ?

জমিরুদ্দি মাথা নেড়ে জানায় সে ফিরে যাবে না।

তালি? বুড়ো আকাশপাতাল ভাবনায় ডুবে যায়!

ছুটে এসে দুজন লোক ঘরে ঢোকে। একজন ছোকরা আর একজন আধবয়েসি। ছোকরার ভারি ফুর্তি—মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি ছুটছে, লাও লাও, ধরো, উপাশটা ধরো, আরে ধেত্তেরি আমার—ছেলেটি একটা নোংরা কথা বলল। আধবয়েসি ধীর-স্থির, বলল, শালা, মেগের ভাই. অতো ফুর্তি মারাচ্ছ কেন? তোমার তেল হয়েছে বাঞ্চোৎ। দেয়াল থেকে স্ট্রেচারটা নিয়ে তারা চলে গেল।

বুড়ো সঙ্গী দুজনের মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে, তালি? তাদের মাথার উপরে ফ্যানটা ঘটর ঘটর শব্দ করে বন্ধ হয়ে যায়। দমকা হাওয়ায় আবার খানিকটা আগুন ঘরে ঢোকে। স্ট্রেচার নিয়ে লোকদুটি ফিরে আসে। ভারি স্ট্রেচারটা বয়ে আনতে আধবয়েসি লোকটার কষ্ট স্পষ্ট। তার চোখদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ছোকরার হাতের পেশি ফুলে উঠেছে। অয়েলক্লথ মোড়া উঁচু বেঞ্চিটার সমান্তরাল করে স্ট্রেচার কাৎ করতেই বালির বস্তার মতো একটা মানুষ গড়িয়ে অয়েলক্লথের উপরে পড়ল। ছোকরা ঝট করে স্ট্রেচারটা নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেই দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিতে দিতে আধবয়েসি লোকটাও তার পিছু নেয়।

বুড়ো চেয়ে দেখে বেঞ্চির উপরে লোকটার জ্ঞান নেই। মাথার খুলি খোলাম কুচির মতো যেখানে সেখানে ভাঙা। রক্তে সমস্ত মুখটা ডুবে গিয়েছে। কিছু কিছু রক্ত এর মধ্যেই শুকিয়ে কালচে হয়ে এসেছে। শুধু একটা চোখের নিচে থেকে এখনো টকটকে লাল টাটকা রক্ত গড়াচ্ছে।

উরি বাপরি সব্বোনাশ—বলে বুড়ো দু'হাতে চোখ ঢাকে।

চাষীদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছে ঘাড় গুঁজে। জমিরুদ্দি ঠিক তেমনিই চোখ পিটপিট করে যাচ্ছে।

কই. কই. কোনদিকে—এই তো এদিকে আনলো—বলতে বলতে একদল লোক ঘরে ঢুকে উঁচু বেঞ্চিটা ঘিরে ধরে লোকটাকে পরখ করে দেখতে লাগল।

ট্রাকটার নম্বর কত? দলের একজন বলে।

কি করে জানব? ট্রাক চলে গেলছে।

রিশকয় লোক ছিল?

কি করে জানব? রিশক গুঁড়ো হয়ে গেলছে।

ওদের পিছনে এখন এমারজেন্সির লোকটিকে দেখা যায়। তার পিছনে

ডাক্তার। ডাক্তারের শাদা জীনস-এর এ্যাপ্রোনটায় কোথাও একটু ধুলোময়লা নেই। তিনি সোজা লোক ঠেলে উঁচু বেঞ্চিটার কাছে এসে লোকটার মাথা ধরে নাড়া দিতেই গোলাপি-শাদা খানিকটা গলা মগজ বেরিয়ে এসে বেঞ্চির একটা পা ধরে নামাতে থাকে।

ডাক্তার ঠাণ্ডা গলায় বলেন, এক্সপায়ার্ড। বলে সেখান থেকে সরে আসেন। কি হলছে, কি হলছে ? অনেকগুলো লোক একসাথে চেঁচায়।

মরে গেলছে ?

হ্যাঁ, মরে গেলছে।

মরা লোকটার মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে দেখে আর কোনো কথা না বলে লোকগুলো মিছিল করে বেরিয়ে যায়। তারা চলে গেলে লোকটা মরা চোখে দরজার মধ্যে দিয়ে বাইরে লম্বা কটা ঘাসের উপর দিয়ে নীল ইস্পাতের মতো আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলেন, এরা ?

এমারজেন্সির লোকটা শুধু ঘাড় ঝাঁকায়। ডাক্তার জমিরুদ্দির কাছে এসে তীক্ষ্ণ চোখে তার ফোলা পায়ের ক্ষতটার দিকে চেয়ে থাকেন। খানিকক্ষণ দেখে বুড়োর দিকে চেয়ে বলেন, এ বাঁচবে না। যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন কিছু করার নেই। কি হয়েছিল ?

বুড়ো এবার বেশ ঠাণ্ডাভাবেই বলে, হুজুর, মাসখানের আগে একটা বাবলার কাঁটা ফুটেছিল। তারপর এই পশু।দন নাপিতের কাছে যেয়ে—

বুঝতে পেরেছি—নাপিতেই বাকি কাজটা সেরে দিয়েছে। নিয়ে যাও।

জমিরুদ্দির শুকনো চোখে পানি চকচক করে ওঠে। এমারজেন্সি ঘাড় নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে থাকে। তখন ডাক্তার বলেন, কাগজ ঠিকঠাক করে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিন। লাভ কিছু নেই।

ডাক্তার চলে গেলেন। এমারজেন্সিও তাঁর পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেল। মরা লোকটার মাথা উঁচু বেঞ্চি থেকে ঝুলে পড়েছে। বুড়ো এদিক ওদিক চেয়ে দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে বেঞ্চিটার কাছে এসে তার মাথাটাকে সোজা করে দেয়। তারপর চট্ করে চোখের পাতাদুটি টেনে বন্ধ করে দিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে।

এমারজেন্সির সঙ্গে স্ট্রেচার-বওয়া ছোকরাটি আর সেই আধবয়েসি লোকটা ফিরে এসেছে।

জমিরুদ্দিকে সে দেখিয়ে বললে, একে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে রেখে এসো।

আধবয়েসি লোকটা রাগে গজগজ করতে লাগল, আমরা মানুষ তো না কি? আর কি কেউ নাই?

এমারজেন্সি তার পিঠ চাপড়ে দেয়, যা যা রেখে আয়—বেচারির হাসপাতালে মরার শখ হয়েছে। যা রেখে আয়! বুড়োর হাতে সে একটুকরো কাগজ দিল।

জমিরুদ্দি খানিকটা চেষ্টা করে টেনে হিঁচড়ে নিজেই স্ট্রেচারে উঠল। ওদের সঙ্গে বুড়ো হাসপাতালের ভিতরের বারান্দায় চলে আসে। চাষী দুজন বসে আছে। এখন দুজনেই জেগে।

জমিরুদ্দিকে নিয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় স্ট্রেচারের একটা দিক এমন ঢালু হলো যে সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো। ছোকরাটা কোনোরকমে সামলে নিল। দোতলায় উঠে একটা ঘরে ঢুকে তাকে স্ট্রেচার কাৎ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে লোকগুলো প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। জমিরুদ্দি গড়িয়ে পড়তে পড়তে বহুকষ্টে কনুইয়ে ভর দিয়ে সামলায়, ফোলা পা নিয়ে তার প্রায় কিছুই করার থাকে না। বুড়ো কুণ্ঠিতভাবে কাগজটি নিয়ে ঘরে ঢুকে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালে টেবিলের পিছনে বসে-থাকা লোকটি হাত বাড়িয়ে কাগজ নিয়ে বলে, রুগী কই?

বুড়ো বলল, ঐ যি। বলে সে হাঁফাতে থাকে।

বেড নেই, মাটিতে থাকতে হবে। পারবে?

কি বুলছেন হুজুর?

বলছি, বিছানা নেই, মাটিতে থাকতে হবে। থাকতে পারবে তো?

পারবে হুজুর।

ঠিক আছে—ঐখানে নিয়ে যাও।

বুড়ো চেয়ে দেখে সারি সারি লোহার খাট। ঘরের পশ্চিমদিকে দুই খাটের মাঝখানে হাত দুয়েক চওড়া একটা ফাঁকা জায়গায় জমিরুদ্দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার। চোখে অন্ধকার দেখে সে। জমিরুদ্দি রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে। জমিরুদ্দির কাছে এসে বলে, জমিরুদ্দি, বাপ, ঐখানটেয় যেতে হবে যি।

জমিরুদ্দি চোখ তুলে তার দিকে তাকায়। বুড়ো তখন জমিরুদ্দির পিছনে দিয়ে তার দুই বগলের তলায় হাত রেখে তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। জমিরুদ্দি অবশ্য তার ভালো পা-টাকে ব্যবহার করছে। খানিকটা করে তাকে টেনে নিয়ে বুড়ো থেমে যায়, তার বুকের ভিতর থেকে হাপরের শব্দ আসে।

বাপ, জমিরুদ্দি, আর একটু—বুড়ো মোলায়েম করে বলে বটে, কিন্তু সে ঘরের কিছুই দেখতে পায় না, সব আবছা ধোঁয়ার মতো হয়ে যায় তার চোখের সামনে। সারি সারি রুগী শুয়ে আছে। তাদের ভিতর দিয়ে লোকজন হাঁটছে কথা বলছে, বুড়োর কিছুই কানে আসে না, চোখেও পড়ে না। জমিরুদ্দিকে ফাঁকা জায়গাটায় এনে সে নিজেই হুমড়ি খেয়ে দেয়ালের উপর পড়ে। এক-নাগাড়ে হাঁফিয়ে বুড়ো যখন একটু ধাতস্থ হয়েছে, যে লোকটি তার হাত থেকে কাগজ নিয়েছিল সে এসে বলল, বাস, ঠিক আছে।

বুড়ো তার ভুরুর উপর থেকে ঘাম মুছে বলল, আমাকে আর কি করতে হবে হুজুর?

কিছুই করতে হবে না। যা করার আমরাই করব।

আমি তাইলে যাই?

যেতে পারো।

বুড়ো আর কথা খুঁজে পেল না। লোকটাও আর সেখানে দাঁড়াল না।

বুড়ো বলল, জমিরুদ্দি, ভুখ লেগেছে?

জমিরুদ্দি একটা ভয়াবহ ফ্যাঁশ শব্দ করে উঠল। হিম ঠাণ্ডা শব্দ। গলার ভিতরের গভীর গর্ত থেকে আসছে। তার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে বুড়ো মানুষটি বুঝল যে সে মানুষের ভাষাতেই কথা বলছে, আর কথা বলতে তার পুরো শক্তিটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তবু কান না পাতলে কিছুই শোনা যায় না।

তেমনই চোখ মুখ ছিঁড়ে মদ্দা হাঁসের মতো ফ্যাঁশ করে সে বলল, না গো।

বুড়ো তার ময়লা হাফশার্টের পকেট খুঁজে আধখানা শক্ত টক গন্ধ-অলা রুটি বের করে বলল, রাখ্, ভুখ লাগলে খাস।

জমিরুদ্দি আবার বলল, না গো।

না বুলিস না, রেখে দে।

জমিরুদ্দি চুপ করে রইল।

আমি তালে যাই বাপ?

চাচা। জমিরুদ্দি ডাকে।

তার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে বুড়ো বলে, কি বুলছিস?

ফোঁস করে তার কানের উপব গরম নিশ্বাস ফেলে জমিরুদ্দি বলল, মরে

তো যাবো চাচা—আর দেখা হবে না। মনে কিছু নিয়ো না।

বুড়ো একবার বলার চেষ্টা করল, না মরবি ক্যানে?

নিজের কানেই তো শুনলে চাচা। ডাক্তারকে একবার শুদোও ক্যানে কদিন দেরি আছে। তিন-চার দিন সময় পালি একবার ছেলে তিনটোকে এনো ক্যানে।

বউকে দেখবি না?

জমিরুদ্দি বলে, দেখব চাচা।

বুড়ো একটু দাঁড়িয়ে থেকে কোমরে হাত দিয়ে খুঁজে পেতে কিছু একটা পেয়ে গিয়ে বলে, তোর কাছে কিছু নাই, আমার কাছেও তো বাপ কিছু নাই, এই বারো আনা পয়সা ছিল, তুই রাখ। এই বলে বুড়ো জমিরুদ্দির ডান হাতের বিরাট থাবা খুলে তার ঘেমো মুঠোর মধ্যে খুচরা কিছু পয়সা দিয়ে দেয়। জমিরুদ্দি বুড়োর শুকনো হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে যায়।

একটু রূঢ়ভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একবারও পিছনে না চেয়ে বুড়ো সোজা বাইরে চলে এল।

সন্ধের পরে দলবল নিয়ে ডাক্তার আসেন। তাঁর চৌকো মুখটা বসন্তের দাগে ভরা। চোয়ালদুটো চওড়া আর মজবুত। তিনি ঘরে ঢুকেই হাসপাতালের দু'সারি বিছানার মাঝখানের সরু পথটা দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে যান আর আড়-চোখে এক একজন রুগীর দিয়ে চেয়ে মন্তব্য করেন, সেই আলসারের রুগী বুঝি। বেঁচে আছে এখনো? বাঁচার কথা নয়। ও বাঁচলে মেডিক্যাল সায়েন্স মিথ্যে হয়ে যাবে। বাঁ দিকের বিছানার দিকে চেয়ে বলেন, গলব্লাডারে স্টোন? সঙ্গীসাথী মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ মটকে বলেন, দারোগা না? মালদার আদমি। গলব্লাডার স্টোন, হাঃ। আপনার কি? এখানে বসে বসে কি করছেন? একটা বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কালো রোগা একটা লোক ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে কোণঠাসা নেড়ি কুকুরের মতো বিব্রত অপ্রস্তুতভাবে সবকটি দাঁত বের করে ফেলে। ডাক্তার খেঁকিয়ে ওঠেন, এখানে কি, কাল চলে যাবেন। —এই, আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো, কাল একে রিলিজ করে দেব।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে রুগী দেখা শেষ করে এবার তিনি যারা খাট না পেয়ে মেঝেতে জায়গা নিয়েছে, তাদের দিকে ফিরে ফেটে পড়লেন, এত

লোক মাটিতে কেন ?

কর্তব্যরত লোকটি ছুটে এল, বিছানার ব্যবস্থা করা যায়নি স্যার। তাছাড়া অত বিছানা পাতার জায়গাও নেই।

তাহলে এদের ভর্তি করা হয়েছে কেন ?

ভর্তি করার মালিক তো আমি নই স্যার। আর. এস. সাহেব পাঠালে আমি কি করব।

আর. এস. সাহেবের আর কি ? খুচ করে লিখে দিলেই হয়ে গেল। হসপিটালের একটা ডিসিপ্লিন নেই ? মাটিতে রুগী থাকবে ? কাল সব বিদায় করে দিন।

ওরা কেউ হেঁটে আসেনি স্যার। সবাইকে স্ট্রেচারে করে দিয়ে গেছে।

তাহলে স্ট্রেচারে করে বাইরে নর্দমায় ফেলে দিয়ে আস্থন। মরবে তো সবাই —অত কায়দা করে মরতে হবে না।

আর. এস. সাহেব বলেন যাদের ভর্তি না করলেই নয় একমাত্র তাদেরই তিনি ভর্তি করেন। সবই তো ক্রিটিক্যাল কেস স্যার।

ক্রিটিক্যাল কি ক্যাল আমি জানি ! হাসপাতালে জায়গা না থাকলে কোথায় রাখা হবে ? মেঝেতে পা ফেলার ঠাঁই নেই—বারান্দা দিয়ে হাঁটার উপায় নেই। ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। এরপর রুগী তো আমার বেডরুমে পাঠিয়ে দেবেন দেখছি। এক ঘণ্টার মধ্যে যে রুগী মরবে না, তাকে যেন এখানে ভর্তি করা না হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে মরা চাই।

তাতেও জায়গা হবে না স্যার—কর্তব্যরত লোকটি গাল চুলকোতে চুলকোতে নিরীহভাবে মন্তব্য করে।

ডাক্তার শুধু একবার অনিশ্চিতভাবে হাঃ বলে কোণের দিকে মেঝেতে যে রুগীটি শুয়ে আছে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু নিচু হয়ে ঝুঁকে তিনি বলেন, এ ছোঁড়াটা কে ? বলতেই যে কালো দাড়ি-অলা লোকটা সেখানে বসেছিল, সে হাউমাউ করে উঠল, ছার, আমার পোলা, ছার, রেলে কাটা গেইছে। আমার একটা মাত্তর পোলা ছার—

রেলে কাটা গেছে তো হাসপাতালে কেন ? মরেনি ?

একটা পা কাটা গেইছে ছার।

পা থেকে মাথা তো বেশিদূর নয় বাপ। ফস্কালে কি করে ?

এই কথা শুনে লোকটা ঝট করে কান্না থামিয়ে দিয়ে, চোখের পানি-টানি

শুকিয়ে একদৃষ্টে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল।

ডাক্তার বললেন, দেখি, কাপড় সরাও।

কাপড় সরালে দেখা গেল, ব্যাণ্ডেজ থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে তখনো রক্ত পড়ছে। একটু লক্ষ্য করে ডাক্তার পিছন ফিরে বললেন, কি ওষুধ দেওয়া হয়েছে, দেখি। প্রেসক্রিপশনটা দেখে-টেখে আবার বললেন, রাতটা টি'কলে কাল দেখা যাবে।

সবশেষে জমিরুদ্দির পালা। সে উত্তর দেয়ালের কোণের দিকে ছিল। ডাক্তার চোয়াল নাড়িয়ে দাঁত কড়মড় করে জিগগেস করেন, তোমার কি ?

জমিরুদ্দি ফ্যাঁশ করে সেই নিঃশব্দতার ছোরা চালিয়ে কি যে বলল ডাক্তার শুনতে পেলেন না। কোমরের পেছনে দুহাত বেঁধে ঝুঁকে নিচু হয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে মুখ বিকৃত করে বললেন, এঁ্যা।

জমিরুদ্দি সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড়ো করে বলল, আমার পা ছার ! পায়ে কি ? বলে ডাক্তার আরো নিচু হয়ে তার ফোলা পা-টাকে ভালো করে দেখে বললেন, হুঁ। বলে কোনোদিকে না চেয়ে দলবল নিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

রাত বেড়ে যায়, কিন্তু কোনো আলো নেভানো হয় না। শাদা পোশাকে নার্সেরা বিছানায় বিছানায় ঘোরাঘুরি শুরু করে। দেয়ালে হেলান দিয়ে জমিরুদ্দি চোখ বন্ধ রাখে। বিছানা নেই, খালি মেঝেয় তার পা পিছলে পিছলে যাচ্ছে। ফোলা পা-টাকে মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে সে মরণের কথা ভাবতে থাকে। পায়ের ক্ষতটা একবার কটকট করে কামড়ে উঠলে তার মনে হলো মরণটা সেখানেই ঘাপটি মেরে বসে আছে। জমিরুদ্দি মনে করার চেষ্টা করে কেমন করে একদিন সকালবেলায় ভোরের শিরশিরে হাওয়ার মধ্যে সে গামছায় গা জড়িয়ে নিয়েছিল, হাতে ছিল পুরনো শাদা কাস্তেটা—এই সময়ে হঠাৎ পায়ে তার ফুটল একটা ধারালো শক্ত কাঁটা, মগজে যেন কিসে একটা আঁচড় কেটেছিল খড়াং করে, নিচু হয়ে বসে জমিরুদ্দি তার বাঘথাবার মোটা মোটা আঙুল দিয়ে কাটাটাকে বের করার চেষ্টা করতেই পট করে সেটা মাঝ বরাবর ভেঙে গেল, একটুও রক্ত এলো না, ভিতরটা একবার শুধু কনকন করে উঠল, মাথার মধ্যে আরো দুবার আঁচড় কাটার খড়র খড়র আওয়াজ হয়েছিল, জমিরুদ্দি উঠে দাঁড়িয়ে গামছাটা গা থেকে খুলে কোমরে বেঁধে বেড়া বাঁধার কাজ পেয়ে সাত টাকা রোজগার করে হাট থেকে যে চাল কিনেছিল তাতে রাতে

তিনছেলে বউ আর সে নিজে পেটপুরে খেতে পেয়েছিল, সেই রাতে স্ত্রীসহবাসে সে খুব আনন্দ পায়, কাঁটার কথা তার কোথাও মনে ছিল না। এই ঘটনার কতদিন পরে ঠিক বলা যায় না, জমিরুদ্দি লক্ষ্য করে কাঁটা ফোটার জায়গাটায় একরত্তি পুঁজ জমে শাদা হয়ে আছে আর এই পুঁজের চারপাশটা শক্ত, জোর করে টিপলে তবে সামান্য ব্যথা লাগে। এই ব্যাপার তাদের প্রত্যেকেরই হামেশা হচ্ছে—কে আর খেয়াল করে—হাতের কাছে গাঁয়ের নাপিতকে পেয়ে সে অনুরোধ করে বসে কাঁটাটা বের করে দিতে। লোকটা তো তার কথা না-ও শুনতে পারত। কিন্তু ক্ষুর, চিমটে, নরুণ এইসব নিয়ে সে কাজে লেগে গেল। কাঁটাটা কি বের করতে পেরেছিল? জমিরুদ্দি জানে না। সে একটুও সন্দেহ করতে পারে না যে গাঁয়ের ভালোমানুষ নাপিতটি নরুণের সরু ডগা দিয়ে পুঁজের ঐ ছোট্ট গর্তটায় মরণকে বসিয়ে দিয়েছে। দুপুর থেকে যেদিন তার জ্বর জ্বর লাগছিল, মাথা ঝিম ঝিম করছিল, সেইদিন রাতদুপুরে সমস্ত পা-টা ফুলে গেল। সকালে সে নিজেই বুঝে যায়, বাঁচার কোনো উপায় নেই। কিন্তু জমিরুদ্দির মরারও কোনো উপায় নেই। তার কুঁড়েঘরের দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে দেখল, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ চড়ে গেল, গরম শুকনো হাওয়া দিতে লাগল, কুণ্ডলি পাকানো শাদা মেঘের মতো ধুলো উঠল, একটা পোড়া কালো ভাঙা মাটির হাঁড়ি দিয়ে উনুন চাপা দেওয়া। জমিরুদ্দি কাজে বেরুতে পারল না, কাজেই আজ রাতেও উনুন হাঁড়ি চাপা থাকবে; আস্তে আস্তে সবকিছু তার মাথার মধ্যে গুলিয়ে উঠলে কারা যে তাকে ধরাধরি করে গোরু গাড়িতে চাপায়, ধুলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে ভ্যাপসা গরম আখের খেতগুলোর ভিতর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলে—এসব কিছুই এখন তার মনে পড়ছে না। জমিরুদ্দি চোখ খুলে চট করে একবার চেয়ে দেখে, আলোয় ঘর ভর্তি—শাদা ধুলোয় যেমন আকাশ ভরে গিয়েছিল ঠিক তেমনি, একটা বিছানাও তার চোখে পড়ে না। তাহলে এক্ষুনি কি তার মরণ হচ্ছে? সে তার ফোলা পা-টায় একবার হাত বুলোয়, ভোঁতা ভারি, আরো ভারি মুঠো দিয়ে দুটো ঘা দিতেই বুকের ভেতর থেকে ধুপ ধুপ আওয়াজ উঠে আসে। একবার চিমটি কেটে দেখে। চিন চিন করে ওঠে। মরলে ঠিক কি রকম লাগবে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। তার নিশ্বাসের সঙ্গে খুব মৃদু একটা আঃ শব্দ উঠে আসে। নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটাও বাইরে বেরিয়ে যায়। জমিরুদ্দি এতক্ষণে পুরো চোখ তুলে তাকায়।

সামনের বিছানা থেকে টুক করে লাফ দিয়ে একজন নেমে তার কাছে বসে

ফিসফিস করে ওঠে, তোমার নাম কি?

জমিরুদ্দি দুটো নিশ্বাসের সঙ্গে দুবার ঘড়ঘড়ে আঃ আওয়াজ করে।

কাঁথাটাঁথা কিছুই আনোনি তুমি? লোকটা জিগগেস করে।

জমিরুদ্দি চোখ বন্ধ করে ফেলে।

তোমার নাম কি—ও চাচা?

এবার কথা তার কানে ঢোকে। জমিরুদ্দি বুঝতে পারে মরার কথাটা ঠিক এক্ষুণি নয়।

সে বলে, আমার নাম? আমার নাম জমিরুদ্দি।

তোমার বিছানা নেই? একটা কাঁথাও আনতে পারোনি।

না বাবা—জমিরুদ্দি একইরকম হাঁসের গলায় বলে।

এই বালিশটা নিয়ে শুয়ে পড়ো।

থাক গো—জমিরুদ্দি বলে।

লোকটা বসে বসেই তার বিছানার উপর থেকে একটা বালিশ নিয়ে তার কাছে রেখে দিয়ে তেমনিই চাপা গলায় বলে, এখানে যে আসবে সেই মরবে। বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। সব ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। বলে সে সরল বালকের একটু হাসি হাসে। আলোতে তার দাঁতগুলো ঝকঝক করে ওঠে, তবে একটু ঘুমোতে পারলেই ভালো চাচা—মরার আগে কষ্ট করে লাভ কি?

জমিরুদ্দি চুপ করে থাকে।

আমার নাম রাশেদ, আমিও তোমার মতো হাসপাতালে মরতে এসেছি—লোকটা বলে।

জমিরুদ্দি তার কথা ভালো বুঝতে পারে না।

আপনার কি হলছে গো? সে বোকা মতো জিগগেস করে।

মরবার আগে তোমাকে বলে যাবো চাচা। শুয়ে থাক এখন—বলে রাশেদ টুক করে লাফ দিয়ে নিজের বিছানায় উঠে যায়।

জমিরুদ্দি বালিশটা টেনে নিয়ে শোবার চেষ্টা করে। ফোলা পা-টার কোনো ব্যবস্থা সে করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত বালিশটা দেয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে আধশোয়া হয়ে সে একটু আরাম পায়। তার মাথার কাছের চুপচাপ বিছানাটা এই সময় একটু নড়ে ওঠে। জমিরুদ্দির খুলুনি এসেছিল। বিকট উহুহু আওয়াজে সে চোখ খুলে চেয়ে দেখে মাথার কাছে বিছানায় একটা লোক উঠে বসেছে। ঝকঝকে আলোয় তার ফ্যাকাশে মুখ দেখতে পাওয়া গেল, চোখদুটো

কোটর ঠেলে থেকে বেরিয়ে আসছে, তলপেট চেপে ধরে সে চিৎকার করে উঠল, উরি বাবা, মরে গেলাম, আরে এই, উরি শালার, নাঃ, বাবারে—

একজন নার্স তার কাছে এসে বলে, কি হয়েছে ?

মরে গেলাম।

চুপ করে শুয়ে থাকুন।

মরে গেলাম, মরে গেলাম।

এতক্ষণ তো বেশ চুপ করে ছিলেন, হঠাৎ কি হলো ?

লোকটা ফেটে পড়ল, হয়েছে আমার মাথা। যান এখান থেকে।

নার্স তার কাছ থেকে সরে যেতেই তিন বিছানা দূরে একজন বেশ শান্তভাবে শুরু করে, বা বা বা, ঠিক ঠিক ঠিক, আয় চলে আয়, আয়, শালা চলে আয়, দেখি তোর কত ক্ষ্যামতা—বলে সে তার তলপেটের নিচের দিকে টোকা দিয়ে বলল, ভ্যালা বাপ, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন—

নার্স তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। লোকটা নিজের যন্ত্রণাকে টিটকিরি দিয়ে ওঠে, ইহিহিহি, বটেরে, আমার জাদু, তোর পাছায় আজ বাঁশ দোব। সে হাঁফাতে লাগল, বিছানা খিমছে খিমচে ধরতে লাগল, চোখ ফেটে পানি গড়িয়ে পড়ল, তবু সে একরোখার মতো নিজের কষ্টকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকে, শুয়োরের বাচ্চা, দেখব দেখব, কতদূর যাস, তোর মাকে আজ—

নার্স জিগগেস করে, খুব কষ্ট হচ্ছে ? শুয়ে থাকুন।

চারপাশ থেকে গোঙানির আওয়াজ আসতে থাকে। এতক্ষণ ঘরটা চুপচাপ ছিল, এখন নানাদিক থেকে শব্দ ভেসে আসে। জমিরুদ্দির মাথার উপরে লোকটা জখম শুয়োরে মতো একনাগাড়ে চিৎকার করে চলল। কানে তালা লেগে যায় সেই শব্দে, তিন বিছানা দূরে লোকটা হুহু কেঁদে উঠে কেবলি বলতে থাকে, দেখব রে শালা, দেখব, উহুহু, হিহিহিহি, বটে বটে বটে, বা বা বা। রেলে কাটা-পড়া ছেলেটার বাপ ছেলের হয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। মানুষের যন্ত্রণার তরঙ্গে ঘরটা ডুবে গেলে নার্সগুলো আঁকুপাঁকু করে তীব্র গলায় ধমক লাগায়, চুপ করুন, চুপ করুন, এই এই, কি হচ্ছে ?

মুখে বসন্তের দাগভর্তি ডাক্তারটি সকাল নটায় এসে তাঁর ঘরে বসলেন। প্রথমেই তিনি রাশেদকে ডেকে পাঠান। রাশেদ এসে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে তাঁর চোখদুটি হাসছে। হাসিটা আর একটু টেনে মুখ পর্যন্ত এনে ঠোঁট বাঁকিয়ে তিনি বলেন, আপনার ব্যাপারটার কি করলেন ?

আমি কি আর করব, যা করবার আপনারাই তো করবেন—রাশেদ একটু অবাক হয়ে বলে।

বুঝলেন না—ডাক্তার মজা করে চোখ মটকে বলেন, আপনারা শিক্ষিত লোক, আপনাদের মত ছাড়া কি কিছু করা চলে?

বাঃ, আমার হয়েছে রোগ, আপনি ডাক্তার, যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

বসুন—একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে ডাক্তার বলেন, ডাক্তারদেরই সবকিছু করার কথা বটে কিন্তু এদেশে নয়। বুঝলেন, এদেশে নয়। আমি এরকম দুটো ওয়ার্ড দেখছি। এখন হাসপাতালে সার্জারিতে একমাত্র আমিই প্রফেসর আছি। একবার হিশেব করুন—দুটো ওয়ার্ডে কজন রুগী হতে পারে। না না, হিশেব করুন না! মেঝেতে আর বারান্দায় যারা আছে, আর যারা গ্রাম গঞ্জ থেকে পিলপিল করে আসছে, এখন পথে আছে—তাদের সবাইকে হিশেবের মধ্যে ধরুন। আচ্ছা, এদের মধ্যে কজনকে এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে বলুন। প্রত্যেকদিন কটা করে অপারেশন করতে হবে বলুন? গ্যাংগ্রিন-এ পচে গেছে, আলসারে স্টমাক ফুটো হয়ে গেছে, রেলে কাটা পড়ে পচন শুরু হয়েছে, হার্নিয়া বার্স্ট করেছে, এ্যাপিন্ডিসাইটিসের যন্ত্রণায় হার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—কোন্ অপারেশনটা দুদিন পরে করলে চলে?

এতগুলো কথা বলে ডাক্তার যখন দু'চোখ বন্ধ করে মোলায়েমভাবে হাসলেন, তখন তাঁকে খুব খারাপ দেখাচ্ছিল না।

হাসিটা শেষ করে আবার শুরু করলেন, একটাও দেরি করা চলে না—বুঝেছেন, সব এক্ষুনি করতে হবে। অপারেশন করতে হলে কি কি করতে হয় জানেন তো? রক্ত পায়খানা প্রস্রাব পরীক্ষা, চমৎকার করে এক্সরে, অঢেল রক্ত জমা করে রাখা, এ্যানাসথেসিয়ার ব্যবস্থা—ইত্যাদি। আমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসবেন চলুন। অবস্থাটি আপনাকে একবার দেখিয়ে আনি। এর মধ্যে আমাকে আবার কলেজে পড়াতে হয়। কি করব আমি—এবার ডাক্তার খুব বিরক্তমুখে রাশেদের দিকে তাকান। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার হাসতে হাসতে বললেন, অতএব এদেশে কোনো চিকিৎসা নেই। কশাইয়ের মাংস-কোপানো কুড়ুল আর জবাই করার ছুরি—এই দুটি অস্ত্রই আমার জন্যে যথেষ্ট। সপ্তাহে অপারেশনের দুটি দিনে এই দুটি অস্ত্র চোখ বন্ধ করে চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর কি করার আছে? সেইজন্যে অপারেশন হয়ে লোক মরছে, না হয়ে মরছে। যার আজ

অপারেশন দরকার, তার হবে পনেরো দিন পরে। সে বেঁচে থাকবে কি ইয়ার্কি মারতে? না মন্ত্রের জোরে?

রাশেদ এতক্ষণে একটা কথা বলল, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই কেন?

ট্রান্সফার, ট্রান্সফার—ডাক্তার হতাশ গলায় বলেন, পেরিফেরি থেকে পেরিফেরিতে, সেন্টার থেকে পেরিফেরিতে নয়—অর্থাৎ এখান থেকে আর এক মফস্বলে, ঢাকা থেকে এখানে নয়। ঢাকা হলো সেন্টার—সেখান থেকে বাইরে পেরিফেরিতে কেউ আসবে না, আর পেরিফেরি থেকে ঢাকায় বদলি হবে তেমন ভাগ্য দু-চারজনেরই। কাজেই ঘুরে মরো পেরিফেরি থেকে পেরিফেরিতে। এই ধরনের ট্রান্সফারের প্রতিবাদে দুজন লম্বা ছুটি নিয়ে বসে আছেন, ট্রান্সফার স্বীকারও করবেন না, অস্বীকারও করবেন না। কাজেই যাঁরা ছুটি নিয়ে বসে আছেন, তাঁদের বদলিতে লোক আসছে না। এর মধ্যে তদবির-টদবিরে ট্রান্সফার বন্ধ হয় ভালো না হলে এই অবস্থাই চলবে।

তা এঁরা গেলেই পারেন, চাকরি যখন বদলির, যাওয়াই তো উচিত।

বিনা প্ররোচনায় ডাক্তার ঝকঝকে দাঁত দেখালেন, আপনি তো বেশ বলে দিলেন যাওয়াই তো উচিত। কেন? যাবে কেন? এখানে প্র্যাকটিশ নেই? গভর্নমেন্টের বেতনের টাকার আমাদের কি হয়? চাকরি করতে হয় করছি—নইলে বেতনের টাকায় হবেটা কি? একজন প্রফেসর প্রাইভেট প্র্যাকটিসে কত রোজগার করে মাসে, আপনার কোনো ধারণা আছে? কেউ কেউ লাখ টাকাও কামিয়ে নিচ্ছে। তবে? প্র্যাকটিশ 'মিয়ে, বাড়িতে ক্লিনিক টিনিক-করে হয়তো একজন কেবল বসেছে, সেই সময়ে ট্রান্সফার। তা আবার কোথায়? আর এক মফস্বলে। এতে লাভটা কার বলুন—সবকিছুকে শুধু শুধু ডিসটার্ব করা ছাড়া আর কি হয় এতে? একটা জায়গায় বড় ডাক্তাব থাকলে, হাসপাতালে না হোক ডাক্তারের বাড়িতে তো পয়সা খরচ করে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়। পয়সাঅলা লোকদের তো একটা সুবিধে হয়। পয়সা যাদের নেই, এদেশে তাদের চিকিৎসা নেই আগেই তো বললাম আপনাকে। ঢাকার ডাক্তার ট্রান্সফার নিয়ে বাইরে আসেন না কেন জানেন? ঐ পয়সার মধু!

তাদেরও তো বদলির চাকরি—তাদের ট্রান্সফার হয় না কেন? রাশেদ ন্যাকার মতো জিগগেস করল।

ডাক্তার হাসলেন, ঢাকার প্রফেসাররা বদলি হবেন? তাহলে তো দেশে হাহাকার পড়ে যাবে। শুনুন, ঢাকাতে বহু প্রফেসরের দাড়ি-গোঁফ গজাতে

দেখেছি, পাকতে দেখেছি, এখন ঝরে পড়তেও দেখছি। যা কিছু আপনি কল্পনা করতে পারেন, এবং যা কিছু আপনি কল্পনা করতে পারেন না, এদেশে তা সবই সম্ভব। যেসব লোক গভর্নমেন্টের ডিসিশন মেকিং-এ আছে তাদের প্রত্যেকেই সেয়ানা। কিন্তু ডিসিশনটি নেওয়া হলে দেখবেন একটা গাধাও তার চেয়ে ভালো ডিসিশন নিতে পারত। আর একটু তলিয়ে ভাবলে বুঝবেন আপনিই গাধা, প্রতিটি ডিসিশনের গুহ্য অর্থ আছে। গুহ্য, অতি গুহ্য অর্থ, বুঝেছেন? এই ছোট দেশে প্রত্যেকটি শিয়াল রাজা, প্রত্যেকটি রুই-কাৎলা পরস্পরকে চেনে। সবাই সবাইয়ের পকেটে—বলে ডাক্তার খানিকটা শিয়ালের মতোই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে নিলেন। হাসিটা শেষ করে ফের গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনার ব্যাপারটা কি করব বলুন।? আমি বলি কি আপনি কেটে পড়ুন।

কিন্তু এখন অপারেশন না করলে তো পরে অসুবিধা হবে?

হবে।

তবে?

আরে সেই জন্যেই তো জিগগেস করছি। ভ্যালা মুস্কিল বটে! আপনার পেটে একটু বিদ্যে না থাকলে এতদিনে হয় আপনাকে খেদিয়ে দিতাম আর না হয় খ্যাঁচ করে ছুরি চালিয়ে দিতাম। লেখাপড়া শিখেই তো মুশকিলে ফেলেছেন।

আপনি আমাকে গোমূর্খ জ্ঞান করুন—রাশেদ বলল।

যে কথাটি বললেন, গোমূর্খ হলে তো এই কথাটিই বলতে পারতেন না।

তাহলে আর আমি কি করব—হতাশ গলায় রাশেদ বলে।

শুনুন, ডাক্তার ভীষণ গম্ভীর, চোদুখটি কুঁচকে গেছে, বসন্তের খোঁদলগুলোর ভিতর থেকে তেলের মতো চটচটে ঘন ঘাম বেরিয়ে আসছে,—শুনুন, আমার বাসায় প্রাইভেটলি এই কাজটি করতে আপনার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নিতাম। একটি পয়সা কম নয়। কিন্তু তার উপায় নেই, আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেছেন। টাকা যখন পাচ্ছিই না, বিনি পয়সায় দুটো ভালো উপদেশ দিতে দোষ কি। শুনুন তাহলে, আপনার এই জিনিশটা না কাটলে আপনি এক্ষুনি মরছেন না—কিন্তু কাটলে—

কাটলে? রাশেদ উৎসুক গলায় জিগগেস করে।

এই ব্লিডিং-ফ্লিডিং—একগাদা শিরা কাটা পড়বে, মুখটুক বেঁকে যেতে পারে—মানে অপারেশন হলে যা যা হওয়া সম্ভব আর কি—

অন্য লোক হলে কি করতেন ?

একবারও জিগগেস না করে কেটে ফেলতাম। আমারও একটা নতুন অভিজ্ঞতা হতো আর তাতে লোকটা মবলে মরতো। ও তো রাতদিন মরছে।

আপনি আমার অপারেশন করুন।

বলছেন ?

হ্যাঁ।

ডাক্তার রাশেদের দিকে একদৃষ্টে একটুক্ষণ চেয়ে থাকেন। বারকয়েক চোখের পাতা ফেলে হাত দিয়ে ঘামে ভেজা মুখটা মুছে বলেন, আচ্ছা।

রাশেদ দ্রুত উঠে ওয়ার্ডে চলে আসে। ঘব এখন একেবারে শান্ত। রুগীরা শুয়ে বসে আছে। মরাচোখে কেউ আস্তে আস্তে পাঁউরুটি চিবুচ্ছে। রাশেদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, গতরাতে এরাই নরক গুলজার করে তুলেছিল। এখন মনে হয়, এরা কেউ যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানে না। এককোণে জমিরুদ্দি দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘাড় গুঁজে আধশোয়া হয়ে রযেছে। রাশেদ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তার ফোলা পা-টি একখণ্ড মোটা তামাটে কাঠের মতো পড়ে আছে। বোঝাই যায়, ওটা নড়ানোর ক্ষমতা নেই জমিরুদ্দির। রাতে উপস্থিত থাকতে না পারলেও, নীল মাছিগুলো পথ ভুলে যায়নি। সকালবেলাতেই এসে হাজির। রাশেদ একদৃষ্টে জমিরুদ্দিব দিকে চেয়ে থাকে। মুখের রঙের মতো তাব দাড়িগুলোও ফ্যাকাশে। মোটা মোটা শক্ত গাঁটওঠা অশক্ত আঙুল এলিয়ে পড়েছে। রাশেদের ইচ্ছা হ. া, প্রচণ্ড চিৎকার করে সে ওকে জিগগেস করে, এখানে কি করছো ? এখানে কেন এসেছো মরতে ? বোধহয় তার নিঃশব্দ প্রচণ্ড চিৎকারের জবাবেই জমিরুদ্দির একটা চোখের পাতা দুবার কেঁপে উঠে তাকে জানিয়ে দেয় যে সে এখনো মরাব স্থবিধে করে উঠতে পারেনি।

দক্ষিণদিকের বিছানার সারির মাঝামাঝি থেকে একজন রুটি চিবুতে চিবুতে খানিকটা নিজের মনেই বলে, পাঁউরুটি থেকে যে গুয়েব গন্দো আসে, এ তো বাবা কোনোদিন দেখিনি। বলে সে হাতের রুটির টুকরোটা আলোর দিকে ফিরিয়ে ভুরু কুঁচকে দেখতে থাকে।

লোকটা কালো ঢ্যাঙা। পুলিশের চাকরি করে, কিন্তু গলায় কাঠের মালা আছে। কুঁচকিতে কি যেন হয়েছে। রাশেদকে বলার উপলক্ষে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে কয়েকদিন আগে শুনিয়ে দিয়েছিল, আমরা হলাম বৈষ্ণব, হাসপাতালে আমাদের জাত থাকে না। তবে পুলিশে চাকরি করি কিনা—পুলিশ

হলো জাতির মেরুদণ্ড।

রুটির টুকরোটা বারকতক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, খুবই সন্দেহব্যাকুলভাবে সে বলে, এতে নির্ঘাত গু আছে—কত পাঁউরুটি খেলাম জীবনে। এ হে হে, জাতটা আর থাকল না—

পাশের বিছানার মোটা ফরশা দারোগা ককাতে ককাতে বলেন, থামো, গোরুর গু খেলে তোমাদের জাত ফিরে আসে, আর মানুষের গু খেলেই জাত যায়—না ?

কিন্তু তবু, মানুষের খাদ্য নয় মানুষের গু—আগুনভরা চোখে পুলিশ কবিতায় জবাব দেয়। তারপর দারোগার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যদের দিকে চেয়ে করাত-চেরা কর্কশ রূঢ় গলায় বলতে থাকে, চোর মুশাই, সব চোর। হবে না কেন ? সারাদেশ চোর আর বদমাইশে ছেয়ে আছে, আর এই হাসপাতালেই শুধু সাধুপুরুষ থাকবে ?

চোরদের সঙ্গে বাবুর আলাপপরিচয় অনেকদিনের। পুলিশের লোক আপনি—তিন বিছানা দূরের একটা ঘেয়ো রুগী বেশ নিরীহভাবে মন্তব্য করে।

এ্যাইয়ো খবরদার, পুলিশের নিন্দা নয়, না খবরদার—চোখ পাকিয়ে বৈষ্ণব পুলিশ ধমক লাগায়, আমাদের মনে রাখতে হবে পুলিশও মানুষ, তারও মাগ-ছেলে আছে। পুলিশ না থাকলে চোর, ছ্যাঁচোড, গুণ্ডা, ডাকাত, বদমাশ, নেতা কিছুই নাই। এরা আছে বলেই তো পুলিশ রাখতে হয়—হেঁ হেঁ বাবা, চালাকি নয়। এই হাসপাতাল সেই পুলিশের কি দশা করেছে শোনেন, শোনেন আপনারা—

লোকটা চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে থাকে। ঘাড় বাঁকিয়ে, কুড়ুলের কোপ দেবার মতো করে হাত উঁচিয়ে বলে যায়, প্রথমত জাত। আমি বৈষ্ণব মুশাই, বাড়ি ছাড়া মাছ-মাংস খাই না। এখানে অবস্থাটা কি ? রুটির সঙ্গে গু খাওয়াচ্ছে, ভাতের সঙ্গে গু খাওয়াচ্ছে। এত গু পাচ্ছে কোথায় বলতে পারেন ? আরে বাপু, গোদা গোদা ভাতের চালে কাঁকর দে, ইটের গুঁড়ো দে, পাথর দে, মাটি দে—দিচ্ছিসই তো—গু দেবার কি দরকার ?

ওয়াক থু—বিচ্ছিরি শব্দ করে ঘেয়ো রুগী থুথু ফেলে।

আচ্ছা বেশ, গেল—পুলিশ ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না—মুরগির মাংস যে দিচ্ছিস—মুরগির কোন্ জায়গাটা দিচ্ছিস বল দিকিনি। নাঃ, কিছুতেই মুরগি নয়। তলায় তলায় কুকুরের মাংস দিচ্ছে নাতো, হ্যা ?

তোবা, তোবা—তিন-চারজন রুগী একসঙ্গে বলে ওঠে। হাসপাতালের কাউকে এই মুহূর্তে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না।

তোমার মাথা, সিনথেটিক মাংস, আমেরিকা থেকে আমদানি—দারোগা ফুট কাটলেন।

সাচ্ছা বেশ, গেল—পুলিশ ফের শুরু করে—দ্বিতীয়ত, এই তিনদিন আগে আমাকে নিয়ে কি কাণ্ডটা করলে? আমার মুশাই অর্শের অপারেশন। ইদিকে কুঁচকিতে এই বড়ো ফোঁড়া হয়ে বসে আছে। কোথায় অর্শের অপারেশন? বললে পেত্যয় যাবেন না, আমাকে দড়াম করে চিৎ করে ফেলে দুই ঠ্যাং ফাঁক করে দুজনে ঠেসে ধরে রাখলে। যত বলি লাগছে, লাগছে—কে শোনে কথা? একটা ইনজেকশান নাই, কিছু নাই, কোথা থেকে এক কশাই ছুরি হাতে এসে একবারে ঘ্যাচাং করে বসিয়ে দিলে। গোরু-জবাই করলে মুশাই! একজন আবার বলে, চুওপ, বেশি চিল্লাচিল্লি করলে ইয়ে বার করে খাসি করে দোব।

জমিরুদ্দির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাশেদ এই আলাপ শোনে। সকালের ঠাণ্ডা ভাবটা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে। এলোমেলো গরম বাতাসের হলকা আসছে মাঝে মাঝে। হাসপাতালের ভিতরের বিরাট চৌকোনা প্রাঙ্গণগুলোয় বুক-সমান উঁচু বেনাঘাস শুকিয়ে ঝনঝনে হয়ে আছে। একটুখানি আগুন দরকার। একটুখানি। রাশেদের মাথার মধ্যে কথাটা পাক দিতে থাকে। জনগণকে, সমগ্র জনগণকে সঙ্গে নিতে হবে। জমিরুদ্দির অসাড়, পচে-ওঠা বিবর্ণ ফোলা পায়ের দিকে তার চোখ যায়। চোখ বন্ধ করে জমিরুদ্দি ঘুমোয়—বাইরের পৃথিবী তার কাছে একটু একটু করে বন্ধ হয়ে আসছে। জনগণকে সঙ্গে নিতে হবে নয়, জনগণের সঙ্গে থাকতে হবে, মিশে যেতে হবে, তলিয়ে যেতে হবে জনগণের মধ্যে, মাছ যেভাবে গভীর জলে তলিয়ে যায়। রাশেদের কটা চোখদুটি থেকে মুহূর্তের জন্যে আগুন ঠিকরে বেরোয়, সে হঠাৎ চিৎকার করে ডাকে, চাচা, চাচা শুনছো?

জমিরুদ্দি ঘাড় গুঁজে শুয়ে থাকে, সাড়া দেয় না। তার পচ-ধরা ফোলা পা-টি সামনে ছড়ানো, মাছি ওড়াউড়ি করছে, মাথা ঝুঁকে এসে পড়েছে বুকের উপর। রাশেদের মাথায় আবার গোলমাল শুরু হয়ে যায়: তুমি মধ্যবিত্ত, তুমি পাতি-বুর্জোয়া, বিপ্লব তোমার শত্রু নয়, কিন্তু তোমার দেরি সইবে, বিপ্লব আসতে দেরি হলে তুমি অপেক্ষা করতে পারো—কিন্তু ওর, এই ক্ষেত-মজুরের একমুহূর্ত বিলম্ব সইবে না, বিপ্লব তার এক্ষুনি দরকার, এক্ষুনি। এক্ষুনি বিপ্লব হলে সে বাঁচে, বিপ্লব হতে দুদিন দেরি হলে সে দুদিন আগে মরে যায়। তাকে এই কথাটা বুঝিয়ে দাও,

সে সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের পক্ষে লড়ুয়ে হয়ে যাবে।

রাশেদ খেপে ওঠে, ক্ষোভে হতাশায় তার হাত কাঁমড়াতে ইচ্ছে করে। আঃ, দেয়ালের লেখা! আবার সে চিৎকার করে ডাকে, চাচা, ও চাচা, কি অবস্থা? জমিরুদ্দিব গলা থেকে ঘড় ঘড আওয়াজ আসে—কিন্তু এবার অতিকষ্টে সে চোখ মেলে তাকায়। ঘোলা অপরিচ্ছন্ন চাউনি।

পুলিশটির বক্তৃতা একটু আগে থেমেছে। ওয়ার্ড একরকম চুপচাপ। খুব মৃদু গোঙানির আওয়াজ আসে শুধু। আবার গরম হাওয়া ঢোকে। রাশেদ ফিরে তাকাতেই দু'তিন বিছানা দূবে এক বুডোর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। বিছানার উপর বালিশে হেলান দিয়ে সে বসে আছে। খালি গা, গলার নিচে কণ্ঠার হাডদুটি ভয়াবহ, নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার কোঁচকানো চামড়া জিরজির করে ওঠে, নিজের চোখদুটির স্যাঁতসেঁতে হলুদ আলো দিয়ে সে বাইরের ঝাঁঝালো তপ্ত বোদেব আকাশ নিভিয়ে দিয়েছে। সেই আকাশের দিকে একবার চেয়ে সে রাশেদের উপর চোখ ফেলে কাঁপা গলায় বলল, আমি এখানে অনেকদিন আছি বাবা।

বুকের ভিতরের সবটুকু জোর গলায় এনে, কথা বলার চেষ্টায় তলপেট পিঠের সঙ্গে আটকে দিয়ে সে আবার বলল, আমি এখানে অনেকদিন রয়েছি। বাঁচবো বলে নয়, মববার জন্যে। মবণ হচ্ছে না। এতবড় হাসপাতাল আমার মরার ব্যবস্থা করতে পারছে না? হাসপাতালের বাইরেও গিয়ে দেখেছি—পোডাদেশ এই হাসপাতালেরই মতো—আমার মরার বন্দোবস্ত কবতে পারে না। মবতে না পারার কি কষ্ট রে বাবা। সবাই বাঁচতে চায়, বাঁচবার জন্যে হাসপাতালে আসে, আমি মরার জন্যে এসেছি, কিন্তু কোনো উপায় করতে পারছি না বাপ। অথচ দিনকতক আগে একতলায় এক শূলের রুগী রাত থাকতে থাকতে গিয়ে ওয়ার্ডের পিছনের আমগাছটার ঝুলে পড়ে সবাইকে কলা দেখিয়ে চলে গেল। দেখেন বাবা, দেখেন, ঐ যে ঐ ছোটো আমগাছটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে—ঐ যে ডালটা, মাটি থেকে বেশি উঁচু নয়, লোকটা ন্যাংটো হয়ে ঝুলতে ঝুলতে দুলতে দুলতে চলে গেল।

বুড়োর গলার আওয়াজ চোতমাসের ফাঁকা মাঠের বাতাসের মতো। মাঝ-খানটা গম্বুজের মতো ফাঁকা, চারপাশে ধুলো আর শুকনো পাতা চর্কির মতো পাক দিতে দিতে উপরে উঠে যায়।

প্রচণ্ড রাগে রাশেদের চোখে রক্ত চলে আসে, দু'হাত মুঠো করে সে চাপা

গর্জন করে ওঠে, চুপ করুন।

বুড়োর থোড়াই তোয়াক্কা, একইভাবে বলে যায়, তা বাদে লম্বা লম্বা ঐ ঘাসের জঙ্গল থেকে এক শেয়াল বেরিয়ে এসে একদিন রেতে ঘুমন্ত মায়ের কোল থেকে ঘুমন্ত বাচ্চা নিয়ে থপ—

রাশেদ আবার দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, চুপ করুন।

পুলিশ হাঁ করে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। চোত মাসের ফাঁকা মাঠের ঘূর্ণি হাওয়া ঢুকে ঘর ভরে ফেলেছে।

বুড়ো প্রাণপণ চেষ্টায় শেষ কথাটা বলে ফেলল, অথচ এই ব্যাটারা আমার মরণের ব্যবস্থাটা আজও করতে পারল না। হায়রে, ঐ আমগাছটা পর্যন্ত যাবার সাধ্যিও যে আমার নাই।

চোখমুখ কপাল ভুরু কুঁচকে বুড়ো প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু চোখে তার কিছুতেই পানি আসে না। বুড়ো হলে নার্ভের জোর কমে আসে, অশ্রুবাহী নালি শুকিয়ে ওঠে—নাহলে বুড়ো যুবকের মতোই ধাঁই ধাপড় কাঁদতে পারত, শুকনো হাহাকারের বাতাস এনে ধুলো আর ঝরা পাতায় ঘর ভরে ফেলতো না। সবাই চুপ করে থাকে। শুধু বাচাল পুলিশটি বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলে, এই হাসপাতালের তাহলে দোষ কিছু নাই। শুধু ঠিক সময়ে লোক মেরে ফেলতে পারে না। ছ্যাঃ কি ঘেন্না, লোক এসে এই হাসপাতালে মরার জন্যে হা-পিত্যেশ করে থাকে। ছ্যা ছ্যা ছ্যা—

নোংরা জ্যালজেলে লুঙির উপর হাফশার্ট গায়ে গতকালকের বুড়ো লোকটা ঘরে এসে ঢোকে। রাশেদ তাকে দেখেই চিনতে পারে। জমিরুদ্দিকে ওয়ার্ডের মেঝের উপর দিয়ে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে এখানে এনে রেখে গিয়েছিল সেই-ই। ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে সে জমিরুদ্দিকে খুঁজতে থাকে। সেখান থেকে জমিরুদ্দিকে দেখতে পাবার তার কথা নয়। আন্দাজে সে দুদিকের বিছানার সারির মাঝখান দিয়ে দু' পা এগিয়ে এলে তার পিছনে দরজার কাছে একটি মেয়েলোক এসে দাঁড়ায়। তার পিছনে তিনটি বাচ্চা। রাশেদ খুব মনোযোগের সঙ্গে দলটিকে দেখতে থাকে। মেয়েমানুষটি তাকে প্রায় আশ্চর্য করে দেয়। বিরাট দশাসই চেহারা, মজবুত চওড়া একজোড়া মাটি-মাখা চোয়াল, মাটি-মাখা মুখ, মাটি-মাখা মোটা কব্জি, ফাটা ধ্যাবড়া ধুলো-ভর্তি একজোড়া পা—ক্ষেত-মজুরের বউ এই স্ত্রীলোকটি ঘরের ভিতরে এগিয়ে আসে। পিছনে পিছনে আসে তার তিন বাচ্চা।

বুড়ো এতক্ষণে জমিরুদ্দিকে দেখতে পায়, মেয়েমানুষটির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলে, ইদিকে এসো গো—ঐ যি জমিরুদ্দি। ঘুমাল্‌ছে। রাশেদের পাশ কাটিয়ে সে জমিরুদ্দির মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে ডাকে, জমিরুদ্দি, অ জমিরুদ্দি, এই গ্যাখ, তোর তিন ব্যাটা আল্‌ছে।

জমিরুদ্দির কাছ থেকে কোনো সাড়া আসে না, বুড়ো মানুষটা তখন তার উপর ঝুঁকে পড়ে কাঁধে হাত দিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে, জমিরুদ্দি, অ বাপ জমিরুদ্দি, তোর বউ বেটা আল্‌ছে যি তোকে দেখতে!

স্ত্রীলোকটি একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তার চোখে পলক পড়ে না। একদৃষ্টে সে জমিরুদ্দির দিকে চেয়ে থাকে। ছোটো বাচ্চাটি মুখের মধ্যে ডান হাতের তর্জনিটি সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিয়ে পরম আনন্দে চুষতে শুরু করে। আরো কয়েকটি ঝাঁকুনির পর জমিরুদ্দি আস্তে আস্তে চোখ খোলে, কিন্তু বুড়ো তার গায়ে হাত দিয়েই চমকে পিছিয়ে আসে।

রাশেদ জিগগেস করে, কি?

বুড়ো চোখ কপালে তুলে বলে, ছার, জ্বর, জ্বরে যি গা পুড়ে যেছে।

এতক্ষণে জমিরুদ্দি পুরো চোখ খুলেছে, মেয়েমানুষটিও ঝুঁকে পড়েছে খানিকটা তার উপর, কিন্তু তাকে দেখেও জমিরুদ্দির চোখে একটুও আলো দেখা দেয় না। চোখদুটি তার আবার বন্ধ হয়ে যেতে চাইছিল, রাশেদের সঙ্গে কথা বন্ধ রেখে বুড়ো তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে, জমিরুদ্দি, তোর বউ যি! তোর ব্যাটারাও আল্‌ছে।

জমিরুদ্দি কোনো কথা না বলে খুব কষ্টের সঙ্গে আস্তে আস্তে ডানহাতটি তার ফোলা পায়ের উপর রাখে। সেটাকে দেখে এখন মনে হয়, বিরাট পুরুষ্টু একটি মুগুর, যে কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। রাশেদ দেখল ক্ষেতমজুরের বউটি আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়েছে জমিরুদ্দির উপর, ঝুঁকতে ঝুঁকতে সে দেয়ালের উপর একহাতের ভর দিল, তার বিশাল নরম স্তন দুটি জমিরুদ্দির বুক স্পর্শ করল, সে আরো ঝুঁকছে, তার সবল মোটা ঘাড় ছোবল দেবার ভঙ্গিতে একটু বাঁকা, চোখদুটি স্থির, অপলক, জমিরুদ্দির নিশ্বাসের সঙ্গে সে মাটির সোঁদা গন্ধ মিশিয়ে দেয়—এতক্ষণে এত চেষ্টার পর সে জমিরুদ্দির নেভা চোখের উপর তার তীব্র স্থির দুটি চোখের আলো ফেলতে পারে। মেয়েমানুষটির দুই ঠোঁট বন্ধ, এতটুকু কম্পন সেখানে লক্ষ্য করা যায় না—শুধু তার প্রবল নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। মানবিক ভাষার জন্যে অসম্ভব পিপাসা বোধ করে রাশেদ—প্রায়

নিজের অজান্তেই ওদের দিকে দু' পা এগিয়ে আসে—কিন্তু মেয়েমানুষটি কিছুতেই তার ঠোঁট খোলে না।

শুধু একবার ঝিলিক দিয়েই জমিরুদ্দির চোখদুটি ফের নিভে যায়।

ডাক্তার তখনো তাঁর ঘরে। রাশেদ তাঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে রাশেদ সরাসরি বলে, ঐ যে লোকটা ফোলা পা নিয়ে আপনাদের এখানে এসেছে—ওকে দেখেছেন ?

ডাক্তার অমায়িক হাসলেন, দেখেছি।

কি অবস্থা, ওর ?

গ্যাংগ্রিন সেট ইন করে গেছে।

কি করতে হবে ?

এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে—এই মুহূর্তে। যতটা পচেছে কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে।

অপারেশন আজ না হলে ?

ডাক্তার আবার অমায়িক হাসলেন, আপনি ছেলেমানুষ !

রাশেদ চেঁচিয়ে ওঠে, বলুন না, আজ অপারেশন না হলে কি হবে ?

কি মুশকিল ! মারা যাবে।

ওর আজ অপারেশন করছেন ?

না, আজ সম্ভব নয়।

কাল করছেন ?

না—সম্ভব হচ্ছে না।

মরে গেলে করবেন ?

আঃ রাগ করছেন কেন ? মরে গেলে অপারেশন হয় না, পোস্টমর্টেম হয়।

রাশেদ নিজেই নিজের দাঁত ঘষার আওয়াজ পেল, একহাতের তালুর উপর আর এক হাত দিয়ে ঘুষি মেরে বলল, আপনি অবশ্যই আজ অপারেশন করবেন।

ডাক্তার তিনবারের বার অমায়িক হেসে ধীরে-সুস্থে পান চিবোনোর ভঙ্গিতে বললেন, আজ আরো অনেক লোক মরার জন্যে অপেক্ষা করছে, ওর দিকে আজ আর খেয়াল করতে পারব না। আমার কুড়ুলের ধার পড়ে যাবে।

ছাদ ফাটানো চিৎকার করে রাশেদ বলল, আপনাকে আজ ঐ লোকটার অপারেশন করতে হবে।

ডাক্তারের মুখটা স্রেফ চৌকো হয়ে গেল, ষাঁড়ের মতো কুতকুতে চোখদুটি থেকে আগুন ছিটোতে ছিটোতে তিনিও চিৎকার করে উঠলেন, আপনার কথাতে নয়। যান এখান থেকে। হাসপাতালের নিয়ম আছে, সেই অনুযায়ী কাজ হবে। যান। যা পারি, তাই করি—যা পারি না, তা পারি না—ব্যস।

রাশেদ দেখল, মেয়েমানুষটি আর তার তিন বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ো ডাক্তারের ঘরে ঢুকছে। সোজা সে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, দু'একটি মুহূর্ত ভাবল, তারপর ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে বলল, ছার, আমরা ঐ পা-ফোলা রুগীটোকে বাড়ি লিয়ে যাবো।

ডাক্তার তাঁর চেয়ারে পাথরের মতো বসে রইলেন।

বুড়ো আবার বলল, উকে আমরা বাড়ি লিয়ে যেতে চাই। উয়ার পরিবার উকে লিতে আল্ছে।

মৃদুস্বরে ডাক্তার বললেন, বাড়ি কেন ?

আমরা উকে বাড়ি লিয়ে যাবো ছার।

ডাক্তার একবার কেঁপে উঠলেন আগাগোড়া, কাল পরশু এসো, নিয়ে যেতে পারবে। যাও, কাল-পরশু খোঁজ নিয়ো।

বুড়ো ইতস্তত করছে। কিন্তু মেয়েমানুষটি হিম ঠাণ্ডা চোখে ডাক্তারের দিকে একবার চেয়ে ফিরল। যে ছেলেটি আঙুল চুষছিল, এক হেঁচকায় তাকে কোলে তুলে, আর একটির কব্জি ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে রাশেদ দেখতে পেল ছোটো দলটি দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

খনন

রেস্টহাউসটা শহরের একধারে বেশ নিরিবিলি জায়গায়। মফস্বল শহরের নিরিবিলি বলতে যা বোঝায় আর কি! শাহেদের পছন্দই হয়েছিল জায়গাটা। কিন্তু গতকাল সারাদিন আকাশ মুখভার করেছিল। বার দুই-তিন ঢেলেছিলও বেশ। কিন্তু আজ সকাল থেকেই একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। সকালে ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে চেয়েই শাহেদের খুব ভালো লেগে গেল। শাদা কুয়াশা উঠছে মাটি থেকে, গাঁয়ের ঘন সবুজ রেখার পিছন থেকে সূর্য আধাআধি বেরিয়েছে। খুব সাধারণ দৃশ্য। এত সাধারণ যে বিনা দ্বিধায় চিরকালীন বলে দেওয়া যায়। খুশিতে শাহেদের ভারি গোলমুখের কাঁচা-পাকা ঝাঁটাগোঁফ হাসিতে একটু তেরছা হয়ে গেল। টুথব্রাশে খানিকটা পেস্ট লাগিয়ে ঘষতে ঘষতে জড়ানো গলায় শাহেদ ডাকল, এই, এই শালা মুনীর, কি কুম্ভকর্ণের ঘুম লাগিয়েছিস বাবা, পোঁদে কাপড় নেই তা খেয়াল নেই, ওঠ।

শাহেদ পুরনো সাংবাদিক। মুখটা এইরকমই তার। মুনীরের কোমর থেকে আলগা লুঙিটা পা দিয়ে এক ঝটকায় নামিয়ে দিয়ে শাহেদ বলে, উঠে ছাখ শালা, কি চমৎকার দৃশ্য। গ্রামবাংলার কি অপূর্ব দৃশ্যপাট! তুই শালা ঘুম মারছিস।

মুনীর আঁকুপাঁকু করে উঠে বসে হাঁটুর কাছ থেকে লুঙিটা তুলে কোমরে জড়াতে জড়াতে ফের শুয়ে পড়ে, জ্বালিয়েন না তো শাহেদ ভাই, ভ্যাপসা গরমে সারারাত একটুও ঘুমুতে পারিনি।

শাহেদ এবার এগিয়ে গিয়ে তার বিরাট থাবা দিয়ে মুনীর চুল ধরে, ক্যানো মানিক, ঘুমুতে পারনি ক্যানো, পাশে মাগ ছিল না বলে? এই বলে গোটা দুই-তিন রামঝাঁকুনি লাগাল সে।

মুনীরের পক্ষে আর শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে সে দেখতে পায়, এই সকাল বেলাতেই শাহেদের বিরাট থমথমে মুখ ঘামে ভিজে গেছে। কুতকুতে চোখ মেলে সে মুনীরের দিকে চেয়ে। বোধহয় হঠাৎ

তার মনে পড়ে যায় যে চার-পাঁচ মাস আগে মুনীরের বউ এক শাঁসাল আধবুড়ো আমলার সঙ্গে চলে গেছে। চোখে চোখ পড়তে ব্রাশের ফাঁক দিয়ে শাহেদ বিকৃত জড়ানো গলায় একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে—সরি। তার দুই ভুরু কোঁচকানো, মাংসভরা বিশাল গোল মুখে বড বড ভাঁজ, চোখ দুটো এত ভিতরে যে প্রায় দেখাই যায় না।

শাহেদ কাঁদলে তার মুখের চেহারাটা কি এইরকমই দাঁড়াবে? মুনীর ভেবে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সে ঘটনাটা যে কিরকম অসম্ভব তা ভেবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি পেয়ে যায়। মুনীর বলে, সকালে উঠে এই খিস্তি-খেউড়গুলো না করলেই চলছে না আপনার শাহেদ ভাই?

খিস্তি? খিস্তি কাকে বলছিস রে শালা? সকালে উঠে খানিকটা খিস্তি করে নিলে সারাদিন আত্মাটা সাফ থাকে—বুঝেছিস।

সকালে উঠে দাঁত সাফ করা, পেট সাফ করা বুঝি, আত্মা সাফ করার কথা তো কোনোদিন শুনিনি শাহেদ ভাই!

শুনবি কি করে? আত্মা আছে কোন শালার? নে ওঠ—বহুৎ কাজ আছে আজ। কাল ঢাকা ফিরতে চাই।

দুজনে বাইরে আসে। এইটুকু সময়ের মধ্যে সামনের বিরাট মাঠটা রোদে ভরে উঠেছে। বেরিয়ে এসে দুজনের কেউ কিন্তু আর সেদিক নজর দিল না।

প্রায় কিছুই পাওয়া গেল না হোটেল। মফস্বলের হোটেলে যেমন হয় আর কি। ছাতা-ধরা গোটাকতক টোস্ট বিস্কিট আর চারটে ডিম জোগাড় হলো বহু কষ্টে। ডিম টোস্ট এলে শাহেদ হোটেলের ছোকরাটাকে বলে, মুরগি কি তোদের পোষা বাবা? কথা বললে কথা শোনে?

অল্পবয়েসি কালো ছোকরাটা লাল মাড়ি বের করে হেসে বলে, কেন সাহেব? ডিম কি ছোডো?

শাহেদ খেতে শুরু করে দিয়েছিল, মুখে খাবার নিয়ে বলে, না এমনিই বলছি—বুঝলি না। যা, চা নিয়ে আয়।

হোটেলের এই জায়গায় বসলে রেল স্টেশনের খানিকটা দেখতে পাওয়া যায়। প্লাটফর্মের একটা অংশ, একটু কাঁটাতারের বেডা, গোটাকতক অচল ওয়াগান।

চা খেয়ে বেরিয়ে আসতেই বোঝা গেল ব্যাপার সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। সকালবেলার সেই লাল মোলায়েম আহ্লাদী সূর্যের দিকে এখন তাকাবার উপায় নেই। ফিকে নীল মেঘশূন্য আকাশও তপ্ত

তামার পাতের মতো এখন ভয়ানক হয়ে উঠেছে। গতকালের ভেজা মাটি থেকে, ময়লা ঘোলা পানিতে ভর্তি খানা-খন্দগুলো থেকে ভ্যাপসা গরম বাষ্প উঠে আসছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘেমে নেয়ে ওঠে শাহেদ। মোটা মানুষ—শরীরে এখন আর মাংস আছে কিনা সন্দেহ, চর্বির পিপে হয়ে দাঁড়িয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ আর ঘাড়টা মুছতেই সেটা ভিজে জবজবে হয়ে গেল। রুমালটা ফের পকেটে রাখতে ঘেন্না হয়, হাতেই রেখে দেয় সে।

গ্রামবাংলার পেরাকৃতিক সৌন্দর্যের ইয়ে করি আমি বুঝলি—শাহেদ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, শালা রোদটা দেখেছিস—চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে।

রোদের তাতের চেয়ে ভ্যাপসা গরমটাই বেশি—বাতাসে হিউমিডিটি বেশি। আবার বিষ্টি হবে শাহেদ ভাই—মুনীর বলে।

আর বিজ্ঞান ফলাস না তো মুনীর! বলে রোদের চোটে হাড় ফেটে গেল, উনি বলছেন বিষ্টি হবে। তা হোক না—ঠেকাচ্ছে কে!

বিষ্টি হলেই তো কাজ বন্ধ—এত বড় একটা কাজে হাত দিয়েছে লোকে, বন্ধ হয়ে যাবে।

এ শালা তো দেখছি আচ্ছা ফচকে! এই বলছে বিষ্টি হবে, বাতাসে ইয়ে আছে, এখন আবার বলছে বিষ্টি হলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ইয়ার্কি মারছিস!

না, মানে বিষ্টি হতে পারে, সম্ভাবনা আর কি! আর যদি বিষ্টি হয় তাহলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বলে আফসোস করছি।

আফসোস করছো? তোমার বাপের কাজ হচ্ছে? কাজ বন্ধ হবে তো তোর কি?

আপনি বুঝতে পারছেন না শাহেদ ভাই! লোক এত বড় কাজে হাত দিয়েছে। এই খালটা যদি ঠিকমতো কাটা যায়—ভুলুক ভালুক দিয়ে সাধারণ লোককে টেনে এনে যদি কাজটা শেষ করা যায়, এই এলাকার কি উপকার হবে আপনি কল্পনা করতে পারেন? চেহারাটাই বদলে যাবে এই এলাকার।

তা মরতে এখানে এয়েছিস কেন? ঢাকায় বসে বসেই তো তোর পিরিতের কাগজে লিখতে পারতিস, খালটি জনসাধারণের সাহায্যে কাটা হইয়া গেলে এই-খানে কখনো কুমীর আসিবে না, এবং এতদঞ্চলের চেহারা বদলাইয়া যাইবে?

একবার নিজের চোখে দেখা দরকার তো, সরেজমিনে না দেখে কি কিছু লেখা ঠিক? সাংবাদিকতা পেশাটাকে অত সহজ বলে—

চোপ—শাহেদ হুংকার দিয়ে ওঠে, ফের যদি সাংবাদিকতার কথা তুলবি—

শালা তোদের নিয়ে আর পারা গেল না। বেশ বাবা করে খাচ্ছিস, করে খা। আবার ধ্যাষ্টামো করে সাংবাদিকতা, সততা, পেশা, হ্যানো ত্যানো—এসব ফক্কুরি ক্যানো। হাতি-ঘোড়া গেল তল, উনি এসেছেন এদেশে সাংবাদিকতার আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতে। বামুনের বাড়ির তোতা পাখি দেখেছিস—বলো কেষ্ট, হরে কেষ্ট শেখায়। দেখেছিস? সাংবাদিকতা শিখতে চাস, তোতা পাখির কাছে যা। বল্ শালা, কেন তুই বললি এই খাল কাটা হলে এলাকার চেহারা বদলে যাবে। বলতে হবে তোকে। দাঁড়া মুতে নিই একটু—বল্ তুই, আমি শুনছি।

কথা বলতে বলতে ওরা শহরের বাইরে চলে এসেছে। ফাঁকা বাদামি রঙের মাঠ পড়ে আছে। গতকাল এত বৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু এর মধ্যেই সব শুকিয়ে মাঠ ফুটিফাটা। কালচে রোদ-পোড়া মাটি থেকে আগুন উঠছে। দূরে একটা শুকনো নদীর রেখা দেখা যায়, নদী বা খাল কিছু একটা আছে ওখানে।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দু'পা ফাঁক করে শাহেদ পেচ্ছাপ করছে। পিছনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনীর বলে, আমাদের দেশটা তো গ্রামভিত্তিক, তাই না শাহেদ ভাই, মানে গ্রামই সব—বেশির ভাগ গ্রাম, কাজেই আমাদের অর্থনীতিটাও গ্রাম-ভিত্তিক—মানে কৃষিভিত্তিক—এই পর্যন্ত বলে মুনীর দেখতে পেল শাহেদ পেচ্ছাপ শেষ করে প্যান্টের দুটো বোতাম লাগিয়ে ফেলে তিন নম্বর বোতামটা লাগাতে লাগাতে তার দিকে ফিরছে। সেই কুতকুতে চোখঅলা ভয়ংকর মুখটার সম্মুখীন হবার সাহস হলো না তার। ঘাবড়ে গেল সে. আমতা আমতা করে বলল, আমি বলছি যে আমাদের অর্থনীতির ব্যাকবোনটাই হচ্ছে কৃষি……

এতক্ষণ ধরে তো গৌরচন্দ্রিকাই করলি, এলাকার চেহারা বদলে যাবে কি করে তা তো বললি না? তুই কি বলতে চাস এলাকার বদন বিগড়ে যাবে?

সব সময়ে ইয়ার্কি ভালো লাগে না শাহেদ ভাই—আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় বের করতে না পেরে মুনির একটু চটে ওঠার চেষ্টা করল।

শোনো ভাই মুনীর—শাহেদ নরম গলায় বলে, তুমি এখনো জানো না কাজটা কি হচ্ছে। কাজটা হয়ে গেলে ঠিক কি কি ঘটবে তাও তোমার জানা নেই। আন্দাজে কোপ মারছো। আমি বলছিলাম, আগে ছাখ, বোঝ, তারপর মিথ্যে কথা বল আমার আপত্তি নেই। সাংবাদিকতা পেশাটাই তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই তাই করছে, শালা আমিও করছি। তুই কোথাকার লাটসায়েব সবজান্তা এয়েছিস? ভিজে জবজবে রুমালটা একবার নিংড়ে নিল শাহেদ। তার মোটা মোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ময়লা ঘাম গড়িয়ে পড়ল। রুমালটা দিয়ে আর

একবার মুখ ঘাড় মুছে শাহেদ গাল ফুলিয়ে একগাদা বাতাস বের করে দেয়, উফ, শালার গেরামবাংলা, বঙ্গ আমার, জননী আমার। হয় ন্যাড়া মাঠ চিত্তির খেয়ে পড়ে আছে, না হলে বানে ডুবে আছে, গ্রামে ঢুকলে শালা পোকামাকড়ের মতো ন্যাংটো কিটকিটে কালো মেয়ে পুরুষ বালবাচ্চা এসে ছেঁকে ধরে, সব ব্যাটার হাতে একটা করে তোবড়ানো এনামেলের বাটি, কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, বানে ভেসে যাচ্ছে, মড়কে সাফ হয়ে যাচ্ছে—আর ইদিকে তোদের জাতীয় অর্থনীতি, গণতন্ত্র, ভেল্কিতন্ত্র, রাহাজানিতন্ত্র—আর বলিস না দিকিনি।

নদীর কাছাকাছি আসতে কানে তালা ধরে যায়। মাইকে কলের গান বাজছে—সে যে কেন এলো না, কিছু ভালো লাগে না, এবার আসুক তাকে মজা দেখাব।

শাহেদ বিকৃত মুখে হাসল, বলছে কি রে? অতো চেঁচাসনি বেটি, ইয়ে ফেটে যাবে।

গ্রামাফোনটি কোন্ জায়গা থেকে এমন নরক গুলজার করছে বোঝা যায় না। চারিদিকে এ্যামপ্লিফায়ার টাঙিয়ে মজা দেখানো চলছে।

নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই এখন, শুধু এককালে যে এদিক দিয়ে একটা নদী বইতো, সেই চিহ্নটুকু আছে। ভরাট হয়ে নদীর বুক দু'পাড়ের সমতলে চলে এসেছে। প্রকাণ্ড হৈ-হল্লার মধ্যে শ'পাঁচেক লোক মিলে মাটি কাটার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শাহেদ একটু দূর থেকে ব্যাপারটা পরখ করে দেখার চেষ্টা করে। মাইকের গানের আওয়াজে সে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। কানে তালা লেগেছে, তাতে চোখের কি? কিন্তু শাহেদ বুঝতে পারল কান বন্ধ থাকলে চোখও বন্ধ থাকে। চোখের সামনে নেংটি-পরা খালি-গা এতগুলো মানুষ চেঁচাচ্ছে, গালা-গালি করছে, ঝপাঝপ কোদাল চালাচ্ছে, ঝুড়িভর্তি মাটি নিয়ে নদীর পাড়ে উঠে আসছে—সব কেমন স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল শাহেদের। গরমে রোদে এত বড় মাঠটা পার হলে এসেছে, শরীরের জলীয় পদার্থটার সবটায় প্রায় বেরিয়ে গেছে। বুক ধড়ফড় করতে শুরু করেছে। চোখে যে এমনিতেই দেখতে পাচ্ছিল না—মাইকের আওয়াজে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। ওদের দেখতে পেয়ে তিন-চারটে ফেরিওয়ালা ছোকরা ছুটে এল সিগারেট পান বাদাম এইসব নিয়ে। বহুকষ্টে হাত নেড়ে শাহেদ ছোকরাগুলোকে ভাগাল। আসল ব্যক্তিটি এতক্ষণে একগাল হাসি নিয়ে একটা পা টানতে টানতে এসে হাজির হলেন।

আসেন, কোথা থেকে আসছেন ? লোকটা জিগগেস করল। পাজামার উপরে একটা শাদা হাফশার্ট চাপিয়ে, চকচকে করে দাড়ি চেঁছে, আঙুলে গোটা দুই-তিন পাথর লাগানো আংটি পরে, পান খাওয়া লাল দাঁতগুলো বের করে সে খুব তোয়াজের সঙ্গে প্রত্যুদগমনের জন্যে এগিয়ে এসেছে।

এই একটু ঘুরে ফিরে দেখছি—আমরা সাংবাদিক—মুনীর বলল।

আপনেরা সাংবাদিক। গদগদ হাসিতে মনে হলো লোকটার দাঁতের মাড়ি গলে গলে পড়ছে। সরাৎ করে মুখে লালা ভিতরে টেনে নিয়ে সে বলল, আসবেন বইকি। আসাই তো উচিত। রাজধানী ঢাকায় থাকেন আপনেরা. সেখান থেকে কি শহরগঞ্জের খবর পাওয়া যায় ? আসেন, দ্যাখেন কি বিরাট কাজ হচ্ছে। আসেন, ভিতরে আসেন।

মুখের ভিতর জিভটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়িত উচ্চারণে শাহেদ বলে, কোথায় যাব ?

আসেন, দেখে যান কি সোন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঁচটা তাঁবু খাটানো হয়েছে। একটায় কলের গান চলছে, আর একটায় প্রচার, তিনটে হাইস্কুলের ছাত্র জোগাড় করা হয়েছে—সব সোমায় প্রচার চলবে—সমানে প্রচার চাই, আপনেরা কাগজে লিখুন, দেশ-গেরামে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে—

লোকটার মুখ থেকে একটুখানি সূক্ষ্ম হাসি কিছুতেই যাচ্ছে না। মুখে যতই খাতির করুক, মুনীরের মনে হলো ওদের সে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না।

আপনাদের বিপ্লব কবে থেকে শুরু হয়েছ ? শাহেদ শান্ত গলায় জিগগেস করে।

বিপ্লব ? মানে বিপ্লব ? লোকটা একটু হকচকিয়ে যায়, এই দিন দশেক হলো।

ন্যাখ—শাহেদ মুনীরের দিকে চেয়ে বলে।

মুনীর কাঁধের ঝোলা থেকে কাগজ-টাগজ বের করতে গেলে লোকটা বলে, আহা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হয়—আসেন, আমার সঙ্গে আসেন, বসে কথা বলবেন।

রোদের মধ্যে ভারি ভারি পা ফেলে বহুকষ্টে শাহেদ একটা তাঁবুতে পৌঁছুল। তাঁবুটা ছেঁড়া, কোনো এককালে শাদা রঙের ছিল, এখন ময়লা পড়ে পড়ে মাটির রঙ। তলার আধহাত ফাঁক দিয়ে হুড়হুড় করে ধুলো ঢুকছে, নিশ্বাস নেওয়া কঠিন। সামনের নদীর দিকটা খোলা, গরম হাওয়া আসছে। তাঁবুর ভিতরে

মেঝের ঘাসগুলো মুষড়ে পড়েছে পায়ে পায়ে, একটা পায়া-ভাঙা ন্যাংটো টেবিলের চারপাশে তিন-চারটে আমকাঠের চেয়ার। কারো অপেক্ষা না রেখে নদীর দিকে মুখ করে শাহেদ একটা চেয়ারে বসে পড়ে। দেখতে দেখতে একপাল উলঙ্গ ছেলেমেয়ে আর এক দঙ্গল ভিখিরি এসে হাজির হলো। বসেন, বসেন—লোকটা তোয়াজ শুরু করে—মুখে সরু হাসির রেখাটা কিন্তু একই রকম আছে।

ভিখিরিদের সব কাজে লাগিয়ে দিয়েছি, সে গর্বের সঙ্গে বলে, ভিখিরি সমিস্তে আর নাই, মেয়ে-পুরুষ যারাই একটু খাটতে পারবে, এইখানে লাগিয়ে দিয়েছি কাজে।

এরা? সামনের ভিখিরিদের দিকে আঙুল দেখিয়ে মুনীর জিগগেস করে।

এরা কিছুতেই কাজ করবে না—এগুলারে গুলি করে মারা উচিত—লোকটা রায় দিয়ে দেয়।

ল্যাখ্—চোখ বন্ধ করে শাহেদ বলল। কথা শুনেই লোকটা বাঘের মতো হুংকার দিয়ে ওঠে, ভাগ হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চারা—

শাহেদ আবার নির্বিকারভাবে বলল, ল্যাখ।

একটুক্ষণ চুপচাপ গেল। মুনীর কাগজ কলম বের করেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি আঁচড়ও কাটেনি।

চোখ খুলে শাহেদ সামনের দিকে চেয়ে বলে, এ নদীটায় পানি নেই কত কাল?

লোকটা জবাব দিল, আমি তো সাহেব বরাবরই এইরকম দেখছি।

ক'মাইল খাল কাটার কথা আপনাদের?

বার মাইল কাটতে হবে।

বড় নদীর সঙ্গে যোগ হলে পানি আসবে?

নিশ্চয়।

শাহেদ আবার চোখ বুঁজল। আসলে সে রোদের দিকে চেয়ে থাকতে পারছিল না। ভিখিরিগুলো বেশি দূরে সরে যায়নি। একটি যুবতী মেয়ে ছেলে কোলে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কাপড়ে শরীরের নিচের দিকটা কোনোরকমে ঢেকেছে কিন্তু ছেঁড়া আঁচলের ফাঁক দিয়ে তার অস্বাভাবিক স্ফীত লম্বাটে গোল, শক্ত স্তন দুটি প্রায় সম্পূর্ণ বেরিয়ে আছে। সেদিকে মেয়েটির বিশেষ খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। অসাধারণ শাদা বড় চোখ দুটি মেলে সে ভুরু কুঁচকে শাহেদের দিকে চেয়ে থাকে। শাহেদের মনে হলো তার দিকেই। তবে মেয়েটি সামান্য

ট্যান্না, মুনীরের দিকেও হতে পারে। শাহেদ দেখল, মুনীর কলমটা টেবিলের উপর রেখে চট করে একবার ঠোঁট চেটে নিল। বিরক্তিকর ব্যাপার—শাহেদ জোর করে মেয়েটি বুকের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

এখানে যারা কাজ করছে সবাই ভিখিরি ?

না না, কি যে বলেন সায়েব—সবাই ভিখিরি হবে কেন ?

এরা সবাই কি বিনে পয়সায় কাজ করছে ?

খাবার দেওয়া হবে, কাজ করবে—এইরকম ঠিক ছিল। দেশের কাজ, সবাই মিলেমিশে করলে তবে দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে—লোকটা বক্তৃতা শুরু করতে যায়।

দেশের পাদুটো কোথায় ? শাহেদের মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

জি ? কি বলছেন ?

না, কিছু নয়। তা বিনে পয়সায় এখন কাজ হচ্ছে না ? শাহেদ হ্যাকার মতো প্রশ্ন করে।

প্রথম দিনকতক হয়েছিল। খুব উৎসাহ করে লেগেছিল। তারপর ভদ্দরলোকেরা সরে পড়ল। এখন যারা কাজ করছে, তাদের প্রায় সবাই দিনমজুরি করেই খায়।

ওদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে ?

খাবার দেওয়া হচ্ছে—মানে মজুরি ঠিক—

শুধু খেতে পেয়েই কাজ করছে ? মজুরি চাইছে না ?

অন্য জায়গায় কাজ করে যে মজুরি পায়, তা দিয়ে তো কোনোরকমে খাওয়াই হয়—আর তো কিছু হয় না। কাজেই—লোকটা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল।

শাহেদের চোখ দুটো আবার যুবতী মেয়েটার বুকে আটকে যায়। কি গেরো ! তুই যা না বাপু এখান থেকে—শাহেদ বিড়বিড় করে বলে।

তাহলে তো ওদের এখানে কাজ না করে অন্য জায়গায় মজুরি নিয়ে কাজ করাই ভালো—বহুকষ্টে শাহেদ বলে।

এইবার লোকটা ফিঁচফিঁচ করে হেসে ওঠে, তাহলে তো কথাই ছিল না। কাজ কোথা সায়েব—এই সময়ে কোথাও কাজ নেই। খাওয়ার বদলে কাজ পেলে ওরা বাঁচে।

কোনো কাজ নেই—পানির মতো শস্তা শ্রমের কথাটা লিখেছিস ? শাহেদ

মুনীরকে জিগগেস করে।

মুনীর মাথা নাড়ে। ক্ষেপে গেল শাহেদ, মুনীরের দিকে ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জালে আটকানো জানোয়ারের মতো চাপা গর্জন করে উঠল, বাঞ্চোৎ, মজা মারতে এয়েছ এখানে? ল্যাখ শালা। শাহেদ চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। তার আর সোজা হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। সেই অবস্থায় থেকেই সে বলে, খাল কাটা হলে পানি আসবে বলছেন। ধরুন, যদি পানি আসেই, তাহলে কি হবে?

লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গাধা ছাত্রকে মাস্টার যেমন করে বোঝায়, ঠিক সেইভাবেই সে শুরু করল, আপনি বলছেন কি সায়েব? পানি এলে কি হবে বোঝতে পারছেন না? নদীর দু'পাড়ের এই বিরাট মাঠ আবাদ হবে। এখন একটা ফসলও পাওয়া যায় না—তখন হেসে-খেলে দুটো ফসল হবে। ফসল বাড়বে। পানির অভাবে এই এলাকায় আবাদের যা কষ্ট—

লোকটা তড়বড় করে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, শাহেদ তার কথার মাঝখানেই খুব নিস্পৃহভাবে প্রশ্ন করল, এখানে যারা কাজ করছে, নদীর পাড়ে তাদের জমি আছে?

লোকটা সাপের মতো ঠাণ্ডা হিম চোখে শাহেদের দিকে চেয়ে থাকে।

বলছি, যারা এখানে কাজ করছে তাদের কজনের জমি আছে মাঠে?

উত্তর না দিয়ে লোকটার উপায় থাকে না, ওরা তো পেরায় সবাই দিনমজুর, ওদের জমিজাতি বিশেষ নাই সায়েব।

নদীর দু'পাড়ে বিরাট মাঠের যারা মালিক তাদের কেউ কি ওখানে মাটি কাটার কাজ করছে? শাহেদ আবার জিগগেস করে।

লোকটা মহা বিব্রত হয়ে পড়ল, ঠিক মাটি কাটার কাজ—মানে—ঠিক—বেশি জমির মালিকের কেউ এখানে নাই—মাঝারি জমির মালিকরা আছে—তদারকি করছে।

আপনার নিশ্চয় জমিজাতি আছে এখানে?

তা কিছু কিছু আছে।

আপনিও তদারকিতে আছেন? শাহেদ বেমক্কা একবার চোখ টিপল লোকটার দিকে চেয়ে। তারপরেই সে আবার গম্ভীর থমথমে গলায় বলে, খালে পানি এলে, এইসব মাঠ ঠিকমতো আবাদ হলে যে ফসল হবে তার মালিক কি ওরা হবে? যে শ'পাঁচেক লোক কাজ করছিল তাদের দিকে আঙুল দেখাল শাহেদ।

দেখেন সায়েব, ওদেরও উপকার হবে। ঠিকমতো আবাদ হলে যে ফসল হবে তাতে ওরাও খেতে পরতে পাবে।

কেন, আপনারা যারা ফসলের মালিক হবেন, তাঁরা কি মাথায় করে ওদের বাড়িতে ফসল পেঁাছে দিয়ে আসবেন ?

লোকটা চুপ করে থাকে।

প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে শাহেদ, আপনার বাড়তি ফসলটা দিয়ে আসবেন ওদের বাড়িতে ?

লোকটা থতমত খেয়ে বলে, না।

তবে ? সরকারি খরচে জমির মালিকরা নিজেদের জমির জন্যে সেচের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে এই তো ? যারা নদী কেটে খাল তৈরি করছে, তারা জমিরও মালিক নয়, ফসলেরও মালিক নয়। তুই থাম—

মুনীর কলম তুলে কি বলতে যাচ্ছিল, শাহেদ তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিল।

ভিখিরিগুলো সরে গিয়েছে। যুবতী মেয়েটিও আর নেই। শাহেদ আধবোঁজা চোখে রোদের দিকে চেয়ে রইল। তার কপালে, চোখের নিচে, মাংসল চিবুকে, মুখের দু'পাশে অসংখ্য রেখা। মাংসে এমন ভাঁজ পড়েছে যেন গাছের গুঁড়িতে কেউ ছুরি দিয়ে বড় বড় আঁক কেটেছে। কানের পাশে গর্জন করে কলের গান বাজছে। শাহেদ আবছা দেখতে পায়, তীব্র, ভয়াবহ তীব্র শাদা রোদ ; ঝুপঝাপ কোদাল পড়ে, কালো মাটি থেকে শাদা ধুলো ওড়ে, যারা কাজ করে তাদের কালো শরীর বেতের মতো বাঁকে, সোজা হয়, তাদের গা বেয়ে ঝুরঝুর করে মাটি ঝরে পড়ে, রোদ-চকচকে পিঠ বেয়ে সরু সাপের মতো কিলবিল করে ঘাম নেমে আসে। সে যেন দেখতে পায়, এইসব লোক দাঁত চাপে, কিড়মিড় করে দাঁতের আওয়াজ তোলে, ঘাম দিয়ে মাটি ভিজিয়ে সেই কাদা গায়ে মেখে রোদের তাত থেকে বাঁচতে চায়। প্রায় ঝিম লেগে যায় শাহেদের। চোখ কচলে সে আবার শাদা চোখে দেখতে পায়, আকাশ হিংসুটে নীল, বারুদের মতো, ভিতরে ভিতরে বিস্ফোরক নিয়ে ঝুঁকে আছে, গাছপালাগুলোর পাতা নেতিয়ে পড়েছে। লোক-জনের কলরব তার কানের কাছে ফেটে পড়ে।

শাহেদ হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে পড়ল, চল্ মুনীর। আচ্ছা চলি ভাই, কাজ চালিয়ে যান।

লোকটা আঁকুপাঁকু করে ওঠে, বসেন, বসেন। আপনেদের জন্যে ডাব আনতে

পাঠিয়েছি।

আমাদের কথা মনে করে নিজেই খেয়ে নেবেন। হাতে সময় নেই। দুজন বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ভিখিরিগুলো ওদের ছেঁকে ধরে। যুবতী মেয়েটিও ওদের সঙ্গে আছে। বোমার মতো ফেটে পড়ে শাহেদ, ভাগ, যা এখান থেকে। লোকটা ঠিকই বলেছে, গুলি করে মারা উচিত ওদের। শালার ভিকিরি—

হোটেলে এসে পেঁছুতে পেঁছুতে প্রায় দুটো বেজে গেল। ফেরার পথে শাহেদ একটিও কথা বলেনি। ব্যাঙের মতো থপ থপ করে পা ফেলে মোটা মানুষটা রোদের ভিতরে যেভাবে হাঁটছিল, মুনীরের ভয় হচ্ছিল, যে-কোনো সময়ে উপুড় হয়ে এই মাঠের উপর পড়ে সে আর উঠবে না। তার শেষ নিশ্বাসটা বেরিয়ে যাবার প্রচণ্ড আওয়াজ সে সহ্য করবে কি করে?

কিন্তু শাহেদ ঠিক পেঁছে গেল হোটেলে। একটা চেয়ারে প্রায় দশ মিনিট চুপচাপ সে বসে রইল। শুধু এইটুকু সময়। তারপরেই গুমোট কেটে গেল। হাল্কা মজাদার গলায় শাহেদ ছোকরাটাকে ডাকে, এই যে বাবা কেলে সোনা—কিছু খেতে দাও। মুরগি রাঁধতে বলে গেলাম, বেঁধেছিস?

ছোকরাটা ঠিক আগের মতোই লাল মাড়ি বের করে হেসে অনেকখানি ঘাড় কাৎ করল।

ফাসকেলাস—যা নিয়ে আয়। হাঁড়িশুদ্ধু মুরগির গোশ্‌ত নিয়ে আয়। কম পড়লে খুন করব তোমাকে। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেল।

গোগ্রাসে খেল শাহেদ। খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে এসে পকেট থেকে একটা ডানহিলের প্যাকেট বার করে মুনীরের দিকে বাড়িয়ে বলল, খা। তারপর নিজে একটা ধরিয়ে একটানে আদ্দেকটা পুড়িয়ে হাসিভরা চোখে মুনীরের দিকে চেয়ে রইল, এইবার বল্।

মুনীর বলে, কি বলব?

বল্ কিছু একটা। বলেই শাহেদ চোখ তুলে স্টেশনের দিকে চেয়ে বিষম খায়। স্টেশনের পাশে এদিকটায় প্লাটফর্মের উপর চট বিছিয়ে বসে একটা লোক দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করে ভাত বিক্রি করছে। লোকটার চারপাশে কালো কালো আরো কতকগুলো হাঁড়িকুড়ি রয়েছে। বোধহয় তাতে তরকারি আছে। খদ্দেরের অভাব নেই, ভালো বিক্রি হচ্ছে। আশেপাশে দু-চারজন লোভী চোখে ডালাখোলা ভাতের ডেকচিটার দিকে চেয়ে আছে, এগোতে সাহস করছে না।

চোখদুটো বড় বড় করে শাহেদ বলল, ও কি করছে র‍্যা?

ভাত বিক্রি হচ্ছে—মুনীর বলে।

ধুর গাড়োল, দেখতেই তো পাচ্ছি ভাত বেচছে। বলছি হচ্ছেটা কি?

শাহেদ ভাই, আপনি মাঝে মাঝে খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েন। এই এতদিন এখানে বসে বসে ভাত কিনে খেয়ে পেট ভরালেন, এখন একটা লোককে ভাত বেচতে দেখে চোখ কপালে তুলছেন?

তুই শালা বাংলাদেশে দাঁড়িপাল্লা করে ভাত বিক্রি করতে দেখেছিস কোনো-দিন কাউকে খোলা জায়গায়? ছটাক ভাত, আধ পোয়া ভাত—ই কিরে বাবা! ভাত বিক্রি করছে।

হোটেলেও তো ভাত বিক্রি করে।

মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না বলছি মুনীর—দোব এক থাবড়া। প্লাটফর্মে পাল্লাদাঁড়ি দিয়ে ওজন করে ভাত বেচা—

রুটি তরকারি তো অনেকদিন আগে থেকেই বিক্রি শুরু হয়ে গেছে।

আবার কথা বলছিস? তাই বলে রুটি আর ভাত এক হলো?

মুনীর চুপ করে যায়। লোকটার হাত দ্রুত উঠছে নামছে। রোদ একটু কমে এসেছে। প্লাটফর্মে বিরাট একটা রেইনট্রি। লোকটা তার ছায়ায় বসে আছে। কিন্তু ওজন করার জন্যে দাঁড়ি তুলতেই তার সরু কালো হাতের উপর ছুরির ফলার মতো রোদ এসে পড়ছে। খালি গায়ে সাত-আট বছরের ঢাউস পেটঅলা একটা ছেলে চুপ করে লোকটার সামনে বসে থাকতে থাকতে হাঁড়ির ভাতের ডেকচিতে হাত ডুবিয়ে একথাবা ভাত তুলে মুখে দিল। দোকানদার একটু সময় নিল না, ঝট করে দাঁড়ি নামিয়ে রেখে ছেলেটার পিঠে গদাম করে একটা কিল বসালো। ধপধপে শাদা পোকার মতো অনেকগুলো ভাত ছেলেটার মুখ ছিটিয়ে মাটিতে পড়ে। চোখমুখ কুঁচকে হাঁ করে কাঁদার চেষ্টা করলে এখান থেকে তার মুখের গর্তে লালা মাখানো শাদা ভাতগুলো দেখা যায়। ককিয়ে কুঁজো হয়ে ছেলেটা একটা হাত নিজের পিঠে রাখার চেষ্টা করে। এইসব এখান থেকে শুধু দেখাই যায়, কোনো শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না।

নিশ্বাস আটকে মরে যাবে—নিশ্বাস আটকে মরে যাবে—উত্তেজনায় শাহেদ সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু ছেলেটা সামলে নিয়েছে। লোকটা আবার নিশ্চিন্তমনে ভাত ওজন করছে। হোটেলের চেয়ারে কাৎ হয়ে বসলে প্রায় কিছুই আর দেখা যায় না—শুধু দাঁড়িপাল্লা আর লোকটির কালো হাতটি দেখা যায়। খদ্দের সামনে বসে

দুটো বেশি ভাত পাল্লাতে তুলে দেবার চেষ্টা করলে যান্ত্রিকভাবে লোকটার বাঁহাত উঠে একটা ঠোক্কর মারে। কাৎ হয়ে বসলে শুধু এইটুকুই দেখতে পাওয়া যায়। শাহেদ হোটেলের কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে।

বিপ্লবের কথাটা লিখলি? আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে শাহেদ জিগগেস করে।

কোন্ বিপ্লব? মুনীর সাবধান হয়ে যায়।

ঐ যে—ঐ খালের কথা জিগগেস করছি।

কিন্তু শাহেদভাই, একটা কথা আপনি হিশেব করে দেখছেন না—মুনীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, যাদের জমি নেই, তারাই খাল কাটার কাজে নিজেদের শ্রমটা খুব শস্তায় বেচে দিচ্ছে—এটা ঠিক। বাংলাদেশের প্রায় আধাআধি লোকের জমি নেই তা-ও ঠিক। কাজেই খালের ব্যাপারটা সাকসেসফুল হলে জমির মালিকদেরই লাভ। যে বেচারারা খাল কেটে মরল, তাদের কোনো লাভ নেই। এসব কথা ঠিকই। কিন্তু একথাটাও তো ঠিক যে, উৎপাদন বেড়ে যাবে। ধরুন, ধানের উৎপাদন যা আছে, তা যদি বেড়ে যায়, তাহলে গরিব মানুষের কোনো উপকার হবে না? খাদ্যশস্য সরকারকে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, যদি উৎপাদন বাড়ে তাহলে তা আর করতে হবে না।

শাহেদ শান্তভাবে বলে, কিন্তু যারা ফসলের মালিক নয়, তাদের ঘরে ফসলটা যাবে কি করে এই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দে। ধানচালের এখন যা দাম আছে, ফলন বাড়লে তা অনেক কমে যাবে, তো বেশ ভালো কথা। কিন্তু বল দিকিনি, দিনমজুরদের মজুরি তখন এখনকার মতো বেশি থাকবে—না কমে যাবে?

কমে তো যাবেই খানিকটা—মুনীর বলে।

কাজেই বুঝতে পারছ কোনো অবস্থাতেই এইসব লোকের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হচ্ছে না। কেনার ক্ষমতা কখনোই বাড়বে না। ব্যবস্থা আছে বাবা, ব্যবস্থা আছে—লাভের গুড় খেয়ে নেবার জন্যে পিঁপড়ে ঠিকই আছে। চোরা-কারবার আছে, মজুতদারি আছে—মনে হলো অজস্র কথা বলার আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়েছে শাহেদ। বিড়বিড় করে বলল, তুই বুঝবি না, আমি শালা নিজেই বুঝতে পারি না। তা হ্যাঁরে, পুঁজিবাদ দোষ করল কি—সেখানেও তো উৎপাদন রম রম করে বাড়ে। এরপর যদি পুঁজিবাদকে গাল দাও, তোমার থোবনা উড়িয়ে দোব। হো হো করে হেসে উঠল শাহেদ, আমি অত উৎপাদন-ফ্যুৎপাদনের কথা বুঝি না বাবা—দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ভাত ওজন—

হোয়াক করে একটা বিকট শব্দ করে উঠল শাহেদ। মুখ তার টকটকে লাল। গলার শিরাগুলো ফুলে উঠছে। কোনোরকমেই সে সামলাতে পারল না। হাত দিয়ে মুখ চেপে ছুটে হোটেলের পিছনে গিয়ে হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলল।

মুনীর বসে বসে শাহেদের নাভি থেকে উঠে আসা গলা-চেরা আওয়াজ শুনতে থাকে। সদ্যভুক্ত খাবারের তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ ভেসে আসে। রোদ পড়ে যায়, বেইনট্রির কালো ছায়ার মধ্যে ভাত-বেচা লোকটার দাঁড়ি ধরা হাতে ওঠে নামে। সময় যেন আর কাটে না। অপেক্ষা করতে করতে মুনীরের মনে হয় বিরক্তিতে সে মরে যাবে। সে ঢাকায় ফিরে যেতে চায়। সেখানে তার ফ্ল্যাট বাড়িতে দশ বছরের ছেলে আর আট বছরের মেয়ে ঝিয়ের কাছে আছে। ওদের মা চলে গেছে। আর কোনোদিন হয়ত ফিরবে না। মেয়ে ইতিমধ্যেই চুলে বিনুনি বাঁধছে, দেখতে হয়েছে অবিকল তার মায়ের মতো। ছেলের শুধু ঠ্যাং দুটোই লম্বা হচ্ছে, হাফপ্যাণ্ট পরলে ছোঁড়াটাকে বেঢপ লাগে। মনে হয়, এরকম নির্বোধ জানোয়ারের মতো ছেলে পৃথিবীতে দুটো নেই। ওদের মা আর ফিরছে না। সিগারেটে টান দিতে গিয়ে মুনীরের বুকে হ্যাঁক করে ধাক্কা লাগে। ভিতরে ভীষণ যন্ত্রণা আর কষ্ট হতে থাকে। সিগারেট ফেলে দিয়ে মুনীর উঠে দাঁড়ায়। মুখে চোখে পানি ছিটিয়ে শার্টের বুকের কাছটা ভিজিয়ে শাহেদ ফিরে আসে। তার মুখ মরার মতো ফ্যাকাশে।

চলুন শাহেদ ভাই, রেস্ট হাউসে ফিরে যাই, শরীরটা আপনার খুব ভালো মনে হচ্ছে না—মুনীর বলে।

চল্—শাহেদ দরজার দিকে পা বাড়ায়।

ধরব আপনাকে? হাঁটতে পারবেন?

ধরতে হবে না। একটা রিক্সা ধর।

দুজনে হোটেলের দরজায় পা দিয়ে রাস্তায় নামতে যাবে, কোলে-বাচ্চা যুবতী ভিখিরিটি ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটির সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে সামলে নিয়ে মুনীর ওর দিকে ফিরে চায়। হাতখানেক দূরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। একটু লম্বাটে, শক্ত পরিপূর্ণ স্তনদুটি খোলা। কটা রঙের কয়েকটা চুল তার গালে আর ঠোঁটের উপর আঠালো ঘামে লেপ্টে আছে। মেয়েটির মুখে ধুলোমাটির একটা পরত—মুনীরের মনে হলো গামছা বা কাপড় দিয়ে ঘষে দিলে মুখটা ঝকঝকে হয়ে উঠবে। এই হিশেবে তার মুখ পরিষ্কার। মুহূর্তের জন্য মুনীর শাহেদের চোখে চোখ রাখে। মেয়েটি ফোঁস করে একটি গরম নিশ্বাস

ফেলে। কিন্তু তার নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ছিল না। ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে। রেস্ট হাউসে ফিরে জামাকাপড় না ছেড়ে, হাতমুখ না ধুয়ে সোজা বেতের চেয়ারটায় বসে শাহেদ বলে, বার কর্ দেখি—আমার স্যুটকেশে আছে।

মুনীর বুঝতে পারে না, কি ?

দ্যাখ না স্যুটকেশটা খুলে। চাবি দেওয়া নেই। এখনো আছে খানিকটা।

মুনীর এইবার ধরতে পারে, এনেছিলেন নাকি ? কিন্তু আপনার শরীর তো বেশ খারাপ হয়ে পড়ল। এখন খাবেন ?

আরে আমি একা খাব নাকি। তুইও খাবি। জিনিশটা ভালো—বার কর্ না।

স্যুটকেশ খুলে হুইস্কির বোতলটা বের করে মুনীর। জিনিশটা দেখে খুশি হয়ে ওঠে, কিন্তু বমি করে খাবার যা পেটে ছিল, সব তো দিলেন উগরে। খালি পেটে খাবেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। না না, পানি দিস না। এমনিতেই শালা পানি।

একটু আগে সূর্য ডুবেছে, এখনো তেমন অন্ধকার হয়নি। মুনীর উঠে আলোটা জ্বেলে দিয়ে এল। বাইরে ধূসর অন্ধকার, অল্প একটু বাতাস উঠছে। বাতাসটা ঠাণ্ডা। এঘরে আলো জোরাল। মুনীর তীব্র চোখে শাহেদের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দু-একবার চুমুক দেয়ার পরেই শাহেদের মুখে রঙ ফুটল। মুনীর দেখে শাহেদের ফুলো মুখের ভাঁজে ভাঁজে ঘাম জমছে। দু-একটি ফোঁটা তিরতির করে মুখের উপর কেটে-বসা রেখা বেয়ে নিচে নামছে। বাজারের পাকা আপেল-নাসপাতির মতো শাহেদের মুখটাও যেন জায়গায় জায়গায় পচে গেছে।

শাহেদ শুরু করে, ভিখিরি আর দিনমজুরদের দিয়ে খাল কাটিয়ে জোত কি জন্যে অঁ্যা ? দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এই, কথা শুনছিস ? মুনীর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চমকে উঠে বলল, উঁ।

শালা, তুমি থাক কোথায়। আমি মরছি বকে। বলছি, দেশের ঠ্যাং দুটো কোথা আমাকে বল।

গরিব মানুষের বুকে—মুনীর দুম করে বলে ফেলে।

কি বললি ? গরিব মানুষের বুকে ? ছ্যামরা, তোর বুদ্ধি খুলে গেছে।

শাহেদ প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করে, ঠিক বলেছিস। গরিব মানুষের বুকে।

শাহেদের ব্যাপার দেখে মুনীর শংকিত হয়ে ওঠে। সারারাত মাতালের সঙ্গে তো থাকা যাবে না। বুড়ো দামড়াটা তো মাতাল হবে বলে ঠিকই করে ফেলেছে। হঠাৎ খুব গম্ভীরভাবে শাহেদ মুনীরের দিকে ঝুঁকে আসে, এত কাছে যে চড়া আলোয় তার মুখের লোমকূপগুলো পর্যন্ত মুনীর দেখতে পায়, হুইস্কির গন্ধ তার নাকে আসে, একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে শাহেদ বলে, ডোণ্ট বি সিলি। উল্লুকের মতো ধরে নিস না আমি মাতাল হয়ে পড়েছি। কিন্তু তোকে সত্যি বলছি আমি খুব ডিস্টার্বড, সারাদিন শালা ডিস্টার্বড। যে যে-ভাবে পেরেছে আমাকে ডিস্টার্ব করেছে। দিস ইজ এ স্ট্রেঞ্জ কাণ্ট্রি—রাস্তায় বসে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ভাত ওজন করে বিক্রি করছে, ছেলেটার কথা তোর মনে পড়ছে—হাঁ করে কাঁদছে আর শালার ব্লাডি—

মুনীর বলে, সত্যি শাহেদভাই, আজ আপনার মন ভালো নেই। শুয়ে পড়ুন বরং—

অপ্রকৃতিস্থের মতো হেসে শাহেদ বলে, লক্ষ্মীভাই, বিশ্বাস কর, এইটুকু মদে আমার কিসসু হয়নি। ব্যাপারটা তা নয়—ধুর শালা, একটা মেয়েমানুষ জোগাড় করতে পারলে হতো।

ছি ছি শাহেদভাই, ছি ছি—মুনীর ধিক্কার দেয়।

ছি ছি আবার কি? মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ, ব্যাস!

মুনীর হাসে, সত্যি বলছেন? নিয়ে আসব জোগাড় করে? আপনি আমাকে চেনেন না। ঠিক এনে হাজির করবে বলে দিচ্ছি।

তুমি বাবা শিকারী বিড়াল। তোমার গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। তা, তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস কেন র‍্যা? কবে আমার বউ মরেছে জানিস? দুটো ছেলে আছে, সে হারামজাদাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমি যাই করি তাতে কার কি এসে যায়? আমি আবার একটা মানুষ নাকি? আমি হচ্ছি ভদ্দরলোক—মানে আগাপাছতলা ভণ্ড। আমার জীবিকা ভণ্ডামি। সাংবাদিকতার নাম করে ক্রমাগত ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছি। শোন, দেশের লোক যদি আমায় ন্যাংটো করে চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে আমার পোঁদে লাথি মারে, আমার কিছু বলার আছে? কিসসু বলার নেই। তা বাবা আমার কোনো ভয় নেই—জোগাড় করে নিয়ে এস একটি মেয়েমানুষ।

মৃদু একটি শব্দ হতে মুনীর চোখ তুলে দেখল দরজার কাছে সেই যুবতী মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তার সঙ্গে বাচ্চাটি নেই। দরজার চৌকাঠে

হাত দিয়ে মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বুকদুটি আগের মতোই খোলা। মেয়েটির মুখে সামান্য একটু হাসি আছে—হাসিটাও তার চেহারার মতো পরিষ্কার।

তখন জানোয়ারের মতো পুরো বাড়িটা কাঁপিয়ে শাহেদ চেঁচাতে লাগল, তাড়িয়ে দে, ওকে তাড়িয়ে দে, দোহাই তোর, তাড়া ওকে।

দূরবাসী

বাসটাকে বেজায়গায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লাম। যেখানে-সেখানে আজকাল আর বাস দাঁড়াতে চায় না। আমাকে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়েছে। সঙ্গে জিনিশপত্র তেমন নেই—পেট-ফোলা ব্যাগটা হাতে নিয়ে মাটিতে পা দেবার আগেই বাস ছেড়ে দেয়। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে আমি সামলে নিলাম। বাসের পিছন দিক থেকে বেরিয়ে আসা একঝস্ট পাইপ থেকে কুচকুচে কালো ধোঁয়া এসে কিছু আমার নাকে-মুখে ঢোকে, কিছু আমার জামাকাপড় মলিন করে দেয়। মুখের ভিতরে ধোঁয়াটে আলুনে স্বাদ, গলার মধ্যে শুকনো কাঠে কাঠে ঘষার মতো খক খক নীরস কাশি আর একটা মোটা সেদ্ধ অসাড় জিভের অনুভূতি নিয়ে আমি একেবারে হঠাৎ-ই খেয়াল করি আমাদের দেশের বাড়ির রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

ধোঁয়ার মতো নোংরা জলকণাহীন মেঘে সমস্ত আকাশ ঢাকা, সূর্যের দেখা নেই। ভাদ্রমাসের গুমোট গরমে গাছপালা থমথম করছে। আমি একবার হাঁ করে নিশ্বাস নিয়েও যেন যথেষ্ট অক্সিজেন পেলাম না। পায়ের নিচে ঘাসপাতা সকালের মৃদু বৃষ্টিতে ঘেমে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। একবার আকাশের দিকে একবার চারপাশের প্রকৃতির দিকে আমি অন্যমনস্কভাবে চেয়ে দেখি। মনে হয় না আমি দেশে ফিরছি। কোথাও কিছু নেই—নিজের দেহের ভিতরটা মনে হয় জং-ধরা পুরনো মেশিন—বহুদিন তেল দেওয়া নেই, কেউ যন্ত্রপাতিগুলো ধোয়ামোছা করেনি। সর্দিবসা গলার আওয়াজের মতো শব্দে ফুসফুসের ওঠা-নামা টের পাই। টের পাই পুরনো ঝরঝরে হৃৎপিণ্ডটা যেন বোঁটা থেকে খুলে আসছে। আমার মনে হয় না আমি দেশে ফিরছি।

রাস্তা পেরিয়ে পিছনে বড় মাঠটার দিকে বহুকষ্টে চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখার চেষ্টা করি। একফোঁটা সবুজ চোখে পড়ে না। বেঢপ কতকগুলো চিমনি থেকে আবার সেই কালো ধোঁয়া উঠছে। মাঠটায় ইটের ভাঁটা তৈরি হয়েছে অনেকগুলো। নিচের মাটি খুঁড়ে উপরে আনা হয়েছে। মাটির তলায় বড় বড়

সুড়ঙ্গ—বিকটাকৃতি ডাইনোসরের মরা দেহের মতো খুঁড়ে তোলা মাটি পিঠ উঁচু করে আছে। ভিতরটা ফোঁপরা, কোথাও পোড়ামাটির ধ্বস নেমেছে। যতদূর চোখ চলে এইরকম লাল পোড়ামাটির ধ্বস—এবড়োখেবড়ো উঁচুনিচু জনহীন দুর্গম। চোখ ফিরিয়ে নিই, মনে পড়ে যায় এই ঘনসবুজ মাঠটা চিরে একটা সরু শাদা পায়ে-চলা রাস্তা দিগন্তের কাছে গিয়ে একটু উঁচু হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠত। এত স্পষ্ট যেন হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে। এখনকার মাঠটার চেয়ে সেই মাঠটা বেশি সুন্দর ছিল কিনা জানি না, শাদা সরু রাস্তাটা চোখের উপর ফুটে উঠল এখন। এইমাত্র।

আমাকে যেতে হবে। বাড়ি যাবার রাস্তার মোড়ে কেউ এমন করে দাঁড়িয়ে থাকে না। মোড়ের উপরেই একটা বটগাছ। গুঁড়িটা বাঁধানো। একটা চাতালের মতো। ইচ্ছে করলে খানিকক্ষণ বসে থাকা যায়। দু'পা এগিয়ে চাতালে পা রেখে দাঁড়াই। সিমেন্টের মেঝে ফেটেচেটে একাকার। যেখানে-সেখানে বড় বড় চারাগাছ গজিয়েছে। অত বড গাছে কোনো পাখি নেই।

আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই। কি সাংঘাতিক ভারি! অথচ কিছুই তো প্রায় ব্যাগে নেই। ব্যাগ তো খালি একরকম। তখন খেয়াল করে দেখি ব্যাগ খালি, মাথার ভিতরটা খালি, বুকের ভিতরে কতকগুলো জবরজং যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নেই। কিছুই নেই—কোনো প্রত্যাশা নয়, কোনো অভাবিত আনন্দ নয়, কোনো প্রাপ্তির আকাঙ্খা নয়। আমি আমার বুড়ো মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তা, এতক্ষণ আমার কিছুই মনে পড়ছিল না—এইবার মনে পড়েছে, বহুদিন দেশের বাড়িতে আসা হয়নি, দেখা হয়নি মা-বাবার সঙ্গে, তাঁরা যে-কোনোদিন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারেন। ওঁদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। কেন দরকার? মনের ভিতরে হাতড়াতে থাকি। বড় বড় ফাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাডা আর কিছুই কানে আসে না, আর কোনো কিছুই চোখে পড়ে না।

মনে পডে ছোটবেলায় দূর থেকে একটি ট্রেনকে মাঠের কিনারা বেয়ে টিক টিক শব্দে চলে যেতে দেখে কি অদ্ভুতই না লেগেছিল। অসম্ভব সুন্দর কারুকাজ করা একটা গালচে চোখের সামনে খুলে যাবার মতো—খুলতে খুলতে আর শেষ হতে চায় না। বটগাছের তলায় ফুটিফাটা সিমেন্টের মেঝের উপর বসে—পিছনে পোড়া লাল মরা মাঠ, ছয়-টনী ট্রাকের মাটি কাঁপানো গভীর আওয়াজ, ধোঁয়া-মাখা গাছপালা আর বর্ষণ-সম্ভাবনাশূন্য আধো-অন্ধকার ছাই-রঙের আকাশের

পটভূমিতে ছেলেবেলাকার সেই গালচে-খেলার ব্যাপারটা মনে পড়ে আমার হাসি পেয়ে যায়। ভবিষ্যতের আর সামান্যই খুলতে বাকি—তবে আন্দাজ করা যাচ্ছে সহজেই। এখন আর ওটা গালচে নয়, একটা বড়ো বস্তা, অন্ধকার পোরা আছে, একদিন শিগগিরই বস্তাটার মুখ খুলে যাবে, আমি সুড়সুড় করে গিয়ে বস্তাটার মধ্যে ঢুকব, মুখটাও যাবে ঝপ করে বন্ধ হয়ে। আর যেটুকু ইতিমধ্যে খুলে গেছে, কি কদর্য সেটা—কি কদর্য!

ছোটো ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। আমার পা-দুটো টলমল করতে থাকে। বটগাছের তলার চাতাল থেকে রাস্তা সোজা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। রাস্তার মাঝখানটা উঁচু, দুদিকে ঢালু, সকালের বৃষ্টিতে সামান্য পিছল। এইবার আমি আমার মা-বাবার কাছে যাব।

সত্যিই পেঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যায়। রাস্তাটা একটু এগোলেই চারদিক এমন স্তব্ধ হয়ে আসে! দু-চারটি ছোটো ঝোপ-জঙ্গল, খানিকটা পড়োজমি, কয়েকটা বসতিহীন ভিটে, পর পর তিনটি অন্ধকার বাঁশঝাড় পার হলে মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই এইভাবে কি প্রেতের জগতে চলে আসা যায়? প্রেতদের হাঁটতে দেখা যায়? চাই কি কথাবার্তাও শোনা যায়? রাতে শকুনের ছানা মানুষের বাচ্চার মতো কাঁদে, সমস্ত দুপুর কর্কশ গলায় একটানা কাক ডেকে যায়। বাঁদিকে চেয়ে আমাদের বাড়িটা চিনতে পারি। অনেকদিন আসা হয়নি, তবু চিনতে পারি, ডোবার কালো পচা পানি স্থির হয়ে আছে, পাঁকের মধ্যে কাঁকড়া বা কোনো মাছ বজবজ শব্দে বুদবুদ তোলে।

আর কোনোদিকে না চেয়ে আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে প্রাণপণে কড়া নাড়ি। চারদিকের নির্জনতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়তে থাকে। আমার নিজেরই দু'কানে তালা ধরে যায়—কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়ি না, কড়া ধরে ঝাঁকাতেই থাকি, ঝাঁকাতেই থাকি।

থপথপ মৃদু মন্থর পায়ের শব্দ আসে, বন্ধ দরজার পিছনে খুট করে আওয়াজ হয়, তারপরই একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আমার কানের কাছে ফেটে পড়ে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দুই চোখ আমি একাগ্র খুলে রাখি, খাড়া করে রাখি দুই কান, এমনকি জং-ধরা হৃৎপিণ্ডটি পর্যন্ত ধবক ধবক করে চলতে শুরু করে। কার সঙ্গে আমার দেখা হবে? মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাই।

দরজা খুলে যায়। খুব আস্তে আস্তে খোলে—এ বাড়ির দরজা আবার সাবেকি ধরনের লোহার হাঁসকলের উপর বসানো। যতক্ষণ দরজা খোলে, একটানা

বিচ্ছিরি একটা শব্দ হতে থাকে। সম্পূর্ণ খুলে গেলে পিছন থেকে এমন একটা চাপা শাদা আলো আসে যে আমি ভালো করে কিছুই দেখতে পাই না। দরজার ওপারে ঘরের মেঝেয় যে দাঁড়িয়ে তাকে আবছা দেখতে পেলাম মাত্র। আলোটা চোখে আর একটু সয়ে এলে যখন তাঁকে ভালো করে দেখতে পাই, তখন যে কিছুতেই চিনতে পারি না। আধময়লা শাদা শাড়ি পরা কোলকুঁজো ছোট্ট মানুষটি কতদূরে দাঁড়িয়ে— এতদূর এলাম, কিছুতেই মেঝেটুকু পেরিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারি না। দরজায় হাতের ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি বললেন, কে? তার গলা আমার কানের কাছে ফিশফিশ করে উঠল। আমি তাঁর নষ্ট ঘোলা চোখ দুটি দেখলাম। একটু সময়ের মধ্যে বড় বেশিই দেখে ফেললাম। মুখের চামড়ায় ধরেছে পোড়া কাল রঙ, অসংখ্য ভাঁজে জীর্ণ কাগজের মতো রসহীন কপাল, শণের নুড়ির মতো পাকা এলোমেলো চুল—এই সব-কিছুই বড় দ্রুত দেখে ফেললাম আমি।

আমার মা আবার বললেন, কে? কে কড়া নাড়ছে?

আমি নিজের নাম বলি। বলে কি ঘটে দেখার জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কি কি ঘটতে পারে ভাবতে গিয়ে অসম্ভব ক্লান্তি লাগে আমার।

আমার নামটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটবে ভেবেছিলাম তা ঘটল না। মাটির উপর ছোট্ট ঢিবির মতো জেগে থাকা আমার মায়ের চোখে একটু আলোও দেখা গেল না, মুখের কোনো রেখাও কাঁপল না, তিনি আমার নামটা দুবার উচ্চারণ করে বললেন, জাহিদুল কে?

যাক, বাঁচা গেল। অবস্থা আমার চেয়ে একটুও ভালো নয়। নিজের ছেলের নামটাও ভুলেছেন দেখা যাচ্ছে। আমি মৃদু গলায় আমার ভালো নাম আর ডাক নাম দু'বার করে চারবার বলি।

ওমা, তাই তো, তোতা, আমি বলি কে বুঝি! মা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন, সম্ভব হয় না; নিজের বেতো অথর্ব শরীরটা নিয়ে তিনি হাঁজোর-পাঁজোর করে আমার দিকে এগিয়ে এসে প্রথমে দু'হাত দিয়ে আমার দু'হাত ধরেন। খরখরে শুকনো হাত একটুকরো শিরীষ কাগজের মতো আমার হাড়ের উপর দিয়ে চলে যায়। তাঁর মুখের ভাঁজগুলো আরো ট্যারাব্যাঁকা হয়ে ওঠে, আমার বুকের কাছে তাঁর শাদা মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকুনি খেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি, তিনি কাঁদছেন কিন্তু চোখের কোণে পানি দেখতে পাই না। এলোমেলো হাত চালিয়ে তিনি তাঁর তালু আমার কানের উপর রাখেন। তারপর কি অসম্ভব ব্যাকুলতার

সঙ্গে আমার মাথাটা টেনে নামিয়ে, টেনে অনেকটা নামিয়ে আমার গালে শব্দ করে চুমো খান—তারপর অন্য গালেও।

আমি কেন স্তম্ভিত হয়ে যাই? কেন স্তম্ভিত হয়ে যাই? আমার দু'গালে শক্ত তারের মতো কাঁচা-পাকা দাড়ি। ঘামে ধুলোয় একটা মোটা আস্তর পড়েছে। নিশ্চয় টক আর নোনতা স্বাদ লেগেছে মায়ের জিভে। এই গালে চুমো! আমার কেমন লাগছিল আমি জানি না। প্রচণ্ড অদৃশ্য চড়ের ভয়ে দু'গাল যে আমার সবসময়েই সিঁটিয়ে থাকে। মায়ের মুখের লালায় সেই গাল একটু ভিজে যায় আর কানের কাছে আবার ফেটে পড়ে সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ-মরুভূমির হাওয়ার মতো। যার উপর দিয়ে যায়, শুষে নেয় তার রসটুকু।

এমনি করে মা আমাকে নাড়াচাড়া করতে থাকেন, ভিজিয়ে গলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি কিছুই বোধ করি না, কোথাও নাড়া খাই না, কিছুই জেগে ওঠে না, ব্যাগ কাঁধে জানোয়ারের মতো দাঁড়িয়ে থাকি—কিছুতেই যোগাযোগ হয় না।

মা জড়িত গলায় বলে যান, কেমন আছিস বাবা? ভালো ছিলে? এতদিন আসিসনি কেন? এলি তাহলে?

আমি বলি, তোমরা কেমন আছ? নিজের গলার শব্দে আমি নিজেই চমকে উঠি। করাত দিয়ে কাঠ চেরার আওয়াজ পাই যেন।

এই সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে চাপা তীব্র গোঙানির শব্দ আসে। মুহূর্তের মধ্যে আমাকে ছেড়ে দিয়ে মা পাশের ঘরে ঢোকেন। আমি জানি, সেখান বাবা আছেন। ব্যাগটা আর কাঁধ থেকে নামাই না—ঘরে গিয়ে ঢুকি। দরজা-জানলা সব বন্ধ—ঘর অন্ধকার, কাজেই প্রথমে কিছু চোখে পড়ে না, শুধু কাতরানির শব্দ কানে আসে। একটু পরে দেখি দু'হাত দিয়ে নিজের ডান জানু ধরে বাবা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। কতটুকুন মানুষ, কত ছোট্ট দেখাচ্ছে তাঁকে, ঘরে একটা জোর হাওয়া উঠলে শুকনো কাঠির মতো মচকে যাবেন। সামনের দিকের দরজাটা আমি খুলে দেই। যেন অনেকদিন পর আলো লেগেছে—এভাবে তাঁর অবোধ চোখ দুটি মিটমিট করতে থাকে। তখন আমি দেখতে পাই, টেবিলের উপর থেকে এক টুকরো ভারি লোহা কি করে তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর পড়েছে—টুকরোটা গড়িয়ে চলে গেছে অনেকটা দূরে, আঙুলটা একেবারে থ্যাতলানো। মা কেবলি অস্থির প্রশ্ন করতে থাকেন, কি হয়েছে? কিন্তু একবারও বুঝতে চেষ্টা করেন না। রাগে আমি ফেটে পড়ি,

কি কাজে এই লোহার টুকরোটাকে টেবিলের ওপরে রাখা হয়েছে? আর তুমি গেলেই বা কি করে ওটার কাছে?

আমার চিৎকারে বাবা গোঙানি থামিয়ে ফেলেন। আমার মনে হতে থাকে পায়ে আঘাতের পুরো খবর তাঁর মগজে পৌঁছোয়নি—কিরকম ভাবলেশহীন ভাবে তিনি আমার দিকে চেয়ে থাকেন। পৃথিবীর খবর, আশেপাশের খবর, রোদ ঝড় বৃষ্টির খবর কিছুই বোধহয় আজকাল আর তাঁর মাথায় পৌঁছচ্ছে না। আমার কথা তিনি একবারও জিজ্ঞেস করলেন না।

ঘরে কি ডেটল আছে? আমি জিজ্ঞেস করি।

মা আমার দিকে চেয়ে থাকেন। তখন একটা শাদা ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে আমি বাবার থ্যাঁতলানো আঙুলটা ভালো করে বেঁধে দিই একটুখানি ফ্যাকাশে রক্ত আমার হাতে লেগে যায়। তাঁকে টেনে বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে আমি নিজের নাম বলি। এবার সরাসরি ডাকনামটাই বলি এবং তিনি চিনতেও পারেন।

তবে তিনি শুধু বলেন, অ, কখন এসেছ? নিচের ঠোঁটটা সম্পূর্ণ ঝুলিয়ে দিয়ে ঝিমুতে শুরু করেন।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। অসম্ভব ক্লান্ত লাগে। পাথরের দেয়াল কে ভাঙতে পারবে? আবার পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকি। কেউ নেই। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই - কোথাও কোনো শব্দ নেই। যেমনি নোংরা মেঘে আকাশ ঢেকে আছে।

রাতে আমি আর মা একঘরে শুয়েছি। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে বলে দরজা-জানলা শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে পুরনো নড়বড়ে একটা জানলা থেকে। হারিকেনটাও একটু আগে নিভে গেল। হাওয়ায় ছেঁড়া মেঘ নিশ্চয় অন্ধকার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে. পাশের ঘর থেকে বাবার কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। দুপুরে মা নিজের হাতে রান্না করে আমাকে খাইয়েছেন—অনেক জিনিশ বের করেছেন ভাঁড়ার থেকে যেগুলো তিনি শুধু আমার জন্যেই জুগিয়ে রেখেছিলেন। সেসব জিনিশের অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। তবু আধ-নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিশের অনেক যত্নে তিনি শুধু আমার জন্যেই তৈরি করেছেন। আমার খেতে ভালো লাগেনি। যা তিনি রেঁধেছেন সবই কেবল আঁশটে, পুরনো মাটির গন্ধে ভরা।

মা ঘুমোননি। এর মধ্যে তিনবার পাশ ফিরেছেন। তাঁর দীর্ঘশ্বাসের সেই

ভীষণ শব্দ শুনেছি দু'বার। সন্ধেবেলায় যখন আলো ছিল, ঝোড়ো হাওয়াটাও ওঠেনি, সেইসময় মা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, জানতে চাইছিলেন, আমি এখন কি করি, কোথায় যাই, কাদের সঙ্গে কথা বলি, কি খেতে পছন্দ করি—এইসব। আমি উৎসাহের সঙ্গেই এসব কথার জবাব দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি, আমার একটি কথাও তাঁর কাছে পৌঁছচ্ছে না। তিনি খুবই অন্যমনস্ক বোকার মতো আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আপন মনে বলে উঠলেন, আমাদের সময়ে সে এককাল ছিল।

আলো নিভিয়ে দেবার পর আমি কুঁজো হয়ে দুই হাত কোলের কাছে জড় করে শুয়ে পড়লাম। ছোটবেলায় ঠিক যেভাবে মায়ের বুক ঘেঁষে শুয়ে শুয়ে রূপকথা শুনতাম, উৎসাহে টগবগ করে ফুটত আমার রক্ত, পক্ষীরাজ ঘোড়ার ঘেমো গন্ধটা পর্যন্ত যেন এসে নাকে লাগত আর কত অসংখ্য রঙে ঝলমল করে উঠত আমার কল্পনা অন্ধকার রাতকে আলো করে দিয়ে—ঠিক সেইভাবে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, মাকে বলি, একটা রূপকথা বল। কতবার ভাবলাম বলি, এখন ঘুটঘুটে অঁাধার, বোধহয় কিছু ঘটবে। কিন্তু জানি, কিছুই ঘটবে না—যে নাড়িটা দিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে বাঁধা ছিলাম, জন্মের পরের মুহূর্তেই কেউ তা কেটে ছিন্ন করে দিয়েছে। কোনো কিছুই আর ঘটবে না।

আমি ঝড়ের গর্জন শুনি—পুরনো শালকাঠের দরজায় আছড়ে পড়ছে। বুনো জানোয়ারের মতো ক্রমাগত থাবা চালাচ্ছে, অঁাচড়াচ্ছে, কিন্তু আমি জানি কিছুতেই ঘরে ঢুকতে পারবে না।

কাল সকালে উঠেই ফিরতি বাস ধরতে হবে। আমি হাত-পা টান টান করে দিয়ে আঁধার ছাদের দিকে চেয়ে থাকি।

পাবলিক সার্ভেণ্ট

ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখ মামুন রশীদের জীবনের শুভদিন। অন্তত এই উনিশশো তিরাশি সালের ফেব্রুয়ারির তিন তারিখের আগে পর্যন্ত তাই ছিল। তিরাশির তিনের সকালেও এই ধারণা পাল্টানোর কোনো কারণ ঘটেনি। মামুন হিশেব করে দেখেছিল ঐদিনে তার চাকরির বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে, তার বিয়ের আঠারো বছর এবং তার একমাত্র পুত্রসন্তান ষোলো বছরে পা দিয়েছে। দুঃখের কথা, মামুন তার নিজের জন্মতারিখ জানে না, তবে তার দৃঢ়বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস সঙ্গত বলেই মনে হয় যে তার জন্মও কোনো এক ফেব্রুয়ারির তিন তারিখে। এতগুলি ফেব্রুয়ারিব তিন যখন তার জীবনে এত শুভ হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন সে নিজেও নিশ্চয় এই দিনেই এক দুর্লভ উপহার হিশেবে এই বাংলাদেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু সে কথা বলা যাবে না, কারণ তার বাবা ঐরকম একটা সময়ে হবে, হয় জানুয়ারি না হয় ফেব্রুয়ারি, হয় মাঘ, না হয় ফাল্গুন এই রকম কথা বলে এসেছেন, কখনো নির্দিষ্ট তারিখ মনে করতে পারেননি। অথচ ভদ্রলোক তাঁর অন্যান্য সন্তানদের প্রত্যেকেরই জন্মের বার তারিখ তিথি নক্ষত্র সবই লিখে রেখেছিলেন, শুধু তার বেলাতেই কিছু লিখে রাখেননি। ভাইবোনদের প্রায় সবাইকে এখন গোরু গাধার শামিল ধরে নেওয়া যায়, অন্তত মামুনের সঙ্গে তাদের কোনো তুলনাই চলে না। এ থেকেই বোঝা যায় মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। মামুন রশীদ তার বাবার পঞ্চাশ বছর বয়েসের সন্তান—ভাইবোনে মিলে তখন পাঁচ-সাতজনের জন্ম হয়ে গিয়েছে।

আজকের আকাশটা নিচু, ঠিক যেন ছাদের উপরেই নেমে এসেছে। সীসের মতো ময়লা ছাই রঙের আকাশ, রোদ নিভে গেছে সকাল থেকেই। হিম ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া বইছে, এইবার টিপিটিপি বৃষ্টি নামবে। আকাশের ভারটা ঘরের মধ্যেও টের পাওয়া যাচ্ছে। মামুন কয়েকদিন থেকে অফিস যাচ্ছে না, লম্বা একটা ছুটি নিয়েছে। পাজামার উপরে মোটা সুতির পাঞ্জাবি পরেছে সে। তার উপরে জড়িয়েছে পুরনো একটা কাশ্মিরী শাল। ড্রয়িংরুম দোকানের মতো সাজানো,

মেঝেতে দেয়াল থেকে দেয়াল পুরু কার্পেট, আমাদের দিশি আমিন ভাইদের নয়, খোদ ইরানি ; ফোম আঁটা ডবল সোফা সেট, নিচু টেবিল, টিপয়, ফুলদানি, ফুল, বুক কেস, ব্রোঞ্জের নগ্নিকা, ডিসকাসনিক্ষেপকারী অ্যাথলেট, দেয়ালে জয়নুল, সুলতান, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন্নবী—মানে সংস্কৃতির একেবারে ছড়াছড়ি। বলা চলে বিশ্বসংস্কৃতির মেলা। অত বড় ঘরেও ঠিকমতো জায়গা হচ্ছে না। জায়গা সংকুলান না হবার একটা কারণ হচ্ছে এতসব সংস্কৃতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে না, তাদের মধ্যে লচঘটি খটাখটি লেগেই আছে। ঘরের আবহাওয়া চব্বিশ ঘণ্টাই তেতে রয়েছে। বাঁদিকে একটুকরো চৈনিক সংস্কৃতি, তার পাশেই ডান হাতে খানিকটা বাঙালি সংস্কৃতি ঠিক যেন নেড়ি কুকুরের মতো দাঁত খিঁচিয়ে আছে। ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার পুতুলের ভিতর পুতুল, বড় মানিব্যাগের মধ্যে ছোট মানিব্যাগ, এদিকে তার কাছেই সংস্কৃতি সুড়ঙ্গ খুঁড়তে খুঁড়তে চলে গেছে মহেঞ্জো-দরো পর্যন্ত। এপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যামদেশের কাঠের তৈরি বিরাট এক হাতি। তার পিঠে চড়া যায়। সত্যি বলতে কি মামুনের ছেলে এই ষোল বছর বয়সেও ওটার উপরে চড়ে বসে থাকে।

এই ড্রয়িংরুম বন্ধ। প্রথমে সূক্ষ্ম তারের পাল্লা বন্ধ, তারপর মোটা কাচের পাল্লা বন্ধ, তার পিছনে কাঁচা সোনা রঙের ভারি পর্দা থকথকে করে টানা। এইভাবে সব বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে কাশ্মিরী শাল গায়ে মামুন বড় সোফার ফোমের মধ্যে শরীরের আদ্দেকটাই ডুবিয়ে দিয়ে বসে আছে। ঠাণ্ডা লাগার প্রশ্নই নেই। ঘরের ভিতরটি কবরের মতো স্তব্ধ, বাতাস ঢোকা তো দূরের কথা বাইরের ঝড়ো বাতাসের গর্জন পর্যন্ত এতটুকু শোনা যাচ্ছে না এ ঘর থেকে। মাঠঘাট ঝেঁটিয়ে হাওয়া যে কেঁদে চলেছে অকূল উদ্দেশ্যে সেটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে অবশ্য রবি ঠাকুরের গানের রেকর্ড রয়েছে। ঘরের কোণে রাখা মিউজিক সেণ্টারটি চালু করে দিলে সমুদ্রের গভীর গর্জনকেও এখানে ডেকে আনা যায়।

সোফায় বসে বসে সকাল থেকে এ পর্যন্ত তিনবার সে ডেকেছে তার বউকে। বউ আসেনি। মামুন বেশ লম্বা, কিন্তু সোফাটিকে তৈরি করিয়েছে তার চেয়েও লম্বা করে যাতে কোনোরকম অসুবিধে না হয়। এই সোফা তাদের বড় প্রিয়, এতে চড়ে তারা সাত ভুবন দেখে এসেছে। সময়-সুযোগ যখন মিলেছে তখন এই সোফাতেই মামুন রকমারি খাবার খেয়েছে, মুখ ফিরিয়েছে

নতুন স্বাদের মাংসে। সেইসব খাদ্যের নানা গন্ধ নানা চিহ্ন এখনো হঠাৎ হঠাৎ মামুন পেয়ে যায়। সেদিন সে পেয়ে গেল এক দীর্ঘ সোনালি চুল, ফোমের ভাঁজ থেকে যখন টেনে বের করছিল, মনে হচ্ছিল যেন দৃঢ়লগ্ন দুই স্তনবলয়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসছে এক স্বর্ণতন্তু। চুল থেকে মনে পড়ে গেল অত-লান্তিকের নীল মেশান একজোড়া নীল চোখ। জোয়ানা ছিল। মামুন বুঝতে পারে না, মেয়েরা কি কারণে পারফিউম মাখে। তার ধারণা খুব ভালোজাতের শিকারী কুকুরের চেয়েও সমজদার পুরুষের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। এই নিষ্কলঙ্ক সোফায় কি বিচিত্র সব সুগন্ধের আভাস। এসবের তো সত্যিই কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিটি নারীর যে নিজের নিজের একা গন্ধ তা সে নির্ভুলভাবে চিনে নিতে পারে, পারফিউম ব্যবহার করার ফলে সেই চিনে ওঠার ব্যাপারটাই শুধু গুলিয়ে যায়। এর কোনো মানে হয় না।

অন্যদিকে মেয়েরা কোনো গন্ধ পায় না। গুয়োপোকার মতো অন্ধ তারা। তাদের ঈর্ষা বড় ছোট জায়গায় ঘুরপাক খায়। তারা কেবল নিজেদের দেখে। আপন আপন পুরুষমানুষকে নাভিমূলের চারপাশে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে চায়। মামুন সারাদিন বসে বসে আকাশের রঙ ফেরা দেখতে পারে। মেয়েরা তা পারে না। গুয়োপোকার দল। সেইজন্যেই বার বার সে তার বউকে এই একই সোফায় ডাকতে সাহস পায়। কিন্তু আজ কিছুতেই আসছে না সে। শোবার ঘরে উপুড় হয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে আছে। কোমর পর্যন্ত লম্বা কাল চুলের গোছা বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে একটিমাত্র রুপোলি গুচ্ছ ঠিক সাপের মতো এঁকেবেঁকে উরুর নিচে চলে গেছে। সাপ নয়, সাপের খোলস। শীতের শেষে শাদা খোলস ফেলে কুচকুচে কালো রঙের সাপ চলে গেছে। কত হবে এখন তার স্ত্রীর বয়স ?

সোফার কোণে বসে চুরুট টানতে টানতে দিশেহারা মামুন রশীদ হিশেব করতে গিয়ে বউয়ের বয়সের কথা ভুলে যায়। মাঝখানে একটি সপ্তাহ চলে গেল, তবু ফেব্রুয়ারির তিন তারিখের কথাটা কেবলই প্যাঁচ কেটে কেটে স্ক্রুর মতো মগজ ছ্যাঁদা করে ভিতরে ঢুকতে থাকে। চাকরির বিশ বছর হয়ে গেল। যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিল, তখন এই দেশটার অন্য নাম ছিল। দেশে তখন জঙ্গল অনেক বেশি, আবাদী জমির পরিমাণ কম, মানুষজন কম। তখন রোদ ছায়া নদী নালা মাটি জল অন্যভাবে সাজানো ছিল। বিশ বছরে সবই প্রায় নিড়িয়ে শাদা করে আনা গেছে। কিন্তু তাতে তার কিছু আসে যায়

না। সে তো একেবারে শুরুতেই নেতৃত্ব দিতে শিখে যায়। কি নিদারুণ নিখুঁত ইংরেজিতেই না সেই চমৎকার বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল ভাষাটি যত্ন করে শেখা, ইংরিজি যার মাতৃভাষা সে কখনই এত চমৎকার কথা বলতে শেখার প্রয়োজন বোধ করে না। মামুন দেখেছে ইংরিজি যাদের মাতৃভাষা তারা এলোমেলোভাবেই কথা বলে, ভক্তি আর আনুগত্য 'মূর্ধা থেকে জননেন্দ্রিয়' পর্যন্ত না পৌঁছুলে পরের ভাষা এত সুন্দর করে বলা কঠিন। যাই হোক, সেই অমোঘ বক্তৃতার মূল কথাটি আঁকড়ে ধরেই তো সে এত উপরে উঠল। তোমাদের বলা হয় পাবলিক সার্ভেন্ট, কিন্তু আদতে তোমরাই জনগণের শাসক। কাজেই ঘোড়ায় চড়তে শেখো এবং চাবুক চালানো আয়ত্ত কর। একই কারণে ইংরিজি শেখ, তোমার দেশের লোকের ভাষায় কথা বললে তারা তোমাকে ঘরের লোক ধরে নিয়ে গা বেয়ে মাথায় উঠে মুতবে। শাসিতদের থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ আলাদা করার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। কিন্তু দাঁত কেলিয়ে ঘাড় চুলকে বিনয় দেখিয়ে পাবলিক সার্ভেন্ট কথাটা সবসময়ে চালিয়ে যাবে। তা না হলেই বাঁশ যাবে, চামড়া খিঁচে নেবে জনগণ। এইভাবে তালিম দিতে শুরু করে তাকে আর তার সেই সময়ের ঝাঁকটিকে একপাল হাঁসের ছানার মতো শামুক গুগলির খোঁজে পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হলো। সকলের সঙ্গে সঙ্গে মামুনেরও বগলের রোঁয়ার উপরে ছোট ছোট একজোড়া পাখা গজাল। তারপর সুদিন এলে পুরো ঝাঁক ডানা মেলে উড়ে দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

মামুনের স্পষ্ট মনে পড়ে ঐ অসাধারণ বক্তৃতার ফলে তার জীবনের ছাঁচ চিরকালের জন্য তৈরি হয়ে যায়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত যখন যেখানে সে গেছে, প্রথমেই সব থেকে উঁচু জায়গাটি দেখে নিয়েছে। চেয়ার হোক, মোড়া হোক, পিঁড়ি হোক নিদেনপক্ষে একটুখানি মাটির উঁচু ঢিবি হোক, উঁচু জায়গাটি ঠিক সময়ে বেছে নিতে কখনো ভুল হয়নি তার আর অসাধারণ অন্যমনস্কতার সঙ্গে সেই জায়গাটি দখল করে নিতেও কখনো সে দ্বিধায় পড়েনি। নিজের জীবনের দিকে চেয়েও মামুন দেখতে পায় সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো উঁচু-নিচু আসনের ছক পড়ে আছে। ধাপে ধাপে সাজানো, সবার উপরে এক বিশাল সিংহাসন। ঐ সিংহাসনটি নিষিদ্ধ ফল—ওটার দিকে কখনো সে হাত বাড়ায়নি, হাত বাড়াবেও না। পুরোপুরি হংসরাজ হয়ে আকাশে ওড়ার মুখে শেষ শিক্ষাটি তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। উঠবে, উঠবে, কেবলি উঁচুতে উঠবে, কিন্তু কখনো

কোনো অবস্থাতেই সবচেয়ে উঁচু আসনটিতে চড়ে বসবে না। তোমার জন্যে ঐ সর্বোচ্চ আসনটি হচ্ছে হিন্দুর গোমাংস ও মুসলমানের শুয়োরের রক্তুতুল্য। ঐ আসনটি হচ্ছে চূড়ান্ত ক্ষমতার আসন। তোমাকে বলা হয়েছে পাবলিক সার্ভেণ্ট, কিন্তু তুমি আসলে জনগণের শাসক। এইবার তোমাকে বলা যাক, শাসক তুমি যতই হও তুমি কিন্তু সত্যি সত্যিই সেবক, ক্ষমতার সেবক। ক্ষমতা কার? সেটা প্রশ্ন পর্যন্ত করবে না। ক্ষমতার নাক মুখ চোখ নেই।

সত্যিই, প্রথম আসনটা খুব উঁচু ছিল। বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনোভাবেই মামুন আর সেটার নাগাল পায় না—শেষে তার তলায় টুল পেতে টুলে দাঁড়িয়ে হাঁজোর পাঁজোর করে তাতে সে উঠে বসে। সে তো আজকের কথা নয়—একটা ফেব্রুয়ারির তিন থেকে তার শুরু। তারপর একটু একটু করে সে উঠেছে। এখন সে মেঘলোকেই চলে এসেছে বলা যায়। মণি মুক্তো দিয়ে সাজানো, মখমলের ঝালর দেওয়া উঁচু সিংহাসনটি এখন তার হাতের কাছেই, ইচ্ছে করলেই ছুঁয়ে দেখতে পাবে। মাঝে মাঝে যখন ফাঁকা পড়ে থাকে, দু একবার বসে নিতেও পারে। কিন্তু এই ভুল সে কখনো করে না। এমন অপয়া এই জায়গাটা যে দুদণ্ড তিষ্ঠিয়ে কেউ পাছা ঠেকাতে পারে না। কেবলই পাছা বদল হচ্ছে। যে বসে সে সিনেমার ছবির মতো, ঝক ঝক ঝক, বদলিয়েই যাচ্ছে, এই গোঁফ, এই গোঁফ চাঁছা, এই দাড়ি, এই কামানো, এই টাক, এই চুল। মামুন ওদিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখে না পর্যন্ত। জীবনে সবচেয়ে ভালো করা মানেই হলো টিকে থাকা। আগে টেকসই হও, পরে কারিগরি ফুটিয়ো। হাউয়ের মতো উপরে উঠে গোঁত্তা খেয়ে পড়ে নিতম্বের হাড়গোড় ভাঙার কোনো মানে নেই। মামুন চুরুট কামড়ে ধরে, জনগণ স্থির, আর আমরা স্থির। ক্ষমতা? ক্ষমতা আবার কি। কাগজের বাঘের আবার গর্জন কি। ওর ল্যাজ তো সলতে, যে আসছে ফস করে দেশলাই জেলে ধরিয়ে দিচ্ছে। কুটকুটুনির শখ হয়েছে, থাকো সিংহাসনে বসে। ক্ষমতাটা ঠিক কোথায় আছে, সে আমরাই ভালো বঝি। চুরুটটাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল সে।

খুব নিচুস্বরে কথা বলতে শিখেছে মামুন। ধীর লয়ে মৃদুকণ্ঠে সে তিনটি ভাষায় কথা বলতে পারে। উচ্চারণ করার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত কখনো বোঝা যায় না কোন্ শব্দটি সে ব্যবহার করবে, কিন্তু কখনোই কোনো শব্দের জন্য তাকে হাতড়ে বেড়াতে হয় না। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় তার শব্দটি অমোঘ। তার আলাপের মূল সূত্রগুলো এইরকম: যে-কোনো প্রস্তাব, যে-

কোনো কাজ সমর্থনযোগ্য। দুই, যে-কোনো প্রস্তাব, যে-কোনো কাজ খণ্ডনযোগ্য। তিন, পথের কোনো অন্ত নেই এবং সব পথই পিচ্ছিল অতএব যে কথাটা সত্যিই বলা হয়েছে, সে কথাটা সত্যিই বলা হয়নি আর সর্বশেষ হলো, বাস্তবের দিকে কখনো চেয়ে দেখা যাবে না, হিশেবটা সব সময়েই আমাদের দিক থেকে। অর্থাৎ বাস্তব এক ধরনের বৌদ্ধিক নির্মাণমাত্র।

সিংহাসনে যে বা যারাই বসে থাকুক, মামুন রশীদরা ক্ষমতার বাঁকে বাঁকে থাবা পেতে অপেক্ষা করছে, কথা বলছে ফিশফিশ করে। তাদের মোলায়েম সুকুমার ঠোঁটে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢেউ উঠছে। সেই ঢেউ বেয়ে গড়িয়ে নামছে শব্দের দীর্ঘ সারি। কালো কালো অক্ষরের পিঠে চড়ে শাদা কাগজ বেয়ে ঢলঢলে কাদার স্রোতের মতো এগিয়ে চলেছে। কার সাধ্য এই স্রোত আটকায়?

মামুন এমন করে সামনের দিকে চেয়ে রইল যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তারই বয়ানে তার ফরমান স্রোতের আকার নিয়ে জনপদের দিকে এগোচ্ছে। ঠেকানোর কোনো পথ নেই। কাঠকুটো মাটি পাথর ফেলে কোনো লাভ হচ্ছে না। মানুষজন ঝটপট দরজা-জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে, পিছন ফিরে দাঁড়াচ্ছে, ঢোল ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে, প্রাণপণে কানে হাত চাপা দিচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, ভ্যাঙাচ্ছে—কিন্তু কোনো ফল নেই, দেয়াল ভেঙে ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যাচ্ছে ফরমান। এক এক টানে খুলে নিচ্ছে মানুষের চামড়াশুদ্ধু জামাকাপড়।

তার কপালে বিনবিনে ঘাম দেখা দিল। অনুপ্রাণিত বোধ করলে এরকম হয় তার। আর বসে থাকা অসম্ভব হলো তার পক্ষে। ঘরের কোণে নকশা তোলা কাঠের যে বাক্সটিতে সিগার রাখা আছে, সেদিকে এগোল মামুন রশীদ। ডালা তুলে দেখল ভিতরটা ফাঁকা। একটু অবাক হয় সে! কাল রাতেও ভরা ছিল বাক্স। চুরুটগুলো সে কি চিবিয়ে খেয়েছে? কয়েকটা মুহূর্ত সে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার ভিতরটা ভারি সীসের পাতে ভর্তি—ঘাড় ঝুঁকে আসে তার, কিরকম একটা বাসি গন্ধ এসে নাকে ঢোকে। বাইরেটা এখন কেমন একবার দেখতে পারলে হতো। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব করতে পারে মামুন রশীদ? প্রথমে জানলার কাছে পৌঁছুতে হবে, তারপরে টানতে হবে কি সাংঘাতিক সোনালি ভারি পর্দা, তারপরে কিসব ছিটকিনি, ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে বাদল দিন দেখা আর সেই ঝড়ো বাতাসের ভয়ংকর গর্জন।

মামুন ফিরল। নিমেষে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল যেন। রাজা আর জল্লাদের তফাৎ নিয়ে যে গল্পটি সেই গল্পের কথা আবার ভাবতে পারছে সে।

রাজা চেয়েছিলেন শিল্পী মানুষের কাটামুণ্ডু আঁকুন। এঁকে দেখালে কাজটা পছন্দ হয়নি তাঁর। শিল্পীকে ডাকলেন তিনি, বললেন, কাটামুণ্ডু আপনি দেখেননি কখনো, দেখা দরকার—এই বলে সামনের ক্রীতদাসটির মাথা কেটে দিতে বললেন জল্লাদকে। জল্লাদের সঙ্গে কিছু তফাৎ আছে রাজার। রাজা নিষ্ঠুর একথাটা বলা যায়, জল্লাদের সম্বন্ধে মনস্থির করা সম্ভব নয়।

চুরুট রয়েছে শোবার ঘরে। অনেকটা পথ যেতে হবে। ড্রয়িংরুমের পশ্চিম কোণে দরজা, সেটা পেরুলে বাঁ হাতে টয়লেট, ডাইনে বন্ধ ঘর, তারপর বন্ধ ঘর, খানিকটা অন্ধকার প্যাসেজ, ডানদিকে মোড় নিয়ে বেশ খানিকটা ফিরে আসা, আবার টয়লেট এবং শেষ পর্যন্ত শোবার ঘর। সমস্ত পথটাতে গালচে পাতা—গা শিউরোনো শব্দ করে গালচের মেঝে নিঃশ্বাস ফেলে, চপ্পলের তলা আঁকড়ে ধরে। এ ঘরে এসে যখন পৌঁছোয় মামুন রশীদ তখন তার হাঁটু দুটি দুমড়ে ভেঙে পড়ছে। চেস্ট অব ড্রয়ারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় সে। চুরুটগুলো কোথায়? এত তুচ্ছ কথা কি জিগগেস করা যায় ঐ পাথরের মূর্তির কাছে? উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তার বউ শায়েলা। গোলাপের শুকনো পাপড়ির মতো দুখানি পায়ের পাতা। বিছানার চাদরের রঙ ঐরকম অসম্ভব শাদা না হলে অত ফিকে গোলাপি রঙ কিছুতেই চোখে পড়ত না। তার সেই কোমর ছাড়িয়ে নামা কুচকুচে কালো চুলের রাশের মধ্যে একগুচ্ছ বরফের মতো ঠাণ্ডা শাদা চুল যাকে কেবলই সাপের খোলসের মতো মনে হয়।

চুরুট দরকার। কোন্‌টায়? খুব মৃদুগলায় মামুন বলে। চুরুট নিতেই এ ঘরে এসে মামুন সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যায় এখানে কেন এসেছে সে। কোনো কথা খুঁজে না পেয়েই যেন সে চুরুটের কথা জিগগেস করে।

শায়েলার শাদা সিল্কের শাড়ির আঁচল মেঝের উপর নিঃশব্দে খসে পড়ে।

আমি তোমার সঙ্গে দু-একটি কথা বলতে চাই। আর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব দেখে মামুন বিছানার এক কোণে বসে পড়ে। সিল্ক সরে যাচ্ছে, মামুন দেখতে পায় শায়েলার পিঠের খানিকটা, পায়ের নিচের দিকের সামান্য একটু অংশ। এক-দৃষ্টে চেয়ে থাকে মামুন।

আমরা কি এটা নিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে পারি না? মামুন ধীর শান্ত গলায় বলে। সে জানে শায়েলাকে একবার তার সঙ্গে কথা বলাতে পারলে সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে আর কোনো অসুবিধে হবে না। জীবনে অসংখ্যবার সে অতি জটিল গিঁট খুলতে পেরেছে মাত্র একটি কথা দিয়ে শুরু করে, আসুন

আমরা কথা বলি। কথা, কথা, কথা—আমরা কথা বলতে চাই—কথা বলতে পারলে আমাদের সব সমস্যাই মিটিয়ে নিতে পারব। মানুষের একটা নরম ভেজা চ্যাপ্টা জিভ আছে যার সত্যিকার শক্তির পরিমাপ মানুষ কখনোই করতে পারেনি। সেই জিভ দিয়ে মামুন একবার তার শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিল।

আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই—আরো একবার প্রায় এই কথাগুলিই সে বলেছে, এবারে মনে হলো বাতাসের মৃদু শব্দের মতো কথাগুলো যেন ঘরের কোণ থেকে উঠে এল। দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে মামুন তার জিভটিকে মুখের ভিতরেই বারকতক ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, দুর্ঘটনা ব্যাপারটা আমরা ইচ্ছে করলেই সবসময়ে এড়াতে পারি না। সবসময় কেন, দুর্ঘটনা যাই ঘটুক না—শেষ পর্যন্ত সেটাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতেই হবে। যদি তুমি সেটা না কর, তাহলে তো ঘটনাটা মুছেও যাবে না, উবেও যাবে না। আমার মনে হচ্ছে তুমি কোনো কথা না বলে বাড়াবাড়ি করছ। আমাদের তো দেখতে হবে এটা নিয়ে আমরা কি করতে পারি?

মামুন খেয়াল করল, হ্যাঁ, এইবার সত্যিই সে কথা বলছে। আর হেলে পড়ছে না কথাগুলো—একটার পিছনে আর একটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। নানারকম ফাঁস তৈরি হচ্ছে, সামান্য বিরক্তির সঙ্গে মেশাতে পেরেছে ঈষৎ শ্লেষ। আছে কি নেই।

অনেকটা সময় নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসছে শায়েলা। সরসর শব্দে চুলের গোছা কোমর থেকে নিচে নামছে, শাদা খোলসটা দুটো মোচড় খেল, তারপর হালকা বাতাসে দুলতে শুরু করল। শায়েলা পিছন ফিরে ছিল—এবার সে মামুনের দিকে ফিরল। গোলাপি ঠোঁট দুটোয় ছোট ছোট অসংখ্য কুঞ্চন, সারা মুখ থমথমে, বাতাসে ভাসছে যেন, মুখের দু'পাশে চুলের গোছা—কপালে গালে থোকায় থোকায় অল্প দুলছে, কিছু নরম চামড়ায় সেঁটে আছে। মামুনের দিকে ফিরে সে স্থির চোখে চেয়ে রইল। সেখানে রাগ ক্ষোভ কিছুই দেখতে পায় না মামুন। কিন্তু একটা আতঙ্ক নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। হাজার বছরের পুরনো পাথর কেটে গড়া এক মূর্তি তার সামনে। হিম সাঁতলা একটা বাতাসের ঝাপটা এসে যেন তার গায়ে লাগল। শায়েলার ঠোঁট নড়ল কি নড়ল না, মামুনের কানে এল দুটি শব্দ, কি বলছিলে? মুখের ভিতরে মামুনের জিভ পাথরের মতো ভারি হয়ে এল, আবার কানে এল তার, কি বলছিলে বল।

আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বল।

তোমার সঙ্গে মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে।

কোন ব্যাপারটা নিয়ে? হেঁয়ালি করো না, স্পষ্ট করে বলো কোন ব্যাপারটা নিয়ে।

আমি এটাকে একটা দুর্ঘটনা বলতে চাইছি।

কোনটাকে তুমি দুর্ঘটনা বলতে চাইছ? এটা সেটা ঘটনাটা দুর্ঘটনা এই-সব কথা বলছ কেন? তুমি জান না ঘটনাটাকে কি বলে?

আমরা যদি কথাই বলতে চাই তাহলে বলার অবস্থাটা বজায় রাখতে হবে। তুমি যে অবস্থায় আছ তাতে কথা বলা অসম্ভব। এই মুহূর্তে তুমি দেখতেও পাচ্ছ না, শুনতেও পাচ্ছ না।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলতে পেরে মামুন বুঝতে পারল কথার উপর তার নিয়ন্ত্রণ এসে গেছে। সে থামল না, শায়েলার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে মৃদুগলায় বলে গেল, দুর্ঘটনা আমরা কাকে বলি? যে ঘটনা প্রচণ্ড ক্ষতি করে—যে-কোনোরকমের ক্ষতি—সেইরকম ঘটনা যা আমরা ঘটাইনি, যা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়, তাকেই তো বলা যায় দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় আমাদের সায় নেই, দায়-দায়িত্বও নেই। দুর্ঘটনা আমরা চাই না বটে, কিছু ঘটে গেলে সেটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কি করার আছে?

তুমি এটাকে দুর্ঘটনা বলছ? শায়েলা আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল মামুনের দিকে।

আর কি বলতে পারি?

তোমার স্ত্রীর সম্মান—

সে কথাটা এখানে আসছে না।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, সে কথাটা এখানে আসছেই না। তার একমাত্র কারণ স্ত্রীর সম্মান বলে তোমার কাছে কিছু নেই। আমি সেটা ভালই জানি। তোমার নিজের সম্মানও তোমার কাছে এতটুকু নেই। একটা কেন্নো বা একটা গিরগিটির সঙ্গেও তোমার তুলনা চলে না, সেটা সারা দেশের কেউ না জানলেও আমি জানি। ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ান হয়ে চাবুক হাঁকড়াচ্ছ, ভাবছ—

আমি তোমাকে আগেই বলেছি কথা বলতে গেলে বলার আর শোনার জন্যে ধৈর্য দরকার। তুমি শুধু তোমার সেন্টিমেণ্ট উগরে দিচ্ছ। আচ্ছা বল তো

দেখি—দুপুরবেলায় ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে ডাকাত টাকাপয়সার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মহিলার ইজ্জৎটুকুও লুট করে নিয়ে চলে গেল। কি করবেন মহিলা—যাই করুন, যতই করুন ঘটনাটাকে ফেরানোর তো কোনো রাস্তা নেই—

কাগজের মতো শাদা হয়ে গেল শায়েলার মুখ। দুটি চোখ বিস্ফারিত—মণির উপরের নিচের শাদা অংশটা বেরিয়ে এসেছে—চোখের সামনে যেন কোনো বিকট দানব দেখছে সে। কেন কথা বলতে এসেছ তুমি, আমাকে তুমি কি বোঝাবে? আমি কি পোশাকের নিচে তোমাকে কোনোদিন দেখিনি? তোমার নোংরা জঘন্য চেহারাটা? এখনো আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। জামা-কাপড়ে যতই নিজেকে ঢেকে রাখ।

আমি কিছুই ঢেকে রাখি না, অন্তত তোমার কাছ থেকে। আমাদের বিবাহিত জীবন তো খুব কম দিনের নয়। নিজেদের কাছে আমাদের কোনো কিছুই গোপন নেই শায়েলা।

শাঁখের মতো শাদা লম্বা ঘাড়ের উপর সাপের খোলস চাপানো একটা অসম্ভব সুন্দর মাথা দুলছে—দেখা যায় কি যায় না। দুটি কালো তারার উপর দু'ফোঁটা আলো। ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে ঝকঝকে শাদা দাঁতের উখোঘষা একটুখানি ধার, দেখা যায় কি যায় না। শায়েলা অদ্ভুত একটা হাসির সঙ্গে বলল, ঠিক বলেছ, আমাদের কারো কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই। আমরা পরস্পরের কাছে হঠাৎ নগ্ন হয়ে গেছি। এই মুহূর্তটা আমার জীবনে আসবেই আমি জানতাম।

তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ আমি জানি না, আমাদের জীবনে একটিই দুর্ঘটনা ঘটেছে। জীবনের এতটা পথ চলে আসার পরে। মাত্রই একটি ঘটনা, যা একবার ঘটেছে, যা আর কখনো ঘটবে না—

কথার মাঝখানে শায়েলা হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল যে সেটা তার চেহারার সঙ্গে একটুও মানানসই হলো না—অনেক ঘটনা আছে যা মানুষের জীবনে একবারই ঘটে, দুবার ঘটার কোনো উপায়ই নেই। যেমন মানুষের জন্ম, মানুষের মৃত্যু। কবার মরতে পারো তুমি? অবশ্য তোমার মতো চামচিকে বেঁচে থাকে কবে যে মরবে?

বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে মামুনের পক্ষে যে এইসব কথা তার অতি লক্ষ্মী দেবী দেবী চেহারার বউ তাকে শোনাচ্ছে। বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে যে শায়েলাকে সে চিনেছে আজ যেন তাকে খুবই নতুন মনে হচ্ছে। একটি

অশিষ্ট শব্দ সে তার মুখে কখনো শোনেনি, এতই সংগোপনে সে জীবনযাপন করেছে যে মামুন নিজের ভোগলালসাভরা দিনরাত্রি নিয়ে কখনো বিব্রত পর্যন্ত হয়নি শুধুমাত্র এই কারণে যে শায়েলা যখন হাঁটে তার পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না, যখন জানলার পাশে কোমরের নিচে নামা একঢাল চুল আঁচড়াতে বসে তখন হঠাৎ-ই ধারণা হয় যে তার শরীরটা যেন-বা সোনালি রঙের আলো দিয়ে তৈরি, শাদা দেয়ালের গায়ে বিকেলের এক-টুকরো ঝিকিমিকি রোদের মতো। শায়েলার পেটে যখন বাচ্চা এল মামুনের মনে হতো যেন কুমারীর গর্ভধারণ—বিছানায় শায়েলায় নগ্নদেহ সে কখনোই স্মৃতিতে আনতে পারত না। সেই শায়েলা এখন কি কদর্য কুৎসিৎ কথাগুলোই না বলে চলেছে। ওর মোমের মতো শাদা মুখের উপর শংকর মাছের লেজের তৈরি চাবুক দিয়ে একটি তীব্র আঘাত করার জন্যে মামুনের হাত নিশপিশ করে ওঠে। আমাদের কোনো সুন্দরীর প্রয়োজন নেই। আর সতীর প্রয়োজন তো নেই-ই। কিংবা সতী উচ্ছন্নে যাক—সতী অসতী আলাদা করার জন্যে কোথাও কোনো দাগ নেই—তা নিয়ে মামুন মাথা ঘামাচ্ছে না—তবে সতীপনা দেখানোর জন্যে একজন রাজপুরুষের বাড়ি উপযুক্ত জায়গা নয়। এই ব্যাপার নিয়ে দেখার মতো সময় সত্যিই তার নেই।

মামুন মনে করে দেখল ঘটনার দিন সকালেই নটার দিকে তিনি ডেকে-ছিলেন। তিনি, বেঁটেখাটো মানুষটি, চুল ছোট করে ছাটা, শাদাসিধে মোটা খসখসে পোশাক পরেন, ছোট কিন্তু চিলের মতো তীক্ষ্ণ কপিশ একজোড়া চোখ। না হেসে তিনি কখনো কথা বলেন না—অথচ তাঁর সামনে দাঁড়ালেই মুহূর্তের জন্যে একটা ঠাণ্ডা স্রোত মামুনের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাবে। কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হবে না। এখন কত সহজ হয়ে এসেছে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা মামুন এতদূর পর্যন্ত প্রশয় পেয়েছে তার কাছ থেকে যে আজকাল কথাবার্তায় কখনো কখনো বেশ উদ্ধত হয়ে ওঠে সে। অথচ সামনে দাঁড়ালেই একবার সেই হিম-ঠাণ্ডা স্রোতটা সে টের পাবেই। তিনি হাসেন, কিন্তু সত্যিই হাসলে সেই হাসির সঙ্গে না মিশিয়ে কোনো কিছু কি ভাবা সম্ভব মানুষের পক্ষে? কিন্তু এই অতিমানুষটি তা করতে পারেন—হাসি একদিকে, মৃদু, চোখ কোঁচকানো, ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি একদিকে আর ভাবনা চিন্তাগুলো আর একদিকে।

তিনি বললেন, আশা করি বিকেলের সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। তবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি একবার তোমার মুখ থেকে এই বিষয়ে একদম আলাদা করে কিছু শুনব বলে। অন্যদের সামনে বিচার-বিবেচনার ভাণ করে যা বল তা

নয়—সত্যিই যা বলার আছে তাই বল এখন।

স্যার, এখন আর বলার কি আছে! সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। বিকেলের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে—আমি নিজে দেখছি এটা। পাঁচ হাজার মানুষের প্যাণ্ডেল, নিখুঁত বন্দোবস্ত। মঞ্চ, আলো, মাইক্রোফোন। কোনো ব্যবস্থাই নিতে আমরা বাকি রাখিনি। জাতি জেনে গেছে আজ আপনি একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেবেন। এখন আপনি কি শুনতে চাইছেন স্যার?

মুহূর্তের জন্যে মুখের হাসিটি নিভল তার। কালো কালো ক্রিমির মতো অন্ধকার উঠে এল মুখের উপর। ছোট নিশ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। সত্যিই এখন আর এটা নিয়ে কথা বলে লাভ নেই, কিন্তু বল—সিদ্ধান্ত কি ভুল হয়েছে? জনগণের কাছে না গিয়ে, জনগণকে না জড়িয়ে কতদিন আর ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা যাবে?

মামুন দেখেছিল এ ঘরে যে কার্পেট পাতা আছে, তার নিজের ড্রয়িংরুমে পাতা কার্পেটটি যে তার চেয়ে খুব কম দামি তা নয়। মৃদু পা ঘষতে ঘষতে সে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, স্যার, আপনি আমার মত জানতে চেয়েছেন, আমার অনেস্ট অপিনিয়ন, তা জানাতে আমি বাধ্য। আমার উপর রুষ্ট হবেন না। জনগণের কাছে যেতে হবে কেন ক্ষমতা যখন জনগণের কাছ থেকে আসেনি?

কথা শুনে তার কপিশ চোখের তারা জ্বলে উঠল, জনগণই ক্ষমতার মূল উৎস। সমস্ত ক্ষমতা সেখান থেকেই আসে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্যার, এই মর্মে আপনার আজকের বক্তৃতা তৈরি করা হয়েছে। আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই। মুসাবিদা করার দায়িত্ব আপনি আমাকেই দিয়েছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে ক্ষমতা তো জনগণের কাছ থেকে আসেনি। জনগণ সেটা ভালো করেই জানে। ক্ষমতা এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে সে বিষয়ে জনগণের কোনো ভুল ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না।

সেনাবাহিনী কি জনগণের অংশ নয়?

স্যার, নিশ্চয়ই সেনাবাহিনী জনগণের অংশ, বিচ্ছিন্ন অংশ। মামুন জোরের সঙ্গে বলল, স্যার, আমি আবার বলছি আপনি আদেশ দিলেই তবে আমি আমার স্বাধীন মত বলব। আমার স্বাধীন মতও আপনার আদেশের অধীন।

তিনি বললেন, আমি ক্লান্ত, এইসব নিয়ে আমি সত্যিই ক্লান্ত। তবু তোমার কথা শুনতে চাই আমি। বাট আই অ্যাম নট প্রিপ্রেয়ার্ড টু লিস্‌ন্ টু এনি নন্‌সেন্স নাউ। সেনাবাহিনী জনগণের বিচ্ছিন্ন অংশ কেন বলছ? তারা কি এদেশের

লোক নয়, তাদের আত্মীয়স্বজন কি জনগণের ভিতর বসবাস করছে না? সেনা-বাহিনীটা আসছে কোথা থেকে?

স্যার, এইসব কূট প্রশ্ন তোলার কোনো দরকার নেই। আসল কথা হচ্ছে ক্ষমতাটা যিনি দখল করে রেখেছেন তাঁর শাসন জনগন নেবে। বর্তমানে জনগণের অবস্থার হিশেব করে আমি এটা বলতে পারি। সেনাবাহিনী একটা সংঘবদ্ধ শক্তি—জনগণের সঙ্গে সেটা কখনো মিশ খায় না। আপনার সামনে আমি এই কথাটা বলেই ফেলতে চাই যে ফায়ার আর্মস্ এমনিতে ঠাণ্ডা হিম কিন্তু ইস্পাতে হাত পড়লে—

আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাইছ। ঠোঁটের সঙ্গে লেগে থাকা তাঁর মৃদু হাসিটা এতক্ষণ প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না, এখন যেন একটু উস্কে উঠল। মামুন থামল না, দেয়ালে তাঁর বিশাল ছবির দিকে পলকহীন দৃষ্টিপাত করে বলল, বিশেষ করে বদলাবদলির সময়টায় জনগণ স্পষ্ট করে বুঝে যায় যে তাদের কখন কিছু করার নেই।

ক্রোধে কালো হয়ে উঠল তাঁর মুখ, আমি বলছি, তুমি কি বলতে চাইছ তা আমি বুঝতে পেরেছি। বলিনি? তবে এইবার বল এভাবে ক্ষমতা কতদিন আঁকড়ে থাকা যায়? আমি হুমদোমুখো লোভী পেট-মোটাদের সবাইকে চিনি—তাদের মগজের উপরেও চর্বি জমেছে। আমি জানি তুমিও একটি পাকা শয়তান কিন্তু মগজটা তাজা আছে। ক্ষমতা এইভাবে চিরকাল আটকে রাখা যাবে? গণতন্ত্রের বন্যায় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে দেখছ না! ইউ নো বেটার দ্যান মি, বাইরের সাহায্য না পেলে একটি দিন দেশ চালানো যায় না। মামুন জানে, তিনি এখন স্বগতোক্তি করছেন, সোচ্চার চিন্তা যাকে বলে, এইসব সময়ে সে একেবারে চুপ করে থাকবে, সে যে এখানে আছে এই সত্যিটাকে পর্যন্ত মুছে দেবার চেষ্টা করবে। হঠাৎ চোখ কুঁচকে তিনি তাকে দেখলেন, কোনো বিকল্প নেই, জনগণের কোনো বিকল্প নেই, জনগণের কাছে আমাকে যেতেই হবে। দেশের সমস্ত বড় বড় নেতাদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে সে তো তুমি জানোই। মামুন অত্যন্ত নিরীহভাবে মৃদুগলায় বলল, হ্যাঁ স্যার, তাঁরা সবাই আপনার পক্ষে আছেন। তাঁদের ভাষায় আপনার নেতৃত্বের সঙ্গে, আপনার নীতির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

আর আমি চেষ্টা করছি দেশে যুবশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে, যুবশক্তির উপর নির্ভর করতে।

যুবশক্তিও বলছে আপনি যেখানে তারাও আছে সেখানে। সমস্ত দেশে এখন অন্য কোনো আওয়াজ নেই। স্যার, চান বা না চান আপনি এখন আর একা নন।

কথাটা শুনে তিনি মামুনের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আমি তোমাকে পছন্দ করি। হ্যাঁ, আমি পছন্দ করি তোমাকে। কিন্তু আমি বলছি তোমাকে, যেখান থেকে ক্ষমতায় উঠে এসেছি, সেখান থেকেই আমি জনগণের দিকে এগবো। সমস্ত জাতি আমার পিছনে এসে দাঁড়াবে। আজ বিকেলেই তুমি দেখতে পাবে মোট তিয়াত্তরটা রাজনৈতিক দলের নেতা নিজের দল ভেঙে দিয়ে আমার নতুন দলে এসে যোগ দিচ্ছে।

স্যার, আমি জানি না আপনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন কিনা আপনাকে এই কথাটা মনে করিয়ে দিতে যে, যে তিয়াত্তরটা দলের কথা আপনি এইমাত্র বললেন তার অর্ধেকগুলিরই সভাপতি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লোক নেই—বাকি-গুলির কোনো নেতা আপনার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন জেল থেকে বেরিয়ে এসে, কেউ-বা—

আমি তোমাকে বলেছি আজ আমি তোমার কোনো বাজে কথা শুনব না।

অবশ্যই স্যার, কিন্তু এঁদের কাউকে কাউকে আপনি ক্ষমতায় এসেই অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ বদমাশ বলে জেলে পাঠিয়েছিলেন।

মানুষ বদলায়, বদলে যায়—

আমার বক্তব্য তা নয় স্যার। এঁদের দিয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা কিভাবে হিসেব করা যাবে তা নিয়ে মৃদু অস্বস্তি থেকে যাচ্ছে আমার মনে।

দাঁতনখ খোয়া গেলেও বুড়ো বাঘকে তো তোমার বাঘই বলতে হবে।

এইরকম বুড়ো বাঘই নরঘাতক হয়।

আহাঃ, ওদের নিয়ে আমি কি করছিটা কি? কিছুই করছি না। খাঁচায় থাকবে। আমি ডিপেণ্ড করছি যুবশক্তির উপর। দশবছর পরে দেশ তো ওদের হাতেই যাবে।

জনগণ যুবশক্তি প্রৌঢ়শক্তি যা-ই বলা যাক না স্যার ক্ষমতা ভাগ হয় না, ক্ষমতা এক, অবিভাজ্য, ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্‌ যা শিখিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আই. এ. পড়বার সময় পড়েছিলাম বটে, হবেস্‌।

হব্‌স্‌।

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবেস্।

হব্‌স্।

মামুন ভাবতে গিয়ে দেখল এ তো প্রায় তাঁর সঙ্গে এক কলকেয় দম মারার মতো ব্যাপার। এদেশের দ্বিতীয় কোনো আমলা কি এই দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা কল্পনাতেও আনতে পাববে? বিকেলে যখন তিনি হেঁটে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছিলেন—সেই বেঁটেখাটো মানুষ, পবনে শাদাসিধে পোশাক, দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন, তখন তাঁর দিকে চেয়ে মামুন সকালেব ইয়ার্কি আর রসালাপের পাকা একটি ঘণ্টা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না। সুন্দর ঐ ব্যক্তিটি, ক্ষমতার শীর্ষে অতিলৌকিক এক মহিমায় আপাদমস্তক ঢাকা। তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে পর্যন্ত সাহস হয় না। অথচ মোহগ্রস্তের মতো তার দিকেই চেয়ে রইল সে। কিছুমাত্র অসাধারণত্ব নেই তাব। গায়ের রঙ বেশ কালো, একটা কাঁধ একটু উঁচু, পা-দুটি মাটিতে পড়ছে একটু তেরছাভাবে, হাঁটাতে কিরকম একটা খিচাং খিচাং ভাব। মাঝে মাঝে হাস্যকরভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে যেন জামাটা ঠিকমতো ঘাড়ে বসিয়ে নিচ্ছেন। হাসিমুখে এগিয়ে এসেছেন মামুন রশীদের দিকে। সামনে পিছনে ডানে বাঁয়ে অগণিত যুবশক্তি; গায়ের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে লোম-ওঠা, শেয়ালের মতো কয়েকজন নেতা। যুবশক্তি বেশ ছড়িয়ে পড়ল। মামুন দেখল গলায় চেন, হাতে ব্যাণ্ড-বাঁধা অসংখ্য তরুণদের একজনকেও সে চেনে না। পুলিশ দেহরক্ষী সবই রয়েছে কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব যেন ওরাই নিয়েছে। প্রচণ্ড চিৎকার চলছে 'ি নি' সম্বন্ধে, তুমি আছো যেখানে আমরা আছি সেখানে।

হাসিমুখেই তিনি এগিয়ে এলেন মামুন বশীদের দিকে কিন্তু তাকে চিনতে পারলেন না। সোজা এগিয়ে গিয়ে উঠলেন মঞ্চে। তারপর পাঁচ মিনিট ধরে এক-টানা গগনবিদারী চিৎকার, পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা, '—' তুমি এগিয়ে চলো, আমবা আছি তোমার সাথে, দালালেবা হুঁশিয়ার, সাবধান।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দেবদূতের মতো দু'হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে নির্দেশ দিলেন। পাচ হাজার মানুষের প্যাণ্ডেলে এতটুকু জায়গা নেই। একটা আশ্চর্য নিস্তব্ধতা নেমে এল। মামুন শায়েলার পাশেই বসেছিল। শাদা রাজহাঁসের মতো গলা তুলে শায়েলা মঞ্চের দিকে চেয়ে আছে। কি অসম্ভব স্নিগ্ধ তার চোখের দৃষ্টি। বেশ মনে পড়ে, মামুনের মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল তার এই সৌন্দর্য অপার্থিব-মুহূর্তের জন্যে সে নত হয়ে ছিল স্ত্রীর কাছে। তারপরেই

তাঁর বক্তৃতা শুরু হলো, নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল, বক্তৃতার টুকরো-টুকরা নিয়ে বাতাস গাঁ গাঁ শব্দে ছোটাছুটি শুরু করল—পেছনের সাততলা বাড়িটা ফেব্রুয়ারির বিকেলের ম্লান রোদে থিরথির করে কাঁপতে থাকল। বক্তৃতা এগিয়ে চলল—তাই আমি এসেছি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে, মানুষকে ভালোবাসতে, মানুষের ভালোবাসা নিতে। আজ মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের কাজে নেমে পড়তে হবে। আর বসে থাকার সময় নেই, আর রাজনীতির সময় নেই। এবারের রাজনীতি উৎপাদনের রাজনীতি, এবারের রাজনীতি রপ্তানির রাজনীতি, এবারের রাজনীতি দুখী মানুষের রাজনীতি···

তিনি যখন চলে গেলেন তখন অন্ধকার নেমে গেছে। সামান্য শীত শীত করছে, পাশের পার্কের ঝোপগুলোতে সন্ধের অন্ধকার গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়েছে।

সমস্ত আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। মামুন রশীদ খুশি হলেন আলোর ব্যবস্থা দেখে। এইরকমই নির্দেশ ছিল তার। প্যাণ্ডেল আলোয় ঝকঝক করছে। কি চমৎকার সুশৃঙ্খল পরিবেশ। শুধু এই বক্তৃতাগুলো! তিনি নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেবার পর থেকেই এই বক্তৃতার তাণ্ডব শুরু হয়েছে। কারো সাহায্য না নিয়ে মামুন নিজের হাতেই মানুষ খুন করে ফেলতে পারে মাত্র একটি অপরাধে। এই বক্তৃতা। মানুষ যদি বক্তৃতা করতে না পারত! মামুন যখন এই কথাগুলো ভাবছিল ঠিক তখন, তিনি চলে যাবার আধঘণ্টা পরে, হ্যাঁ, সে তখন ঘড়ি দেখেছিল, সমস্ত আলো একসাথে নিভল।

কি করে এমন হওয়া সম্ভব? ভীষণ অবাক হয়ে মামুন পিছন ফিরে দেখতে পেল অত বড়ো প্যাণ্ডেল, অত লোকজন সম্পূর্ণ গিলে নিয়েছে অন্ধকার। ঠিক তখুনি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ এলো কয়েকটা। এত আচমকা, এত প্রচণ্ড সেই শব্দ যে মামুনের বুকের ভিতরে কয়েকটা ধস নেমে গেল পর পর আর নিশ্বাসটা যেন আটকে গেল গলার কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো কানফাটা শ্লোগান—পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা। মঞ্চের দিক থেকে ছুটে এল কয়েকজন, পেছন থেকে ছুটে গেল একটা দঙ্গল মঞ্চের দিকে। তারপর অন্ধকার চোখে সয়ে এল খানিকটা, পাঁচ হাজার মানুষ একসঙ্গে উঠে চারদিকে দৌড়ুচ্ছে, বিকট চিৎকার করছে, হারারারা শব্দে কারা বিকট হেসে উঠল একবার আর তারপরেই কি তীব্র একটা টর্চের আলো এসে পড়ল শায়েলার মুখের উপর। এই যে রে এইখানে এ্যাত্ত-বড়ো পালান নিয়ে সিন্ধী গাইটা বসে আছে—এই কথাগুলো কানে এল মামুনের আর সে দেখতে পেল একটা

হাত শায়েলার কাঁধের কাছে শাড়ি আর ব্লাউজ বাঘ-থাবায় চেপে ধরে মুহূর্তের মধ্যে চেয়ার থেকে তাকে তুলে ফেলল। মিথ্যে নয় যে সে বাধা দেবার জন্য শায়েলার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কিন্তু আবছা আঁধারে কিছু দেখা যায়নি, ছায়াগুলো বাস্তব না অবাস্তব তা বিচার করার সময় পাওয়া যায়নি, কার হাতে অস্ত্র আছে তা আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না এবং ঠিক তখুনি শায়েলা আর তার মাঝখানে এক মূর্তিমান যুবশক্তি এসে মামুনের কাঁধে হিংস্র ধাতব একটি রদ্দা মেরে বলল, আবে আমলার বাচ্চা, বাড়িতে যা, খানিক বাদে আইস্যা নিয়া যাস, এক-আধটা ফ্রি সার্ভিস দিলে কি হইবো—পইচ্যা যাইবো তর বৌ? রদ্দা খেয়ে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিল মামুন সেটুকুও পুরোপুরি আঁধারে লেপে গেল। মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল তার। সত্যিই মামুন শায়েলাকে দেখতে পায়নি আর।

যে স্বচ্ছ, আয়ত, ঈষৎ ক্লান্ত চোখ দুটির দৃষ্টি এতক্ষণ পাখির মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল এবার তা নিবদ্ধ হয়েছে মামুনের মুখের উপর। কি দেখতে চাইছে শায়েলা? আলো নিভে গেল, মামুন তার পাশেই বসেছিল, এই সময় পাঁচটা ইস্পাতের আঙুল তার কাঁধে মাংসের মধ্যে বসে গেল, বলতে গেলে হাড়ের ভিতর দিয়ে গেঁথে গেল। তারপর যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে। অন্ধকারের মধ্যে মামুনকে সত্যিই আর দেখতে পাওয়া যায়নি। দুহাত বাড়িয়ে শা'য়েলা যতবার কিছু একটা ধরতে যায় ততবারই তার কাঁধে গেঁথে-যাওয়া হাতটাকেই আঁকড়ে ধরে। বার দুয়েক সে বলতে চেষ্টা করে, কে, কে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তখন দুটি হাত তাকে জড়িয়ে প্রায় পিষে ফেলল। মাটি থেকে উঠে গেল তার দুটি পা—অতি কঠিন একটি হাত নির্মমভাবে নিংড়ে দিল তার একটি বুক আর তার মুখের উপরে ঝুকে এল একটি খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা দুর্গন্ধযুক্ত মুখ—আবছা অন্ধকারে সেই মুখের বড় বড় কয়েকটি শাদা দাঁত দেখা গিয়েছিল, তাদের ভিতর দিয়ে গরম বাতাসের একটি হল্কা বেরিয়ে এল, চুপ মাগি, গলা টিইপা শ্বাষ কইরা দিমু, সতীপনা রাইখ্যা দে। অবশ হয়ে এল শায়েলার শরীর। মুখে মুরগি নিয়ে শেয়াল যেমন ঝোপের আড়ালে যায় ঠিক তেমনি করেই সাততলা বাড়ির পুব-দিকের দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকার ঝোপের তলায় তাকে নিয়ে ঢুকে গেল লোকটা। একমাত্র তখুনি শায়েলা স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিল কি ঘটতে যাচ্ছে, তীব্র গলায় সে বলে উঠেছিল, পুলিশ তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।

পুলিশের বাপে পাহারা দিত্যাছে য্যান ইদিগে কেউ না আসে। আমরা যুব-শক্তি, আজ নতুন পার্টি হইয়া গ্যাছে—মনের সুই কই রাখি, উম্‌ম্‌ম্‌ম্‌—

পিঠের নিচে ভাঙা ক্যানেস্তারা, কাচের টুকরো, ইটের খোয়া, সিমেণ্ট আর বালির বড় বড় চাঙর—উপরে অন্ধকার আকাশ আর আকাশে উজ্জ্বল কালপুরুষ—ঠিক এই সময় মুহূর্তের জন্যে আলোর তরঙ্গ এসেছিল, সব আলো একবার জ্বলে উঠেছিল। তখন সেই আলোর বন্যার মধ্যে দশ হাত দূরে যে মানুষটি দাঁড়িয়েছিল, যাকে একবার মাত্র দেখা গিয়েছিল, আলোর তরঙ্গ ফিরে গেলে যে তার সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল, সে কে? সে কি মামুন রশীদ? এই একটি জানার পরেই তাকে মরে যেতে হবে বা বাঁচার কথা আবার ভেবে দেখতে হবে। কেউ কি শায়েলাকে বলে দেবে সে কে? যে তাকে বলতে পারে কে ছিল সেই মানুষ, তার হাতে তার জীবনটা বোঁটাশুদ্ধ ছিঁড়ে এনে এক্ষুনি দিতে পারে শায়েলা।

ভুরু কুঁচকে, সাপের মতো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে, গলার দু'পাশের রগ ফুলিয়ে কদর্য একটা ভঙ্গিতে শায়েলা প্রাণপণে চেয়ে রইল মামুনের দু'চোখের দিকে।

পনেরো সেকেণ্ডের জন্যে একবার আলো জ্বলে উঠেছিল এটা মামুন অবশ্যই বলতে পারে। কিন্তু সে কি হামাগুড়ি-দিয়ে-বসা কুকুরের মাংস খাওয়ার কোনো দৃশ্য দেখেছিল? কোনো উন্মোচিত নাভি? নাঃ, সে সত্যিই বলতে পারে না। জীবনে একটি বা দুটি সত্যের সামনে দাঁড়ানোর সাধ্য কারো নেই। তাছাড়া একটু পরেই তো সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

জননী

কয়েক বছর আগে আমাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে যে মেয়েটি কাজ খুঁজতে আসে তার রূপ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে হবে তার, গায়ের রঙ ধপধপে ফর্সা, টানা টানা টলটলে বিশাল দুটি চোখ, ঈষৎ লম্বাটে মুখে টিকলো ছোটো নাক, তাতে সাদা পাথর বসানো এতটুকু একটা নাকফুল।

আমার স্ত্রী তাকে জিগগেস করলেন, নাম কি তোর?

আয়েশা।

কাজ করবি?

করবো না ক্যানে?

কি কাজ করবি, শুকনো না ভিজে?

পেলে ভিজে করবো।

থাকবি তো আমাদের বাসায়, রাতে?

সাঁঝবেলায় মায়ের ঠেঁয়ে যাবো।

তা পারবি না, ভিজে কাজ কর‌্‌লে এই বাসায় থাকতে হবে।

তবে আমি যেচি—কাজ করব না—বলে মেয়েটি বেরিয়ে যাবার জন্যে পা তোলে।

বেশ কদিন কাজের লোক নেই বাসায়। আমাদের গরজ বেশি।

স্ত্রী তার পথ আটকে ধরলেন, তুই বাড়ি যাবি কখন?

বন্নু তো সাঁঝবেলায়—মায়ের ঠেঁয়ে যাবো।

ঠিক আছে। কাজে লেগে পড়্ যা।

মেয়েটি কাজে বহাল হলো। মনে মনে একবার ভাবি আগুনের রূপ নিয়ে কে এই মেয়েটি।

বিকেলের দিকে আমার ছোটো ঘরে বসে কাজ করছি। পাশের বাসার বৌ আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে জিগগেস করলেন, মেয়েটিকে কাজে লাগালেন?

ওঁদের আমি দেখতে পাচ্ছি না। কথা শুনতে পাচ্ছি। বৌটি চাপা হেসে বললেন, বুঝবেন পরে।

আমার স্ত্রী কৌতুকব্যস্তে জিগগেস করেন, কেন, কেন বলুন তো! কোনো ব্যাপার আছে নাকি? থাকলে বলুন, ছাড়িয়ে দিই কাজ থেকে।

না না, তেমন কিছু নয়। আবার যেন তাঁর চাপা হাসির শব্দ পেলাম।

রাতে শোবার ঘরে স্ত্রী বললেন, আচ্ছা, এটা কি অসম্ভব নয়?

কেন কি হয়েছে বল তো?

এই কথা কি বিশ্বাস হয়? বলে স্ত্রী হাসতে শুরু করেন।

কথাটা কি সেটা তো আগে বলবে।

উনি হাসতেই থাকেন। আমি বিরক্ত হয়ে বলি, কথাটা কি বলে তারপর যতখুশি হাসো।

হাসতে হাসতেই স্ত্রী বললেন, ওর নাকি এই বয়েসেই—এইটুকু বলে আবার হাসি।

অতিষ্ঠ হয়ে বলি, দুত্তেরি।

হাসি তখনো চলছে, ওর মধ্যেই বললেন, ওর নাকি এই বয়েসেই একটা ছেলে হয়ে গেছে।

দুর তাই হয় নাকি? খবরটা তোমাকে দিল কে?

খবর যে-ই দিক, কথাটা সত্যি।

একটু অস্বাভাবিক বটে, তবে অসম্ভব নয়। মেয়েটির তাহলে বিয়ে হয়েছিল নিতান্ত অল্পবয়েসে—আমি বলি আর সকালের পরিষ্কার আলোয় দেখা মেয়েটির মধু রঙের নরম ত্বক, অসাধারণ দুটি চোখ, প্রতিমার মতো সুডৌল মুখ আমার মনে পড়ে যায়। এসব একবার তছনছ হয়ে যাবার পর মেয়েটি আবার গুছিয়ে নিয়েছে। মহাভারতের সত্যবতীর কথা মনে পড়ল, সঙ্গমের পরও তাঁর কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি।

স্ত্রী আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন দেখে আমি বলি, বিয়ে হয়েছিল তাহলে। সেই একই গল্প, স্বামী ভাত দেয় না, তাড়িয়ে দিয়েছে, না হয় নিজে গায়েব হয়ে গেছে।

আমার মুখের উপর থেকে চোখ সরান না তিনি, বিয়ে হয়নি।

বিয়ে হয়নি? কি বলছো কি তুমি? তাহলে—

বাচ্চা হতে হলে বিয়ে হতেই হবে কে বলল তোমাকে?

তা বটে! ইস্—প্রচণ্ড ক্ষোভে ভিতরটা আমার জ্বলে যেতে থাকে। কি অসঙ্গত, কি বীভৎস।

গণ্ডারের তাজা গোলাপ খাওয়ার মতো।

এই রকমই নাকি করে মেয়েটি—অনেকক্ষণ পরে স্ত্রী বললেন।

তাড়িয়ে দেবে কি মেয়েটিকে? আমি জিগগেস করলাম।

উপায় কি? জেনেশুনে এরকম একটা মেয়েকে—

লোকভয়ে?

না, ঠিক তা নয়।

ঠিক তাই। কে কি বলবে তাই তো?

তাহলে কি করা যায়?

রেখে দাও মেয়েটিকে। আমাদের নিজেদের মেয়েরও তো ঐরকম বয়েস। তাড়িয়ে দিলে ওর কপালে কি ঘটবে আন্দাজ করতে পারছ?

তা তো পারছি।

ওকে কাজে রাখা যদি উচিত মনে করো তাহলে সাহস করো। ও তোমার দয়া ভিক্ষা করছে না—কঠিন মেহনত করে তোমার কাছ থেকে রুজিটা পাচ্ছে।

আচ্ছা থাকুক—দ্বিধার সঙ্গে স্ত্রী রাজি হলেন।

মেয়েটির কাজ নিখুঁত। আপনমনে চুপচাপ খেটে যায়। কথা কম বলে—কিন্তু যখন বলে খুবই খারাপ শোনায়। গোলাপ কাঁটার মতো ঘষা কর্কশ কণ্ঠস্বর তার। তবে কথা কম বলে।

মাস দুই গেছে। মেয়েটি যে আসে যায় আমি খেয়ালও করি না। হঠাৎ সেদিন রাতে শোবার আগে স্ত্রী বলেন, ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছ?

কি বল তো।

না, তোমাদের চোখে অবশ্য পড়ার কথা নয়। মেয়েটির আবার বাচ্চা হবে।

কি? তার মানে! ভীষণ চমকে আমি চিৎকার করে বলি।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। মেয়েদের চোখ এই ব্যাপারে ভুল ছাখে না। আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম। এখন ছাখো।

কি করবে তাহলে? আমার ভিতরটা শুকিয়ে ওঠে, এটা তো একদম ঠিক কথা নয়—বিয়ে-টিয়ে হয়নি বলছ।

আবার বিয়ে। বাচ্চা হতে বিয়ে লাগে না।

থাকুক আমার বাড়িতে। আমি রুখে দাঁড়াচ্ছি। যদি পেটে বাচ্চা ধরেই থাকে, এখানেই ওর প্রসব হবে।

বুদ্ধি বটে তোমার। সারা দেশে ঢি ঢি পড়ে যাক আর কি?

পালাব? ভিতরটা আমার জ্বলে যাচ্ছে, পালাব এই বাস্তব থেকে? যা করা দরকাব মনে হচ্ছে, লোকভয়ে তা করতে পারা যাবে না? শোনো, যা হয় হোক, মেয়েটিকে তোমার আশ্রয় দাও। জীবনে অন্তত একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতে দাও। এই অসহ্য ছুঁচো আর চামচিকের জীবন থেকে অন্তত একবার বেরিয়ে আসি।

মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার নিজের বোধহয় ছেলেমেয়ে সংসার বলতে কিছু নেই।

এ মেয়েটি আমাদেব মেয়েটিরই মতো—বুকের ভিতর থেকে উঠে আসা বাষ্প আমি কিছুতেই ঠেলে ভিতরে পাঠাতে পারি না। কথা বন্ধ হয়ে যায় আমার কথার মাঝখানে।

কি বললে? আমাদেরই মেয়ের মতো? খেপে গেলে নাকি? একটা রাস্তার বদস্বভাব মেয়ে, জন্মের পর থেকে পুরুষসঙ্গ করছে—

সেই হারামজাদা শুয়োরের দল, পুরুষ শুয়োরদের বুঝি কোনো দোষ নেই—রাগে চিৎকার করে আমি গলা চিরে ফেলি।

সে তো তোমরাই—স্ত্রীও চেঁচিয়ে ওঠেন।

সে তো আমরাই—চকিতে একটা করুণ সত্য লোহার শাবলের মতো কপালের ঠিক মাঝখানে আঘাত করে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে আমি বলি, সে তো ঠিকই কিন্তু মেয়েটির দোষ কি?

আমার অত জজিয়তির দরকার নেই—কালই আমি ওকে তাড়াব।

কি আশ্চর্য, একটা ঘোরের মধ্যে আমি বলে ফেলি. একটু সবুর কর, মানুষ আসা দেখতে দাও আমাকে।

কি ভেবে কেমন করে যে এই শস্তা সিনেমার ডায়লগটি বলে ফেলি জানি না। কিন্তু আমার স্ত্রী চুপ করে যায়। মেয়েটা থামে না, সিনেমা চলতে থাকে, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশু আসছে, সুস্থ সতেজ জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসবে মানুষ। সমস্ত পৃথিবীর অপেক্ষা তার জন্যে।

যেমন বলেছিলেন, আমার স্ত্রী পরের দিনই মেয়েটিকে তাড়িয়ে দিলেন না। তবে মেয়েটির প্রতি তাঁর ব্যবহার খুবই কঠিন হয়ে উঠল। ছোটোখাটো ত্রুটির জন্য

নির্মম কথা শুনতে হতো তাকে। কিন্তু সে একটি কথারও জবাব দেয় না।

আমি ওকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করতে থাকি। বলতে কি আমার স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত হতে লাগল। চোখ বন্ধ করলে আমি দেখতে পাই নির্জন জ্যোৎস্নারাতের স্তব্ধতার মধ্যে কান্নায় কান্নায় ভিতর থেকে ভরে উঠছে ধলেশ্বরী মধুমতী—নিষ্কলুষ রুপোর পাতের মতো ডিমে ভরা ইলিশের ঝাঁক সমুদ্র থেকে ছুটে আসছে স্রোতের উজান বেয়ে—ডিম ছাড়তে পারার আগেই জালে আটকে তারা আছড়ে পড়ছে জেলেদের ডিঙি নৌকায়। ঝিকিয়ে উঠছে আবছা তরল অন্ধকারের মধ্যে। তাদের পুচ্ছ তাড়নার শব্দ উঠছে ছপ ছপ, তারপর কানকো ফেটে গলগল করে কালচে-লাল রক্ত বেরিয়ে এসে ধুয়ে দিচ্ছে রুপোলি শরীর। চৌকো স্লাইডের মতো চারপাশ বাঁকা একটি কবে ছপি শব্দ করে সরে যায়। আমি চোখ খুলি। সামনের মাঠে দেখি শীতের শুকিয়ে ওঠা শাদা ঘাসের জমির একপাশ থেকে সবুজ ঘাস উঠে আসছে, ঢেকে ফেলছে বিবর্ণ মাঠটা আর দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশাল মেহগনি গাছ, মোম দিয়ে মাজা ফিকে সবুজ পাতায় আগাগোড়া সাজান।

কতদিন কেটেছে এমন। মাস দুই হতে পারে। শেষে একদিন ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমার স্ত্রী শান্ত নিচু কঠিন গলায় বললেন, ওকে আর রাখা যায় না।

আমি বলি, ঠিক বলেছ—আর একদিনও ওকে রাখা চলে না।

পরের দিন আয়েশা এলে আমার স্ত্রী বলেন, তোকে আর রাখতে পারছি না। নিজের জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে চলে যা আমার বাড়ি থেকে। দূর হয়ে যা।

আয়েশা কোনো কথা না বলে নিজের ময়লা একটা শাড়ি, রঙ-জ্বলা একটা গামছা আর এমনি টুকিটাকি দু-চারটি জিনিস হাতে তুলে নিয়ে আমার স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ায়, তার সেই আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ মেলে সে বলে—বেচি, আমার এমাসের যা পাওনা হয়েছে দিবেন না? স্ত্রী বলেন, এই তোর মাইনে; নে ধর, আর এইটা তোকে দিলাম। আর কোনোদিন এদিকে আসবি না। তোকে যেন আর কোনোদিন দেখতে না পাই। যা, মরগে তুই—তীব্র রাগে কথা কটি বলে তিনি মেয়েটির হাতে একটা একশো টাকার নোট দিয়ে তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাইরে ঠেলে দেন।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েটা সিঁড়ির দিকে যেতেই আমার স্ত্রী অত্যন্ত দ্রুত, অত্যন্ত অস্থির হাতে খটাখট শব্দে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়েই

ফিরে দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল চাপা দেন। তাঁর মুখের উপর কেটে-বসা কঠিন রেখাগুলি কিন্তু একটুও ভাঙে না—অথচ সামান্য নড়চড় হলেই নানা টুকরোয় যেন ছড়িয়ে পড়বে ওঁর মুখ। তিনি ঘরের দিকে চলে গেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, তারপর উজ্জ্বল রোদের মধ্যে আয়েশা বেরিয়ে এল। ছেঁড়া ময়লা শাড়ির ভিতর দিয়ে আগুনের শিখার মতো তার রূপ ঝলকাচ্ছে। অনেক বড় দেখাচ্ছে তাকে। শরীর ঢাকতে তার উজ্জ্বল ত্বক যেন একটু কম পড়েছিল, সেজন্যে খুব টানটান। এখনো ঠিক বোঝা যায় না। উষ্ণ রক্তের মধ্যে কি গভীর নিমগ্নতায় নিশ্চিন্ত অন্ধকারে এই কুমারী জননীর সন্তান কতটা বড় হয়েছে। আমি জানি বলেই আয়েশার ঈষৎ ভারি তলপেটটার আন্দাজ পাই।

আমাদের এদিক আসে না বটে, তবে ওকে মাঝে মাঝে রাস্তার কিনারা ধরে ধীরপায়ে হেঁটে যেতে দেখি, দেখতে পাই গাছের ছায়ায় বসে নিরুদ্বেগে ময়লা আঁচল দিয়ে ঘাম মুছছে। পৃথিবীকে সে দেবে অমূল্য উপহার, গর্বে তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে তার বুক, অবজ্ঞার চোখে সে চেয়ে আছে মানুষের ইতর সংসারের দিকে। জানি এসব কিছু নয়, আমিই তৈরি করেছি দুষ্পাঠ্য দুর্জ্ঞেয় অক্ষরমালা, যা কেবল আমিই পড়তে পারি। এইসব অক্ষর কি দাগে-ঢাকা, ক্ষয়-পাওয়া সুদূর অতীতের কোনো শিলালিপিতে ছিল, নাকি আমিই তৈরি করে নিয়েছি?

দুটোই পাশাপাশি চলতে থাকে। কঠিন কঠোর কল্পনাহীন সত্তাহীন অর্থহীন ক্লান্তিকর বাস্তব আর ঠিক তারই পাশে সৃষ্টি হতে থাকে অগ্নিগর্ভ সংকেত, দেখা দেয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্ম দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক জননী। আমার নিজের অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছে দেখছি।

এরপর আবার একদিন আয়েশাকে দেখতে পেলাম বিরাট ধামার মতো পেট নিয়ে পা টেনে টেনে হেঁটে চলেছে। কোনো বাড়িতে তো সে আর এখন ঢুকতে পারছে না। ও কি এখনো ওর 'মায়ের ঠেঁয়ে' যায়? সেখানে কি ওর ঠাঁই মিলবে প্রসব হওয়ার জন্যে? নাকি সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে এক কুকুরীর সঙ্গে একই যন্ত্রণায় সে কাতরাবে?

হঠাৎ একদিন দেখি বেশ ঝরঝরে শরীর তার। একটু শীর্ণ হয়েছে। দুই স্ফীত স্তনভার বইতে পারছে না। মরিয়া হয়ে তাকে আমি হাতছানি দিয়ে ডাকি। ক্লান্ত পায়ে হেঁটে সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমাকে চিনতে পেরেছে এমন

কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। চিনতে পারলেই বা কি? নিস্পৃহ নিরাসক্ত চোখে আমার দিকে চাইল সে। সেই বিশাল দুটি চোখ একটু গর্তে বসে গেছে। বিচ্ছিরি ব্যাপার, ঠিক তখুনি আমার কান্না এল। এমন অসম্ভব ভাবপ্রবণতায় নিজের ওপরেই আমি জ্বলে উঠি। গলায় বাষ্প ফেনিয়ে উঠতে উঠতে আবার নিচে নেমে যায়। কেউ যেন শুনতে না পায়, দেখতেও যেন না পায়, আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখে নিচু গলায় ফিশফিস করে জিজ্ঞেস করি, বাচ্চা হয়েছিল তোর, তার কি হলো রে?

তার সেই নিচু কর্কশ গলায় সে বলে, নাইখো।

কেন, কোথায় দিয়েছিস তাকে? কঠিন গলায় আমি বলি। আমার হঠাৎ রাগ হয়ে যায়।

কিছুমাত্র পরিবর্তন নেই তার মধ্যে। ঠিক আগের কথাটিই আবার বলে, নাইখো।

কোথায় কাকে দেয় সে সন্তান? দেবতাদের শাপমুক্ত করছে নাকি? আয়েশা ধীর পায়ে গাছতলার দিকে ফিরে যায়।

তিনবারের বার সে গর্ভধারণ করেছে জানতে পেরে আমি বাসায় ফিরে এসে আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েটিকে কোলে নিয়ে কাঁদতে থাকি। আমার স্ত্রী কাছে এসে বলেন, ও আবার কি ঢং!

আমি চোখ মুছতে মুছতে বলি, ওকে তো কোনোদিন আদর করি না। কচি-বেলায় হাত মুঠো করে আমার বুকে ঘুমতো, গান শুনতে শুনতে কাঁধে মাথা রাখতো যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় পেঁৗছে গেছে।

আমার স্ত্রীর চোখেও হঠাৎ জল চলে এল। মেয়েকে ধমকে উঠে বললেন, যা এখান থেকে। মেয়েটা হকচকিয়ে চলে যায়।

এবার দেখি আয়েশার শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। এ সেই রকমের ভাঙা যাতে মনে হয় ভাঙার ব্যাপারটা শেষ হলে শরীরের টুকরোগুলো এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়বে। চারদিক থেকে কুড়িয়ে এনে জোড়াতালি দিতে গেলে হয়তো দেখা যাবে পা বা কণ্ঠার হাড় নিয়ে চুষছে একটা কুকুর। কোথাও যায় না সে। গর্ভের অসম্ভব ভার নিয়ে বৃত্তাকার রাস্তা ধরে ধীরপায়ে শুধু হেঁটেই চলে। চোখে তার নিস্পৃহ অবজ্ঞা মেশানো দৃষ্টি।

আমার স্ত্রীকে কখনো তার কথা বলি না। আমি হঠাৎ জেগে উঠে দেখেছি আমার মুখের দিকে তিনি অপলক চেয়ে আছেন। আমার চোখ খুলে গেলেই

'তিনি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নেন।

প্রসবের সময় আসন্ন হয়ে এলে একদিন আয়েশাকে দেখি তার সেই পছন্দের জামগাছের তলায় চিৎ হয়ে নিস্পন্দ শুয়ে আছে। বাতাসে ফাঁপিয়ে তোলা মশারির মতো ফুলে আছে তার পেট। মাটি রঙের পালো ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছে—কিন্তু সব ঢাকেনি। এই পেটের বোঝা খালাস হয়ে গেলেই এতটুকু সময় নষ্ট না করে সে তার জরায়ুতে নিযুক্ত করে নেবে আর একটি ডিম্বকোষ। আজ তার এই বিশাল গর্ভগৃহ দেখে মনে হয়, একটিমাত্র সন্তানের জন্য জায়গাটি বড্ড বড়—হয়তো ওখানে শত কলসীতে ভরা আছে একশো সন্তান। তারা জন্ম নিয়েই মাকে ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে যাবে। পিতৃহীন জারজেরা মায়ের হয়ে অধিকার নেবে মাটির।

আর একবার মাত্র আয়েশাকে দেখেছি। তারপরে আর কখনো নয়। একটা ইটের ভাঙা পাঁচিলের উপর সে বসে আছে। পাতলা তামাটে চামড়া দিয়ে আগা-গোড়া মোড়া। কিন্তু চামড়াটা এবার মাপে বড় হয়েছে। কনুইয়ের কাছে ময়লা ন্যাকড়ার একফালি ঝুলে আছে—গলার কাছে কয়েকটা ভাঁজ, বুকের উপর ন্যস্ত আছে একটু কালো কোঁচকানো দুটো ধারালো ফালি আর বাকি বাড়তিটা ঝুলে আছে তার নিতম্বের নিচে। বাংলাদেশের ম্যাপের মতো খাঁজকাটা, ভাঁজকরা তীব্র ধারালো। এবার কিছুতেই ওর চোখ দেখতে পাই না। কপালের নিচে দুটি বড় বড় কালো গর্ত, সেখানটায় এমন অন্ধকার যে কিছু দেখতে পাওয়া গেল না। সরু শীর্ণ হাত তুলে সে আকাশে দাগ কেটে দেয়, তারপর হাত নামিয়ে হিংস্র নখরসহ তার ধাতব আঙুলগুলি দিয়ে কঠিন আক্রোশে মাথা চুলকোতে থাকে।

আমি দেখি আকাশ বুঁজোতে বুঁজোতে অন্ধকার নেমে আসছে। তার মধ্যে সে হারিয়ে যাবার আগেই আমি দ্রুত পায়ে এই পরিশুদ্ধ জননীর কাছে গিয়ে জিগগেস করি, মা, এবার তোর কি হলো?

তার জনহীন জন্মদ্বার সে সম্পূর্ণ খোলা রেখেছে।

হাওয়া নেই

আপনার ব্যাগটা আমাকে দিন। শুধু ঝোলাটা কাঁধে রাখুন।

তাহলে তোমার দুটো ব্যাগ একটা ঝোলা হয়ে যাবে। হাঁটবে কেমন করে?

আমি পারব। কিন্তু এই ভারি ব্যাগ আর ঝোলা নিয়ে আপনি তো হাঁটতে পারবেন না।

ব্যাগটা শুধু শুধু আনলাম। ঝোলাটাই যথেষ্ট ছিল। ঝোলা কেন, খালি হাতেই আসা ছিল সবচেয়ে ভালো।

দিন ব্যাগটা আমাকে।

নাও।

কামাল আর আপত্তি করে না। তার সাহস নেই; বুকের বাঁ দিকটায় ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। বিকাশ ডান হাত বাড়িয়ে যখন তার কাছে থেকে ভারি পেট-ফোলা ব্যাগটা নেয় মসৃণ বেগুনে চামড়ার ভিতর দিয়ে তার হাত আর বাহুর পেশিগুলি ফুটে ওঠে।

ফুলঝুরি আসতে চেয়েছিল আমাদের সঙ্গে—রাস্তায় নামতে নামতে বিকাশ বলে। বেশ চওড়া কাঁচা সড়ক। নিশ্চয়ই বহুদিনের পুরনো। গ্রামের দিকে নতুন রাস্তা আজকাল এত চওড়া হয় না। এদিকের মাটি ধপধপে শাদা। রাস্তায় ধুলো। খুব মিহি পাউডারের মতো ধুলো। পুরু হয়ে জমে আছে। এই বিকেল-বেলায় বাতাস নেই, কাজেই উড়ছে না তেমন। রাস্তায় পা দিতেই কামালের স্যাণ্ডালের প্রায় সবটাই ধুলোয় ডুবল। সে বিকাশের দিকে চেয়ে দেখে তার পায়ে ঘাড়-তোলা জুতো। ছেলেটা শক্ত মজবুত, পোশাক বাছতেও জানে পরতেও জানে। নীল জীনসের আঁটোসাঁটো প্যান্ট পরেছে, গায়েও জীনসের শার্ট, বুকের দিকে বোতাম প্রায় সবগুলোই খোলা, ভিতরে গেঞ্জি নেই।

রাস্তার রঙ এখনো শাদা। রোদও শাদা সেই জন্যে। হেমন্ত এসে গেলেও রোদের তেজ মরেনি তেমন। ঘাড়ের কাছে জ্বালা করছে। রোদটা পড়ে এলে কি দাঁড়াবে রাস্তার রঙ? লাল? দু'পাশের সমতল জমি থেকে রাস্তা তেমন উঁচু

নয়। ধুলো যেখানে শেষ, রাস্তার দুই প্রান্তে সেখানে ফ্যাকাশে সবুজ ঘাসের পাড়। তার ওপর ছাড়া ছাড়া আকন্দ আর বনফুলের ঝোপ। ধুলো ঢাকা পড়ে সব শাদা। দু'দিকের মাঠে গাছপালা চোখে পড়ে না বিশেষ।

এদিকটায় এর আগে কোনোদিন আসিনি আমি, কামাল বলে।

আমিও এই প্রথম। ফুলঝুরি আমাদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল কেন?

এমনি আসতে চেয়েছিল আমাদের সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে?

আমাদের সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে। কামাল অন্যমনস্কভাবে বলে। তারপর কথাটা কি বলল খেয়াল হয় তার। মৃদু হেসে বলে, আসাটা ঠিক হতো না।

কেন?

গ্রাম সম্বন্ধে এখনো তোমাদের কোনো ধারণা নেই।

আপনি জানেন না গ্রাম বদলে গেছে। দশ বছরে অনেক বদলেছে। গত দশ বছর আপনার সঙ্গে গ্রামের কোনো যোগাযোগ নেই। আজকের গ্রাম নিয়ে আপনি লেখেন না। অন্তত আপনার লেখা পড়ে তা মনে হয় না। আপনার পুরনো স্মৃতি থেকে লিখছেন। গ্রাম অনেক বদলে গেছে। বিকাশ এক কাঁধের ঝোলা অন্য কাঁধে নিতে নিতে বলে।

আমি বলছিলাম, আমাদের সঙ্গে আসাটা ফুলঝুরির পক্ষে উচিত হতো না।

কেন বললেন তাই তো জানতে চাইছি।

অনেক কারণ আছে। গ্রামের মানুষ সেটা ভালো চোখে দেখত না।

বলেছি গ্রাম অনেক বদলে গেছে।

বদলে গেছে মানে কি?

গ্রামের মানুষের দুই চোখ সোজা তার পেটের দিকে। ঘোঁট পাকানোর সময় নেই তার। তার পিঁচুটিজমা চোখে সে ভালো দেখতেও পায় না।

তুমি বলতে চাও গ্রামে ন্যায় নিয়ম বলতে কিছুই নেই?

নেই, সব ভেঙে গেছে।

আমিও সেটাই জানতে চাই। কি বদলেছে, কি ভাবে বদলেছে, কি ঘটেছে।

অধঃপাতে যাচ্ছে গ্রাম, বিকাশ বলে।

অধঃপাত কি ঊর্ধ্বপাত সেটাই জানা দরকার। গ্রামের রিয়ালিটি আজ কি?

উঃ, রিয়ালিটি রিয়ালিটি! আপনাদের শব্দ। আমি কিচ্ছু ভাবি না। কিন্তু আমি দেখি। দেখতে না চাইলেও দেখে ফেলি। মানুষ বাড়ছে, শুয়োরের পালের মতো। জমি কমছে লোকের হাতে। মানুষ জমিহারা হয়ে যাচ্ছে। সরকার বড়লোকদের কেনা, যাদের জমি আছে।

তোমারও শব্দ, তোমারও না ভাবা! কিন্তু আমি একটা শাদা কথা বলতে চেয়েছিলাম, ফুলঝুরিকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা ঠিক হতো না। এই কথাটা বুঝতে চাইছো না কেন তুমি? রিয়ালিটি বুদ্ধির ব্যাপার নয়—রিয়ালিটি একটা সমগ্র। ওটা থাকে—ওটাকে বানিয়ে তোলা যায় না। ওকে বুঝে তবে ওর মধ্যে কাজ করতে হয়, তবে যদি বদলানো যায়।

সে কাজ আপনার? লেখকের?

হ্যাঁ, খানিকটা। বোঝার কাজটা। আমরা লিখতে পারলে বদলানোর কাজে সাহায্য হতে পারে।

বিকাশ চুপ করে যায়। একটু পরে সে আস্তে আস্তে বলে, আপনি জানেন, ফুলঝুরির সঙ্গে আমি অনেক রাত কাটিয়েছি। সে এখানে খোলা আকাশের নিচে আমার সঙ্গে একটা রাত কাটাতে চেয়েছিল।

কামালের ঠোঁটে একটুকরো তেতো হাসি দেখা দেয়, তুমি আমাকে বৃথা রাগাতে চেষ্টা করছ। তোমরা এখনও আমাদের অচেনা হওনি। তোমাদের ধারণা তোমরা তরুণরা খুব বদলেছ, জেনারেশন গ্যাপ যাকে বলে আর কি। কিন্তু আমি তোমাদের জীনস-টীনসের' এই নতুন ঠোঙার মধ্যে পুরনো জিনিশই দেখি।

আমি এসব কথা ভাবিনি।

তুমি না ভাবতে পার কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার এইরকম মনে হলো। আধুনিকতা ল্যাজে গজায় না।

ইস! আপনি খুব রেগে গেছেন।

আমার কথাটা তুমি শুরু থেকে ধরতেই পারছ না। আমি তরুণদেব বোঝার খুব চেষ্টা করি, লেখক হিসেবে। অনেকটা পেশাদারি ব্যাপার বলতে পার। গত দশ বছরের তরুণরা কেমন? খুব চেষ্টা করি, শ্রদ্ধা আসতে চায় না। ঠোঙা ঠোঙা, কেবলই ঠোঙা বদলাচ্ছে। শিক্ষিত তরুণরা কেমন, আমি কেমন করে জানব বলো তো? একটা রাস্তা তো বাতলাবে। একটা পথ হচ্ছে তারা কি করে দেখার চেষ্টা করা। তারা কিছুই করে না। তারা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে

রাজনীতি করে, গল্প, কবিতা, নভেল লেখে পড়ে। টেলিভিশন মঞ্চে নাটক-থিয়েটার করে। টেলিভিশন ? বিকাশ তুমি টেলিভিশনে তরুণদের নাটক দেখো নাকি ? কামাল দাঁড়িয়ে পড়ে পাগলের মতো হাসতে থাকে। কি ভয়ানক ! ঠোঙা উপুড় করলেই মধ্য উনিশ শতক বজবজ করে বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে মার্কিন নির্বুদ্ধিতা। ছাড়িয়ে যাওয়াই আধুনিকতা। যা চিরকাল লোকে ভেবে আসছে বা করে আসছে, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া। বুঝলে ?

আহা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই তো আমি ফুলঝুরির সঙ্গে গাঁয়ের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে একটা রাত কাটাতে চেয়েছিলাম।

কামাল আর কথা বলার উৎসাহ পায় না। হঠাৎ তার মনে হয়, আলগা হয়ে আসছে। কিছুই হয়নি এটা যেমন নিশ্চিত, কিছুই হবে না এটাও যেন তেমনিই নিশ্চিত। কিছুই হবে না, এই বিশ্বাস দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই তো মৃত্যু হয়ে গেল। মৃত্যু ঘটুক আর না ঘটুক এসে-যায় না কিছু। মুঠো আলগা হয়ে আসছে, পৃথিবীতে আর বেশিদিন থাকা হবে না—আর কিছু হবে না মনে হচ্ছে। কামালের বেঁচে থাকাটা ডুবতে থাকে। চাপা পড়তে থাকে। বুকের বাঁদিকের খিঁচ ব্যথাটা আবার দেখা দেয়, চোখ দুটির আলো হঠাৎ মরে আসে।

বিকাশ খুব গম্ভীর, এজন্যে তরুণরা দায়ী ?

কামালের বেঁচে থাকা যেন ডুবছে। তীব্র চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে। একবার তার চেতনা আস্তে আস্তে নিবে এল। আলোভর্তি আকাশ মাঠ-ঘাট গুটিয়ে আসতে লাগল তার চারদিকে, অন্ধকার তোরঙ্গের ডালা পড়ার মতো। কিন্তু সে ভেসে ওঠে, আবার হাওয়া বইতে থাকে চারপাশে, কামাল একা একা আঁকুপাঁকু করে।

বিকাশ তখনো গম্ভীর, আপনার কথায় আমি একটুও ভিজছি না, আপনি যা বললেন তার চেয়েও লাগসই কথা আমাদের কবিরা হরহামেশা বলছে। কথা বলা খুব সহজ। আপনি আমাকে আগাগোড়া বলুন। তরুণরাই দায়ী ?

কামালের কানে ক্ষীণ শোনায় বিকাশের কথা। কত দূর থেকে সে কথা বলছে যেন। কামাল ফিরে আসছিল। কাছে এসে পৌঁছয় যখন, তখন সূর্য আরো পশ্চিমে গেছে। রোদের রঙ লাল, ধুলোর রঙ লাল, রাস্তার রঙ লাল, ফিকে রক্তে ডুবে গেছে দেশ। এখন সে পরিষ্কার শোনে বিকাশের প্রশ্ন তার কানের কাছে ফেটে পড়ছে, বলুন তরুণরাই কি দায়ী।

দুলতে দুলতে কামাল বলে, একবার তরুণরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে-

ছিল জানো? একবার ভিতর থেকে ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে এসেছিল। ঘরের ভিতরটা ভেঙে ফেলছিল। নরম আর সূক্ষ্ম জিনিশ কিছুই রাখতে চাইছিল না। পিলপিল করে বেরিয়ে এসে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অফিস আদালত সবরকম প্রতিষ্ঠান চুরমার করে দিতে শুরু করেছিল। কিছুই দাঁড়াল না সত্যি। কিন্তু এই নির্মম ভাঙাটাই ছিল একেবারে নতুন করে গড়ে তোলার শুরু। আর মুক্তি-যুদ্ধ পেরিয়ে-আসা গত দশ বছরের তরুণদের দিকে চেয়ে দেখো। দায়ী কিন্তু তরুণরা নয়। দায়ী হয়তো যারা বচন দেয় তারাই। গাঁয়ে এসে প্রেমিকার সঙ্গে একটি রাতে কাটাতে চায় একজন তরুণ। এই হচ্ছে মোট প্রগতি।

বিকাশ ঘাড় ফিরিয়ে একটুক্ষণ কামালের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর মৃদু গলায় বলে, আপনি সত্যিই রেগে যাননি, না?

সেটা জানা তোমার জন্যে কি খুবই দরকারি? রাগ কি কখনই সত্যি থাকে না?

আমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমিও কচি ছেলের হাত মুচড়ে দিয়েছি। মাঝবয়েসি মহিলার ঘাড়ে হাত দিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে বাসা থেকে বের করে দিয়েছি। এত করলাম, আর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়টায় কি করতে হবে, কেউ বোঝাতেই পারল না। যতসব পাঞ্জাবি ঝোলানোর দল। বিকাশ বলে।

ঢুকলে তো গিয়ে বিদেশী ফার্মের শাঁসালো চাকরিতে।

বিকাশ বিপন্ন চোখে কামালের দিকে তাকায়। দূরে একটি ঘূর্ণি বাতাস। ধুলোর শাদা স্তম্ভ একটি। না একটি নয়, কয়েকটি। ধুলোর ফাঁপা স্তম্ভ। পর পর সাজানো। স্তম্ভগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ফিকে হয়ে এল; স্তম্ভ ভেঙে মিলিয়ে গেল। চারপাশে হেমন্তকালের ভরা স্তব্ধতা।

আমাকে দোষ দিচ্ছেন? আমাকে সামনে পেয়েছেন বলে? কেন আমাকে ফাঁকা থাকতে দিয়েছেন? কাজ দিয়েছেন আমাকে? পাঞ্জাবি ঝোলানোওলারা খতম চালু করে দিয়ে এখন চুপ কেন? এখন পর্যালোচনা হচ্ছে।

এসব কথা আমাকে বলো না। আমিও তোমার মতোই কোনো কাজ করি না। আমার একটাই দোষ—আমি বুঝতে চাইছি। প্রাণপণে আমি শুধু যোগা-যোগটা রাখতে চাই। যেটা এদেশে খুব কঠিন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আলাদা হয়ে পড়বে। আর যদি একবার শহরে পৌঁছুতে পার, বিশেষ করে রাজধানীতে, তাহলে তোমার ধ্যাস্টামোর আর অন্ত থাকবে না। সহজ স্বাভাবিক

পায়ে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। তোমার সঙ্গে যখন গাঁয়ে আসা নিয়ে কথা হলো মনে আছে তোমার? কোনো বিশেষ প্রস্তুতি না নিয়ে সামান্য কিছু কাপড়-চোপড সঙ্গে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ে সোজা সামনের গ্রামের দিকে এগিয়ে যাব। মনে আছে? তোমার কি মনে হয়েছিল জানি না—কিন্তু আমার তখুনি কেমন অস্বাভাবিক, কেমন অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার লাগছিল ব্যাপারটা। এই তো এখন খুব সহজ হবার চেষ্টা করছি -কিন্তু হতে পারছি কি। বাসটা থামতেই এই রাস্তাটা চোখে পডল—চিরকালের চেনা ধুলোভরা গাঁয়ের সড়ক—দু'পাশে মাঠ। মাঠের শেষে গাঁ। ঠিক যেমন আশা করা যায়—

বিকাশ ওর কথা শুনছিল কিনা সন্দেহ। কামালও বুঝতে পারছিল শুধু শুধু বকবক করছে সে। কথা তো আজকাল প্রায়ই জিভ নাড়া হয়ে যায়। কিন্তু তার গ্রামে আসতে ইচ্ছে হয়েছিল কেন? মাঝে মাঝে হয় কেন? লেখার উপাদান খুঁজতে? গ্রাম-কাঠামোর রদবদল খুঁজে দেখতে? সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা ফলাতে? আর কিছু নেই মনের তলায়! এমন কিছু যা অনেকের কাছে তো দূরের কথা নিজের কাছেও স্বীকার করতে লজ্জা হতে পারে?

মাঠটাকে যত বড বলে মনে হয়েছিল, আসলে তত বড় নয়। একেবারে গাছপালা না থাকায় ফাঁকা ভাবটা এত বেশি এখানে। উঁচু-নিচু হলে কাছে দূরে দু'রকমই মনে হয়। তা তো নয়। মাঠ একেবারে সমতল? কাছের গ্রামও দূরের বলে মনে হয়।

হঠাৎ খেয়াল হলো সড়কটি গাঁয়ে ঢুকছে। খুব বড় একটা অশ্বত্থ গাছ। গুঁড়ির কাছটা মসৃণ তেলতেলে—বোঝা যায় লোকজন খুব ব্যবহার করে জায়গাটা। রাস্তাটা গাছটাকে একবার বেড় দিয়ে ধরেই ছেড়ে দিয়ে ছোট বড় গাছের জঙ্গলের ঘন ছায়ার মধ্যে ঢুকল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে চেয়ে দেখে কামাল। মাঠের শেষে সূর্যাস্ত হচ্ছে: হাওয়া জবজবে করে পানশে রক্তে মাখানো, তাতেই ডুবে যাচ্ছে চারপাশ। হেমন্তের ফসলে পাকা রং। কামাল চেয়ে থাকতে থাকতেই হিঙুল রঙের সূর্য আধখানা ডুবল, চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না সে। মনের কোনো অতলে গাঁয়ে ফেরার বাসনা, তা কি সে জানে না? মনে মনে এক দুই করে এক মিনিট গুনতে না গুনতে সূর্য মিলিয়ে যায়। বিকাশ ঝোলা ব্যাগ নামিয়ে অশ্বত্থতলায় বসে পড়েছে।

আমরা গাঁয়ে ঢুকব না? বিকাশ জিগগেস করে।

গাছপালার জঙ্গলের মধ্যে ঠিক যেখানে রাস্তাটি গাঁয়ের মুখে ঢুকেছে

সেখানটা এরই মধ্যে হিম, ধুলো ভিজে ভারি। রাস্তার ওপরে গাছগুলো শাখায় শাখায় গ্রন্থিবদ্ধ, অন্ধকার গুহামুখের মতো। এখানটা দেখেছ? ঠিক যেন একটি গুহা—খানিকটা অন্যমনস্কভাবে কামাল বলে।

গাঁয়ে ঢোকার মুখটা?

হ্যাঁ।

আশেপাশে কোনো লোকজন দেখছি না। ঢুকব নাকি গাঁয়ে? কি রকম গাঁ কিছুই তো জানি না। এখান থেকে তো মনে হয় না বাড়িঘর, লোকজন কিছু আছে।

আছে নিশ্চয়। গুহায় একবার ঢুকে তো পড়; তারপর দেখবে সবই আছে।

চলুন, যাই তাহলে? রাতটা তো কাটাতে হবে এখানে। এখন মনে হচ্ছে এভাবে আসাটা ঠিক হয়নি। এককালে গাঁয়ে কাজ করেছি আমি। এমন করে যারা গাঁয়ে আসে, তাদের লোকে পছন্দ করে না। মাতব্বরদের তো কথাই নেই—গরিব মানুষেরাও ভালো চোখে দেখে না। যাদের ঠেঙিয়ে, তাড়িয়ে দেয়া কর্তব্য গাঁয়ের গরিবরা যে এখনো তাদের খাতির করে, আশ্রয় দেয়, এটাই আশ্চর্য।

কামাল শুনছে না। সে চেয়ে আছে একটা উঁচু পাড়অলা পুকুরের দিকে। বিশাল একটি গাছ উঁচু পাড়ের এক কোণে মাথা তুলে আকাশে শাখা-প্রশাখা মেলে ধরেছে। কালো পাথরের তৈরি দৈত্যের মতো চেহারা। কিন্তু তার দাঁড়ানোর মাটি নেই। এই মহীরুহের ধপধপে হাড়ের মতো শাদা অজস্র শিকড় উঁচু পাড়ের এক কোণে শূন্যে ঝুলছে। সরু মোটা মসৃণ শিকড় কিলবিল করতে করতে যেন হাওয়া আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কামাল কিছুতেই বুঝতে পারে না গাছটা খাড়া আছে কিভাবে। বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টায় সে উল্টো ঝুঁকে পড়েছে মাটির দিকে, কিছু মোটা শিকড় সেখানে এখনো মাটিতে গেঁথে রয়েছে। কামাল মুখ ফিরিয়ে আর একবার মাঠের দিকে চাইল। এর মধ্যেই মাঠ অন্ধকারে ডুবে গেছে, সন্ধ্যাতারার আলো পৃথিবীতে আসতে শুরু করেছে।

গাঁয়ে কি আমাদের যেতেই হবে বিকাশ? কামাল বলে। তার বুকের ভিতর আবার ব্যথা।

উপায় কি। থাকবেন কোথায় রাতটা?

কিন্তু এখানে এসে চ্যাংড়ামির চূড়ান্ত হলো। গুহার মধ্যে কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। যদি থাকে তাহলে হয়তো কোনো জোতদারের বাড়িতে

আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। এরকম চেষ্টা আমি আর কখনোই করব না বিকাশ।

কামালের বুকের ভিতরে ব্যথাটা জানান দেয়। গাছটির দিকে সে আবার চেয়ে দেখে। অন্ধকার যত ঘন হচ্ছে ঝুলন্ত শিকড়গুলো ততই ফুটে উঠছে, জ্যান্ত হয়ে উঠছে। হঠাৎ ওর দৃষ্টিবিভ্রম হয়। সে দেখতে পায় মোটা মোটা শিকড়গুলো প্রাণপণে বাঁকতে বাঁকতে উল্টোদিকে ঘুরে মাটি কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে।

গাঁয়ে যাবেন না? কিছু একটা ঠিক করুন!

আমাদের কাছে খাবার তো আছে, তাই না?

তা আছে। ফ্লাস্কে চা আছে।

ফ্লাস্কে চা? কামাল হাসে।

গরম আছে, খাবেন?

থামো। আমি ভাবছিলাম, গাদা গাদা অপরাধের তলায় পড়ে এমনিতেই থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো গাঁজলা তুলে মরছি। আর অপরাধ না বাড়ালাম। হয়তো, হয়তো আবার আসব—প্রবল আবেগ কামালের গলা টিপে ধরে। চেষ্টা করে সেটা গলার নিচে নামিয়ে দিয়ে সে বলে, এইখানে রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে দিয়ে সকালে চলো আমরা পালাই।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিকাশ কামালের মুখের দিকে চেয়ে দেখার চেষ্টা করে। খুবই আশ্চর্য হয়ে যায় সে।

এখানে থাকবেন কোথায়? এই গাছতলায়!

ঐ গাছটা দেখতে পাচ্ছ? যার তিনখানা শিকড় শূন্যে ঝুলছে? ঐ গাছটার পাশে ওটা একটা কুঁড়েঘর নয়? আমার তো তাই মনে হচ্ছে। ভালো করে দেখ তো?

খুব আবছাভাবে একটা মুখ থুবড়ে-পড়া কুঁড়েঘরের মতো দেখা যাচ্ছিল।

তাই তো মনে হচ্ছে।

চলো তো ঐখানে গিয়ে দেখি রাতটা থাকা যায় কিনা!

বিকাশ বিপন্ন মুখে উঠে দাঁড়াল, এটাও কিন্তু কম ছেলেমানুষি হচ্ছে না।

জানি, কিন্তু উপায় কি বলো।

দুজনে বহু কষ্টে ঝুলন্ত গাছটার তলা দিয়ে উঁচু পাড়ে উঠে এল। কামাল উঠে আসার সময় একটা শিকড়ে হাত দিয়ে দেখে। সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা—হেমন্তের শিশিরে ভেজা। কুঁড়েটার সামনের দিক পড়ে গেছে। কিন্তু পিছনের

দিকটা এখনো খাড়া। সেদিক দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়। দুজনে হেঁট হয়ে ঢুকে পড়ে।

সাপ-টাপ নেই তো?

ঠাণ্ডার আমেজ এসে গেছে তো। না থাকাই সম্ভব—বলতে বলতেই বিকাশ ভয়ার্ত চিৎকার করে তার জিনিসপত্র সমেত একদিকে বেড়ার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লাফ দিয়ে জিনিশটা বেরিয়ে যেতেই বোঝা যায় একটা বড় শিয়াল। দিনের শেষে বাইরে বেরুনোর উদ্যোগ করছিল, এই সময় বিপত্তি। এরা দুজনে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বোধহয় শিয়ালটাও তাই; নিজের জায়গার দখল ছেড়ে পালাতে পালাতেও বারদুয়েক দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে চেয়ে দেখে।

বাচ্চা-টাচ্চা নেই তো? কামাল জিগগেস করে।

থাকতেও পারে—বলা যায় না।

কুকুরের মতো শিয়ালও শুনেছি কখনো কখনো পাগল হয়।

আমাদের কাণ্ড দেখে হতেও পারে।

শব্দ না করে হাসতে গিয়ে কামালের ঠোঁটটা বেঁকে যায়। ঠোঁটের কোণের কাছটা শিরশির করে উঠছে, সরু সরু রেখা পড়ছে, বেঁকে যাচ্ছে বুঝতে পারে কামাল। ধপাস করে বসে পড়ে সে। তবে কি? মুহূর্তের জন্যে কালো গুহামুখ ভেসে ওঠে। একবারই অবশ্য, আর কিছু ঘটে বিনা পরীক্ষা করার জন্যে কামাল জোর গলায় বলে, ঝোলায় মোমবাতি ম্যাচ আছে, জ্বালো তো।

মোমের নরম আলোয় জায়গাটা ভরে ওঠে। কুঁড়ের যেদিকটা ঘাড় মুচড়ে পড়ে আছে, সেদিকে আলো ঢুকতে গিয়ে পিছিয়ে আসছে। ছোট ছোট অন্ধকার গর্ত। বিকাশ কম্বলটা পেতে ফেলে। কাজে লেগে গেছে সে। ঝোলা থেকে বের করছে পাঁউরুটির টুকরো, ঠাণ্ডা কড়কড়ে ডিমসেদ্ধ। বোঝা যায়, সে ভাণ্ডারী ভালো।

আমি ডিমটা আর খাবো না—এক টুকরো রুটি তুলে নিতে নিতে কামাল বলে।

ডিম ছেড়ে দিয়েছেন আপনি?

ছাড়িনি—তবে এগ-ইয়োক—মানে কুসুমটা খাই না।

কুসুম বাদ দিয়েই খান।

থাক, দরকার নেই।

ডিম ছেড়েছেন কেন ?

আমার কলেস্টরেল হাই। প্রেসারও বেড়েছে।

এসব কথার মানে কি ?

চল্লিশের আগে এসব কথার মানে বোঝা যায় না।

ভদ্রলোক না হলে বোধহয় কখনই বোঝা যায় না।

এ-কথাটা বোধহয় ঠিকই বলেছো—রুটি চিবুতে চিবুতে কামাল বলে।

গরম চা খাবার পর একটু ভালো লাগতে থাকে। গুহামুখে একটু আলো যেন দেখা যায়, অন্ধকার আকাশ গ্রহনক্ষত্র নিয়ে বাড়তে থাকে, একবার করে মৃদু কেঁপে ওঠে আর বাড়ে, মাঠ প্রান্তরও সীমানা বাড়ায়। কোনো কথা না বলে মাথার নিচে দু'হাত রেখে কামাল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু বিকাশের পক্ষে চুপ করে থাকা কঠিন হয়ে ওঠে; তার ফুলঝুরির কথা মনে পড়ে, একেবারে ভিন্ন কারণে, কিন্তু সে-কথা তুলতে সাহস হয় না।

রাজনীতি কি একটা ঝোঁক? বিকাশ আচমকা জিগগেস করে।

কেন বলো তো?

কলেজে ঢোকার পরেই যখন রাজনীতিতে ডুবে গেলাম, অবস্থাটা নেশাখোরের মতো। জনগণের নামে রাজনীতি। কিন্তু মনে পড়ে না জনগণ বলতে কোনোকিছু কোনোদিন স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছি। রাজনীতিতে ঢোকার দিনকতক পরে আমরা হয়ে উঠলাম জনগণের সোল এজেন্ট, উঠতে জনগণ বসতে জনগণ বাঁয়ে জনগণ ডাইনে জনগণ। অদ্ভুত যাদুকরী একটি কথা 'জনগণ', ঠিক যেন টাচস্টোন। আমাদের হিন্দুদের গঙ্গাজলের মতো, একটু ছিটিয়ে দিলেই পবিত্র—

তুমি উল্টোপাল্টা উপমা দিচ্ছ, কিন্তু তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে, বলো তোমার অভিজ্ঞতার কথা—কামাল চোখ বুঁজেই বলে। মোমের আলোয় বিকাশের মুখে আলো-অন্ধকার কাঁপতে থাকে, সে বলে যায়—নেতা বলবেন, তুমি কোনদিকে। আমি গলাটা শক্ত করে বলব, আমি জনগণের পক্ষে। নেতার আর কিছু জানার নেই। যাক, ছোঁড়াটা স্বীকার করেছে সে জনগণের পক্ষে আছে। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মনে করবে তুমি জনগণের পক্ষে। তারপর জনগণের কাছে যাও। জনগণ তোমার শিক্ষক। বন্দুকের নল নয়, জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। এইসব। আমার কিছুই হলো না—তখনো আমি জনগণ থেকে যত দূরে ছিলাম এখনো তাই। শহর গঞ্জে হাট

বাজারে সভা সমিতি গোপন মিটিং-এ সব জায়গায় জনগণ শব্দটা লক্ষ লক্ষ বার ব্যবহার করলাম—জনগণের ভিতরে এসে—তবুও একফোঁটা কাছে যেতে পারিনি। তাহলে রাজনীতি করতাম কেন! যখন রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলাম, মনের মধ্যে কোথাও তো উচ্চাকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র ছিল না। তাহলে—তাহলে কি নেশাগ্রস্ত হয়েছিলাম?

কামাল উঠে বসে, এই একটু আগে তুমি যে আমাকে বয়ান দিলে গ্রামের মানুষ এটা পছন্দ করে না, ওটা পছন্দ করে না, তারা অনেক বদলে গেছে—সে-সব তুমি কোথা থেকে জানলে?

ওটা আমাদের পুরোনো অভ্যেস। আমাদের শেখানো হয়েছিল, আমরা সবকিছু বুঝি এবং অন্যেরা কোনো কিছুই বোঝে না। কথা বলার সময় বলতে হবে কোনো জানাই সম্পূর্ণ নয়, প্রতি মুহূর্তে আমাদের শিখতে হবে কিন্তু তারপরে কথা এমনভাবে বলতে হবে যেন আমিই চূড়ান্ত কথা বলে দিচ্ছি। মনে রেখো, বুর্জোয়া পণ্ডিতের চেয়ে তুমি সব সময়ই বেশি জানো, যে-শ্রেণীর পক্ষে তুমি কথা বলছ সে-শ্রেণীই তোমাকে পৃথিবীর সত্য ইতিহাস শেখাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তত্ত্বটা হচ্ছে সমাজে দ্বন্দ্ব আছে, এই দ্বন্দ্ব সার্বক্ষণিক। অতএব গতি ও পরিবর্তনও সার্বক্ষণিক। কাজেই চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়, আপনি গ্রাম চেনেন না, গ্রাম বদলে গেছে। না বদলালেও তত্ত্ব বলছে বদলানো উচিত।

মৃদু হাসিতে কামালের মুখ ভরে ওঠে, কোমল গলায় বলে, তুমি কি বলতে চাও যা শিখেছো তা মিথ্যে?

না, বোধহয় মিথ্যে নয়।

আবার বোধহয় কেন?

এই কথাগুলো সত্যি বলে বুঝতে গেলে যে-পথে হাঁটার দরকার ছিল, সে-পথে আমরা কখনো হাঁটিনি। কিছু স্বতঃসিদ্ধ বাক্য ছাড়া আমরা কিছুই পড়িনি, অন্যদিকে কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেরা ঐ বাক্যগুলিতে পৌঁছোবার পথও ধরতে পারিনি।

তুমি যাকে স্বতঃসিদ্ধ বলছো, তার পেছনে কি দুর্জয় সংগ্রাম ছিল তুমি জানো? কি প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা?

তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তাতে আমার লাভ কি? জনগণ বিপ্লবী, এই কথাটা ধরে নেয়া নিশ্চয় ঠিক। কিন্তু তাতেই আমার দেশের জনগণ বিপ্লবী হয়ে ওঠে না এবং বিপ্লবও ঘটে না। আপনি বলতে পারেন লোকেরা আমাদের

বিশ্বাস করেনি। কেন? আমি জনগণের বলে আপনি গলা ফাটিয়ে মরলেন, জনগণের ভিতরে বসে ঐ একই গীত গাইলেন, কিন্তু জনগণ আপনাকে তাদের মনে করল না কেন? ভিতরে ভিতরে দম্ভ, গাড়লের মতো অহংকার, আমি জনগণের নেতা!

তোমার কিন্তু এইসব কথা বলার কোনো অধিকার নেই।

রাজনীতি ছেড়ে দেবার পর আমি কখনও এসব কথা বলি না তো। কথাটা উঠে পড়ল তাই। মাঝে মাঝে ভাবি আমি গিয়েছিলাম কেন! বয়েস আর বুদ্ধি কম ছিল বলে? নাকি অ্যাডভেঞ্চারের মোহ? বিকাশ শিউরে ওঠে, আমার মনে পড়ছে আমি···

কি বল তো—কামাল উঠে বসে।

না থাকগে। কিন্তু আমি ফিরে এলাম কেন? আপনি বলুন এজন্যে আমিই সম্পূর্ণ দায়ী? আর কারো কোনো দায়িত্ব নেই? বিকাশের চোখ লাল হয়ে ওঠে। আপনি তো তখন দু-চারটে প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ লিখতেন আমাদের জন্যে, আমাকে বলুন না!

আমি কখনো রাজনীতিতে যাইনি তোমাদের মতো!

বাঃ, দায়িত্ব শেষ আপনার, তাই না? কিছুই করিনি, কাজেই আমার কাজে কোনো ভুল হয়নি। বাঃ চমৎকার।

সে কথা বলছি না। যে কথা তুমি আজ বলছো, তা আমি বুঝবো কি করে? আমি তো তোমার ঐ পথটা দিয়ে যাইনি। তোমার যেটা তেতো লাগছে, সেটা তুমি খেয়ে দেখেছ বলে। তবে বুদ্ধি-টুদ্ধি খাটিয়ে আমাকেও ব্যাখ্যা বের করতে হয় বইকি। ঐখানেই যা একটু বিবেক কাজ করে। মোদ্দা কথাটা এই বুঝছি যে ভুল যা হয়, আমাদেরই হয়—অন্যদের হিসেবে কখনো ভুল হয় না। শোষকরা বুদ্ধির দোষে ভুল করে জনগণকে সুবিধে দিয়ে ফেলল এমন কোনোদিন দেখেছ কি? কখনো ঘটে? অথচ গাঁয়ের দরজা তোমাদের জন্যে আজ বন্ধ।

আপনার জন্যেও।

সে তো অবশ্যই। অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমি সরে এসেছি।

সরে এসেছি আমিও।

একটু পরে কামাল বলে—বিকাশ, এই প্রসঙ্গটা বন্ধ করো। বুকের ভিতর আমার এই দেশের কোটি কোটি মানুষের ছবি। কথা বলার অধিকার সেটাই, আর সেটা কোনো অধিকার নয়। গাঁয়ে ঢোকার মুখটায় উঁকি দিতেও আমার

ভয় করল।

কামাল আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে। জোরে নিঃশ্বাস পড়তে থাকে তার। বুকের ব্যথাটা বাড়ছে।

বিকাশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। শরীর খারাপ লাগছে নাকি আপনার?

না, বিব্রত মুখে কামাল বলে, মাঝে মাঝে ও-রকম একটু ব্যথা করে ওঠে। থেমে যাবে এক্ষুনি।

কিন্তু ব্যথাটা বাড়তে থাকে। তার কপালে বিনবিনে ঘাম জমে, হু হু করে জ্বলতে থাকে সে। বুকের বাঁ-দিকটায় ছোট্ট একটি জায়গায় ছোরা বেঁধানো ব্যথা। সেখান থেকে ব্যথাটা ছড়াতে থাকে সরু সরু আঁকাবাঁকা পথে। বিকাশ আকাশের দিকে চেয়ে দেখে। কালো আকাশ তারায় ভরা। মাঠের অন্ধকার নক্ষত্র আর ছায়াপথের আলোয় আবছা। স্তব্ধতার মধ্যে একবার বাতাস ওঠার শব্দ শোনা গেল। কুঁড়ে থেকে একটু দূরে ঝোপের ভিতরে একজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। শিয়ালটা ফিরে এসেছে। নিশ্চয় এখানে কোথাও ওর বাচ্চা-টাচ্চা আছে। বিকাশ হুস করে শব্দ করে উঠে একবার। আলো-জ্বলা চোখ দুটি ডুবে যায়। পট পট শব্দ হতেই বিকাশ চেয়ে দেখে মোমবাতিটা নিবছে। সে জানে, তার ঝোলায় আর কোনো মোমবাতি নেই।

এই বইটি নিয়ে হাসান আজিজুল হক-এর দুটি বই প্রকাশ করল অনুষ্টুপ। অন্য বইটি হলো 'সক্রেটিস'। আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুই বাংলাকে আলাদা করে দেখি না। আমরা মনে করি এ-দুটি সাহিত্যের দুটি ধারা। বাংলা সাহিত্য সারা পৃথিবীতে বঙ্গভাষীদের অবিভাজ্য সম্পদ।

হাসান আজিজুল হক এই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন প্রকাশ করতে পেরে অনুষ্টুপ গর্বিত। আশা করা যায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত সময়ের হাসানের লেখা গল্পের এই নির্বাচিত সংকলন পাঠকের ভালো লাগবে।

ISBN : 81-85479-36-4